প্রচ্ছদ : মদন সরকার

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৪৯



প্রকাশিকা : সান্ত্বনা দে / পত্রপুট / ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

মুদ্রাকর : শ্রীসরোজকুমার রায়, শ্রীমুদ্রণালয়, ১২ বিনোদ সাহা লেন, কলিকা[redacted]

উৎসর্গ

শ্রীমতী কনকনলিনী দে
শ্রীমতী কনকলতা রায়চৌধুরী

যাঁদের অফুরন্ত স্নেহ-ভালবাসায় আমি আবাল্য ঋণী

প্রথম পর্ব

নিকষ কালো রাত। আকাশে একটিও তারা নেই। নিঃসঙ্গ একজন মানুষ মার্সিয়েন থেকে মঁস্যুর পথে হাঁটছিল। দু ধারে বিস্তীর্ণ বীটের ক্ষেত। তার সামনে যতদূর চোখ যায় শুধুই আঁধার। মাঝে মাঝে শোঁ শোঁ করে বাতাস বইছে। মার্চের রাত। কনকনে ঠাণ্ডায় হাত পা যেন জমে যায়। দিগন্তের আভাস তো মেলে না! এ পথের শেষ কোথায়? গাছপালার ছায়াও চোখে পড়ে না অন্ধকার আকাশের গায়ে। সোজা রুক্ষ পথ এগিয়ে গেছে যেন কোন অচেনা জগতের দিকে।

এই ছেলেটি পথে বেরিয়েছে বেলা দুটো আন্দাজ। পরনে পাতলা সুতীর কোট আর কর্ডরয়ের প্যাণ্ট। বড় চৌখুপী নক্সাকাটা একটা রুমালে বাঁধা টুকিটাকি জিনিস-পত্তর। একবার পুঁটলিটা ডান হাতের কব্জিতে ঝোলায়, একবার বাঁ হাতে—যাতে পালা করে দুটো হাতই প্যাণ্টের পকেটে ঢুকিয়ে গরম করে নেওয়া যায়। বাড়ি-ঘর নেই, কাজের জাযগা থেকে গলাধাক্কা দিয়েছে। কোনো প্রত্যাশা নেই আর—এখন শুধু সূর্যোদয়ের অপেক্ষা। রোদ্দুরে হিম গলে যাবে, পথ চলা হবে অনেক সহজ। প্রায় ঘণ্টাখানেক হল একটুও না থেমে সে হাঁটছে। এখন মঁস্যুর মাইল দুয়েকের মধ্যে পৌঁছে গেছে। হঠাৎ বাঁ দিকে চোখ পড়ল তার—এ কি! তিনটে গনগনে লাল আলো—ওই দূরে দেখা যায। ভয়ে হাত পা সিঁটিযে গেল তার। শেষে কি অপদেবতার খপ্পরে পড়লাম! কিন্তু ঠাণ্ডায যে প্রাণ যায়! ওগুলো বোধহয় আগুনের আভাস। হাত পা একটু গরম না করলে তো পথ চলাই দায় হয়ে উঠবে! সে আর নিজেকে সংযত রাখতে পারছিল না যেন।

পথটা হঠাৎ বেঁকে গেল। মিলিয়ে গেল আলোগুলো। ডানদিকে একটা বেড়া, ঠিক বেড়াও নয়—অনেকটা উঁচু করে ঘিরে রাখা হয়েছে চৌহদ্দিটা, রেলগাড়ির লোহা-লক্কড় রাখবার জায়গার মতো। বাঁ দিকে ইতস্তত ছড়ানো মেঠো চালাঘর—যেন হঠাৎ গজিয়ে ওঠা খুদে একটা গ্রাম। দুশো পা হেঁটে একটা মোড় ঘুরল সে। এবার যেন আলোগুলো পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—দপ দপ করে জ্বলছে আকাশের গাযে, ধোঁয়াটে চাঁদের আলোর মতো। হঠাৎ চোখে পড়ল মাটির ওপর নীচু নীচু একসার বাড়ি। এছাড়া যেন অনেকটা কলকারখানার চিমনিরও আদল পাওয়া যায়। দূরে দূরে কয়েকটা জানলায় টিমটিমে আলো, বাইরের চত্বরে খুঁটিতে বাঁধা পাঁচ-ছ'টা কালিপড়া লণ্ঠন। এই রকম ভূতুড়ে গা-ছমছমে আবহাওয়ার মধ্যে কানে আসে শুধুমাত্র ধোঁয়ানিকাশী নলের একটানা ঘরঘর শব্দ।

এতক্ষণ পরে ছেলেটি বুঝতে পারল সে খনি অঞ্চলে এসে পড়েছে। হতাশায় বিবর্ণ হল তার চোখ-মুখ। গলার ভেতর পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। [illegible]

হল ? এখানে তো কাজকর্ম মিলবে না ! নীচু নীচু বাড়িগুলোর দিকে না গিয়ে যেখানে গনগনে চুল্লীর কাছে বসে মজুররা তাদের হাত পা গরম করছিল, সেইদিকেই গুটি গুটি এগিয়ে চলল সে। এত রাতেও শিথিল কর্মব্যস্ততা। মজুরেরা ঝুড়ি ভর্তি করে কয়লা খালাস করছে আগুনের পাশে। প্রায় ভোর হয়ে এল।

ছেলেটি পাশের একজন মজুরকে বলল, সুপ্রভাত।

এই মজুরটি বৃদ্ধ। নোংরা বেগুনী রংয়ের জামা আর জীর্ণ একটা টুপি পরা। আগুনের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। তার বড ঘিয়ে রংয়ের ঘোড়াটা ঠিক যেন একটা নিষ্প্রাণ মূর্তি। এইমাত্র যে ছ'টা বালতি ভর্তি মাল উঠল, সেগুলো খালাস না করা পর্যন্ত অপেক্ষা তো করতেই হবে। যে লোকটা মাল খালাসের কাজে ব্যস্ত ছিল সে লালচুলো, অল্পবয়স্ক। প্রায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাজ করছে। হাতের সঙ্গে মনের যোগ নেই কোনো। মাথার ওপরে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস—হাড় পর্যন্ত কাঁপুনি ধরায়।

বুড়ো মজুরটি প্রতিসম্ভাষণ জানালো। খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। তারপর বৃদ্ধটির জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখে ছেলেটি আর স্থির থাকতে পারল না।

—আমার নাম এতিয়েন লঁতিয়ে। আমি মিস্ত্রী। কাজকর্ম খালি আছে কিছু ?

লালচে আগুনের আভায় ছেলেটিকে এতক্ষণে স্পষ্ট দেখা গেল। বছর একুশ বয়সের যুবক। গায়ের রং গাঢ তামাটে। সুদর্শন আর শক্তসমর্থ চেহারার।

বৃদ্ধ মাথা নাড়ল।

—কাজ ? দু দু'জন এসে ঘুরে গেছে। এখানে তেমন সুবিধে হবে না।

দমকা বাতাসের ঝাপটায় দু'জনের কথা বন্ধ হয়ে গেল।

একটা অন্ধকার গভীর গর্ত দেখিয়ে এতিয়েন লঁতিয়ে বলল, এটা একটা খনি না ?

বুড়ো লোকটা কাশির দমকে খানিকক্ষণ কথা বলতে পারল না। তারপর বিকৃত মুখে একদলা থুথু ফেলল। আগুনের আভায় লালচে হয়ে থাকা মাটিতে খানিকটা জায়গায় যেন কালি ঢেলে দিল কেউ।

—হ্যাঁ ; এটা খনিই—ল্য ভোর্য়। ওই দেখ, দূরে আমাদের বসতি দেখা যায়।

ঘাড় ঘুরিয়ে নজর করল এতিয়েন। ও আগে যা ভেবেছিল, তাই। সেই ছোট ছোট চালাঘরগুলো। কিন্তু এর মধ্যেই ছ'টা ঝুড়ির মাল নেমে গেছে। বুড়ো লোকটা কথা বলবার জন্য দাঁড়ালো না আর। কেঠো কেঠো বেতো পায়ে খটখট করে হাঁটতে লাগল নিজের ধান্দায়—ঘোড়াটাও যেন নিছক অভ্যাসবশতই কোনো আদেশের অপেক্ষা ছাড়াই প্রভুর পিছু নিল। কাজ করে করে হাড়-জিরজিরে হয়ে গেছে জন্তুটা, আজকাল আর বেতও লাগে না। ওর ঘাড়ের কেশরগুলো বাতাসে ফুলে ফেঁপে উঠছিল।

[illegible] ঘুমালু চোখে এতিয়েন তাকিয়ে ছিল আস্তে আস্তে কেটে যাওয়া অন্ধকারের [illegible] ল্য ভোর্য় ছবির মতো স্পষ্ট হচ্ছে ক্রমশ। ত্রিপল ঘেরা খানিকটা শেড, হেড [illegible] বিরাট ওয়াইন্ডিং-হাউস, ড্রেনেজ পাম্পের চৌকোণা টাওয়ার। চালু জমিতে

লাল ইঁটের তৈরি বাড়ি। চিমনিগুলো রাগী ষাঁড়ের শিংয়ের মতো উঁচু হযে রয়েছে। খনির খাদটা ভয়ংকর চেহারার। পৃথিবীর সবকিছু গিলে খাবার জন্য যেন বিরাট একটা হাঁ করে রয়েছে। একদৃষ্টে সেদিকে তাকিযে থাকতে থাকতে এতিয়েন ওর নিজের কথা মনে মনে ভাবছিল। গত সপ্তাহটা ধরে একটা যে কোনো ধরনের চাকরির আশায সে হন্যে হয়ে ঘুরছে। চোখ বুজলেই সামনে ভাসে ছবিটা—সবাই তার পেছনে নানা ছুতোয় লাথি মারবার জন্য বুটসুদ্ধ পা উঁচিয়েই আছে। গত শনিবার থেকে হাঘরে হাভাতের মতো কোথায় না সে ঘুরে বেড়িয়েছে, কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী বিরূপমনা—সব জাযগাতেই তার মুখের ওপর সামান্যতম সুযোগ আর সাফল্যের দরজাটা বন্ধ। রবিবার কোথাও মাথা গোঁজবার ঠাঁই না পেয়ে শেষে একটা রেল-ইয়ার্ডে শুয়ে ছিল। সেখান থেকেও গলাধাক্কা খেয়েছে। আর এখন খালি পেট, পকেটে একটা ফুটো পয়সারও সম্বল নেই—এই রকম অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। কোথায যাবে, কি করবে। চিন্তায়, আতঙ্কে এতিয়েনের প্রায পাগলের মতো অবস্থা হযে যাচ্ছিল।

এখন অন্ধকার কেটে যাবার পর এখানে ওখানে কতকগুলো লণ্ঠনের আলো পুরো খনি অঞ্চলটাকে অনেকটাই স্পষ্ট করে তুলেছে। এতিয়েনের উপস্থিতি সম্পর্কে সকলেই নির্বিকার। হঠাৎ দূর থেকে একটা দমকা কাশির আওয়াজ শোনা গেল। সেই বুড়োটা আসছে। পিছু পিছু ঘি রংযের ঘোড়াটা, পিঠে মালবোঝাই আরও ছ'টা ঝুড়ি চাপানো।

—আচ্ছা, এখানে কি কোনো কলকারখানা আছে?

বুড়োটা পিচ করে একদলা থুথু ফেলল। বাতাস কেটে তার খনখনে গলার আওয়াজ কানে ভেসে এল।

—হ্যাঁ, কলকারখানায় তো ছেযে গেছে এই জাযগাটা। তিন-চার বছর আগে অবস্থা একদম অন্যরকম ছিল। তখন চাহিদামতো লোক পাওয়া যেত না, লাভের অংশও কম থাকত। আর এখন লোক বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে নিত্যি মজুর ছাঁটাই লেগেই আছে। আমি বলছি না যে এগুলো শাসন ব্যবস্থার দোষ, তাহলেও দেশের সম্রাট এবং কর্তাব্যক্তিদের এ নিযে কিছুটা মাথাব্যথা থাকাই উচিত।

এরপর দু'জনে কিছুক্ষণ টুকটাক কথাবার্তা চালালো। এমন শোঁ শোঁ করে বাতাস বইছে যে কান পাতলেও পাশের লোকের কথা স্পষ্ট ভাবে শোনা যায় না। এতিয়েন নিজের দুরবস্থা, অভাব এ সব কিছুই সাড়ম্বরে ব্যাখ্যা করছিল।

—কিছুদিন পরেই তো মনে হয় অবস্থা এমন দাঁড়াবে যে রাস্তায় ভিখিরীদের ভীড়ে আর পা ফেলা যাবে না।

বুড়ো লোকটা ঘাড় নেড়ে সায় দিল এ কথায়।

—মাংস তো রোজ জোটেই না।

—আরে রুটি জুটলেও তো বাঁচা যায়।

—হ্যাঁ, তা অবশ্য সত্যি। নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।

দূর থেকে একটা অস্পষ্ট হৈ-হল্লার আওয়াজে দু'জনের গলার স্বর ডুবে গেল।

হঠাৎ দক্ষিণমুখো হয়ে বুড়োটা চেঁচিয়ে উঠল, ওই দেখ, মঁস্যু দেখা যাচ্ছে।

কয়েকবার চোখ পিটপিট করেও এতিয়েন তেমন কিছু নজর করতে পারল না। বুড়োটা কিন্তু কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বকেই যাচ্ছিল একটানা।

—'ফোভেল' চিনির কারখানা এখনো পুরোদমে চলছে কিন্তু 'ওতোঁ' (এটাও চিনি উৎপাদন করে) প্রচুর ছাঁটাই করেছে। 'দ্যুতিয়্যু' ময়দাকল আর 'ব্লজ্' কেব্ল-ওয়ার্কস ছাড়া আর কোথাও কাজকর্ম তেমন কিছু হচ্ছে না বললেই চলে। সোনভিল বিল্ডিং ফার্ম যে পরিমাণ কাজকর্মের অর্ডার পায় এবার তার দুই-তৃতীয়াংশও পায়নি। মার্শিয়েন ফর্জ্-এর তিনটে তাপচুল্লীর মধ্যে চালু আছে দুটো। 'গ্যাগবোয়া' কাঁচের কারখানায় দিনমজুরি কমিয়ে দেওয়া হবে বলাতে শ্রমিকেরা ধর্মঘটের হুমকি দিয়েছে।

প্রতিবার একটা করে খবর শোনার পর অধৈর্যভাবে হাত নাড়ছিল তরুণটি।

—জানি, জানি। আমি তো ওই জায়গা থেকেই এসেছি।

—এখনো পর্যন্ত আমাদের পক্ষে ঠিক আছে। কিন্তু এই সব খনিতেও উৎপাদন কমে গেছে। কাজেই ভবিষ্যতে যে কি হবে কেউ বলতে পারে না। লা ভিক্তোয়ার-এ মাত্র দুটো কয়লার চুল্লী জ্বলে। সুতরাং অবস্থা খুব খারাপ।

বুড়ো লোকটা আবার একদলা থুথু ফেলল। তারপর ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে গেল খানিক দূরে খালি ঝুড়িগুলোর সামনে অপেক্ষা করে থাকা ঘোড়াটার দিকে।

এতিয়েনের চোখে এখন গোটা অঞ্চলটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখনও অবশ্য যথেষ্ট অন্ধকার রয়ে গেছে ; কিন্তু ওই বুড়ো লোকটা যে অভাব-অনটনগ্রস্ত দুঃখময় জীবনের বর্ণনা দিয়েছে তাতে চোখের, মনের সব তমসাই কেটে গেছে। আকাশে বাতাসে অবহেলিতের বুকচাপা কান্নার সুস্পষ্ট অনুরণন। প্রকৃতির আগ্রাসী ক্ষুধার শিকার এইসব খনির মজুররা। দু চোখ্ মেলে দেখতে সাধ যায় কিন্তু পরক্ষণেই ভয়ে চোখ বুজে ফেলতে হয়। সবকিছু যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে এই অন্ধকারে —শুধু রাগী অসহায় মানুষের রক্তচক্ষুর মতো গনগনে হয়ে জ্বলছে তাপচুল্লীগুলো। চিমনির মাথায় লালচে বিন্দুর মতো আগুনের ফুলকি—আকাশের গায়ে যেন তারা হয়ে ফুটে আছে। নিজের মনে মগ্ন হয়ে ছিল এতিয়েন। পেছন থেকে বুড়ো লোকটার গলার আওয়াজে চমক ভাঙলো।

—তুমি বুঝি বেলজিয়াম থেকে আসছ?

এইবার মাত্র তিন ঝুড়ি কয়লা এনেছে সে। খনিতে ছোটখাটো একটা যান্ত্রিক গোলযোগ ঘটেছে—মিনিট পনেরো কাজ বন্ধ থাকবে। কিন্তু আপাতত এই ঝুড়িগুলো [illegible]লি করতে হবে। মজুরদের তৎপরতার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না আর। শুধু ধাতব [illegible]তের ওপর হাতুড়ি পেটার শব্দ।

—না, আমি দক্ষিণের বাসিন্দা।

[illegible]টার ওপর মাল খালাস করবার ভার দেওয়া আছে সে বিরস মুখে

তাকালো। বুড়োর কাণ্ড দেখ! আনকোরা ছোকরা দেখেই মজে গেছে। সাধে কি আর বলে বয়স হলে ভীমরতি হয়।

—আমি অবশ্য মঁস্যুরই বাসিন্দা। সবাই আমায় বোন্‌মর মায়্য্ বলে জানে।

—এ আবার কি রকম নাম!

—আসলে তিন-তিনবার আমি মরতে মরতে বেঁচে গেছি। লোকে দেখল আমি যমেরও অরুচি। তাই ঠাট্টা করে।

বুড়ো লোকটাকে আজ যেন কথায় পেয়ে বসেছে। দমকা কাশির আওয়াজে কথার টানে ভাঁটা পড়ছে মাঝে মাঝে; তাতেও কোনো ক্লান্তি নেই। মস্ত বড মাথা, কয়েকগাছা পাকা চুলের আভাস। চাপা নাক মুখ, নীল শিরাগুলো বেরিয়ে এসেছে। বেঁটেখাটো গড়ন, এখনো শক্ত রয়েছে ঘাড়টা। পা দুটো পরিশ্রমে, ক্লান্তিতে কেমন যেন বেঁকে গেছে, চেটানো হাতগুলো আজানুলম্বিত। যেন পাথরে কোঁদা মূর্তি—শত দুর্যোগেও যাকে টলানো যায় না, শুধু দমকা বাতাসে মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে—প্রমাণ করছে সে জ্যান্ত। এমন কাশছে যে বুকটা ওঠানামা করছে হাপরের মতো, এখুনি বোধহয় প্রাণপাখি বেরিয়ে পড়বে পাঁজরের জীর্ণ খাঁচাটা থেকে।

এতিয়েন একবার বুড়োটার দিকে তাকালো, আর একবার মাটিতে জমে ওঠা থুথুর দিকে।

—তুমি কি অনেকদিন খনিতে কাজ করছ?

দু হাত বাড়িয়ে দিল বুড়ো লোকটা, যেন এ ধরনের ছেলেমানুষী কথা আশাই করেনি ও।

—অনেক দিন! যখন আমি প্রথম খনির নীচে নামি, আমার বয়স তখন আটও পেরোয়নি। ওই খনিটাও ল্য ভোরা-এ। এখন আমার বয়স আটান্ন। আমার পক্ষে যা যা করা সম্ভব ছিল তাই করেছি। একদম শিশু-শ্রমিক থেকে শুরু করে কয়লা বোঝাই, গাড়ি ঠেলার কাজ, তারপর আঠারো বছর ধরে কয়লা ভাঙা, গুছিয়ে তোলা, মেরামতির কাজ—কিছুই বাদ যায়নি। শেষে ডাক্তার বলল, পরিশ্রম না কমালে সমূহ বিপদ। তাই আপাতত মাল চালানের কাজ করছি। পঞ্চাশ বছরের খনির জীবন, তার মধ্যে পঁয়তাল্লিশ বছরই কেটেছে মাটির নীচে। খুব খারাপ নয়, কি বলো?

আগুনে তেতে ওঠা কয়লার টুকরোর লালচে আভায় উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল বুড়োর চোখ দুটো।

সে বলে চলল, সবাই বলছে আমাকে বিশ্রাম নিতে। কিন্তু আমি অত বোকা নাকি! কোনোক্রমে আর দুটো বছর কাটাতে পারলেই একশো আশি ফ্রাঁ পেনশন মিলবে। আর এই মুহূর্তে কাজ ছেড়ে দিলে একশো পঞ্চাশের বেশী জুটবে না। পা দুটোই যা মাঝে মাঝে নেমকহারামি করে। না হলে আমি তো বেশ ভা[illegible] আছি। আসলে জলের কাজ এত বেশী করতে হয়েছে যে পা দুখানা [illegible] একেবারে। কোনোদিন হয়ত দেখব নড়াচড়ার ক্ষমতাই নেই।

আবার কাশতে কাশতে হাঁপিয়ে উঠল বুড়োটা।

—আর তার থেকেই বুঝি কাশিটা হয়েছে ?

—আরে না না। গত মাস থেকে ঠাণ্ডা লেগে এই অবস্থা। আগে কখনো এমনটি হয়নি। কিছুতেই সারছে না। আর মজাটা এমন—যতবারই থুথু ফেলি ··

—রক্ত ?

—দূর্! কয়লা! কয়লা! তার মানে এই পঞ্চাশ বছরে পেটে এত কয়লা জমেছে যা শীতকালে আমার শরীরকে গরম রাখার পক্ষে যথেষ্ট। আর অদ্ভুত ব্যাপার হল গত পাঁচ বছর যাবৎ আমি খনিতে নামিনি। তার মানে আমার অজান্তেই শরীরের ভেতরটা কয়লাব কারখানা হয়ে গেছে। অবশ্য শরীর এখনও ভালোই আছে।

দূর থেকে হাতুড়ির শব্দ ভেসে আসছিল। বাতাসেব শনশনানি একটুও কমেনি। বুড়ো লোকটাকে পুবনো দিনের কথার নেশায় পেয়ে বসেছিল। সবকিছুই যেন ছবির মতো চোখের সামনে ভাসে। সে এবং তাব পুরো পরিবাব বংশপবম্পরায় এই খনির আদি ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত। তার ঠাকুর্দা পনেরো বছব বয়সে প্রথম কাজ করতে আসেন। শক্তসমর্থ মানুষ ছিলেন। ষাট বছর বয়সে মারা যান। তারপর তার বাবা নিকোলাস মায়্য। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সেই তাব খনিব জীবন শেষ হয়ে যায়। ছাদ চাপা পড়ে দেহটা একেবারে চ্যাপ্টা হয়ে গিয়েছিল। তারপর দুই কাকা এবং তিন ভাই ওই খনিব মধ্যেই প্রাণ হারিয়েছে। আব সে, ভিনসেণ্ট মায়্য, এখনো পর্যন্ত ঠিকই করে খাচ্ছে। রুটিব যোগাড তো করতেই হবে, তাই না ? তার ছেলে তুসঁ্যা আর নাতি-নাতনীরা তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে।

এতিয়েন বলল, তবু তো দু বেলা খাওয়া জুটছে ?

—তা তো বটেই। সেজন্যই মুখ বুজে সহ্য করা যায়।

—এই মালিকরা কি বড়লোক ?

—তা কিছুটা তো বটেই। অঁজাঁ কোম্পানির মতো নয় অবশ্য। তাহলেও লাখ লাখ টাকার কারবার তো চলছে। উনিশটা খনি। তেরোটার কাজ চলছে পুরোদমে। দশ হাজার লোক কাজ করে। প্রতিদিন কয়লা ওঠে পঞ্চাশ হাজার টন। নিজেদের কারখানা। ওঃ, টাকায় তো শুয়ে আছে একেবারে।

বড ঘিয়ে রংয়ের ঘোড়াটা কান খাড়া করল। নীচে মজুরদের ব্যস্ততা টের পাওয়া যাচ্ছে। যান্ত্রিক গোলযোগ ঢুকে গেছে বোধহয়। ঘোড়াটাব পিঠ চাপড়ালো বুড়ো।

—বুঝলি, কক্ষণো কাজে ফাঁকি দিয়ে আড্ডা দিবি না। যদি মঁসিয় এন্‌বো টের [redacted]ায়ে যান !

এতিয়েন জিজ্ঞেস করল, উনিই বুঝি সর্বেসর্বা ?

—আরে না না। উনি তো ম্যানেজার। আমাদেব মতোই মাইনে-করা [redacted]। তবে কি না অনেক ওপর তলার লোক।

[redacted] নাড়ল এতিয়েন।

—তাহলে আসল মালিকটা কে?

সেই মুহূর্তে আবার কাশি। কথা বলতে পারছিল না বুড়োটা। হাতের উল্টো পিঠে কয়লামাখা লালা মুছে বাতাস কাঁপিয়ে খনখনে গলায় বলল, কারা আবার? আমরা!

সে আঙুল তুললো অদূরে শ্রমিক বসতির দিকে—একশো ছ বছরেও অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। মজুররা সপরিবারে নিজেদের অস্থিমজ্জা রক্তমাংসের বিনিময়ে নির্বিবাদে শুধু মন মন কয়লাই তুলে গেছে।

এতিয়েন বলল, তবু তো পেটটা ভরে!

—হা ভগবান! আমি কি তা অস্বীকার করেছি? দু বেলা দু মুঠো পেটে পড়লে জীবন নিয়ে যে কোনো ধরনের জুয়োই খেলা যায়।

ঘোড়াটা চলতে শুরু করল। তার মালিকও শীর্ণ পা দুটো টেনে টেনে হাঁটতে লাগল সামনের দিকে। মাল খালাস করবার লোকটা দু হাঁটুতে মুখ রেখে শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়েছিল।

এতিয়েন বোঝাটা পিঠে ফেলতে গিয়েও ফেলল না। আগুনের তাতে বুকটা গরম হয়ে উঠেছে। কিন্তু পিঠটা যেন জমে যায়। যা কপালে থাকে, এখানে একবার চাকরির আবেদন করতে তো দোষ নেই। হয়ত বুড়োটা সব কথা জানেও না। যে কোনো রকম একটা কাজের দরকার শুধু। এ ভাবে রাস্তার কুকুরের মতো না খেয়ে সে কিছুতেই মরতে পারবে না।

তবুও কোথায় যেন তার মনে একটা দ্বিধা ছিল। এই কয়লা খনির জীবন তার শরীর আর মনের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে। দিগন্তে নেই সূর্যোদয়ের ইশারা। আকাশ মৃত। শুধু কয়লা আর আগুনের লালচে ছায়া অদ্ভুত ভূতুড়ে একটা পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। বুভুক্ষু, রক্তলোলুপ খনির এই হাতছানি সে এড়াবে কি করে?

দুশো চল্লিশ নম্বর কলোনীতে তখনো কারও ঘুম ভাঙেনি। চারটে বড় বাড়ি, তাতে পায়রার খোপের মতো ঘর—কান পাতলে শুধু শোনা যায় বেড়ার গায়ে গাছের পাতার খসখসানি।

দ্বিতীয় বাড়িটার ষোলো নম্বরে কারও কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। দোতলার ঘরটাতে জমাট বাঁধা অন্ধকার। হাঁ করে গাদাগাদি করে শুয়ে আছে সকলে ভেড়া-ছাগলের মতো। ক্লান্তিতে সাড় নেই কারো। বাইরে বাতাস হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দেয় আর এখানে নিঃশ্বাসে ঘর গরম হয়ে আছে। যে দিকে তাকাও শুধু তাল তাল মানুষের মাংস।

নীচে ঘড়িতে চারটে বাজার আওয়াজ পাওয়া গেল। তখনো সবাই ঘুমে [illegible] —হালকা নিঃশ্বাসের শব্দ। মাঝে মাঝে নাক ডাকার আওয়াজ। হঠাৎ [illegible] উঠে বসল ক্যাথরিন। ঘুমের মধ্যে চারটে বাজার আওয়াজ কানে [illegible]

প্রতিদিনের অভ্যেস তো ! হাতে পায়ে জোর পাচ্ছিল না সে। ওঃ ভগবান ! হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে পা দুটো বিছানা থেকে বের করে আনলো—দেশলায়ের বাক্সের জন্য হাতড়াতে লাগল। তারপর দপ করে জ্বলে উঠল একটা মোমবাতি। মাথায় যেন একশোটা লোহার বল চাপিয়ে দিয়েছে কেউ, টলে যাচ্ছে কাঁধের দু'ধারে। হা ভগবান, বালিশে যদি মাথাটা আর একটু রাখা যেত!

মোমের আলোয় ঘরের একাংশ স্পষ্ট হল। চৌকোণা ঘর। দুটো জানলা। তিনটে খাটেই প্রায় পুরো জায়গাটা ভর্তি হয়ে গেছে। এ ছাড়া একটা দেওয়াল-আলমারি, একটা টেবিল, দুটো পুরনো আখরোট কাঠের চেয়ার। দেওয়ালের রং বিবর্ণ হয়ে গেছে। খুব ভালো করে নজর করলে বোঝা যায় কোনো একসময় বোধহয় ঘিয়ে রংয়ের ছিল। ব্যস্, এ ছাড়া আর কোনো আসবাবপত্র নেই। পেরেকে ঝোলানো জামা-কাপড়, মাটিতে একটা জলের পাত্র, মুখ ধোওয়ার জন্য একটা লাল মাটির বেসিন।

বিছানার বাঁ দিক ঘেঁষে শুয়ে আছে সবচেয়ে বড় ছেলে জাশারী, সঙ্গে এগারো বছরের ভাই জঁল্যাঁ। ডান দিকের খাটে লেনোর্ আর অঁরি—একজনের বয়স ছয়, অন্যজনের চার, জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে। অন্য খাটটাতে ক্যাথরিন আর তার ন' বছরের অপুষ্ট বোন আলজির্। তার অবশ্য থাকা না-থাকা সমান। এত শীর্ণ, শুকনো যে চট করে কারুর নজরেই পড়বে না। খোলা কাঁচের দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সরু প্যাসেজ—সেখানে বাবা মা আর তাদের সবচেয়ে ছোট তিন মাসের শিশু-সন্তান এস্তেল।

ক্যাথরিন প্রাণপণ শক্তিতে হাত পায়ের খিল ছাড়াতে লাগল। আঙুল চালালো জটে ভরা লালচে চুলে। তাকে দেখলে মনেই হয় না পনেরো বছর বয়স। সারা গা ঢাকা রাতপোশাকে। শুধু চোখে পড়ে কয়লা ঘেঁটে ঘেঁটে দাগ ধরে যাওয়া খুদে খুদে পায়ের পাতা, ফর্সা শিরা-ওঠা দুটো হাত—যার জায়গায় জায়গায় কালির ছোপ। বারবার সস্তা সাবান ব্যবহার করে মুখটা রুক্ষ হয়ে গেছে। বিরাট হাই তুললো সে—ঝকঝকে সাদা দাঁতের সারি। ধূসর শ্রান্ত চোখ দুটো যেন সব সময়ই জলে ভরে আছে, তাতে রাজ্যের ঘুম জড়ানো।

হঠাৎ বাইরে থেকে তুসাঁ মায়্যুর গলার স্বর ভেসে এল।

—সর্বনাশ, এত বেলা হয়ে গেছে ! ক্যাথরিন, পোড়ারমুখি, মোমবাতি জ্বালিয়েছিস ?

—হ্যাঁ বাবা, এই তো সবে চারটে বাজলো।

—কুঁড়ের হদ্দ একেবারে! কালকে অত রাত পর্যন্ত ফুর্তি না করলে তো আজ একটু আগেও ওঠা যেত। কাজে ঠিকমতো না গেলে পিণ্ডির যোগাড় হবে কি করে !

গজগজ করতে লাগল সে। ঘুমে আবার দু চোখ জুড়ে এল তার। খানিক পরই [illegible] পড়ে নাক ডাকাতে লাগল।

[illegible] টিপে টিপে মেঝেতে হাঁটছিল ক্যাথরিন। লেনোর্ আর অঁরির গা

থেকে হ্যাঁচকা টানে চাদরটা খুলে ফেলল। কিন্তু ওদের ঘুম ভাঙলো না। আলজির্ বোকা বোকা চোখে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর গড়িয়ে সরে গেল ক্যাথরিনের জায়গায়। তার শরীরের মধুর উত্তাপে বিছানাটা এত আরামের হয়ে আছে এখনো!

—উঠে এস জাশারী! এই জঁলঁ্যা, আয় না।

অনেকবার ডাকল ক্যাথরিন। কিন্তু বালিশে মুখ গুঁজে শুয়েই রইল ওরা।

জাশারীর দু কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিতে থাকল ক্যাথরিন। রাগে চেঁচাতে শুরু করল জাশারী আর সেই ফাঁকে টান মেরে চাদরটা ফেলে দিল ক্যাথরিন। জঁলঁ্যা, অসহায় কিশোর অস্থির আক্রোশে পা দাপাতে লাগল বিছানায়।

চোখ ডলতে ডলতে উঠে বসল জাশারী।

—ছেড়ে দে না আমায় ক্যাথরিন। বোকা মেয়ে কোথাকার! তোর কি ধারণা খুব মজার ব্যাপার এটা? আমি মোটে এসব বরদাস্ত করতে পারি না। ওরে বাবা, এত বেলা হয়ে গেছে!

জাশারী রোগা পাতলা গড়নের। রক্তশূন্যতার ছাপ চোখে মুখে। অল্প দাড়ি-গোঁফের আভাস। শার্টটা কোমর থেকে টেনে নীচের দিকে নামানোর চেষ্টা করল সে। ভদ্রতায় নয়, নিছকই ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য।

ক্যাথরিন বলল, ঘড়ি ঠিকই জানান দিয়েছে। শীগগির উঠে পড়, বাবা রেগে আগুন হয়ে আছে।

জঁলঁ্যা গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ল।

—গোল্লায় যা তুই! এই আমি আবার ঘুমোলাম।

খিলখিল করে হেসে উঠল ক্যাথরিন। দু হাতে কোলে তুলে নিল ওকে। জঁলঁ্যা এত ছোট্ট! শরীরে বাড়ই নেই কোনো। লাথি ছুঁড়ল জঁলঁ্যা, দুষ্টু বুদ্ধিতে ঝিকিয়ে উঠল খুদে খুদে সবুজ চোখ দুটো—রাগে চেঁচিয়ে উঠল। তারপর ক্যাথরি-নের বুকের ডানদিকে দাঁত বসিয়ে দিল।

—শয়তান কোথাকার!

যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে জঁলঁ্যাকে ঝপ করে মাটিতে ফেলে দিল ক্যাথরিন।

আলজির্ নাক পর্যন্ত চাদরে ঢাকা দিয়ে তিন ভাই-বোনের কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিল। ওঃ এত চেঁচামেচিতে কি ঘুমোনো যায়! রাতে চারদিক কি সুন্দর নিস্তব্ধ থাকে, আর দিনের আলো ফুটতে না ফুটতে ঘরটাকে যেন বাজার বানিয়ে ফেলেছে।

ওরা তিনজন বেসিনের সামনে মারপিট করছিল। জাশারী আর জঁলঁ্যার বক্তব্য —ক্যাথরিন মুখ হাত ধোয়া নিয়ে অনর্থক সময় নষ্ট করছে। শেষ পর্যন্ত সবার আগে তৈরি হয়ে গেল ক্যাথরিন। খনিতে পরবার উপযোগী প্যাণ্ট আর মোটা সুতীর জ্যাকেট পরে নিল। চুলগুলো ঝুঁটি বেঁধে মাথায় চাপালো নীল টুপি। দেখে কে বলবে সতেজ কিশোরী!

জাশারী নাক মুখ কুঁচকে বলল, বুড়ো আসুক! দেখিস না, এরকম ল[illegible] দেখলে কি আদর করবে! বলে দেব তুই করেছিস।

'বুড়ো' অর্থে আমাদের পরিচিত ওই বৃদ্ধ বোন্‌মর। সে রাতে খনিতে কাজ করে আর দিনের বেলা ঘুমোয। তাই সারাদিনই বিছানাটা নানা শরীরের তাপে গরম হয়ে থাকে।

কোনো কথা না বলে বিছানা ঠিক করতে শুরু করল ক্যাথরিন। পাশের ঘর থেকে সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে। এখানকার ঘরের দেওয়াল এত পাতলা যে সবাই সবাইকার হাঁড়ির খবর জানতে পারে। শিশুরাও কদর্যতম কেচ্ছার খবর রাখে। সিঁড়িতে দুম দুম করে হেঁটে যাওয়ার শব্দ হল। ক্যাথরিন ঠোঁট টিপে হাসল—লেভাক নেমে গেল। বুতলু উঠে এল। মাদাম লেভাককে এবার সঙ্গ দেবে।

জঁলাঁ থেকে শুরু করে বাচ্চা আলজির্ পর্যন্ত ব্যাপারটা জানে। একজন মজুর তার ঘরটা আর একজনকে ভাড়া দিয়েছে। দু'জনের একজন রাতে কাজ করে, অন্য-জন দিনে। সুতরাং মাদামের খবরদারী করতে এখন একজন আইনসঙ্গত স্বামী ছাড়াও আছে উপপতি।

ক্যাথরিন বলল, ফিলোমিন কাশছে।

ফিলোমিন লেভাকের বড মেয়ে। উনিশ বছরের কৃশাঙ্গী তরুণী, জাশারীর রক্ষিতা এবং এরই মধ্যে দুটো বাচ্চাব মা। তার বুকের ব্যামো আছে বলে খাদে নামতে পারে না, খনির অন্য কাজকর্ম করে।

জাশারী বলল, দূর, ছাখ্ গে যা ও হাঁ করে ঘুমোচ্ছে এখন। বেলা ছ'টা বেজে যায়, ঘুম আর ভাঙে না নবাবজাদীর—আল্‌সে শুযোর একটা!

প্যান্ট পরতে পরতে হ্যাঁচকা টানে জানলা খুলে দিল জাশারী। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার, তবে কান পাতলে মানুষজনের সাড়া পাওয়া যায়। একটা দুটো বাড়ির খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে আস্তে আস্তে আলো জ্বলে উঠতে দেখা যাচ্ছে। আর তার পরই শুরু হল আর একচোট তর্ক। সারসের মতো গলা বাড়িয়ে জাশারী পিয়েরেঁার ঘরের দিকে নজর করতে চেষ্টা করছিল। দঁসের্ নাকি পিয়েরেঁার অনুপস্থিতিতে তার বউয়ের সঙ্গে রাত কাটায। কিন্তু ক্যাথরিন চিল চিৎকার করছে, না, তা হতেই পারে না। পিয়েরেঁার এখন দিনের বেলা কাজ, রাতে বাড়িতেই থাকে। দঁসের্ সে সুযোগই পাবে না!

জানলা দিয়ে হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস আসছিল। ছোট্ট এস্তেল ঘুম ভেঙে ককিযে উঠল হঠাৎ। ব্যস্, মায়্যুর ঘুম ছুটে গেল। বকে বকে সারা বাড়ি মাথায় করে তুললে সে। ভয়ে সবাই চুপটি করে হাতের কাজ সারতে লাগল।

মায়্যু গরগর করে বলল, ক্যাথরিন, মোমবাতিটা দে।

জামাকাপড় পরে ক্যাথরিন আলোটা নিয়ে পাশের ঘরে গেল। বাপের হাতে [illegible]আলোটা দিযে তরতর করে নীচে নেমে গেল। কফি বানাতে হবে এবার।

[illegible]হাঁ করে চেঁচিয়ে কাঁদছিল এস্তেল।

[illegible] কর্ শয়তান।

[illegible] মায়্যু।

এই প্রৌঢ় তুস্যাঁ মায়্যু দেখতে একেবারে তার বুড়ো বাপ বোন্‌ময়রের মতোই, শুধু অতটা হাড়-জিরজিরে নয়। বেঁটেখাটো, মস্ত মাথাটা, ফ্যাকাশে চ্যাপ্টা মুখ আর ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল। বাচ্চাটা ভয় পেয়ে আরো চেঁচাতে লাগল।

ক্লান্ত গলায় বাচ্চার মা বলল, ছেড়ে দাও না। দেখছ তো আরও বেশী করে চেঁচাচ্ছে।

ক্লান্তিতে, হতাশায় পাণ্ডুর তার চোখ দুটো। মাত্র উনচল্লিশ বছর বয়স—সাত সাতটা বাচ্চার মা। অভাবে অনটনে শরীরে শ্রী বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

স্বামী স্ত্রী অনুচ্চ স্বরে কথাবার্তা চালাচ্ছিল।

—জানো, ঘরে তো একটা কানাকড়িও নেই। আজ মাত্র সোমবার। মাইনে পেতে পেতে আরও ছ'দিন। এভাবে সংসার চলে কি করে? সপ্তাহে মাত্র ন' ফ্রাঁ দিয়ে দশটা মুখের হাঁ আমি বোজাবো কি করে!

—কি করে ন' ফ্রাঁ হয়? আমি আর জাশারী মিলে তিন দুগুণে ছয়, ক্যাথরিন আর বাবা—আরও চার, এই দশ আর জঁলঁ্যার এক—এগারো।

—হ্যাঁ। কিন্তু হাতে তো ওই ন' ফ্রাঁ মতোই আসে।

—সব ব্যাপারে খ্যাচখ্যাচ কোরো না তো! ওই দিয়েই গুছিয়ে চলতে শেখো। জায়গায় জায়গায় খনির কাজ বন্ধ আছে বলেই তো এত দুর্ভোগ।

—তাতে আমাদের কি! রুটির যোগাড় হবে কোথা থেকে? তোমার হাত বোধহয় একেবারে খালি?

—সামান্য কিছু খুচরো পড়ে আছে।

—ও তো তাড়ির দোকানেই উড়ে যাবে। আর ঐ সামান্য পয়সায় হবেই বা কি? এই ছ'-ছ'টা দিন এতগুলো লোকের মুখের সামনে আমি কি খাবার তুলে ধরবো? মেইগ্রার কাছে ষাট ফ্রাঁ ধার হয়ে গেছে। পরশু তো আমায় প্রায় কুকুর বেড়ালের মতোই খেদিয়ে দিল। তবু আবার ওর কাছেই হাত পাততে হবে।

ঘ্যানঘ্যানে গলায় অভাবের কথা বলে যেতে লাগল ক্যাথরিনের মা। সেই একই কথা···রুটি নেই, মাখন নেই, কফিও ফুরিয়ে এসেছে। শুধু বাঁধাকপির পাতা সেদ্ধ!

ধীরে ধীরে মহিলাটির গলার জোর বাড়ছিল, এস্তেলের সরু গলার কান্নার সঙ্গে তাল মিলিয়ে। হঠাৎ মায়্যুর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। দু হাতে তুলে ধরল এস্তেলকে। তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিল তার বউয়ের কোলে।

—কি নচ্ছার বাচ্চা রে বাবা! ইচ্ছে করে মাথাটা ঠুকে দিই। দু হাতে গলা টিপে জন্মের মতো থামিয়ে দি শকুনির ছানার কান্নাটা। সব সময়ই দুধ খাচ্ছে, তবুও ওর গলা থামে না!

সত্যিই! বাচ্চাটা মায়ের কোলে গিয়ে চুপ করে গেল। খানিক বাদেই শান্ত হয়ে চুকচুক করে দুধ খেতে লাগল।

মায়্যু স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল, আজ না তোমার লা পিয়োলেইন-এ যাবার কথা?

—হ্যাঁ। ওখানে দুঃস্থ বাচ্চাদের জামাকাপড় বিলোনো হয়। [illegible]

অঁরিকে সঙ্গে নেব ভাবছি। ইস্, যদি ওখানে ওরা কয়েকটা টাকাও দিতে পারতো আমাকে!

ঘরে হিমেল নিস্তব্ধতা।

খানিক পর নিরুত্তাপ উদাসীন গলায় মায়্যু বলল, যাকগে, কপালে যা আছে তাই হবে। দেখ, যদি যা হোক করে স্যুপ বানাবার ব্যবস্থা করতে পারো। এ নিয়ে আমায় আর জ্বালিও না। বাইরেও হাড়ভাঙা পরিশ্রম করব, গেরস্থালির কাজেও মাথা ঘামাবো—এত কিছু আশা কোরো না আমার কাছ থেকে।

—হ্যাঁ, সে আর আমার জানতে বাকি নেই। তুমি যাবার আগে আলোটা নিভিয়ে দিও।

এক ফুঁয়ে মোমবাতিটা নিভিয়ে জাশারী আর জঁলঁ্যার পেছন পেছন সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল মায়্যু। আস্তে আস্তে বাচ্চারা আবার ঘুমিয়ে পড়ল। শুধু ওদের মায়ের ভ্রু চোখের পাতায় বিনিদ্র দুশ্চিন্তা।

সকালবেলায় ক্যাথরিনের প্রধান কাজ হল উনুন ধরানো। বাজে জাতের কয়লা। চোখ জ্বালা করে। ফুঁ দিতে দিতে বুকের বাতাসে টান ধরে, কিন্তু উপায় কি! একটা কেটলিতে জল চাপিয়ে সে ভাঁড়ারে উঁকি দিল। একটা টেবিল, গোটা কয়েক চেয়ার, সস্তা চকচকে রাজা-রাণীর ছবি, খাবার রাখার বাক্স আর কোকিল-ডাকা ঘড়ি —ঘরের আসবাবপত্র বলতে এই।

ক্যাথরিন গালে হাত দিয়ে ভাবছিল। খানিকটা রুটি আর বেশ কিছুটা চিজ আছে কিন্তু মাখন প্রায় বাড়ন্ত। স্যাণ্ডউইচ চাই চারজনের মতো। সে মনস্থির করে ফেলল। রুটি কেটে একটায় চিজ লাগালো, অন্যটায় সামান্য মাখন। তারপর দুটো চেপে জুড়ে দিল। খনিতে রোজকার খাবার বলতে এই। চারটে স্যাণ্ডউইচ— সবচেয়ে বড়টা বাবার, আর খুদেটা জঁলঁ্যার।

যদিও কাজে ব্যস্ত ছিল ক্যাথরিন তবু জাশারীর মুখে শোনা কেচ্ছাটা তার মনের কোণে উঁকি মারছিল। দরজা খুলে বাইরে মুখ বাড়ালো সে। আরও আলো জ্বলে উঠেছে। বাইরে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝলক। ধীরে ধীরে খনির দিকে লোকজন পা বাড়িয়েছে। সামনের বাড়িটার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ক্যাথরিন। কে যেন পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল—দূর, লিডি নামের বাচ্চাটা!

হঠাৎ ভেতর থেকে শোঁ শোঁ শব্দ ভেসে এল। দৌড়ে ভেতরে গেল ক্যাথরিন। সর্বনাশ! জল ফুটে ফুটে বাইরে পড়ে আগুনটা প্রায় নিভে এসেছে। যা হোক করে কফিটা বানিয়ে ফেলতে হবে। কফি, চিনি সবই তো ফুরিয়ে এসেছে।

জাশারী, জঁলঁ্যা আর মায়্যু এসে পড়েছে। জাশারী নাক কুঁচকালো—কি কফির চেহারা!

মায়্যু গরগর করে উঠল, যা পাচ্ছো তাই খাও, তবুও তো শরীরটা গরম হবে।

জঁলঁ্যা টেবিল থেকে রুটির টুকরোগুলো খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল। কফি শেষ করে [redacted]ালো ক্যাথরিন। বাকিটা ঢেলে রাখল ফ্লাস্কে। খনিতে কাজ দেবে।

রাগে গরম হয়ে মায়্যু বলল, কি হে নবাবের বাচ্চারা, তাড়াতাড়ি গা তোলো।

ওপর থেকে ওদের মা চেঁচালো, সব রুটিটা নিয়ে যাও। বাচ্চাদের ব্যবস্থা আমি করে নেব।

ক্যাথরিন বলল, ঠিক আছে মা।

খানিকটা স্যুপ ক্যাথরিন ঠিক করে রাখল ঠাকুর্দার জন্য। বুড়ো ছ'টার সময় ফিরে খাবে।

সবাই হাঁটতে লাগল খনির দিকে। ছেলেরা লম্বা লম্বা পায়ে, মেয়েটি ধীরে ধীরে।

চারদিকে বাড়িগুলোর আলো আস্তে আস্তে নিভতে শুরু করেছে। যারা বাড়িতে তারা আবার ঘুমের তোড়জোড় শুরু করেছে। কুলি-মজুরের দল শীতে জমে যাচ্ছে, চলার গতি বাড়ছে না যেন দৈনন্দিনতার বোঝা বয়ে ক্লান্ত। একদঙ্গল মানুষ যাদের জীবন মালবোঝাই গাধা কিংবা বলদেরও অধম।

* * * *

এতিয়েন কাজের ধান্দায় খনির এদিক ওদিক ঘুরছিল। দু-একবার আশেপাশের লোককে জিজ্ঞেসও করেছে। সবাই বলেছে ওপরওয়ালা না এলে কথা বলা যাবে না। আবছা আলো-আঁধারি ঘেরা কেমন যেন ভূতুড়ে জায়গা! হাতড়াতে হাতড়াতে একটা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল সে। বাবা, গনগনে লালচোখো ফার্নেসটা যেন তাকেই চোখ রাঙাতে চায়!

পাহারাদারদের মতো দেখতে গুঁফো একটা লোককে (তার নাম রিশোম) এতিয়েন জিজ্ঞেস করল, এখানে কি কোনো কাজ খালি আছে?

আসলে এই বুড়ো লোকটাকে দেখে মনে হয় কিঞ্চিৎ দয়ামায়া আছে। তাই এতিয়েনের এত সাহস!

অভ্যেসবশত হাত নেড়ে 'না' বলে দিতে যাচ্ছিল বুড়োটা। হঠাৎ সুর পাল্টালো—বড়কর্তা মঁসিয় দঁসের্ এলে দেখা কোরো।

ঘরের চার কোণে চারটে লণ্ঠন। তাদের আলোগুলো তিরতির করে কাঁপছে। দেওয়ালে লম্বা লম্বা ছায়া পড়েছে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল এতিয়েন। তারপর গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে এল ইঞ্জিনটার দিকে। চকচকে তামা আর ইস্পাতে তৈরি এই রাক্ষুসে জিনিসটা—আলো পড়ে জায়গায় জায়গায় ঝকঝক করছে। শ্যাফ্ট থেকে প্রায় পঁচিশ মিটার দূরে শক্ত ইটের গাঁথনির ওপর রয়েছে যন্ত্রটা। একটা লোক নিবিষ্ট মনে ঘণ্টার সংকেত অনুযায়ী যন্ত্রটার গতি কমাচ্ছে বাড়াচ্ছে। বনবন করে দুটো ড্রাম ইঞ্জিনের সঙ্গে ঘুরে চলেছে।

একটা লম্বা মই কাঁধে নিয়ে আসছিল তিনজন মজুর। তারা চেঁচিয়ে উঠল, তফাৎ যাও! চোখে দেখতে পাও না নাকি?

এতিয়েন তখন নিমগ্ন ছিল ইঞ্জিনের কাজ দেখতে। তার কানেই গেল না কথাগুলো।

মজুরগুলো আবার চিৎকার করে উঠল।

এতিয়েন আস্তে আস্তে হেঁটে বাইরে এসে দাঁড়ালো। খাদের মুখে ব্যস্ততা বেড়েছে ততক্ষণে। একের পর এক কয়লার ঝুড়ি খালি হচ্ছে, আবার ভর্তি হচ্ছে। মস্ত একটা ঘণ্টায় দড়ি দিয়ে একটা হাতুড়ি বাঁধা। একবার বাজলে থামবার সঙ্কেত, দু বারে নীচে যাবার আর তিন বারে ওপরে ওঠবার। বিরামহীন ঘণ্টাধ্বনি।

এত সব যান্ত্রিক কারিকুরি কিছুই বুঝছিল না এতিয়েন। শুধু একটা জিনিস পরিষ্কার। খনির দানবটা রাক্ষুসে হাঁ করেই আছে সর্বক্ষণ। সেই যে রাত চারটে থেকে তার গ্রাসে গ্রাসে মানুষ খাওয়া শুরু হয়, তার আর শেষ দেখা যায় না। আগ্রাসী খিদে একেবারে। এক-একবারে পঁচিশ-তিরিশজন করে রুগ্ন উপোসী মানুষ-গুলোকে খেয়ে ছিবড়ে করে দেয়। কলের মতো কাজ চলে। খাঁচা ভর্তি করে তাজা তাজা প্রাণগুলোকে নামিয়ে দেওয়া হয় ওই রাক্ষসটার পেটে। তারপর খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। শুধু মাটির ওপর সংকেতের তারে গুমগুম শব্দ।

একজন আধঘুমন্ত খনির শ্রমিককে খোঁচা দিল এতিয়েন।

—আচ্ছা মশাই, এ খনিটা কি খুবই গভীর ?

—পাঁচশো চুয়ান্ন মিটার। তবে চারটে স্তর আছে। প্রথমটা তিনশো কুড়ি মিটার গভীরে, তারপর বাকি তিনটে।

এতিয়েন হাঁ করে খাঁচাটার ওপরে ওঠা দেখছিল।

হঠাৎ বলল, যদি ওটা ভেঙে যায় ?

—ওঃ, তাহলে ভেঙেই যাবে···বাস্।

নির্বিকার ভাবে কাঁধ ঝাঁকালো লোকটা, এ যেন একটা খেলা।

এবার লোকটার পালা এল। আবার এক ঝাঁক মানুষ কশাইখানার গরু-ছাগলের মতো নেমে গেল। খানিক বাদেই আবার উঠে আসবে খাঁচাটা। আরো খাবার চাই ···আরো আরো।

শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে এতিয়েনের কেমন যেন অস্বস্তি হতে শুরু করল। কিই বা লাভ কাজের চেষ্টা করে। এরাও তো দুদিন বাদে গলাধাক্কা দেবে। তখন আবার যে তিমিরে, সেই তিমিরে। ঐ তো দরজার ফাঁক দিয়ে সাতখানা বয়লার দেখা যাচ্ছে। রাবণের চিতার মতো দিবারাত্র গনগনে হয়ে জ্বলেই চলেছে। হঠাৎ ক্যাথরিনের দলটাকে আসতে দেখা গেল।

—আচ্ছা, এখানে কি কোনো কাজ খালি আছে ?

ক্যাথরিন চমকে ঘুরে তাকালো। অন্ধকারে লোকটাকে দেখতেই পাওয়া যায়নি !

মায়্যু পেছন থেকে বলল, না ভাই। কাজের বাজার বড় মন্দা।

তারপর অন্য সকলের সঙ্গে যেতে যেতে বলল, দেখলে তো ? এই সব দুঃখী লোকগুলোর তুলনায় আমরা অনেক সুখী। তবু দু বেলা দু মুঠো পেটে পড়ে। যে মানুষের হাতে কাজ নেই, তার আর জীবনে রইলটাই বা কি ?

কলে লকার রুমের দিকে পা বাড়ালো। গায়ে গা লাগানো সারি সারি তাক।

হাত পা গরম করবার ব্যবস্থা আর সময়ে সময়ে কাজের ফাঁকে দু'দণ্ড জিরিয়ে নেবার সুযোগ আছে।

মায়্যুরা যখন ঘরে এসে ঢুকল, হাসির শব্দে ঘর তখন ফেটে পড়ছে। জনা তিরিশ লোক গা গরম করতে ব্যস্ত। সবাই মুকেত্ নামে একটি আঠারো বছরের মেয়ের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে শুরু করেছে। মেয়েটির সর্বাঙ্গে যৌবনের জোয়ার আর নিজেও সে এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন। কয়লা খনির কাজ যখন না থাকে, তখন আ· পাঁচজন উঠতি বয়সের ছেলে-ছোকরাকে সঙ্গ দেওয়াটা তার নেশা। তার বাবা আর ভাইও এখানেই কাজ করে তবে তাদের কাজের সময়টা আলাদা হওয়াতে একেবারে সোনায় সোহাগা। ওর সঙ্গে মজা না মেরেছে এমন একটি লোকও খনিতে পাওয়া যাবে না। তাতেই গর্বে মাটিতে পা পড়ে না মেয়ের। একবার কে নাকি বলেছিল ও একজন অন্য জায়গার কর্মচারীর সঙ্গে ঘুরছে। তাতে মেয়েটা জোর গলায় বলেছে —খনির লোক ছাড়া ও আর কারও সঙ্গে কোথাও গেছে, এ কথা কেউ বলুক তো দেখি! তার 'চরিত্তির' অত সস্তা নয়!

সবাই মিলে অশ্লীল সস্তা রসিকতার ফুলঝুরি ছড়াচ্ছিল আর মেয়েটা জঘন্য গা-দেখানো জামা পরে আহ্লাদে একেবারে এর ওর গায়ে ঢলে পড়ছিল।

হঠাৎ হাসি থেমে গেল।

মুকেত্ বলল, ফ্ল্যর্ঁস সম্ভবত আর কাজে আসতে পারবে না। হয় তার হৃদযন্ত্র খারাপ হয়েছে নয়তো অতিরিক্ত মদ গিলে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

মায়্যু রাগে নীল হয়ে গেল। কি কাণ্ড দেখ! এরকম বেআক্কেলেপনা দেখালে সে-ই বা কি করে কাজ করবে? তার অধীনে চারটে মাথা কাজ করে। এই যে মেয়েটা অসুখে পড়ল, তার ভাগটা কার ঘাড়ে চাপাবে সে?

হঠাৎ তার এতিয়েনের কথা মনে পড়ল। সেই মুহূর্তে দঁসের্ ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তাকে ডেকে মায়্যু এতিয়েনের কাজ খোঁজার কথা জানালো। দু-চারবার না না করে কর্তা রাজী হলেন।

জাশারী বলল, আরে, সে মক্কেল এখনো বসে থাকলে তো!

ক্যাথরিন বলল, না না, আমি দেখেছি ও বয়লারের কাছে বসে আছে।

দৌড়ে বেরিয়ে গেল ক্যাথরিন। জঁলঁ্যা আরও দু'জন ছেলেমেয়ের সঙ্গে আলো হাতে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

বয়লারে কয়লা দেওয়া দেখছিল এতিয়েন। আজ রাতের মতো এখানেই থাকতে হবে। বাইরে যা ঠাণ্ডা! হঠাৎ তার কাঁধে হাত পড়ল। ঘাড় ঘোরাতেই ক্যাথরিনের মুখোমুখি।

—এদিকে এসো। তোমার বোধহয় কাজের ব্যবস্থা হল।

প্রথমে কথাটা মাথায় ঢুকলই না এতিয়েনের, তারপর আনন্দে লাফিয়ে উঠে ক্যাথরিনকে একটা বড় মাপের ঝাঁকুনি দিল।

—লক্ষ্মী ছেলে! আমি আগেই বুঝেছি, তুমি খুব ভালো।

হাসিতে চিকচিক করে উঠল ক্যাথরিনের চোখ দুটো। তার পোশাক দেখে ঐ লোকটা তাকে ছেলে বলে ভুল করেছে। এক নিমেষেই বন্ধু হয়ে গেল তারা।

মায়্যুর সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেল। দিনে তিরিশ স্যু পাবে। পরিশ্রমের কাজ তবে শক্ত কিছু নয়। পা থেকে জুতো খোলা চলবে না আর মাথা বাঁচাতে একটা চামড়ার টুপি পরতে হবে।

যন্ত্রপাতি সব বের করে দিল মায়্যু। তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল।

—হতচ্ছাড়া শাভাল কোথায় গেল? নাঃ, এ ভাবে আর কাজ চালানো যাবে না দেখছি। এমনিতেই আধ ঘণ্টা দেরি হয়ে গেছে।

জাশারী আর লেভাক শরীর গরম করছিল।

জাশারী বলল, ও অনেকক্ষণ আগে জিনিসপত্র নিয়ে নেমে গেছে।

—কি? আর এতক্ষণ তুই সে কথা আমাকে বলিসইনি? আঃ, হাঁ করে দাঁড়িয়ে সব দেখছ কি? চল, চল, কাজের দেরি হয়ে যাচ্ছে।

ক্যাথরিন হাত-পাগুলো শেষবারের মতো গরম করে নিল। তারপর এতিয়েনের সামনে সামনে হাঁটতে লাগল। সবাই সিঁড়ি বেয়ে বাতি রাখার ঘরে এসে ঢুকল। শ'য়ে শ'য়ে পরিষ্কার করে রাখা ডেভি ল্যাম্প রয়েছে এই কাঁচের ঘরটায়। প্রত্যেকটা বাতি আগের দিন কাজের শেষে ভালোভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। প্রত্যেকের হাতে হাতে নম্বর লেখা একটা করে বাতি—তারা নিজেরা পরীক্ষা করে দেখছে। একজন লোক সময়টা লিখে রাখছে খাতায়। বাইরে আবার একপ্রস্থ পরীক্ষা, তারপর খনির কাজ। মায়্যুকে এতিয়েনের জন্য কাগজে দরখাস্ত লিখতে হল একটা। ওরও তো একটা বাতি লাগবে।

ক্যাথরিন কাঁপতে কাঁপতে বলল, ওঃ, কি ঠাণ্ডা রে বাবা!

নীরবে মাথা নেড়ে সমর্থন জানালো এতিয়েন।

মাঝে মাঝে মানুষ নেমে যাচ্ছে গভীর অন্ধকার গহ্বরে। অবশেষে ওর নামার পালা এল। তার ইতস্তত ভাব দেখে জাশারী আর লেভাক কটু মন্তব্য করল একটা। জাশারী একেবারেই এসব উটকো ঝামেলা বরদাস্ত করতে পারে না। আর লেভাকের রাগটা অবশ্য অন্য কারণে। তার সঙ্গে এ নিয়ে মায়্যু তো একটা পরামর্শ করলে পারতো!

এতিয়েনকে সব কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছিল মায়্যু।

—এই যে দেখছ খাঁচাটা, এর ওপর একটা 'সেফটি ক্যাচ' আছে। যদি তার ছিঁড়ে যায় তবে এই লোহার হুকে খাঁচাটা আটকে থাকবে। মাঝে মাঝে যে এটা কাজ করে না, তা নয়; তবে সেসব কথা থাক। শ্যাফ্‌টটা লম্বালম্বিভাবে তিনটে ভাগে ভাগ করা। মাঝখানে খাঁচা, বাঁ দিকেরটা মই রাখার জন্য আর···এই, ওটা কি হচ্ছে অ্যাঁ? হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কি?

ম্রিশোম আলো হাতে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। যদিও এ লোকটার পদোন্নতি হয়েছে [illegible] পুরনো সঙ্গীদের একেবারে ভুলে যায়নি।

—মায়্যু, সাবধানে কথা বোলো। জানো তো, দেওয়ালেরও কান আছে। কে কখন কর্তাদের কান ভাঙায়, কে জানে। যাক গে, নীচে নামো এবার।

খাঁচাটা ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল। সুন্দর সরু জাল আর লোহার পাত দিয়ে তৈরি। মায়্যু, জাশারী, লেভাক আর ক্যাথরিন ভেতরে ঢুকে এতিয়েনেকে জায়গা করে দিল। এটাতে পাঁচজন গুঁতোগুঁতি করে যেতে পারে বটে তবে দম যেন বন্ধ হয়ে আসে। ক্যাথরিনের গা ঘেঁষে বসতে হয়েছে এতিয়েনকে। ক্যাথরিনের কনুই-য়ের গুঁতো লাগছে পেটে কিন্তু উপায় কি? বাতিটা কোথায় রাখবে ভেবে পাচ্ছিল না এতিয়েন। তাই বাতিটা হাতে নিয়েই বসে রইল।

কতক্ষণ এভাবে বসেছিল, খেয়াল ছিল না। গরমে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। কি রে বাবা, এভাবে অনন্তকাল বসে থাকতে হবে নাকি। খাঁচাটা একইভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে যে। নড়ছে না কেন? হঠাৎ দুলে উঠল খাঁচাটা। পেটের ভেতর পাক দিয়ে উঠল এতিয়েনের। হুড়মুড় করে যে যেমন পারল অন্যের ঘাড়ে বসে পড়ল। আর এ সবের মাঝে নির্বিকার গলায় মায়্যু জানালো যে খাঁচাটা খাদে নামতে শুরু করেছে।

সবাই চুপ করে বসে ছিল। মাঝে মাঝে এতিয়েনের মনে হচ্ছিল খাঁচাটা বোধহয় ওপরে উঠছে, নীচে নামার বদলে। কি রকম যেন ব্যাপার। খানিক বাদ বাদ ঝাঁকুনি লাগে। আর অন্য সময় গতিটা টেরই পাওয়া যায় না। পাশের লোককেও কেমন যেন আবছা লাগে। টিমটিমে আলো।

মায়্যু সমানে কথা বলে যাচ্ছিল।

—দেখ, এই জায়গাটার ব্যাস চার মিটার। মালিকদের উচিত এই অঞ্চলটার দিকে নজর দেওয়া। কাজ করতে গেলে জল ঢুকে যায়।…এইবার আমরা আরও নীচে নামছি। তুমি শুনতে পাচ্ছো?

ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়লে যেমন আওয়াজ হয়, ঠিক সেরকম একটা শব্দ এতিয়েনের কানে ভেসে আসছিল। প্রথমে সত্যি সত্যি কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির মতো জল চড়চড় করে খাঁচার ছাদে পড়ল। ওঃ কি ঠাণ্ডা কনকনে জল। হঠাৎ আলোয় ভরে গেল চারদিক। চোখ যেন ধাঁধিয়ে যায়। অনেক লোক কাজ করছে। তারপরই আবার নিকষ কালো অন্ধকার।

মায়্যু বলল, আমরা প্রথম স্তর পার হয়ে এলাম। আমরা এখন তিনশো কুড়ি মিটার নীচে। এখন আমাদের গতি কত, জানো?

এতিয়েনের মাথায় কিছু ঢুকছিল না। বিচ্ছিরীভাবে গাদাগাদি করে বসে থাকতে হচ্ছে। ক্যাথরিনের কনুইটা ক্রমাগত খোঁচা দিচ্ছে। ক্যাথরিনকে এখনও ছেলে বলেই ধরে নিয়েছে ও।

অবশেষে খাঁচাটার গতি বন্ধ হল। পৌঁছে গেছে শুনে হাঁ হয়ে গেল এতিয়েন। এই পাঁচশো চুয়ান্ন মিটার নীচে নামতে মাত্র এক মিনিট সময় লেগেছে।

বেরিয়ে এল সবাই।

কর্তৃত্বের সুরে বলল মায়্যু, এখন আমাদের দু কিলোমিটার মতো পথ হাঁটতে হবে।

অন্ধকার হাতড়াতে হাতড়াতে সকলে এগিয়ে গেল। অনেক মজুর দলে দলে ভাগ হয়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়েছে। ক্যাথরিন, জাশারী, লেভাক—এদের পেছনে মায়্যু, আর তাকে অনুসরণ করছে এতিয়েন। পরপর দাঁড়িয়ে ধীরে বাতি হাতে এগোতে হচ্ছে। প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে হোঁচট খেয়ে পড়ছে এতিয়েন। দূর থেকে জলপ্রপাতের গর্জনের মতো শব্দ ভেসে আসছে কানে। হঠাৎ যদি মাথার ওপরের ছাদটা ভেঙে পড়ে? সবাই দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালো। সাদা ঘোড়াটা দুলকি চালে বেরিয়ে গেল মাল বোঝাই করে। পেছন পেছন ঘোড়ার মালিক।

সবাই আবার হাঁটতে শুরু করল। খানিক পরে একটা খোলা জায়গা। তার দু ধারে নতুন স্তর থেকে কয়লা তোলা হবে। এইখানে আলাদা আলাদা ভাবে কাজ শুরু করবে সবাই। কাঠের তক্তা দিয়ে ছাদের জায়গায় জায়গায় সামাল দেওয়া হয়েছে। খালি বা ভর্তি ঝুড়িগুলো অনবরত ঘ্যাঁষর ঘ্যাঁষর শব্দে আনাগোনা করছে। একটা লম্বা মাল রাখার গাড়ি কালো অজগর সাপের মতো নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে। জায়গাটা দু ধারে আস্তে আস্তে সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে—পাশাপাশি দু'জন লোক দাঁড়াতে পারে না। ছাদটা নেমে এসেছে ঢালু হয়ে। পিঠ বেঁকিয়ে কাজ করতে হয়। নয়তো মাথায় গুঁতো লাগবে। এতিয়েন এরই মধ্যে মাথায় বিচ্ছিরী গুঁতো খেয়েছে। ভাগ্যিস চামড়ার টুপিটা পরা ছিল নয়তো এতক্ষণে খুলি ফেটে চৌচির হয়ে যেত। মায়্যু তার ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে। তার প্রতিটি নড়াচড়া নকল করতে চেষ্টা করছে এতিয়েন। কই, আর কারও কিন্তু গুঁতোটুঁতো লাগেনি। লাগবেই বা কেন? প্রত্যেকেরই তো খনির প্রতিটি খুঁটিনাটি জানা। এর মধ্যে আবার জল পড়ে পড়ে মেঝেটা পিছল। জায়গায় জায়গায় জল জমে ছোটখাটো পুকুর হয়ে রয়েছে। কাদায় থিক থিক করছে পুরো মেঝেটা। সব থেকে বিচিত্র হল তাপমাত্রার পরিবর্তন। খনির ঠিক নীচের অঞ্চলটা ভীষণ ঠাণ্ডা। তারপর সরু রাস্তাটায় যেন সব সময়ই ঘূর্ণিঝড় আর যেখানে এরা কাজ করছে সেখানটায় এত গরম যে সুস্থির হয়ে দু'দণ্ড দাঁড়ানোই দায়।

মায়্যু শুধু প্রয়োজনমতো নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ ডান দিকে যাবার আদেশ দিল সে। এখানে ছাদটা এত নেমে এসেছে যে মাথাটা অনবরত ঠুকে যাচ্ছিল এতিয়েনের। তার ওপর আবার পায়ের পাতা ডোবা জল। এইভাবে দুশো মিটার চলার পর অন্ধকারে টুক করে মিলিয়ে গেল ক্যাথরিন, জাশারী আর লেভাক।

বাতিটা উঁচু করে মায়্যু বলল, এবার আমাদের ওপরে উঠতে হবে। কোণে বাতিটা আটকে সাবধানে উঠে এসো। এই দেওয়ালটা বেয়ে।

এই বলে ঝপ করে সে-ও মিলিয়ে গেল। এতিয়েনকে অগত্যা আন্দাজে অনুসরণ ...তে হল। এ জায়গাটা ভীষণ দুর্গম। চওড়ায় ষাট সেন্টিমিটারের বেশী হবে না। ...তো একেবারেই আনাড়ি। সে অন্ধের মতো হাতে ভর দিয়ে বুকটা ঘষটাতে

ঘষটাতে উঠতে লাগল। প্রথম গ্যালারিটা পনেরো মিটার উঁচুতে। মায়্যরা কাজ করছে ষষ্ঠটায়। প্রত্যেকটা গ্যালারির মধ্যে পনেরো মিটার উচ্চতার ব্যবধান। দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল এতিয়েনের। পাথরে ঘষা লেগে লেগে তার শরীরের সমস্ত ছাল চামড়া উঠে যাচ্ছে। সর্বাঙ্গে কালশিটে পড়ে গেছে। চোখ মুখ ফেটে এক্ষুণি যেন সব রক্ত বেরিয়ে আসবে। একটা গ্যালারিতে কাজ করছে দু'জন—লিডি আর মুকেত্। ওঃ ভগবান, আর কত দূর?

ওপর থেকে ক্যাথরিনের গলা পাওয়া গেল।

—এই তো এসে গেছ। ব্যস্, আর একটুখানি।

অবশেষে পথ সত্যিই শেষ হল।

রাগী গলায় শাভাল বলল, কি, কাকে দেখে এত উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে শুনি? এই শর্মা যে দু কিলোমিটার পথ উঠে এল, তার বেলায় তো ঠোঁট বেঁকানো হয়।

শাভাল বছর পঁচিশের ছিপছিপে চেহারার যুবা। এতিয়েনকে দেখে অবাক হয়ে গেল সে।

—কি ব্যাপার ওস্তাদ! আজকাল মেয়েদের কাজেও ছেলেরা ভাগ বসাচ্ছে নাকি?

দু'জনে দু'জনের দিকে তীব্র ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। শাভাল আর এতিয়েন। এতিয়েন বুঝল তাকে কোনোভাবে অপমান করা হচ্ছে। খানিক বাদে চুপচাপ কাজ শুরু করে দিল সকলে। প্রচুর মজুর হাত মেলালো একসঙ্গে। এত ভূতুড়ে পরিবেশ যে শুধু পাথরের গায়ে শাবল, গাঁইতির শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাওয়া যায় না।

মুখ ফিরিয়ে তাকালো এতিয়েন। পেছনে ঘুরলো। এবার ক্যাথরিনের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা লাগল এতিয়েনের। তার কবুতরের মতো উষ্ণ বুক। বিদ্যুচ্চমকের মতো কি যেন খেলে গেল এতিয়েনের মাথায়।

—ওঃ, তুমি তাহলে একজন মেয়ে!

ক্যাথরিন ঝকঝকে দাঁতে হাসল।

—বুদ্ধু কোথাকার! সেটা বুঝতে তোমার এত সময় লাগল!

* * * *

চারজন ছড়িয়ে পড়ল বিভিন্ন দিকে যাতে পুরো জায়গাটায় কাজ চালানো যায় একই সঙ্গে। প্রত্যেকের ভাগে পড়ল মোটামুটি চার মিটার করে জায়গা। মাঝে মাঝে শক্ত তক্তার ঠেকা দেওয়া আছে আলগা হয়ে যাওয়া কয়লার চাঙড়গুলোকে ধরে রাখবার জন্য। যেখানে ভর দিয়ে কাজ করতে হবে সেইখানটা মোটে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার মতো চওড়া। দেওয়াল আর ছাদের মাঝখানটাতেই পুরো মরণফাঁদটা পাতা আছে। কনুই আর হাঁটু ঘষটাতে ঘষটাতে এগোতে হয়। দরকারমতো ঘাড় ঘোরাবারও জায়গা নেই। কয়লা ভাঙার জন্য একদিকে সমানে ঘাড় কাত করে হাত দুটো মাথার ওপর তুলে ছোট্ট হাতলওয়ালা গাঁইতিটা দিয়ে দেওয়াল ঠুকতে হয়।

জাশারী সবচেয়ে নীচে। তার ওপর লেভাক আর শাভাল। আর সকলের ওপরে মায়ু নরম কয়লার স্তরগুলোকে কঠিন পুরুষালি হাতের চাপে আলগা করে দিচ্ছে। সেগুলো আবার এদেরই পেট, উরুর ওপর দিয়ে গড়িয়ে আটকে যাচ্ছে তক্তার ফাঁকে। বেশ খানিকটা সংগ্রহ করে তা জমা করে দেওয়ার কাজ। মায়ুর অবস্থাই সবচেয়ে সঙ্গীন। তাপমাত্রা এখানে প্রায় পঁচানব্বই ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। চামড়া পুড়ে ঝলসে যাওয়ার দাখিল। বাতাস চলাচল প্রায় নেই বললেই চলে। দম বন্ধ হয়ে আসে। ভালো করে দেখবার জন্য সে আবার আলোটা ঠিক মাথার ওপরেই একটা ছোট্ট হুকে ঝুলিয়েছে। তার তাপ যেন মাথার রক্তে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। কিন্তু সবচেয়ে কষ্টের দিকটা অন্য। মুখ থেকে ঠিক কয়েক সেন্টিমিটার ওপরেই জলের ছোট্ট একটা উৎস, তা থেকে ক্রমাগত ছোট বড় ফোঁটায় জল টপটপ করে পড়ছে—তীরের ফলার মতো চামড়া ভেদ করে যেন ঢুকে যাচ্ছে ভেতরে। ঘাড় ফেরাবারও উপায় নেই। চতুর্দিকে একই অবস্থা। পনেরো মিনিটের মধ্যেই মায়ু ভিজে চুপসে গেল। শুধু জলে নয়, ঘামও আছে। তার সমস্ত গা দিয়ে, অত তাপের জন্য গলগল করে ঘাম ঝরতে লাগল। অবিশ্রান্ত নিজেকে, ভাগ্যকে গালিগালাজ দিয়ে চলেছে সে। একমুহূর্ত কাজ থামাবার উপায় নেই। গাঁইতি চালাবার সময় সর্বাঙ্গ কাঁপছে থরথর করে, ঠিক যেন বইয়ের দুটো পাতার মাঝখানে আটকে পড়া একটা মাছির মতো অবস্থা, এই বুঝি চেপ্টে যায়।

কেউ কারো সঙ্গে কোনো কথা বলছে না। শুধুমাত্র ঠকঠক শব্দ—একটানা, কর্কশ, ধাতব। এমন কি কোনো অনুরণনও নেই। অন্ধকারে আশেপাশের কোনো কিছুই তেমন নজরে পড়ে না। কয়লার ধুলোয় আর গ্যাসে বাতাস ভারী। বেশীক্ষণ চোখ খুলে থাকা দুষ্কর। শুধু দপদপ করে ইতস্তত জ্বলছে গ্যাসের বাতিগুলো। কয়লার স্তর আর কয়লার স্তর। চারপাশ ঘিরে কয়লার চাঙড়গুলোর খাঁজে খাঁজে কালিমাখা আবছা হাড়সর্বস্ব মুখ আর মাঝে মাঝে কানে ভেসে আসা মানুষের গলার স্বর এই ভূতুড়ে পরিবেশে শত দুর্ভোগের মধ্যেও প্রাণ ঠাণ্ডা করে। গত দশ বছরে এই খনির আভ্যন্তরীণ রূপ বদলায়নি একটুও।

জাশারী ক'দিন জ্বরে ভুগে উঠেছে। তাই হাতে জোর পাচ্ছে না তেমন। খানিক বাদেই অন্য কাজের ছুতোয় এই কাজ বন্ধ করে দিল সে। তারপর টুকটাক হাত চালানো, সঙ্গে সঙ্গে শিস। পেছনে তিন মিটার আন্দাজ স্তর কাটা হয়ে গেছে কিন্তু ওখানকার আলগা পাথর ঠেকা দেবার ব্যবস্থা করেনি কেউ। ওই সময়টুকু নষ্ট না করে বরং কয়লা কাটলে কাজ দেবে। এই আহাম্মক মজুরগুলো তো এই ভাবেই মরে!

জাশারী এতিয়েনকে ডেকে বলল, যাও তো, খানিক কাঠ এনে দাও। এখানটা ঠেকা দিতে হবে।

ক্যাথরিন কয়লা ভাঙার কাজ এতিয়েনকে শিখিয়ে দিয়েছিল। নতুন তো! তাই [illegible]দের চেয়ে সময় কিছু বেশী লাগছিল ওর।

[illegible]আরে, তাড়াতাড়ি দাও।

এই নতুন লোকটার গড়িমসি ভাব সহ্য করতে পারছে না জাশারী। নতুন কাজ করছে তো হয়েছেটা কি! আচ্ছা গতরপোষা লোক তো!

এতিয়েন অপ্রস্তুত মুখে চার টুকরো কাঠ এনে দিল।

মাহ্যু দাঁত খিঁচিয়ে জাশারীকে বলল, এসব বাজে কাজ ছেড়ে কয়লা কাটায় হাত লাগা না। নইলে দিনের কোটামতো কয়লা তো উঠবে না।

—সে এমনিতেও উঠবে না। দ্যাখো না, ওইখানটা ভেঙে পড়ল বলে।

—হুঃ, তাহলেই হয়েছে। এমনটা হবেই না কখনো। এসব খনির ভিত অনেক শক্ত। আর যদি বা ভেঙেও পড়ে তাতেই বা হয়েছেটা কি? সবাই নিরাপদে বেরিয়ে পড়তে পারলেই তো হল। যা যা, যা বলছি তাই কর্।

আসলে সেই মুহূর্তে সবাই একটু বিশ্রামের ছুতো খুঁজছিল। লেভাকের বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল পাথরের টুকরো লেগে চিরে গেছে। তা থেকে রক্ত পড়ছে টপটপ করে। শাভাল শার্টটা খুলে কোমরে বেঁধেছে—যা গরম! সবাই আপাদমস্তক কয়লার গুঁড়ো মেখে ভূত সেজেছে। তার ওপর ঘাম জমে চেহারা খোলতাই হয়েছে আরও।

মাহ্যুই প্রথম আবার কাজ শুরু করল। তার ঠিক মাথার ওপরেই ওই আলগা পাথরটা। তাতে অবশ্য ভ্রূক্ষেপ নেই কারও। জল পড়ে পড়ে মাথার খুলিটা যেন ফুটো হয়ে যাবে এবার।

কাথরিন উপদেশ দিল এতিয়েনকে।

—বেশী মাথা ঘামিও না ও নিয়ে। এদের স্বভাবটাই এরকম বেযাড়া ধাঁচের।

কাথরিন যন্ত্রের মতো নিখুঁতভাবে কাজ করে যেতে লাগল। পরিষ্কার কয়লায় ঝুড়ি ভরে নম্বর লাগাতে হবে। কয়লা খারাপ হলে ঝুড়ি বাতিল তো বটেই, তার সঙ্গে অতিরিক্ত—গঞ্জনা।

এতক্ষণে চোখে অন্ধকার সয়ে এসেছে এতিয়েনের। সে নরম চোখে ভালো করে তাকালো কাথরিনের দিকে। মেয়েটার ফ্যাকাশে চামড়া। রুখুসুখু চুল দেখে বয়স বোঝার উপায় নেই। তবে শরীরের যা বাড়, তাতে মনে হয় বারোর বেশী নয়। কে জানে, আরও বেশী হতে পারে, যা বুড়িদের মতো হাবভাব। নাঃ, একটু চ্যাটাং চ্যাটাং কথা আছে। মোটের ওপর মেয়েটাকে তেমন পছন্দ করতে পারছে না ও। কিন্তু ওই একরত্তি মেয়েটার গায়ের জোর দেখে হাঁ হয়ে গেল সে। একজন পুরুষ-মানুষের সমান দক্ষতায় ও কাজ চালিয়ে যাচ্ছে হাত যন্ত্রণায় ফেটে যাচ্ছে এতিয়েনের, আঃ, উঃ শব্দ করছে, কিন্তু ওই মেয়েটা এত কষ্টেও নির্বিকার।

এই কয়লা তোলার কাজটা আদপেই সোজা নয়। কয়লার স্তর থেকে ঢালু ছাদের দূরত্ব ষাট মিটারের মতো। সুড়ঙ্গের মতো গলিপথ, তাও কেটে চওড়া করা হয়নি। উঁচুনীচু, এবড়োখেবড়ো জমি। কোনো কোনো জায়গা তো এত সরু যে কোনোক্রমে একটা ঝুড়ি গলে যেতে পারে। মাথা নীচু করে বুকের ওপর ভর দিয়ে কাজ করতে হয়। যাতে ছালচামড়া উঠে না যায় সেজন্য যথেষ্ট সতর্ক হয়ে চলাফেরা করতে হয় এদের। মনে হয় এই বুঝি শিরদাঁড়ার হাড় ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল।

ক্যাথরিন হাসল।

—কি হল?

এতিয়েনের কয়লাভর্তি গাড়িটা লাইন থেকে ফসকে বেরিয়ে গিয়েছে। নিজের সমস্ত শরীরটা প্রাণপণে বেঁকিয়েও সেটাকে তুলতে পারছে না সে। অশ্রাব্য কটূক্তি করল একটা।

ক্যাথরিনের দাঁতগুলো ওই অন্ধকারেই ঝিকিয়ে উঠল।

—মাথা গরম কোরো না। জানো তো, যত মেজাজ গরম করবে ততই কাজ পিছিয়ে যাবে।

সুন্দর ভাবে সরীসৃপের মতো নীচু হয়ে কি রকম এক অদ্ভুত কায়দায় পিঠ ঠেকিয়ে ঝুড়িটা লাইনে তুলে দিল ক্যাথরিন। কম করেও সাতশো কিলোগ্রাম ওজন হবে সেটার। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল এতিয়েন।

ক্যাথরিন সহজ করে বুঝিয়ে দিচ্ছিল সব ওকে। কেমন ভাবে দু পায়ের ওপর ভর দিয়ে, শরীরটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে কাজ করতে হয়, যাতে সমস্ত হাতের আর ঘাড়ের শক্তিটা গাঁইতির ওপর পড়ে। এতে কয়লা তোলার কাজটাও সহজ হয়ে যায়। এতিয়েন একপ্রস্থ শিক্ষা নিল ওই খুদে মেয়েটার কাছ থেকে। ঠিক যেন চারপেয়ে জন্তুর মতো ক্ষিপ্রতায় ক্যাথরিন কাজ করে যাচ্ছে। ঘেমে নেয়ে একেবারে একাকার অনবরত আঘাত লাগছে তবু মুখে কথাটি নেই। ও যেন কবেই বুঝে গেছে যে অনুযোগ করলে কষ্ট তীব্রতর হয়। কিন্তু একটু পরেই অনভ্যস্ত এতিয়েন হাঁপিয়ে উঠল। তার সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে গেছে। যন্ত্রণায় হাত পা বিকল। দু'দণ্ড না জিরোলে কাজ করা অসম্ভব।

এইবার শুরু হল আর এক যন্ত্রণা। কয়লার ঝুড়ি খালি করতে হবে। খাদের একেবারে শেষ পর্যন্ত দু'জন করে অল্পবয়সী ছেলে (তাদের বয়স বারো থেকে পনেরোর মধ্যে) দাঁড়িয়ে থাকে। এক বিচিত্র কপিকলের সাহায্যে কয়লার ঝুড়ি খালি করতে হয়। এই দুটো ছেলে আবার নিজেদের মধ্যে ক্রমাগত অশ্লীল গালিগালাজ করেই চলেছে। তাদের কানে কথা পৌঁছাতে গেলে আরও অশ্লীল চিৎকার করতে হবে।

ক্যাথরিন চেঁচিয়ে উঠল, এই হারামজাদা বেজন্মাগুলো, শীগগির ঝুড়িগুলো খালাস কর্।

সারা খনি গমগম করতে লাগল তার মেয়েলী সানুনাসিক চিৎকারে। লোকগুলো নিশ্চয়ই ফাঁকতালে একটু বিশ্রাম করছিল কারণ কারুরই সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না।

খানিক পরে খনির আর এক কোণ থেকে একটা মেয়ের গলার স্বর ভেসে এল।

—দ্যাখো গে যাও, মুকেত্ ওখানে পীরিত করতে গেছে। সে ছুঁড়ির তো কমবয়েসী ছোঁড়া দেখলে লালা ঝরে।

চারদিক থেকে খিলখিল হাসি শোনা গেল।

এতিয়েন ক্যাথরিনকে জিজ্ঞেস করল, কে বলল কথাটা?

ড়ি। জানো, ও কি ছোট্ট দেখতে। পুতুলের মতো হাত-পায়ের গড়ন।

তবুও গায়ে কি জোর। মুকেত্ সম্বন্ধে ঠিকই বলেছে। একটা কেন, দু-দুটো ছোকরাকে একসঙ্গে সমান তালে নাচাতে পারে ও।

হঠাৎ কোনো এক প্রান্ত থেকে কর্তামতো এক ব্যক্তি তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করার হুকুম দেওয়াতে পরিস্থিতি অন্যরকম হয়ে গেল। সব জায়গায় ছুটোছুটি, ব্যস্ততা। সবাই তাড়াতাড়ি নিজের ঝুড়ি খালি করতে চায়। মালবোঝাই গাধা আর খচ্চরের মতো ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল সকলে।

গরমে, পরিশ্রমে প্রাণ আইঢাই করছে। মায়্যুর বয়স হয়েছে। দম নেবার জন্য সে শুয়েই পড়ল। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাদা আর কয়লার গুঁড়োয় মাখামাখি। জাশারী আর লেভাকের যথারীতি মেজাজ খাপ্পা। শাভাল অকারণে এতিয়েনের সঙ্গে খিটিমিটি করতে লাগল।

—ওঃ কি আমার শহুরে বাবু এসেছেন। কয়লা ভাঙলে হাতে ফোস্কা পড়ছে, না? একটা মেয়েরও অধম। ছিঃ ছিঃ, কয়লা যদি বাতিল হয়, তবে সব মজুরী কেটে নেব বলে দিচ্ছি।

আজেবাজে কোনোরকম তর্কাতর্কির মধ্যে যেতে ইচ্ছে করে না এতিয়েনের। সবে কাজটা পেয়েছে তো, মন এমনিতেই খুশী। আর চিরকালই এমনটা হয়ে এসেছে—ক্ষমতাবানেরা হীনক্ষমদের ওপর কর্তৃত্ব চালায়। কিন্তু তার যে সত্যিই আর এক পা-ও চলার ক্ষমতা নেই। পা ফেটে রক্ত পড়ছে, হাতে পায়ে অসাড়তা, পেটে যেন ছুঁচোয় ডন মারছে। কি ভাগ্যিস বেলা দশটা বাজে। খাবার ছুটি এখন।

মায়্যুর সঙ্গে ঘড়ি অবশ্য একটা আছে কিন্তু সেটা দেখার দরকার পড়ে না। অন্ধকারে কাজ করতে করতে কেমন করে কে জানে সময় সম্বন্ধে একটা নির্ভুল ধারণা করে নিতে পারে। সবাই পা মুড়ে কনুইয়ে ভর দিয়ে খালি মেঝের ওপর খেতে বসল। এভাবে খাওয়াটা এমনই অভ্যেস হয়ে গেছে যে বাইরে গেলেও এই ভঙ্গির কোনো ব্যতিক্রম হয় না। সবাই টুকটাক কথাবার্তা চালাচ্ছিল রুটি চিবোতে চিবোতে। হঠাৎ ক্যাথরিনের নজর পড়ল এক কোণায় বসে থাকা এতিয়েনের দিকে।

—তুমি খাবে না?

—নাঃ, আমার খিদে নেই।

হঠাৎ ক্যাথরিনের মনে পড়ল গত রাতে এই লোকটা নিঃস্ব অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। নিজের কামড় দেওয়া পাউরুটিটা সে অসঙ্কোচে তুলে ধরল এতিয়েনের সামনে।

—এসো, আমরা ভাগ করে খাই।

—না, না। আমার খিদে নেই।

—ওঃ, তোমার বুঝি ঘেন্না করছে আমার এঁটোটা খেতে দিলাম বলে? তুমি এই দিকটা থেকে খাও, আমার এঁটো হয়নি।

ক্যাথরিন দরাজ হাতে দু'ভাগ করে ফেলল রুটিটা। এতিয়েন যেন [illegible]

পেল। তার সর্বাঙ্গ ব্যথায়, খিদেয় কাঁপছে। সে কথা লুকোবার জন্য নির্বিকার মুখে হাঁটুতে ভর দিয়ে খেতে লাগল। নিঃসঙ্কোচে দেওয়ালে হেলান দিয়ে ক্যাথরিন খাচ্ছিল—যেন তারা কত দিনের বন্ধু। দু'জনের মাঝখানে টিমটিমে বাতিটা—নীরব সাক্ষী। ক্যাথরিন চুপ করে লক্ষ্য করছিল এতিয়েনকে। তার সুঠাম চেহারা, সরু কালো গোঁফ আদপেই মজুরশ্রেণীর নয়।

হেসে ফেলল ক্যাথরিন।

—তুমি আগে মিস্ত্রী ছিলে, তাই না? তা সে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিল কেন?

—ওপরওয়ালার গায়ে হাত তুলেছিলাম।

ক্যাথরিনের এতদিনের অন্ধবিশ্বাসের মূলে সজোর কুঠারাঘাত। সে এতদিন ধরে শুধু দেখেছে অধস্তন, শোষিতরা মাথা নীচু করেই থাকে। এ লোকটা বলে কি! তার বাক্‌স্ফূর্তি হলো না।

এতিয়েন বলে চলল, আসলে সেদিন আমি খুব মদ খেয়েছিলাম। আর ওসব খেলে আমার আবার মাথাব ঠিক থাকে না। সমস্ত পৃথিবী ছারখার করে দিতে পারি। তারপরই অবশ্য বিছানায় দু'দিন শুয়ে থাকতে হয়।

ক্যাথরিন বয়স্ক ভারিক্কী চালে বলল, তাহলে ওসব ছাইপাঁশগুলো গেলার কি দরকার?

মাথা নাড়ল এতিয়েন। সেও ছোট্টবেলা থেকে মদকে ঘৃণা করে এসেছে। আর আজ?

—না। জানো, আসলে মায়ের জন্য। মায়েব দুঃখ ভুলতে আমায় তাড়ি খেতে হয়। মায়ের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভালো নয়। পারলেই মাঝে মাঝে পাঁচ ফ্রাঁ করে পাঠাতাম আমি। আর এখন যে তাও বন্ধ!

—তোমার মা এখন কোথায়?

—প্যারিসে। একটা কাপড় কাচার দোকান আছে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ এতিয়েনের চোখ দুটো ঝিলিক দিয়ে উঠল। এই অন্ধকার পঙ্কিল খনির মধ্যে কাজ করতে করতে তার মনে পড়ে গেল ছেলেবেলার কথা। তার বাবা পালিয়ে গিয়েছিল মাকে ফেলে রেখে। কিছুদিন পর মা আবার যাকে বিয়ে করে সে লোকটিও তথৈবচ। স্ত্রীর টাকায় ফুর্তি করে, মদ খায় আর লাথি মেরে বউকে বের করে দেয়। তারপর ওই ছোট্ট দোকানটি—দিন রাত চেঁচামেচি হৈ-হল্লা···কি জঘন্য জীবন!

এতিয়েন বলে চলল, কিন্তু এখন তো এই টাকা থেকে মাকে সাহায্য করতে পারব না। কি যে হবে!

ক্যাথরিন ফ্লাস্কের ছিপি খুলতে খুলতে বলল, একটু কফি খাবে? এতে তো আর নেশা হবে না। বরং গলাটা ভিজলে ভালোই লাগবে।

কিন্তু ওর খুব সঙ্কোচ হল। একেই তো খাবারে ভাগ বসিয়েছে, তার ওপর [illegible] কফি!

ক্যাথরিন অনেক জবরদস্তি করার পর এতিয়েনকে বলল, ঠিক আছে, আমিই আগে খাচ্ছি, কিন্তু তুমি অন্তত এক চুমুক খাও।

কফি খেতে খেতে এতিয়েন ক্যাথরিনের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। তার কালি-ঝুলি মাখা মুখ, উজ্জ্বল চোখ। ধবধবে সাদা দাঁত আর টুপির ফাঁক দিয়ে উঁকি মারা লাল চুল···হঠাৎই কেমন ভালো লেগে গেল ওব। কি আশ্চর্য! মেয়েটাকে তো ভালোই দেখতে। তীব্র আবেগে আপ্লুত হল এতিয়েন। মনে হল এই নরম মনের ছোট্ট মেয়েটাকে সবল হাতে জড়িয়ে ধরে দুটো চুমু খায়। ক্যাথরিনের হালকা গোলাপী পুরন্ত ঠোঁট দুটোতে এত সজীবতা, এত মায়া···এত আকর্ষণ! এতদিন সে শুধু বাজারের মেয়েই দেখে এসেছে। তারা অনেক চটকদার ছিল কিন্তু তাদের এই রকম শ্রী কই?

—ক্যাথরিন, তোমার বয়স কত? চোদ্দ?

—না তো। পনেরো। আসলে আমি তো তেমন বড়সড় নই। এখানকার মেয়েদের যে শরীরে তেমন বাড় নেই।

এতিয়েন তাকিয়েছিল মেয়েটির দিকে। কি সরল, সজীব, ফুটফুটে কিশোরী! ওর দেহমন এখনও নিষ্পাপ—এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। তার মানে অবশ্য এই নয় যে ও স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছুই জানে না! কথাচ্ছলে মুকেতের কথা জিজ্ঞেস করল এতিয়েন। খুব ঠাণ্ডা গলায় দিব্যি রগবগে কেচ্ছার কাহিনী শুনিয়ে দিল ক্যাথরিন।

—আচ্ছা, তোমার কোনো প্রেমিক আছে?

—পাগল! মা তা হলে চোখে অন্ধকার দেখবে।

—কিন্তু এখানে সবাইকে একই সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে হয়। কাজেই প্রেমিক জোটা তো অসম্ভব নয়।

—তা ঠিক।

—তবে? আর এতে তো ক্ষতিও হচ্ছে না কারও। নিশ্চয়ই বিয়েটিয়েও বাধ্যতামূলক নয়?

—না, না। তবে কি না 'কালো ভূত' আছে—ঠিক খারাপ মেয়েদের ঘাড় মটকে দেয়।

হো হো করে হেসে উঠল এতিয়েন।

—তুমি এ সব আজগুবী গালগল্প বিশ্বাস কর?

—হ্যাঁ। জানো, আমি কিন্তু পড়তে লিখতে জানি। বাবা মা যেমন নিতান্তই নিরক্ষর, আমি তা' নই।

ক্যাথরিন মেয়েটা বেশ। এতিয়েন মনে মনে ঠিক করল খাওয়া মিটে গেলে, ক্যাথরিনকে ও ঝাপটে ধরে চুমু খেয়ে ফেলবে। ছেলেদের পোশাক পরা এই অতি-সাধারণ মেয়েটি তার শিরায় শিরায় উত্তেজনা ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

খাওয়া মিটে গেল। ভীরু চকিত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নিল

এতিযেন। হঠাৎ একজন লোক সামনে এসে দাঁড়ালো। শাভাল। সে দু পা ফাঁক করে নাযকোচিত ভঙ্গিতে দু'জনকে দেখল খানিকক্ষণ, তারপর এতিযেনেব বুকে জ্বালা ধরিযে নৃশংসভাবে জডিযে ধবল ক্যাথরিনকে। নিষ্ঠুবভাবে চুমু খেল। যেন এতিযেন সেখানে উপস্থিতই নেই।

—শাভাল, ছেডে দাও আমায। উঃ, ছেডে দাও বলছি।

বাধা দেবাব ব্যর্থ চেষ্টা করল ক্যাথরিন। শাভাল মর্মভেদী তীব্র দৃষ্টিতে তাকিযে বইল ক্যাথবিনেব দিকে। হাতেব বাঁধন আলগা করল।

এতিযেনের সম্বিৎ ফিরল। ছি ছি, কি বোকাব মতো ভাবছিল এতক্ষণ ক্যাথরিনকে এবপব চুমুটুমু খাওযা অসম্ভব।

শাভাল চলে গেলে ফিসফিসে গলায ও ক্যাথবিনকে বলল, তুমি কেন আমায মিথ্যে বললে? ওই তো তোমার প্রেমিক!

—না না, বিশ্বাস করো। ও আমাব কেউ না মাঝে মাঝে একলা পেলে অমন হ্যাংলামি কবে। ও মাত্র ছ'মাস আগে এখানে এসেছে পা-দ্য-কালে থেকে। আমবা ওকে কতটুকু চিনি?

দু'জনে উঠে দাঁড়ালো। কাজে যোগ দেবাব সময হযেছে। ক্যাথবিনকে দেখে মনে হচ্ছিল এতিযেনেব শীতল ব্যবহারে ও খুব আঘাত পেযেছে। শাভালেব চেযে এতিযেন তো কত ভালো! এতিযেন তাব জ্বলজ্বলে চোখে তাকিযে ছিল হাতে ধবে থাকা বাতিটার দিকে।

ক্যাথরিন বলল, চলো, তোমায একটা জিনিস দেখাই।

কযলার স্তবের এক জাযগায একটা ফাটলেব মধ্যে দিযে ভেসে আসছে পাখির কিচিরমিচিবের মতো শব্দ। বদ্ধ আব বিষাক্ত বাতাস জমে এমনটা হযেছে।

মাযুার অধৈর্য গলা শোনা গেল।

—এখনও গল্প শেষ হযনি?

ক্যাথরিন আব এতিযেন দ্রুত হাতে কযলা তুলতে লাগল। আবাব সেই দিনগত পাপক্ষয। সবাই অন্ধভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মাথায শুধু একটাই চিন্তা—কত বেশী কযলা তোলা যায। পৃথিবীব সব আলো হাসি গান তুচ্ছ হযে গেছে। গাযে অঝোরে জল পডছে গবমে প্রাণ ওষ্ঠাগত, তবুও কযলা চাই, কযলা—আবো, আরো কযলা।

* * * *

মায্যুর সঙ্গে কোটের পকেটে সর্বদাই একট ঘডি থাকে বটে কিন্তু সেদিকে নজব দেবার প্রযোজন পডে না তাব। সময সম্বন্ধে নির্ভুল আন্দাজ হযে গেছে এতদিন কাজ করতে করতে। হঠাৎ চেঁচিযে উঠল মায্যু।

—বাস। ঠিক একটা বাজে। তোমার হল, লাশারী?

লাশারী হাতের কাজ প্রায শেষ করে এনেছিল। শুযে শুযে আলসেমি করছিল। জুযোতে বড্ড হেরেছে। উঠে খনির যে দিকটায কযলা কাটার কাজ

চলছে, সে দিকে চলে গেল। লেভাক আর শাভালও কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে মুখের ঘাম মুছে নিল তারা।

এই সব মজুররা কাজ করতে এসে খনির বিষয় বাদ দিয়ে অন্য কোনো বিষয়ে কদাচিৎ কথা বলে।

শাভাল মৃদুস্বরে বলল, কি আলগা দেওয়াল দেখেছো? যে কোনো মুহূর্তে ধসে পড়তে পারে।

গজগজ করে উঠল লেভাক।

—আমরা মরলেও তো ওদের কিছু এসে যায় না।

জাশারী হাসতে শুরু করল। ওর ভারি মজা লাগে সহকর্মীদের এই ধরনের অসন্তোষ দেখে।

মায়্যু বলল, প্রতি কুড়ি মিটার অন্তর খনির প্রকৃতি পাল্টেছে। ওপরওয়ালাদের তো আর দোষ দেওয়া যায় না। ওরাই বা এ সব বুঝবে কেমন করে?

কিন্তু লেভাক আর শাভাল দমবার পাত্রই নয়। মালিকপক্ষের উদ্দেশ্যে ক্রমাগত বিষ উদ্গীরণ করতে লাগল তারা।

শেষে অস্বস্তিভরে মায়্যু বলল, চুপ কর। ঢের হয়েছে।

লেভাক সায় দিল।

—ঠিক বলেছ। দেওয়ালেরও কান আছে।

মাটির এত নীচেও তারা সবাই ভাড়া করা গুপ্তচরের ভয়ে তটস্থ। কে জানে কখন বেফাঁস কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

শাভাল জেদী স্বরে বলল, ওসবের ভয় দেখিয়ে আমার মুখ বন্ধ করা যাবে না। শুয়োরের বাচ্চা দাঁসেরের মুখ আমি জুতিয়ে ছিঁড়ে দেব। ওর আস্পর্ধা কত যে আমাকে চোখ রাঙায়! পরের বউ নিয়ে ফূর্তি করা আমি ঘুচিয়ে দেব জন্মের মতো।

জাশারী হো হো করে হেসে উঠল।

দাঁসের্ আর পিয়েরোঁর বউয়ের কেচ্ছার কথা খনির সবাই জানে। ক্যাথরিনও দু হাতে পেট চেপে ধরে হাসছিল। এতিয়েন নতুন লোক কিন্তু তার কাছেও এসব রসালো তথ্য অজানা ছিল না ক্যাথরিনের দৌলতে।

মায়্যু রেগে চেঁচিয়ে উঠল।

—চুপ কর। আমাদের আগে বেরিয়ে যেতে দাও। তারপর যত খুশি চেঁচিও। তোমার জন্য আমরা ঝামেলায় পড়তে চাই না।

কথা শেষ হতে না হতে মাথার ওপর পায়ের শব্দ শোনা গেল। তার পর এসে হাজির হল খনির ইঞ্জিনীয়ার পল নেগ্রেল আর দাঁসের্ (খনির ওভারম্যান)।

মায়্যু ফিসফিস করে বলল, হল তো? এখন ঠেলা সামলাও। পই পই করে বারণ করেছিলাম অকারণে মাথা গরম করতে।

পল নেগ্রেল হল মঁসিয় এন্‌বোর ভাগ্নে। ছাব্বিশ বছরের সুদর্শন, বুদ্ধিমান যুবক

একমাথা কোঁকড়ানো চুল আর চমৎকার একজোড়া গোঁফের মালিক। এমনিতে ভালোই কিন্তু কর্তাব্যক্তিদের মতো হাবভাব। তারও হাতে মুখে কালি। শ্রমিকরা যাতে তাকে নিজেদের লোক ভাবে সেজন্য খনির সব ব্যাপারে এগিয়ে আসতে তার জুড়ি নেই। আগুন লাগলে বা ধস নামলে সর্বাগ্রে তাকেই চোখে পড়ে।

—দঁসের্, এই জায়গাটাই তো?

—হ্যাঁ স্যার। আজ সকালে এই লোকটাকে নতুন কাজে নেওয়া হয়েছে।

এতিয়েনের ডাক পড়ল। হাতের বাতি তুলে কোনো প্রশ্ন না করে ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল নেগ্রেল।

ঠিক আছে। কিন্তু অজানা অচেনা লোকদের এমন হুটহাট করে চাকরি দেওযাটা আমি ঠিক পছন্দ করি না। ভবিষ্যতে এরকম যেন আর না হয।

এ ব্যাপারে আর কথা বাড়তে দিতে রাজী নয় নেগ্রেল। সে যা বলবে, সেটাই চূড়ান্ত।

মজুররা আবার হাতে শাবল তুলে নিয়েছে। কাজ আরম্ভ করতে যাবে—ছাদ পরীক্ষা করে চিৎকার করে উঠল নেগ্রেল।

—মায়্যু, বুড়ো হয়ে কি চোখের মাথা খেয়েছ নাকি? এখানে তো এক্ষুণি সবাই চাপা পড়ে মরবে।

মায়্যু শান্ত স্বরে উত্তর দিল, না, দেওযাল তো বেশ শক্তই আছে।

—কি! শক্ত আছে! দেখ, পাথর ক্রমশই বিপজ্জনকভাবে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। অবশ্য তোমাদের কোনো ভালো কথা বলতে যাওযাই বৃথা। ভালো চাও তো এক্ষুণি ব্যবস্থা নাও।

শ্রমিকেরা নীচু গলায আপত্তি জানাতে লাগল। এই খনির হাড়হদ্দ তাদের জানা। আর এই পুঁচকে ছোঁড়াটা কিনা শেখাচ্ছে!

ভীষণ রেগে গেল নেগ্রেল।

—তোমাদের জানতে আমার আর বাকি নেই। এর ফল কি হবে তা ভেবে দেখেছ? সব দায় তখন আমাদের ঘাড়ে চাপবে। তোমরা মরলে একবাশ টাকা ঢালতে হবে তোমাদের বউ মেয়েদের পেছনে—ক্ষতিপূরণ হিসেবে। দরকার হলে তোমরা দু'পয়সা বাড়তি রোজগারের জন্য মরতেও পিছপা নও।

মায়্যুর রাগ আস্তে আস্তে বাড়ছিল।

—আমাদের মাইনেপত্তর ঠিকমতো দেওয়া হলে তো এমনটা হত না।

কাঁধ ঝাঁকালো নেগ্রেল, তারপর শেষবারের মতো নির্দেশ দিল।

—আর এক ঘণ্টা বাকি আছে। ভালো চাও তো যা বলছি তাই করো। অবাধ্যতার জন্য তোমাদের তিন ফ্রাঁ জরিমানা হল।

শ্রমিকদের চাপা অসন্তোষ ধোঁয়ার মতো ছড়িয়ে পড়তে লাগল ক্রমশ। শাভাল আর লেভাক গালাগালি করতে লাগল অশ্রাব্য ভাষায়। মায়্যু চিন্তা ভাবনায় অস্থির। জাশারী ঠাট্টার ভঙ্গিতে হাসছে। এতিয়েনের প্রতিক্রিয়া হল সবচেয়ে

বেশী। এই সব মজুররা নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে দু বেলা দুটো রুটির সংস্থান করবে, তাতেই এই অবস্থা!

নেগ্রেল দঁসের্‌কে তার সঙ্গে নিয়ে চলে যাচ্ছিল। দঁসের্ মালিকের পায়ে পায়ে ঘুরছিল পোষা কুকুরের মতো। হঠাৎ এক জায়গায় কাঠের 'ঠেকা'র অবস্থা দেখে চমকে উঠল নেগ্রেল। এরকম গোঁজামিল দিয়ে মেরামতির কাজ সারা হয়েছে!

—পেয়েছ কি তোমরা! আমাদের কোনো কথাই কি কানে যায় না? আর তোমাকেও বলি দঁসের্, বসে বসে পয়সা পেতে খুব ভালো লাগে, না?

—না তো, আমি তো দেখি। তবে এই হারামজাদাগুলো তো ভালো কথায় মানুষ নয়!

ষাঁড়ের মতো চেঁচাতে লাগল নেগ্রেল।

—মায়্যু! মায়্যু! এদিকে এসো।

সবাই দৌড়ে এল।

নেগ্রেল চিৎকার করতে লাগল।

—ছাখো, কি কাণ্ড করে রেখেছো! কোনো রকমে ছাদের পাথরটা আলগা হয়ে লেগে আছে। এই জন্যই ফালতু সারাইয়ের কাজ এত বেশী। তাই ভাবি, এত খরচ কি করে হয়। যতক্ষণ তোমরা খনিতে আছো ততক্ষণ কোনো কিছু না ঘটলেই তোমাদের দায়িত্ব মিটে গেল, তাই না? খুব লায়েক হয়ে গেছ। তোমাদের ধরে ধরে চাবকানো উচিত।

শাভাল প্রতিবাদ জানাতে চেষ্টা করছিল। এক দাবড়ানি দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল নেগ্রেল।

—জানি, জানি তোমরা কি বলবে। খলের তো ছলের অভাব হয় না। মাইনে বাড়ানোর কথা বলবে তো? খুব ভালো! কোম্পানি এর পর একটাই ব্যবস্থা নেবে। আর সেটা তোমাদের পক্ষে খুব সুখের হবে না। ঝুড়ি প্রতি মজুরী কমে যাবে আর সেই ঘাটতিটুকু দেওয়া হবে এই ঠেকা দেওয়ার মেরামতি কাজের মজুরী হিসেবে। ছাখো এখন, কোন্‌টা পছন্দ হয়। আমি আবার কাল আসবো।

নেগ্রেল চলে যাবার পর দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে বিষোদ্গার করল দঁসের্।

—হারামজাদা! আমার পেছনে না লাগলে শান্তি হয় না, না? ওই তিন ফ্রাঁ জরিমানা তো কিছুই নয়। দাঁড়াও না, ছাখো কি হাড়ির হাল করি তোমাদের।

সে চলে গেলে মায়্যু গজগজ করতে লাগল।

—কি অবিচার দেখেছ? কোথায় শান্তিতে কাজ করব, তা না, যত্তো সব বাজে ঝুট ঝামেলা। দেখলে তো, মজুরী বাড়াবার কথায় কি লাভ হল? হা ভগবান!

গায়ের ঝাল মেটাবার জন্য মায়্যু ইতিউতি তাকাচ্ছিল। হঠাৎ চোখ পড়ল ক্যাথরিন আর এতিয়েনের ওপর। খেঁকিয়ে উঠল সে।

—হাঁ করে দেখছ কি? ভেবেছ তোমার গায়ে এ সবের আঁচটি লাগবে না? জলদি গিয়ে কিছুটা কাঠ দাও আমায়।

এতিয়েন চুপচাপ কাঠ এনে দিল। সে একটুও রাগ করেনি মায়্যুর ওপর। ওপরতলার কর্তারা এত নচ্ছার! এই মজুরগুলো প্রাণপাত করে খাটছে, তার বদলে কি না শুধুই জুতোর বাড়ি। লেভাক আর শাভাল ঘেন্নায় পিচ করে থুথু ফেলল। এর পর আধঘণ্টা ধরে সবাই কাঠের ঠেক্‌নাগুলোকে ভালো করে বসাতে লাগল চুপচাপ। শুধু মাঝে মাঝে আক্ষেপ আর অসন্তোষ।

মায়্যু শেষ পর্যন্ত বলল, ঢের হয়েছে। দেড়টা বাজে। দিনটা আমাদের খাসা কাটলো, কি বলো? পঞ্চাশ স্যু ছাড়া আজ আর বাড়তি কিছু জুটবে না। রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে আমার।

যদিও আরও আধঘণ্টাটাক কাজ বাকি ছিল, কিন্তু কারুরই কাজে গরজ নেই। খনিতে থাকতে হচ্ছে, তাতেই গায়ে জ্বালা ধরে যাচ্ছে। এতো কষ্টও কপালে থাকে! ক্যাথরিন একটু কাজ করবার ধান্দায় ছিল, সবাই তাকে ধমকে থামিয়ে দিল। আবার দু কিলোমিটার হাঁটা-পথ খনির মুখে যেতে গেলে।

চিমনির কাছাকাছি এসে ক্যাথরিন আর এতিয়েন লিডির সঙ্গে কথা বলার জন্য পিছিয়ে পড়ল। মুকেত্ নাকি নাক দিয়ে রক্ত পড়ার জন্য খানিক আগে কেটে পড়েছে। লিডি ঝুড়িটা নিয়ে আর নড়তে পারছে না। ওর বয়সী একটা বাচ্চার তুলনায় ঝুড়িটা অসম্ভব ভারী। কাদাভর্তি হাত পা, জামা। লিডি একটা কালো নোংরা পিঁপড়ের মতো দেওয়াল ধরে ধরে হাঁটতে লাগল। সাবধানে বুকে হেঁটে আসছিল ক্যাথরিন আর এতিয়েন। একটু অসতর্ক হলেই কপাল কেটে রক্ত পড়বে। আগুনের হল্কা বেরোচ্ছে সব সময়। গায়ের চামড়া ঝলসে লাল হয়ে যাচ্ছে।

পথের শেষপ্রান্তে এসে দেখা গেল ক্যাথরিন আর এতিয়েন একেবারে দলছুট হয়ে গেছে। মিটমিট করে খনির লাল আলোগুলো এদিক ওদিক জ্বলছে। ক্লান্ত শরীর আর টানতে পারছে না—দু'জন ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল। ক্যাথরিন আগে, তারপর এতিয়েন। আলোগুলোর কাঁচে কালি পড়েছে—ক্যাথরিনকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। এতিয়েনের একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। ক্যাথরিন একটা মেয়ে আর সে একজন টগবগে তরতাজা যুবক হয়েও এখনও একটা চুমু খেতে পারল না। কিন্তু অন্য লোকটার চেহারাটা চোখের ওপর ভেসে উঠতে নিজেরই কেমন যেন বিশ্রী লাগছে। ক্যাথরিন নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলেছে। ওই লোকটা নির্ঘাত ওর প্রেমিক! অকারণ রাগ হতে লাগল এতিয়েনের—যেন ক্যাথরিন ওকে ঠকিয়েছে। কিন্তু আবার কেমন বন্ধুর মতো আচরণ করছে ক্যাথরিন। সতর্ক করে দিচ্ছে···। এতিয়েনের মনে অসম্ভব দোটানা।

অবশেষে সত্যিই পথটা শেষ হল।

এখানে আলো, লোকজনের ব্যস্ততা, কয়লার ঝুড়ি খালি হচ্ছে; ঘোড়ায় টানা [illegible]তে বোঝাই হয়ে চলে যাচ্ছে বাইরে। দেওয়ালের সঙ্গে লেপ্টে দাঁড়াতে [illegible] প্রায় যাতে মানুষ আর জন্তুর চলার পথে বাধা না আসে। কিন্তু তাতেও [illegible] নিঃশ্বাসের হল্কা গায়ে এসে পড়ছে। জাঁ-ল্যাঁ কি একটা কটু মন্তব্য করল

কিন্তু গাড়ির চাকার ঘরঘর আওয়াজে তা ডুবে গেল। ক্যাথরিন এখন নীরব পথপ্রদর্শিকা। এতিয়েনের প্রতিমুহূর্তেই ভয় হচ্ছে এই বুঝি মেয়েটা পথ ভুল করল। আর কি ঠাণ্ডা! হাত পা জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে। হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে অবশেষে ওরা খনির একেবারে নীচে এসে পৌছল।

শাভাল আড়চোখে তাকালো এতিয়েন আর ক্যাথরিনের দিকে। খুবই সন্দেহের ব্যাপার! নতুন ছোকরাটার মতলব কি কে জানে। আর ক্যাথরিনের আদিখ্যেতা ছাখো না। আরও অনেকেই সেখানে ছিল। মনে মনে সকলেই ওপরওয়ালার মুণ্ডপাত করছে। আরও আধঘণ্টার আগে ওপরে ওঠা যাবে না। ততক্ষণ বসে বসে শীতে হি হি করে কাঁপা ছাড়া উপায় নেই। সমানে মাল ওঠানামা করছে। ওপর থেকে বৃষ্টির মতো তোড়ে জল পড়ছে। নীচে জল থৈ-থৈ। তারই মাঝে কেউ দড়ি টানছে, কেউ কপিকলে হাত লাগিয়েছে। বড় বড় তিনটে আলো। মানুষগুলোর আবছা ছায়া দৈত্যের মতো লাফাচ্ছে দেওয়ালের গায়ে—দেখলে মনে হয় ভুল করে যমরাজের দপ্তরে এসে পড়েছি।

মায়ু শেষবারের মতো অনুরোধ করল।

—পিযেরো, আমাদের এবার ওপরে উঠতে দাও। আর কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকব!

—বোকার মতো কথা বোলো না। তারপর আমার চাকরিটা যাক আর কি!

মজুরদের গজগজানি শোনা গেল। ক্যাথরিন নীচু হযে এতিযেনের কানে কানে ফিসফিস করে বলল, এসো, তোমায় আস্তাবলটা দেখাই।

সকলের চোখের আড়ালে দু'জনে চট করে বেরিয়ে গেল। ধরা পড়লেই বকুনি খেতে হত। কারণ এভাবে জায়গা ছেড়ে যাওয়াটা বেআইনী।

বাঁ দিকের খানিকটা জায়গা জুড়ে আস্তাবল। পঁচিশ মিটার লম্বা, চার মিটার উঁচু। কুড়িটা ঘোড়ার জাযগা হয। তাজা খড়ের গন্ধ, মিষ্টি ফুরফুরে বাতাস। জায়গাটা সত্যিই সুন্দর। ছোট্ট একটা আলো সমস্ত পরিবেশটাকে মায়াবী করে রেখেছে। বড় বড় নিরীহ চোখে কযেকটা ঘোড়া তাকালো ওদের দু'জনের দিকে, তারপর আবার মুখ ফিরিয়ে দানা চিবানোয মন দিল।

ক্যাথরিন চুপ করে ঘোড়াদের নামগুলো পড়ছিল। হঠাৎ চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, আরে, এ যে মুকেত্!

আসলে মুকেত্ সারা রবিবার দিনটা ইয়ার-দোস্তদের সঙ্গে ফুর্তি করে সোমবার খুব ক্লান্ত থাকে। তখন কাজ থেকে রেহাই পাবার জন্য ইচ্ছে করে নিজের নাক ফাটিযে রক্ত বের করে। তারপর নাকে জল দেবার অজুহাতে বেরিয়ে এসে এই খড়ের গাদায় নিরিবিলিতে ঘুমোয়। মুক্ ওর বুড়ো বাপ—সেও এতে সায় দেয়। ঐ তো, বুড়োটা এসে পড়েছে। বেঁটেখাটো, টাকমাথা, হৃষ্টপুষ্ট চেহারা।

মুকেতের পাশে ক্যাথরিন আর এতিয়েনকে দেখে রাগে তার গা জ্বলে গেল।

—এই ক্যাথরিন, তুই এখানে কি করছিস? যা বেরিয়ে যা! আবার সঙ্গে একটা ছোঁড়া আনা হয়েছে, না! এখানে ওসব বেলেল্লাপনা চলবে না।

এতিয়েন তো অপ্রস্তুত। মুকেত্ আর কাথরিন হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল এতিয়েনের পিছু পিছু। বাইরে বেবের আর জ্যঁল্যাঁ তখন মাল খালাস করবার কাজে হাত লাগিয়েছে। ক্যাথরিন 'বাতাঈ' নামে একটা টাট্টু ঘোড়ার গল্প বলছিল। দশ বছর খনির নীচে একটানা কাজ করতে করতে জন্তুটা এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে পথে নীচু ছাদ পড়লে নিজেই মাথা নীচু করে। নাক দিয়ে ঠেলে দরজা খোলে— এত বুদ্ধি! এমন কি নির্দিষ্ট কাজটুকু করে ফেলার পর তাকে আর এক চুলও নড়ানো যায় না। ঠিক যেন মানুষের মতো।

খাদের নীচে সব সময়ই একটা হৈ-হট্টগোল চলছে। আসলে জন্তুগুলো ভয় পেয়ে যায়, চিৎকার করে, নীচে নামতে চায় না। মাঝে মাঝে কষ্ট সহ্য করতে না পেরে মারাও যায়। এই তো! এইমাত্র তিন বছরের ঘোড়া ত্রোঁপেত্ শুয়ে পড়েছে, আর নড়ছে না। সবাই যখন ওকে জোর করে তুলে এনে লাগাম খুলতে ব্যস্ত, খুট খুট করে 'বাতাঈ' এসে দাঁড়ালো। দু-একবার শুঁকলো বন্ধুর গা, তারপর ডাক ছেড়ে আর্তনাদ করে উঠল। সবাই নাড়াচাড়া করছে ত্রোঁপেত্‌কে, কিন্তু সে আর ওঠে না। অবশেষে জোর করে চার পায়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল তাকে। বুড়ো মায়্য দুটো ঘোড়াকেই আস্তাবলের দিকে নিয়ে গেল।

মায়্যু বলল, কি, তোমরা সব তৈরি তো?

এখনও খাঁচা খালি হয়ে ওপরে উঠতে মিনিট দশেক দেরি। ইতিমধ্যে পঞ্চাশ-জন মজুর ওপরে যাবার জন্য তৈরি। ভিজে সপসপ করছে তাদের গা। পিয়েরোঁ তার মেয়ে লিডিকে মৃদু বকুনি দিল কাজে ফাঁকি দিয়ে আগে আগে চলে আসার জন্য। জাশারী সকলের অলক্ষ্যে মুকেত্‌কে চিমটি কাটছে। সকলেই আস্তে আস্তে অধৈর্য হয়ে উঠল। শাভাল আর লেভাক নেগ্রেলের চোখ রাঙানির গল্প করছে সাড়ম্বরে। মাটির নীচে ছ'শো মিটার গভীরে স্বল্পপরিসর ওইটুকু জায়গায় বিপ্লবের ইশারা। আস্তে আস্তে মজুরদের গলা চড়তে লাগল রাগে, অন্ধ আক্রোশে, জিঘাংসায়। মালিক ভেবেছে কি! হাড়ভাঙা খাটুনিও চাই আবার পয়সাও কম! এতিয়েনের রক্ত গরম হতে লাগল। রিশোম এতসব অসন্তোষের কাহিনী না শোনার ভান করে ওপরে ওঠার জন্য তাগাদা দিতে লাগল সবাইকে।

খানিক পর পরিস্থিতি আরও জটিল হল। রিশোম মায়্যুকে বলল, তুমি তো বিচক্ষণ লোক। এদের বোকার মতো হুজ্জুতি করতে বারণ করতে পারছ না? তোমাদের যখন খুঁটির জোর নেই, তখন কষ্ট সহ্য করতেই হবে।

চুপ করে ছিল মায়্যু। তার একটু একটু ভয় করছিল। হঠাৎ সবাই থেমে গেল। [illegible]মে নেয়ে হাজির হল নেগ্রেল আর দঁসের্। চিরটাকাল মজুররা সবাই মুখ বুজে [illegible]র খেয়ে চলতে অভ্যস্ত—আজও তার ব্যতিক্রম হল না। সকলের নাকের ডগা [illegible]টপট করে দুই মূর্তিমান দু খালি খাঁচাটায় বসে ওপরে উঠে গেল।

*　　*　　*　　*

আরও চারজন মজুরের সঙ্গে ওপরে উঠতে উঠতে এতিয়েন ভাবছিল : আর নয়, ঢের হয়েছে। এত কষ্টের জীবন! বাপ্‌রে বাপ্! এর চেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করাও ভালো। আবার তাও যদি পুরো মাইনেটা পকেটে আসতো। ক্যাথরিন আলাদা হয়ে গিয়েছিল। ওর সান্নিধ্যের সামান্য উষ্ণতাটুকুর জন্য এতিয়েন মনে মনে ছটফট করে মরছিল। নিজের মনকে ধমকাচ্ছিল নিজেই। গরীবের প্রেমে পড়ার বিলাসিতা সাজে না। আবার এও ভাবছিল যে তার শিক্ষাদীক্ষাও আর পাঁচজন মজুরের থেকে উঁচু দরের। এত যন্ত্রণা, অপমান সহ্য করবার আগে সে দু-চারজন কর্তাব্যক্তিকে গলা টিপে মেরে ফেলবে।

হঠাৎ বাইরের প্রখর আলোয় চোখ যেন অন্ধ হয়ে গেল এতিয়েনের। এত তাড়াতাড়ি খাঁচাটা ওপরে উঠে এসেছে! একজন লোক দরজা খুলে দিতে সবাই হুড়মুড় করে নামতে শুরু করল।

জাশারী ওই লোকটাকে (এতিয়েন কথা শুনে জানতে পারল তার নাম 'মুকে') চোখ টিপল।

—কি হে, আজ ভলকাঁতে যাবে নাকি?

ভলকাঁ একটা সস্তা দরের শুঁড়িখানা—সেখানে আনুষঙ্গিক উপকরণ হিসেবে নাচ গান চলে। মুকে একটু ঠোঁট টিপে হাসল। এর মধ্যে তার গুণধর বোনটিও এসে পাশে দাঁড়িয়েছে।

এতিয়েন চারধারে তাকিয়ে দেখল খনি অঞ্চলের ভীড় আস্তে আস্তে পাতলা হতে শুরু করেছে। দু-একটা জায়গায় শুধু টিমটিমে আলো। আর তামার ইঞ্জিনের চকচকে চেহারা চোখে পড়ে। ফিতের মতো ইস্পাতের তারগুলো বাতাসে পতপত করে উড়ছে। ধুলোয় চারদিক ছেয়ে গেছে একেবারে।

এর মধ্যে শাভাল অফিসঘর থেকে রেগে দৌড়ে বেরিয়ে এল তাদের দলের দু ঝুড়ি কয়লা বাজে অজুহাতে বাতিল হয়েছে। একটায় নাকি নির্দিষ্ট পরিমাণের কমতি আছে, আর—অন্যটার কয়লা বাজে জাতের।

—কি হাড়বজ্জাত সব, দেখ! আরও কুড়ি সু কমে গেল মজুরী থেকে। এই সবই হল ঢিলে স্বভাবের অচেনা লোক ভর্তি করার ফল। পুরুষমানুষের হাত তো নয়, যেন বাচ্চা শুয়োরের ল্যাজ!

এতিয়েনের ইচ্ছে করছিল একটা ঘুষিতে ওই শাভালের নাকটা গুঁড়িয়ে দেয়। অতিকষ্টে নিজেকে নিরস্ত করল। কিই বা লাভ ঝুটমুট ঝামেলা করে! কাল তো সে চলেই যাবে।

মায়্যু মৃদু গলায় প্রতিবাদ জানাতে চেষ্টা করল।

—থামো না শাভাল, ও তো সবে নতুন এসেছে। ধাতস্থ হতে দু-চারদিন সময় তো লাগবেই।

যাই হোক, মোটের ওপর কারুরই মেজাজ ভালো নেই। বাতি রাখার [illegible]

লেভাক অকারণে ঝগড়া করল সেখানকার লোকটার সঙ্গে। কারণটা তুচ্ছ—তার বাতি নাকি তেমন পরিষ্কার ছিল না। অবশ্য বিশ্রাম করবার ঘরে গিয়ে হাতে পায়ে গনগনে আগুনের তাপ পেতে সকলের মেজাজ খানিক ঠাণ্ডা হল। মুকেত্ অশালীন ভঙ্গিতে আধখোলা জামা কাপড় পরে গা সেঁকছিল, আর তাই দেখে উঠতি বয়সের ছোঁড়াগুলোর সে কি উল্লাস!

শাভাল বলল, আমি চললাম, যন্ত্রপাতি নিয়ে।

মুকেত্ ছাড়া তার সঙ্গে আর কেউ উঠল না। মুকেত্ও ওইদিকেই যাবে নইলে সবাই জানে শাভালের সঙ্গে ওর এখন মাখামাখি নেই।

ক্যাথরিন চুপ করে কি যেন ভাবছিল। হঠাৎ সে তার বাবার কানে কানে কি বলাতে মায়্যু ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে এতিয়েনকে ডাকল।

—ছাখো, মাইনে পেতে পেতে অনেক দেরি। এ ক'দিন পেট চালাবার মতো টাকা ধার করতে হবে। চলো, একটু চেষ্টা করে দেখি।

এতিয়েন অপ্রস্তুত মুখে চুপ করে রইল। তার ধান্দা ছিল পরদিন চলে যাওয়ার। কিন্তু ক্যাথরিনের মুখের দিকে তাকিয়ে তার দ্বিধা হল। কে জানে বাবা! হুট করে চলে গেলে মেয়েটা হয়তো তাকে অলস, অকর্মণ্য ঠাউরে বসবে। মনস্থির করে ফেলল সে।

মায়্যু বলল, অবশ্য ঠিক কথা দিতে পারছি না আমি। যদি ওরা গররাজী হয়।

এতিয়েন ভাবলো—সেই বেশ হবে। ধারও মিলবে না আবার ক্যাথরিনের কাছে মুখরক্ষাও হবে। সে ঘাড় নাড়লো। পলকে ক্যাথরিনের চোখমুখ উজ্জ্বল, বন্ধুত্বের হাসি মনের ভেতরটা যেন ওলটপালট হয়ে যায়।

চটপট সবাই তৈরি হয়ে রওনা দিল। কয়েক পা এগিয়েছে কি এগোয়নি, হঠাৎ এক সাংঘাতিক কাণ্ড দেখে সব দাঁড়িয়ে পড়ল।

একটা বড় কয়লা কারখানার শেড ওই খনি অঞ্চলেই। এখানেই কয়লা খালাস হয়। তারপর ঝাড়াই বাছাই হয়ে ট্রাকে করে চালান যায়। ফিলোমিন লেভাক সেখানে দাঁড়িয়ে। মাথায় একটা নীলচে উলের টুপি জড়ানো। হাতের কনুই পর্যন্ত কালিঝুলিতে মাখা। পিয়েরোঁর বুড়ি শাশুড়ি 'মা ব্রুলে'র সঙ্গে কাজ করছে। বুড়ির চেহারা ডাইনীর মতো। মাথায় বড় বড় জটা, পেঁচার মতো জুলজুলে চোখ আর সরু চিমসানো ঠোঁট। দু'জনেই হাতে বড় চিমটে আর হাতুড়ি নিয়ে আস্ফালন করছে। ফিলোমিন বলছে বুড়ি নাকি তার দিক থেকে কয়লা টেনে নিচ্ছে যাতে নিজের ঝুড়িটা তাড়াতাড়ি ভর্তি করা যায়। দু'জনেই চুল ছিঁড়ছে, গালাগাল দিচ্ছে, বুক চাপড়াচ্ছে, বাপান্ত করছে পরস্পরের—সে এক অদ্ভুত দৃশ্য।

জাশারী ফিলোমিনকে বলল, বুড়ি কুত্তীটার মাথা ফাটিয়ে দাও।

উপস্থিত সবাই হেসে উঠল হো হো করে। বুড়ি একরাশ থুথু ছিটিয়ে বলল, [illegible] কবু, বেজন্মা কোথাকার! যতো দরদ মুখে, না? বিয়ে করবার মুরোদ নেই [illegible] দু-দুটো বাচ্চা বিইয়েছে হারামজাদী মাগী। তোরই জন্ত তো! লজ্জাও নেই!

মায়্যু প্রাণপণে নিজের ছেলেকে সামলাতে চেষ্টা করল। কয়লাখনির পরিবেশ এত কদর্য যে গা গুলিয়ে ওঠে।

বাইরে হঠাৎ সব বাতাস থেমে গেছে। হিম-জমা ঠাণ্ডা। দু হাত বুকের ওপর জড়ো করে পাতলা জামা পরা শীর্ণ চেহারার মজুররা জোর কদমে পা চালালো যেন একদল নিগ্রো পাঁক, কাদা ঘেঁটে ঘরে ফিরছে।

জাশারী নাক কুঁচকে বলল, ওই দ্যাখো, বুতলু।

লেভাক পথ চলতে চলতেই বড়সড় হোঁৎকা হাবা চেহারার বুতলুর সঙ্গে দু-চার কথা বলল। বুতলু ওর বাড়িওয়ালা।

—কি লুই? স্যুপ তৈরি?

—মনে তো হয়।

—তাহলে তো গিন্নীর মেজাজ খুশ?

—তাই তো মনে হয়।

এখন তিনটে বাজে। একদল মজুর ঢুকছে আর একদল কাজ শেষ করে ঘরের পথে। খনির কাজ দিনে রাতে কখনও বন্ধ থাকে না।

ছোটরা অনেকটা এগিয়ে গেছে। জঁল্যাঁ আর বেবের্ নীচু গলায় কি যেন আলোচনা করছে। পেছনে খানিকটা দূরে লিডি। তারপর ক্যাথরিন, এতিয়েন আর জাশারী।

'আ লাভঁতাজ' কাফের সামনে মায়্যু আর লেভাক জোর পা চালিয়ে তাদের সবাইকে ধরে ফেলল।

এতিয়েনকে বলল মায়্যু, আমরা এসে গেছি। চলো ভেতরে যাই।

দলটা দু ভাগে ভাগ হয়ে গেল। ক্যাথরিন একটু দাঁড়ালো। কালিমাখা মুখে ঝিকিয়ে উঠল দু'-সারি মুক্তো—তারপর হাঁটা দিল খাড়াই পথে, বাড়ির দিকে।

এই কাফেটা দোতলা, ইঁটের তৈরি। সাদা চুনকাম করা। বাইরে হলুদ রঙে লেখা কাফের নাম। খনির মালিকরা এই রকম মাঝরাস্তায় ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা কাফেটা অনেকবার হস্তগত করার চেষ্টা করেও পারেনি।

মায়্যু ডাকলো, এসো, ভেতরে এসো।

ছোট একটা বারান্দা—তাতে তিনটে টেবিল, বারোটা চেয়ার। ছোট্ট একটা আলাদা টেবিল—সেখানে টাকাপয়সার হিসেবনিকেশ হয়। তার ওপর গোটা দশেক গ্লাস, তিন বোতল মদ, একটা বড় পাত্র, আর বড় একটা কল-লাগানো বীয়ারের মগ। আর কিছু নেই—কোনো ছবি, তাক, খেলার সরঞ্জাম, কিচ্ছু না। লোহার তাপচুল্লী, তাতে মৃদু আঁচে কয়লা জ্বলছে।

একটা মেয়েকে দেখে মায়্যু বলল, ছোট এক পেগ দাও।

মেয়েটা ওই অঞ্চলেরই। এক প্রতিবেশীর মেয়ে।

মায়্যু জিজ্ঞেস করল, হ্রাসন্তর আছে?

মেয়েটা বীয়ার ভর্তি করতে করতে বলল, এক্ষুণি এসে যাচ্ছে।

এক চুমুকে অর্ধেক গ্লাস খালি করে দিল মাহ্যু। এতিয়েনকে সে দিলই না কিছু। আর একটাই লোক দোকানে, সেও চুপচাপ নিজের গ্লাসে চুমুক দিয়ে যাচ্ছে। আরও একজন এল— আবারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

এরপর হ্রাসন্যর এসে ঢুকল। এই সরাইখানার মালিক। বছর আটত্রিশ বয়স। পরিষ্কারভাবে দাড়ি গোঁফ কামানো। হাসিখুশী স্বভাবের লোক। ও আগে কয়লা খনিতে চাকরি করত। একবার অন্যায়ের প্রতিবাদ করে ধর্মঘট করায় চাকরি গেছে। অন্য অনেক মজুরের বউয়ের মতো ওর বউয়েরও নিজের একটা শুঁড়িখানা ছিল। খনি থেকে গলাধাক্কা খাবার পর হ্রাসন্যর এখন কিছু টাকাপয়সা সংগ্রহ করে এখানে দিব্যি জাঁকিয়ে ব্যবসা করছে, তাও আবার খোদ মালিকের নাকের ডগায়। মজুররা সবাই তাকে পছন্দ করে, আপদে-বিপদে পরামর্শ নিতে ছুটে আসে।

মাহ্যু তাড়াতাড়ি বলল, এই ছেলেটিকেই সকালে কাজে নিয়েছি। তোমার এখানে কি ঘর খালি আছে? আর, দিন পনেরো চলার মতো যদি কিছু টাকা ধার দিতে পারো।

ক্লান্ত চোখে এতিয়েনের দিকে তাকালো হ্রাসন্যর।

—না হে, আমার দুটো ঘরই ভর্তি।

এতিয়েন জানতোই এরকম কিছু একটা ঘটবে। তবুও নিজেকে তার বড় হতভাগ্য বলে মনে হল। নাঃ। কাল পাওনা টাকাটা নিয়েই সে কেটে পড়বে।

মাহ্যু চুপচাপ গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিল।

হ্রাসন্যর বলল, তারপর, আর কি খবর?

সতর্ক চোখে চারদিকে তাকালো মাহ্যু। এতিয়েন ছাড়া ধারেকাছে আর কেউ নেই। সে গলা নামিয়ে নেগ্রেলের সব কথা জানালো।

পলকে জ্বলে উঠল হ্রাসন্যরের চোখ। বলে উঠল, বেশ তো, দেখাই যাক না, ওদের মুরোদ কত। এতিয়েনের সামনেই আকারে ইঙ্গিতে বিষোদ্গার করতে লাগল হ্রাসন্যর। বার বার একটাই কথা: এভাবে চলতে পারে না। একদিন না একদিন বারুদের স্তূপে আগুন লাগবেই। সব জায়গায় চাপা বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠেছে। বিস্ফোরণের আর দেরি নেই।

হঠাৎ হ্রাসন্যরের স্ত্রী এসে পড়ায় কথা থেমে গেল। লম্বা চওড়া, বড় থ্যাবড়া নাকের দশাসই চেহারার মহিলা।

—প্ল্যুশার-এর চিঠির কথা বলেছো? ও-ই তো তোমায় সব জানিয়েছে।

এতক্ষণ এতিয়েন চুপ করে শুনছিল। তার তাজা রক্ত টগবগ করে ফুটছে। পরিচিত নাম শুনে তার গলা থেকে আপনিই স্বর বেরিয়ে এল।

—প্ল্যুশার? ওকে আমি চিনি।

ঘরের সব ক'জোড়া চোখ এখন এতিয়েনের দিকে। ও বলল, আমি মিস্ত্রী ছিলাম [illegible] লিল্-এ ও আমার ফোরম্যান ছিল। আমার সঙ্গে ভালোমতো আলাপ আছে।

হ্রাসন্নরের হাবভাব নিমেষে বদলে গেল। তার চোখে এখন গাঢ় সহানুভূতি। বউয়ের দিকে ফিরে বলল, এই ছেলেটিকে মায়্যু সকালে কাজে লাগিয়েছে। ছাখো না, থাকবার মতো ঘর আর কিছু টাকা ধার হিসেবে দেবার ব্যবস্থা করা যায় কি না!

ব্যস! দু-চার কথাতেই সব ঠিকঠাক হয়ে গেল। একটা ছোট ঘর নাকি আজ সকালেই খালি হয়েছে। তারপর খনি নিয়ে খানিক গরম আলোচনা।

মায়্যু শেষমেষ বলল, তাহলে আজ চলি। দেখা যাক কর্তারা কি বলেন। আমাদেরও যেমন কাজ চাই, ওদেরও কয়লার দরকার। খনিতে গিয়ে আমাদের জীবনীশক্তি তো কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। ছাখো হ্রাসন্নর, তুমি যে তিন বছর হল খনি থেকে বেরিয়ে এসেছো, দিব্যি ভালোই আছ। কি আর বলবো বলো, সবই কপাল।

—যা বলেছ।

মায়্যুর সঙ্গে সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেল এতিয়েন। মায়্যু বড় বড় ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে গেল বাড়ির দিকে। মাদাম হ্রাসন্নর এতিয়েনকে একটু অপেক্ষা করতে বললেন। অসম্ভব ভীড় খরিদ্দারদের। একটু সামলিয়েই উনি ঘর দেখিয়ে দেবেন।

দোটানায় পড়ল এতিয়েন। স্বাধীনভাবে রাস্তায় ভবঘুরের জীবন ভালো না সামান্য টাকার জন্য এই বন্দীদশা! এখনই মনে হচ্ছে তার সর্বাঙ্গে এমন কি মনেও ছোপ ছোপ কয়লার দাগ। শত ধুলেও উঠবে না।

এসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে চোখ গেল সামনের দিকে। খোলা প্রান্তর, ওই দূরে দেখা যায় দিগন্তরেখা—পৃথিবী এত সুন্দর! সামনে লা ভোরা, ইট কাঠের তৈরি অঞ্চল—কেমন নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ঘিরে যেন আরও কালো কালি ঢালা একটা গভীর হ্রদ। ডান দিকে নজর বেশীদূর যায় না। আবর্জনার পাহাড় জমে আছে। মাটির ভেতরকার অসহ্য উত্তাপে ঘাস পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। এ সব ছাড়িয়ে গম, ভুট্টা আর বীটের বিস্তীর্ণ ক্ষেত—ফসল তোলার পর এখন কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া লাগছে। আজ এই শীতের পড়ন্ত বিকেলে সব কেমন স্বপ্নের মতো বলে মনে হয়। দূরে স্কারপ নদী বয়ে চলেছে তিরতির করে—ঠিক রূপোলী জরির ফিতে যেন। দু ধারে লম্বা পাতা ছাওয়া গাছের সারি, আর ছোট ছোট ডিঙি নৌকো বাঁধা। নদীর দিক থেকে চোখ সরিয়ে এতিয়েন গ্রামের দিকে তাকালো। সারি সারি একই রকমের ঘর। বেড়ার ধার দিয়ে কয়লাখনির রেল লাইন হারিয়ে গেছে কোনো নাম-না-জানা দেশের দিকে। আকাশে ফুটে উঠছে একটা দুটো তারা। হঠাৎ মনের আকাশের এক কোণে উঁকি দিয়ে গেল ক্যাথরিনের দুষ্টু মিষ্টি হাসিমুখ। পলকেই উথালপাথাল বুক। এতিয়েন জোরে জোরে শ্বাস টানলো একটা। নাঃ, এ জায়গা ছেড়ে সে নড়তে পারবে না। কি যেন এক অদৃশ্য অচ্ছেদ্য নাড়ীর বন্ধন। এই কয়েক হাজার খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি সমবেদনায় ভরে উঠল বুক। এই কয়লা-খনির পরিবেশ, মানুষজন তাকে টানছে। এতিয়েন মনে মনে মুখ ডুবিয়ে দিল এখানকার মাটিতে—স্পর্শ পেতে চেষ্টা করল প্রাণের স্পন্দনের···মায়ের বুকের ওমের মতোই।

দ্বিতীয় পর্ব

মঁস্থ থেকে দু কিলোমিটাব পুবে জোযাজেল রোড ধরে হাঁটলে লা পিয়োলেইন। এটা গ্রেগোযারদের সম্পত্তি। সাদামাটা চেহারার চৌকোণা মস্ত বড একটা বাড়ি। গত শতকের শেষ দিকে তৈরি তিরিশ হেক্টর জমির ওপব বাগান আব বাড়ি। এককালে এই বাগানের ফল আর সব্জিতে রমরমা ছিল এ তল্লাটের পুরো বাজার। খানিকটা জঙ্গল, একটা পুরনো চার্চ—এ সবই সম্পত্তির আওতায় পড়ে।

যে দিনটার কথা বলছি, সেদিন গ্রেগোযারদের ঘুম ভেঙে গেছে সকাল আটটায। তারপরও নিত্যকার নিযম অনুযায়ী পাক্কা এক ঘণ্টা বিছানায গড়ানো—পরিবারেব সবাই ঘুম-কাতুরে। তাব ওপব কাল বাতে ঝড়েব যা তাণ্ডব গেছে, অনেকক্ষণ দু চোখের পাতা এক কবা যাযনি। কর্তা সকালে উঠে বাগানে ক্ষযক্ষতিব পরিমাণ দেখতে বেবিযে যাবার পরই ঢিলেঢালা পোশাক চাপিযে চপ্পল পাযে মাদাম গ্রেগোযাব রান্নাঘরে এসে হাজির হলেন। পঞ্চাশেব কোঠাব শেষে পৌছেও তাঁব এখনও দিব্যি গোলগাল পুতুল পুতুল চেহারা। চামড়াব জৌলুসে অনেক তরুণীও লজ্জা পাবে।

রাঁধুনীকে ডাকলেন মাদাম।

—মেলানি, আজ সকালে ববং পুডিং বানাও। সব জিনিস তৈরিই আছে দিদিমণি তো আরও আধঘণ্টার আগে উঠছে না। ওকে পুডিংযেব সঙ্গে খানিকটা চকোলেটও দিও। খুব খুশী হবে পুডিং দেখলে।

হাড়-জিরজিরে চেহারাব রাঁধুনী (মেযেটা গত তিবিশ বছব যাবৎ এ সংসারে টিকে আছে) হাসতে শুরু করল।

—ঠিক বলেছেন মা। স্টোভ আমাব জ্বালানোই আছে আব ওনোবিন আমাকে একটু সাহায্য করলেই হবে।

ওনোরিনের বযস এখন কুড়ি। সেই কোন ছোট্টবেলায তাকে এ বাড়িতে এনে কাজেকর্মে তালিম দেওযা হযেছে। ও এখন পবিচারিকা। এই দু জন ছাড়া আছে ফ্রাঁসোয়া—সে কোচোযানও বটে আবার দরকারমতো ভাবী কাজও করে। একটা মালী আর তার বউ বাগানের ফলপাকড, সবজি আর মুরগিদের দেখাশুনো করে। মনিবদের সঙ্গে কর্মচারীদের সম্পর্ক এই বাজারেও মোটামুটি ভালোই বলতে হবে।

গিন্নী রান্নাঘরে ঘুরে ঘুরে তদারক করতে লাগলেন। বিরাট বড ঘর, হাত পা ছড়িয়ে কাজ করা যায়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বাসনপত্র পরিপাটি করে গোছানো। বাড়ি করবার সময় সবচেয়ে বেশী যত্ন নিয়ে এই রান্নাঘরটা বানানো হয়েছে বোঝা যায়। ভাঁড়ার উপচে পড়ছে দামী দামী খাবারে।

মাদাম গ্রেগোয়ার খাবার ঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

যদিও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাড়ি, তবু খাবার ঘরে অতিরিক্ত একটা তাপচুল্লীর [illegible]আছে। এ ঘরটা ছিমছামভাবে সাজানো। একটা টেবিল, কযেকটা চেয়ার,

সাইডবোর্ড—সবই দামী মেহগনি কাঠের। দুটো আরামকেদারা। পরিবারের লোকেরা কেউই পারতপক্ষে (নিজেদের মধ্যে থাকলে) বৈঠকখানা ব্যবহার করে না। খাওয়াদাওয়া, গল্পগুজব—সবই এই ঘরে।

মঁসিয় গ্রেগোয়ার ঘরে ঢুকলেন। দিব্যি তরুণের মতো চেহারা। কে বলবে ষাট বছর বয়স। কালকের ঝড়ে বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়নি বাগানের—সকালবেলা পুরো জায়গাটা তদারকী করা তাঁর একটা নেশার মতো দাঁড়িয়ে গেছে।

—কি হল, সেসিল এখনও ওঠেনি ?

—কি জানি। একবার তো মনে হল ওপরে চলাফেরার শব্দ পেলাম।

স্বামী-স্ত্রী খাবার ঘরে এসে হাজির হলেন। টেবিলে ধবধবে সাদা কাপড় পাতা—তাতে তিনজনের খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওনোরিন ওপরে গেল সেসিলকে ডাকতে। হাসতে হাসতে ফিরে এল সে।

—গিন্নীমা, দেখুন গে কি ছোট্ট মেয়েটির মতো দিদিমণি ঘুমোচ্ছেন। ঠিক যেন পটে আঁকা ছবিটি।

সস্নেহ প্রশ্রয়ের হাসি হাসলেন মঁসিয় গ্রেগোয়ার। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, কি গো, গিয়ে একবার দেখে আসবে নাকি ?

দু'জনে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলেন।

এ ঘরটাই সবচেয়ে বিলাসবহুল ভাবে সাজানো, একটি মাত্র মেয়ের জন্য। অকাতরে অর্থব্যয় করেছেন মঁসিয় গ্রেগোয়ার। নীল রেশমী পর্দা, সাদা চকচকে কাঠের আসবাবপত্র, তার ধারে ধারেও মানানসই করে নীল রেখা টানা। অল্প সূর্যের আলো তেরছাভাবে পর্দার ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে বিছানায়। ঘুমিয়ে আছে সেসিল। দেখতে সুন্দরী নয় তবে বড় টাটকা ছটফটে মেয়ে। আঠারো বছর বয়স। ভালো স্বাস্থ্য, শাঁখের মতো মসৃণ চামড়া, গাঢ় রংয়ের চুল। এত আস্তে আস্তে শ্বাস নিচ্ছে যে বুকের ওঠানামা বোঝাই যায় না প্রায়।

মা বললেন, দেখেছ, কাল রাতে ঝড়ের দাপটে বেচারীর বোধহয় ঘুম হয়নি।

মঁসিয় ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে স্ত্রীকে চুপ করতে বললেন। দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে সন্তানের আশা যখন ছেড়ে দিয়েছিলেন তখন সেসিলের জন্ম। প্রায়-শুষ্ক দাম্পত্যজীবনে এক ঝলক দখিনা বাতাসের মতোই।

সামান্য কেঁপে উঠল মেয়ে। পা টিপে টিপে সরে এলেন দু'জনে।

মঁসিয় বললেন, ওকে ঘুমোতে দাও। বেচারী। কাল নিশ্চয়ই খুব কষ্ট গেছে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। যত খুশি ঘুমোক। আমরা বরং নীচে অপেক্ষা করি।

নীচে নেমে এলেন দু'জনে। ভদ্রলোক একটা আরামকেদারায় জাঁকিয়ে বসলেন খবরের কাগজ নিয়ে। গিন্নী বিছানার চাদরে রঙবেরঙের ছুঁচের ফোঁড় তুলতে লাগলেন। সেসিলের চকোলেট উনুনে চাপানোই রইল।

গ্রেগোয়ারদের সম্পত্তির বাৎসরিক আয় চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ। মঁসুর কয়লাখনির ব্যবসায় তা লগ্নী করা আছে।

গত শতকের গোড়ার দিকে লিল্ আর ভালঁসিয়েন-এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে কয়লা-খনির সন্ধান পাওয়া যায়। এ বিষয়ে উৎসাহী ব্যক্তির অভাব ছিল না। দলে দলে লোক কয়লার ব্যবসাতে নাম লেখাতে শুরু করে। তবে সব জায়গা থেকেই যে কয়লা উঠত, তা নয়—বহু জায়গাতেই নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুন কাজ বন্ধ হয়ে যেত। এই ব্যাপারে সবার চেয়ে বেশী একনিষ্ঠতা দেখিয়েছেন ব্যারণ দেস্র্যুমো। চল্লিশ বছর ধরে একটানা তিনি বিভিন্ন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যান। শেষ পর্যন্ত তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আর আগ্রহে প্রতিষ্ঠিত হয় 'দেস্র্যুমো, ফোক্যনোয়া অ্যাণ্ড কোম্পানি'—মঁসুর এই কয়লাখনি অঞ্চলে। ধীরে ধীরে লাভের অংশটা বাড়তে থাকে। তখন আরও দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। কাউণ্ট কুন্তির তৈরি 'কুন্তি কোম্পানি' আর করনিল ও জেরনার পরিচালিত 'জোয়াজেল'। শেষ পর্যন্ত ১৭৬০ সালে ২৫শে আগস্ট এঁরা পারস্পরিক সমঝোতায় আসেন—প্রতিষ্ঠা হয় 'মঁসু মাইনিং কোম্পানি', এই আজও যাদের দাপট এই অঞ্চলে অব্যাহত। তিন ভাগে লভ্যাংশ ভাগ হয়। মোট সম্পত্তির পরিমাণ তিন লক্ষ ফ্রাঁ।

সেই সময় ব্যারণের এক স্টুয়ার্ড ছিল—বর্তমান মঁসিয় গ্রেগোয়ারের প্রপিতামহ। সে মনিবকে দুঃসময়ে দশ হাজার ফ্রাঁ ধার দেয়—ব্যারণ স্টুয়ার্ডকে নিজের সঙ্গে কোম্পানির অংশীদার করে নেন। তারপর লাভের অংশ বাড়তে থাকে হু হু করে। এগিয়ে আসে ফরাসী বিপ্লব। কিন্তু ওই দশ হাজার ফ্রাঁর আয় বাড়তে বাড়তে ১৮৫০ সালে হয় চল্লিশ হাজার। দু বছর আগে তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ।

যখন এই রকম অবস্থা, সবাই মঁসিয় গ্রেগোয়ারকে পরামর্শ দেয়, সময় থাকতে থাকতে শেয়ার বেচে ফেলতে। কিন্তু সে কথায় কান দেননি তিনি। ছ'মাস পর নানা কারণে কয়লার দর নেমে আসতে থাকে, তখনও কিন্তু তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত হতে দেখা যায়নি। তাঁর অগাধ আস্থা এই খনির ওপর। ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য। এ ব্যাপারে মানুষের নাক না গলানোই ভালো—এই রকম একটা মনোভাব তাঁর। তাছাড়া তিনপুরুষ ধরে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে বসে খেয়ে কাজের উৎসাহও নষ্ট হয়ে গেছে। এই ভাবেই যে ক'দিন চলে চলুক। আরও একটা ভয়ও মনের মধ্যে কাজ করত—কাঁচা টাকা আর চাঁদের আলো একই রকম, কোনোটাকেই মুঠোর মধ্যে ধরে রাখা যায় না। তার চেয়ে সম্পত্তি থাকুক মাটির নীচে, নিরাপদে।

মঁসিয় গ্রেগোয়ার খুব অল্প বয়সে একজন গরীব রসায়নবিদের মেয়েকে বিয়ে করেন। স্ত্রীকে ভালোবাসতেন পাগলের মতো আর স্ত্রীও স্বামীর মনে কখনও কোনো খেদ জমা হতে দেননি। দিনরাত মুখ বুজে সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকতেন তিনি। স্বামীর মতামত ভিন্ন নিজের মত বলতে কিছু ছিল না তাঁর, এমন কি পছন্দ অপছন্দও ছিল এক ধাঁচের। বিয়ের অনেক বছর পর সেসিল জন্মালো। খরচাপাতিও বাড়লো কিছুটা। তবুও অভাব ছিল না কিছুরই। মেয়ের সব আহ্লাদ আবদার সস্নেহ প্রশ্রয়ের নিতেন দু'জনে। একটার জায়গায় দু'টো ঘোড়া, দু'টো বেশী গাড়ি,

প্যারিস থেকে আনানো জামাকাপড়। তাঁরা দু'জনে কিন্তু সেই আগের মতোই আছেন। গত চল্লিশ বছরে বদলাননি একটুও। যত সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না সবই তাদের মেয়েকে ঘিরে।

দরজা খুলে গেল। সেসিলের রিণরিণে গলা ভেসে এল।

—কি হল? আমাকে ছাড়াই বুঝি খাওয়াদাওয়া খতম?

মেয়েটির চোখ থেকে এখনও ঘুম যায়নি। পরনে সাদা পশমের পোশাক।

মা শশব্যস্তে বলে উঠলেন, না না সোনা। দেখ না, এই তো তোমার জন্য আমরা সবাই বসে আছি। কাল রাতে ঝড়ের জন্য ঘুমের অসুবিধে হয়েছে, না?

সেসিল অবাক চোখে তাকায়।

—ঝড়? কই কিছু টের পাইনি তো! সারারাত মড়ার মতো ঘুমিয়েছি।

হো হো করে হেসে ওঠেন কর্তা-গিন্নী। পরিচারিকাও বাদ যায় না। যেন এটা ভীষণ মজার ব্যাপার।

সেসিল খাবার দেখে হাততালি দিয়ে ওঠে আনন্দে।

—কি কাণ্ড! আমাকে অবাক করে দেওয়া হল বুঝি!

সবাই খেতে বসলেন। রাঁধুনী, পরিচারিকা পরিবেশন করতে লাগল। টুকিটাকি কথা, হালকা হাসি।

হঠাৎ কুকুরদের চিৎকার। সবাই ভাবলো হয় পিয়ানো শেখাবার দিদিমণি অথবা সাহিত্যের অধ্যাপক এসেছেন। দু'জনেই আসেন মেয়ের জন্য। কিন্তু তা নয়, মঁসিয় অন্ত্রলঁ্যা। ইনি কর্তার জ্ঞাতি ভাই। উঁচু গলায় কথা বলেন, ছটফটে স্বভাবের লোক—পঞ্চাশের ওপরে বয়েস কিন্তু চুল আর গোঁফে এখনও পাক ধরেনি।

—সুপ্রভাত। না না, আমার জন্য ব্যস্ত হবার কোনো দরকার নেই।

মঁসিয় গ্রেগোয়ার বললেন, কি ব্যাপার বলো তো?

—আরে কিছু নয়। এমনিই, এ পথঃ দিয়ে যাচ্ছিলাম তাই ভাবলাম একবার খোঁজ নিয়ে যাই।

সেসিল তাঁকে তাঁর মেয়েদের খবর জিজ্ঞেস করল। জান্ আর লুসি।

—দু'জনেই দিব্যি আছে। একজন ছবি আঁকা নিয়ে ব্যস্ত, অন্যজন পিয়ানো।

যদিও অন্ত্রলঁ্যার হাবভাব স্বাভাবিক, তবু তাঁর কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ গোপন থাকছিল না।

—খনিতে সব ঠিক আছে?

জিজ্ঞেস করলেন মঁসিয় গ্রেগোয়ার।

—হ্যাঁ। মোটামুটি ঠিকই। তবে কিনা বড় বেশী প্রতিযোগিতার মধ্যে চলতে হয় আজকাল। ব্যাঙের ছাতার মতো সব কোম্পানি গজিয়ে উঠছে।

উনিও মঁসু কয়লাখনির অংশীদার ছিলেন। লাভের অংশ যখন সর্বোচ্চ, তখন নিজের ভাগটা বেচে দেন। ওঁর মাথায় আসলে অন্য মতলব আছে। ওঁর স্ত্রীর নামে অন্য একটা কয়লাখনির কিছু অংশ ছিল। সেটা বিশেষ ভাগ্যে ছিল

না। উনি তার পেছনে টাকা ঢালতে উৎসাহী ছিলেন যদি আবার ওটাকে দাঁড় করানো যায় ভেবে। কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর পর নানান কারণে ব্যবসা মন্দা যাচ্ছে। মেজাজও ওঁর বড় খিটখিটে। কর্মচারীদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারেন না। কারণে অকারণে অন্যদের অপমান করেন, নিজেও অপমানিত হন। মেয়েরা তো হাতের বাইরে চলে গেছে, তবে হাসিমুখে ঘরের কাজকর্ম সামাল দেয়।

—বুঝলে লিয়ঁ, তুমি তখন নিজের অংশ বেচে না দিয়ে খুব ভুল করেছ। দেখছ তো চারদিকে কি অবস্থা। বরং আমায় যদি টাকাটা দিতে, ভঁদাম কয়লাখনির হাল ফিরিয়ে দিতাম।

নিস্পৃহ গলায় মঁসিয় বললেন, না হে, এসব ব্যবসাপাতির দিকে নতুন করে মন দেবার বয়স বা ইচ্ছে—কোনোটাই আমার নেই। মঁস্যুর অবস্থা যত খারাপই হোক, আমাদের তিনটে পেট ভরাবার মতো অবস্থা তার সব সময়ই থাকবে। দেখো, তোমারই বরং একদিন আফসোস হবে নিজের অংশটা বেচে দিয়েছ বলে।

দ্যন্তলঁ্যা অপ্রস্তুত ভাবে বললেন, তাহলে আমার প্রস্তাব তোমার পছন্দ নয়?

মঁসিয় গ্রেগোয়ারের মুখ দেখে মনে মনে হাত কামড়ালেন দ্যন্তলঁ্যা। ছি ছি, এত তাড়াতাড়ি ঘুঁটি কাঁচিয়ে দেওয়া উচিত হয়নি। আরও রয়ে সয়ে বলা উচিত ছিল।

কথা ঘুরিয়ে নিলেন তিনি।

—না হে, না। ঠাট্টা করছিলাম। সত্যি তুমিই ঠিক বলেছ।

কথাবার্তা এরপর অন্য দিকে মোড় নিল। মাদাম গ্রেগোয়ার কথা দিলেন একদিন মেয়েকে নিয়ে উনি নিশ্চয়ই ওঁদের ওখানে বেড়াতে যাবেন। মঁসিয় গ্রেগোয়ার কিন্তু চুপ করে অন্য কথা ভাবছিলেন।

হঠাৎ বলে উঠলেন, দ্যন্তলঁ্যা, আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম তবে ঐ মঁস্যু-তেই ফিরে আসতাম। মঁস্যু তো চেষ্টা করছে ভঁদাম কিনে নেবার জন্য।

জ্বলে উঠল দ্যন্তলঁ্যার চোখ।

—না, আমি থাকতে মঁস্যু কখনও ভঁদামকে হাত করতে পারবে না। সেদিন এনবোর সঙ্গে খেতে গিয়ে ওর মতলব বুঝেছি আমি। সব বড়লোকের পা-চাটা কুত্তার দল!

কথাটা কিছুটা হয়তো ঠিক। প্রথমে ছ'জন কর্তাব্যক্তিকে নিয়ে মালিকপক্ষ (পরিচালক সমিতি) তৈরি হয়েছিল। এঁদের মধ্যে একজন মারা গেলে দেখে শুনে প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী বিত্তবান কাউকে নিজেদের মধ্যে ডাকা হয়। মনে মনে এ ব্যাপারটা অপছন্দ করেন মঁসিয় গ্রেগোয়ার। কাজেই তিনি মালিকপক্ষের হয়ে ওকালতি করলেন না।

মেলানি টেবিল পরিষ্কার করতে এল। আবার বাইরে কুকুরদের চিৎকার। মুখে খাবার নিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠল সেসিল।

—দেখি, বোধহয় মাস্টার মশাই এলেন।

দ্যন্তলঁ্যাও উঠে দাঁড়িয়েছেন। সেসিলের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে তিনি হাসলেন।

—ওর সঙ্গে নেগ্রেলের বিয়ের কি হল ?

মাদাম বললেন, এখনও ঠিক হয়নি কিছু। হুট করে তো দেব না। খানিক ভেবে দেখি।

—সে তো বটেই। ওই ছোকরা আর তার মামীর মধ্যে বোধহয় অন্য রকম কোনো·· । যাকগে, এখন সবই সেসিলের কপাল।

বাড়ির কর্তা রেগে গেলেন।

—ছি ছি ! ভদ্রমহিলা নেগ্রেলের থেকে চোদ্দ বছরের বড। তাকে নিয়ে এত কুৎসা কেন !

গ্রন্ভল্যঁ্যা করমর্দন করে বিদায় নিলেন।

সেসিল দৌড়ে এল ঘরে।

—না মা। মাস্টারমশাই নন। ওই যে বউটা, দুটো বাচ্চা নিয়ে এসেছে—যার বর খনিতে কাজ করে। ভেতরে ডাকবো ?

সবাই একটু দ্বিধা করছিল। কে জানে কতটা নোংরা ! যাক গে, জুতো বাইরে ছেড়ে এলেই হবে।

স্বামী-স্ত্রী আরামকেদারায় বসে খাবার হজম করছিলেন।

—ওদের ভেতরে ডাকো, ওনোরিন।

মায়্যুর বউ দুটো বাচ্চা নিয়ে ভেতরে এল। ভয়ে, শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে। ওঃ ঘরটা কি গরম আর কতরকম খাবারের লোভনীয় সুগন্ধ।

* * * *

শোবার ঘরে দরজা জানলা বন্ধ—সবেমাত্র ভোর হয়েছে। ক্যাথরিনরা বেরিয়ে গেছে। ঘুলঘুলি দিয়ে বাঁকাভাবে এসে পড়েছে সূর্যের আলো। লেনোর্ আর অঁরি দু'জন জড়াজড়ি করে ঘুমোচ্ছে। আলজিরের অবস্থাও তথৈবচ। ঠাকুর্দা বোন্মর—জাশারী আর জ্যঁল্যাঁর খাটে হাঁ করে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। অন্য ছোট ঘর থেকেও কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। মায়্যুর স্ত্রী বাচ্চা এস্তেলকে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে ঘুমিয়ে পড়েছে। এস্তেলেরও পেট আপাতত ভর্তি। সেও ঘুমোচ্ছে চুপচাপ।

নীচে ঘড়িতে ঢং ঢং করে ছ'টা বাজলো। বাইরে লোকের চলাফেরার শব্দ। এর পর আবার ঘণ্টাখানেক চুপচাপ। হঠাৎ প্রচণ্ড চেঁচামেচির শব্দে আলজিরের ঘুম ভেঙে গেল। খালি পায়ে পাশের ঘরে দৌড়ে গেল সে মায়ের ঘুম ভাঙাতে।

—মা, মা শীগগির ওঠো। ঢের বেলা হয়ে গেছে। কোথায় যেন বেরোবার কথা বলেছিলে না ? ছাখো কাণ্ড ! এস্তেলকে চাপা দিয়ে মেরে ফেলবে নাকি ?

বাচ্চাটাকে সরিয়ে দিল আলজির্।

চোখ কচলাতে কচলাতে মায়্যুর বউ বলল, বাবা রে বাবা ! সারা জীবন হাড়ে মাসে জ্বলে পুড়ে মরলাম, দু'দণ্ড যে নিশ্চিন্তে ঘুমোবো, তার উপায় নেই। ঘুম এসে না নেওয়া পর্যন্ত সংসারের ঝক্কি সামলাতে হবে। লেনোর্ আর অঁরিকে [illegible] করে

দে। আমি ওদের নিয়ে বেরোবো। তুই এস্তেলকে দেখবি। ওকে নিয়ে এই ঠাণ্ডায় বেরোতে ভরসা হয় না।

তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নিল মাম্যু-গিন্নী। তারপর পুরনো নীল ঝলঝলে একটা স্কার্ট (এটাই ওর সবচেয়ে পরিষ্কার পোশাক) আর দু জায়গায় তাপ্পিমারা ছাই-ছাই রঙের পশমী জামা পরল একটা।

—আলজির্, ওদের তৈরি করে দে তাড়াতাড়ি।

নীচে নামতে নামতে চিৎকার দিল।

আলজির্ এস্তেলকে কোলে তুলে নিল। কোঁকিয়ে কেঁদে উঠল বাচ্চাটা কিন্তু এই বয়সে কচি বাচ্চা সামলানোয় বেশ পোক্ত হয়ে গেছে আলজির্। বোনকে নিজের খাটে শুইয়ে নিজের একটা আঙুল চুষতে দিল তাকে। আবোলতাবোল ছড়ার গানে তাকে ঠিক ঘুম পাড়িয়ে ফেলল। ইতিমধ্যে লেনোর্ আর অঁরি উঠে তাণ্ডবনৃত্য শুরু করেছে। লেনোর্ মেয়েটা বড়, অঁরি ওর চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট ভাই। একমাত্র ঘুমের সময় ছাড়া দু'জনকে কখনই গলা জড়াজড়ি করে থাকতে দেখা যায় না। চুলোচুলি খিটিমিটি লেগেই আছে। লেনোর্ ঘুমচোখেই অঁরিকে পিটতে শুরু করল। তারপর জামাকাপড় পরে তৈরি হবার সময় আলজির্কে ধরে খিমচানো আর মার! এসব অবশ্য নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সকলেরই গা-সহা হয়ে গেছে। বাড়িতে পিঠোপিঠি ভাইবোন থাকলে অমন একটু-আধটু হয়। তবে এই শুম্ভনিশুম্ভের লড়াইয়েও ঠাকুর্দার ঘুম ভাঙলো না।

ওদের মা চেঁচালো, কি রে, তোদের হল?

সে বুড়ো শ্বশুরের জন্য স্যুপ তৈরি করে রাখলো। বুড়ো এখন রাক্ষসের মতো সবটা না গিললেই রক্ষে! কোনোরকমে আজকের মতো বাচ্চাদের খাবার যোগাড় হয়ে যাবে। তবে ভাঁড়ার শেষ। কাল থেকে পেটে কিল মেরে পড়ে থাকতে হবে যদি মুদিখানায় ধার না পাওয়া যায়। আর 'লা পিয়োলেইন'-এ পাঁচ ফ্রাঁ চাইলে যদি না দেয়, তবে নেহাতই ভগবান ভরসা। না খেয়ে বেঁচে থাকার কোনো উপায় যদি থাকতো!

—তোরা নেমে আয় না! দেরি করতেও পারিস বাবা!

আলজির্ দু'জনকে নিয়ে নীচে নেমে এল। খাবার ভাগ করে তিনজনের প্লেটে রাখলো তাদের মা। নিজে শুধুমাত্র কফির তলানিটুকু ছাড়া কিছুই নিল না। তার নাকি তেমন খিদে নেই।

আলজির্কে সে বললো, দেখো, ঠাকুর্দাকে জাগিয়ে দিও না। এস্তেল যেন পড়ে-টড়ে না যায়। যদি উঠে খুব কান্নাকাটি করে, জলে একটু চিনি গুলে খাইয়ে দিও। আমি জানি তুমি লক্ষ্মী মেয়ে। বোনের খাবারে যেন ভাগ বসিও না।

—আর আমার স্কুল?

—আজ আর হবে না। কাল যেও। দেখছই তো বাড়িতে কত কাজ। ...র আসতে দেরি দেখলে আমি কি স্যুপটা রান্না করে রাখব?

—না। আমার জন্য অপেক্ষা কোরো।

আলজিব্ চুপ করে রইল। এইটুকু বয়সেই ও জেনে গিয়েছে কত কষ্ট করে মাকে সংসার চালাতে হয়।

বাইরে দু-তিনজন করে বাচ্চারা স্কুলে যেতে শুরু করেছে। ঘড়িতে আটটা বাজলো।

জানলার শার্সিতে নাক ঠেকিয়ে একজন চেঁচালো।

—ওহে মায়্যু-গিন্নী, জোর খবর আছে।

—এখন না। একটু বেরোচ্ছি। এসে শুনব, কেমন ?

বাচ্চাদের হাত ধরে বেরিয়ে গেল সে। বুড়ো বোনমর গাঁক গাঁক করে নাক ডাকাতে লাগলো।

রাস্তায় বেরিয়ে দেখা গেল বাতাস থেমে গেছে। চারদিকে থিক থিক করছে কাদা। আকাশ থমথমে। বেশী জোরে হাঁটা যাচ্ছে না, কাদায় পা আটকে যাচ্ছে। লেনোর্ কাদা ঘাঁটবার ফিকির করছিল। হঠাৎ মা দেখে ফেলল।

—বজ্জাত মেয়ে! দাঁড়াও, আজ ওই কাদার গোলা খাওয়াবো তোমাকে।

ইতিমধ্যে অঁরি দু হাতে কাদা মাখামাখি করে ফেলেছে। মা ঘাড় ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের। বেশ অনেকটা রাস্তা। দু ধারে নানান ধাঁচের বাড়ি। কয়লাখনি অঞ্চলের ছোট ছোট কারখানা—ধোঁয়ায় ধুলোয় একাকার।

মাদাম এনবোর বাড়ির সামনে চকচকে পোশাক পরা ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা। দু'দণ্ড নিজের অজান্তেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল মায়্যু-গিন্নী। তারপর চটকা ভেঙে হাঁটতে শুরু করল।

ওই তো মেইগ্রার মুদিখানা। কি না বেচে ও—রুটি, বীয়ার থেকে শুরু করে বাসনপত্র পর্যন্ত। ব্যবসা দিব্যি জমে উঠেছে। কয়লাখনির মালিকদের কৃপায় ও এখন দু' পয়সার মুখ দেখছে।

মায়্যু-গিন্নী নীচু গলায় বলল, মঁসিয় মেইগ্রা, আমি এসেছি।

দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল মেইগ্রা। মোটা বেঢপ চেহারা, শীতল গলায় কথা বলে।

মায়্যুর বউ বলেই চলল, আজ কিন্তু আমি কালকের মতো খালি হাতে ফিরে যাচ্ছি না। অবশ্য এটা মানি যে গত দু'বছরে আপনার কাছে আমাদের ষাট ফ্রাঁ ধার হয়ে গেছে।

ছোট ছোট অসম্পূর্ণ বাক্যে নিজের দুরবস্থার কথা, সাংসারিক অসুবিধের কথা বোঝাতে চেষ্টা করছিল সে। খনিতে ঠিকমতো মাইনে পাওয়া যায় না। এদিকে ওদিকে ধারেরও কমতি নেই—চারদিকেই নানান অসুবিধে। সে একলা মেয়েমানুষ, ঠাণ্ডা মাথায় সব দিক বিবেচনা করে চালায়ই বা কি করে!

মেইগ্রা কিন্তু ঘাড় নেড়ে বলে যাচ্ছিল যে কিছু লাভ হবে না।

—দুটো পাউরুটি দিন। আমি তার বেশী চাই না। কফি ছাড়াই চালিয়ে নেব। শুধু দুটো তিন পাউণ্ডের রুটি।

গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে উঠল মেইগ্রা।

—বলছি তো, হবে না!

মেইগ্রার অসুস্থ চেহারার স্ত্রী বাইরে বেরিয়ে এল। মায়্যু-গিন্নীর আকুতি শুনে তার খুব কষ্টও হচ্ছিল, কিন্তু উপায় কি! শোনা যায় মেয়ে খদ্দেরদের আনাগোনা বাড়াবার জন্য সে স্বামীকে যথেচ্ছাচার করতে দেয়। মেইগ্রার কাছে বাড়তি সুবিধে পাবার জন্য বেশী কষ্ট করতে হয় না। মেয়ে, বউ যাকে হোক তার দোকানে পাঠিয়ে দিলেই হল।

মেইগ্রা নোংরা চোখে তাকালো মায়্যুর বউয়ের দিকে। সমস্ত শরীর সিঁটিয়ে গেল মায়্যু-গিন্নীর। লোকটার দৃষ্টিতে এত আবিলতা! মনে হয় চোখ দিয়ে সর্বাঙ্গ চাটছে। ছি ছি, সে সাত ছেলেমেয়ের মা! তার ওপরও লোকটার লালসার দৃষ্টি! লেনোর্ আর অঁরির হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চললো সে—ছেলেমেয়ে-গুলোও হয়েছে এক নম্বরের হাভাতে—এইটুকু সময়ের মধ্যেই পথে পড়ে থাকা বাদামের খোসা খুঁটতে শুরু করেছে।

যেতে যেতে অভিসম্পাত দিচ্ছিল মায়্যুর বউ।

—মাথার ওপর ভগবান রয়েছেন। গরীবের ওপর এত অত্যাচার ধর্মে সইবে না কখ্‌খনো।

এখন ভরসা 'লা পিয়োলেইন'-এর বাসিন্দারা। যদি ওখানে পাঁচ ফ্রাঁ ধার পাওয়া না যায়, ছেলেপুলে নিযে না খেযে মরতে হবে। সকলে বাঁ দিকের মোড ঘুরলো। এ দিকটা অভিজাত পাড়া। পাঁচ ফ্রাঁ দিয়ে কি করবে তার একটা হিসেব ছকে ফেলাই আছে। প্রথমে রুটি আর কফি তারপর খানিকটা মাখন, সেরখানেক আলু আর সম্ভব হলে একটু মাংস।

রাস্তায় একজন ধর্মযাজকের সঙ্গে দেখা হযে গেল। তিনি একটু হেসে তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে গেলেন। গরীবদের সবাই এড়াতে চায়।

আবার কাদা ভেঙে পথ চলা। এখনো দু কিলোমিটার রাস্তা বাকি। বাচ্চারা খিদেয়, ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে গেছে। দু'জনেই পালা করে কোলে চাপতে চায়। স্কার্টটা হাঁটুর ওপর তুলে হাঁটতে হচ্ছে। তিন-তিনবার তো পড়েই গেল! অবশেষে সিঁড়ির কাছে এসে পৌছল তিনজনে।

দুটো বিরাট কুকুর চিৎকার করে এগিয়ে আসতে ভয়ে কেঁকিয়ে উঠল বাচ্চারা।

বাড়ির পরিচারিকা ওনোরিন বলল, তোমরা ভেতরে এস।

মা আর দুই বাচ্চা বিস্ময়ে মূক হয়ে সাজানো গোছানো ঘরে দাঁড়িয়ে ছিল। বাড়ির মালিক আর তাঁর স্ত্রী কিছুটা কৌতূহলভরে, কিছুটা অনুকম্পায় তাকিয়েছিলেন ওদের দিকে।

সেসিলকে তার মা বললেন, তুমি এদের কি দেবে, নিয়ে এস।

স্বামী স্ত্রী সব সময় দানধ্যানগুলো মেয়ের হাত দিয়েই করেন। সেটাই ভব্যতা। [illegible]নেদীয়ানায় অভ্যস্ত করে তুলতে চান। ঈশ্বরের এত দয়া তাঁদের ওপর,

কিছুটা দান না করলে শান্তি হয় না। আর তাঁদের মতে গরীবদের হাতে কাঁচা পয়সা না দিয়ে জিনিসপত্র দেওযাই ভালো—পযসা হাতে পেলে ওরা নেশা করতে ছোটে।

সেসিল বলল, আহা রে, দুধের বাচ্চাগুলো শীতে একদম জমে গেছে। যাও তো ওনোরিন, ওপর থেকে জামাকাপড়ের বাণ্ডিলটা নিযে এস।

কাজের লোকেরাও হাঁ করে তাকিয়েছিল বাচ্চা দুটো আর তাদের মায়ের দিকে। যত্তোসব হাঘরে হাভাতে এসে জোটেও বাবা!

সেসিল বলল, আমার কাছে দুটো পশমের জামা আর কিছু অন্য জামাকাপড় আছে। কিন্তু তাতে কি শীত কাটবে?

মায্যু-গিন্নী কৃতজ্ঞতায প্রায় কেঁদে ফেলল।

—দিদিমণি, আপনার কত দযা। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

এদিকে কিন্তু মায্যুর বউযের মাথায় ঘুরছে কি করে ওই পাঁচ ফ্রাঁর কথাটা তোলা যায়। এখনও জামাকাপড় নিযে পরিচারিকাটি আসেনি।

ঘরের নীরবতা ভেঙে মাদাম গ্রেগোযার বললেন, তোমার বুঝি এই দুটি ছেলে-মেয়ে?

—না মাদাম, সাতটা।

মঁসিয় গ্রেগোযার আর চুপ করে থাকতে পারলেন না।

—বলো কি। খেতে পাও না অথচ এসব আহাম্মকি তো ঠিক আছে!

মাদাম বললেন, সত্যিই! এটা কি করলে!

মায্যু-গিন্নী ক্ষমা চাইবার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো।

—আসলে গরীবের সংসারেই যতো মা ষষ্ঠীর কৃপা! বুড়ো শ্বশুর শক্তসমর্থ হলে আর বাচ্চারা সবাই খনিতে কাজ করবার মতো বড়সড় হলে কি আর এরকম দুরবস্থা হতো!

—তোমরা কি অনেক দিন খনিতে কাজ করছ?

মায্যু-গিন্নীর মুখ উদ্ভাসিত হল।

—হ্যাঁ। আমার কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত খনিতে কাজ করেছি। যখন আমার দ্বিতীয বাচ্চাটা হল, ডাক্তার আর কাজ করতে বারণ করল। তবে তাতে ভালোই হয়েছে কারণ সংসারের ঝক্কি তো কম ছিল না! আমার স্বামীরা কয়েক পুরুষ ধরে খনিতে কাজ করছে।

মঁসিয় গ্রেগোয়ার চিন্তান্বিতভাবে তাকিয়েছিলেন ওদের দিকে। না-খেতে-পাওয়া অপুষ্ট রক্তহীন চেহারা! এখানে কত মহার্ঘ বিলাসিতা আর ওদিকে সীমাহীন দারিদ্র্য—দুনিয়াটাই তাজ্জব!

সেসিল রাগে চেঁচিয়ে উঠল।

—কি হল কি! ওপরে গেছে তো গেছেই। মেলানি, যাও তো, ওকে বলো তাড়াতাড়ি নেমে আসতে।

মঁসিয় গ্রেগোয়ার বললেন, পৃথিবীতে বঞ্চনা, দারিদ্র্য তো আছেই। জানি

মজুরদের অনেক কষ্ট কিন্তু এটাও ঠিক, সময়ে সময়ে ওরাও বড় বেয়াড়াপনা করে। দু'পক্ষকেই তো কিছু না কিছু ছাড়তে হবে।

—হ্যাঁ স্যার, আপনি ঠিকই বলেছেন। ওরাও ঠিকমতো চলতে জানে না। টাকা পেলেই শুঁড়িখানায় ছোটে। আমি তো সব সময় বাড়ির লোককে বোঝাতে চেষ্টা করি। তবে আমি একদিক দিয়ে ভালো আছি। আমার কর্তা তেমন নেশাভাঙ করে না। মাঝেমধ্যে যেটুকু না করলে নয়, শুধু সেইটুকু। পুরুষমানুষের আবার একটু-আধটু বারটান না থাকলে চলে না। তাতেও তো হাত খালি। সারা ঘর তোলপাড় করেও কানাকড়ি মেলে না।

যেন-তেন-প্রকারেণ পাঁচ ফ্রাঁর কথাটা একবার তুলতে পারলে হয়। ধার-দেনার কথা বলে কর্তা-গিন্নীর মন ভেজাতে হবে! ইনিয়ে-বিনিয়ে অভাবের কথা বলতে শুরু করল সে।

মাদাম গ্রেগোয়ার বললেন, কিন্তু কোম্পানি থেকে তো থাকার জায়গা আর জ্বালানি দেওয়া হয় তোমাদের।

লেনোরের মা আড়চোখে তাকালো গনগনে ফায়ারপ্লেসের দিকে।

—হ্যাঁ, তবে সে যা কয়লা! ধরাতেই প্রাণ বেরিয়ে যায়। আমাদের যা আর্থিক অবস্থা চলছে তাতে আমাকে কেটে ফেললেও ফুটো পয়সা বেরোবে না।

কর্তা-গিন্নী গম্ভীর মুখে বসে রইলেন। এত বাজে বকতেও পারে বউটা! অভাব-টভাব এত দূরের জিনিস বলে মনে হয় আমাদের, এই মূর্খরা সেটা না বুঝেই বিব্রত করে।

মায়্যু-গিন্নী শশব্যস্তে বলল, আমরা অবশ্য এত দুঃখ-কষ্ট মেনে নিয়েছি। সবই ভাগ্যের ব্যাপার। যে যেমন আছে, ভগবান যাকে যেমন রেখেছেন—তাতেই তো তার সন্তুষ্ট থাকা উচিত, তাই না?

মঁসিয় গ্রেগোয়ার সায় দিলেন।

—ঠিক বলেছ। এমনটা বোঝে ক'জন?

পরিচারিকারা কাপড়চোপড় নিয়ে এল। সেসিল সব ভালো করে দেখল। দুটো জামা, শাল এমন কি মোজা আর দস্তানা পর্যন্ত। হ্যাঁ, সবগুলোই ঠিক মাপসই হবে। তাড়াতাড়ি এখন এদের বিদায় করে দিতে পারলে বাঁচা যায়! এদিকে আবার গানের দিদিমণি এসে বসে আছেন। সেসিল সকলকে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

মায়্যুর বউ বলল, আমাদের আর্থিক অবস্থা সত্যিই খুব খারাপ। যদি পাঁচ ফ্রাঁ ধার পাওয়া যেত···

কথাটা মাঝপথেই গলায় আটকে গেল। মায়্যুরা তো কখনও ভিক্ষে চায় না।

সেসিল আড়চোখে তার বাবার দিকে তাকালো। মঁসিয় গ্রেগোয়ার ইশারা করলেন।

মেয়ে বলল, না, আমরা তো ওরকম ভাবে সাহায্য দিই না।

মায়্যুর বউয়ের মুখটা করুণ হয়ে গেল। বাচ্চাগুলোর জন্য মায়া হচ্ছিল সেসিলের। [illegible] কেকের দুটো বড় টুকরো কেটে দিল সে।

—নাও, তোমরা নাও।

পরক্ষণেই বলল, নাঃ, তার থেকে বরং কাগজে মুড়িয়ে দিই বাড়ি গিয়ে ভাইবোনেরা সকলে ভাগ করে খেও।

সকলে বেরিয়ে গেল, খাবার আর পোশাকের মোড়কগুলো দু'হাতে বুকের ওপর আঁকড়ে ধরে।

ফেরার পথে মায়্যর বউ আবার গেল মেইগ্রার দোকানে। এত সহজে হাল ছাড়বার পাত্রী নয় সে। ঘ্যানর ঘ্যানর করে ঠিক রুটি, কফি, মাখন এমন কি পাঁচ ফ্রাঁ নগদ ধারও পেয়ে গেল। তবে মেইগ্রার এত দয়ার আসল কারণটা ক্যাথরিন। ছল-ছুতোয় সে মায়্য-গিন্নীকে বলল মেয়েকে দোকানে পাঠাতে।

ক্যাথরিনের মা ঘাড় নাড়লো। মনে মনে ভাবলো, সে দেখা যাবে। আপাতত তো সমস্যা মিটুক। তারপর শয়তান মেইগ্রা বেশী বেয়াদপি করলে সেও জানে কি করে এসব লোলুপ বদমায়েসগুলোকে শায়েস্তা করতে হয়।

* * * *

চার্চের ঘড়িতে ঢং ঢং করে এগারোটা বাজলেই প্রতি রবিবার নিয়ম করে ফাদার জোয়ার উপাসনা শুরু করেন। পাশের স্কুল থেকে ভেসে আসা বাচ্চাদের সুরেলা কণ্ঠস্বরে ভেঙে খানখান হয়ে যায় নিস্তব্ধতা। সব বাড়ির চিমনি দিয়ে গল গল করে বেরিয়ে আসছে রান্নাঘরের ধোঁয়া—এখন গিন্নীদের কাজের সময়।

বাড়ি ফেরবার পথে এক ভদ্রমহিলার কাছে জমে থাকা কিছুটা আলু কিনে নিল মায়্যর বউ। কাদা-মাখা লেনোর আর অঁরিকে নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সে বলল, ওরে আলজির, আমরা এসে গেছি।

আগুনের পাশে আলজিরের কোলে এস্তেল চিল চিৎকার করছে। চিনি খাওয়াতে খাওয়াতে ভাঁড়ার শেষ, তবুও থামে না বাচ্চাটা। শেষ পর্যন্ত মায়ের অনুকরণে আট বছরের মেয়ে আলজির বোনের মাথাটা চেপে ধরল নিজের শিরা বের হওয়া খোলা বুকের ওপর। তারস্বরে কঁকিয়ে চলেছে এস্তেল।

বাজার নামিয়ে মা বলল, ওভাবে হবে না, দে আমার কাছে।

বাচ্চাকে দুধ দিতে লাগল সে। হঠাৎই চুপ করে গেল এস্তেল। ওঃ এতক্ষণে শান্তিতে কথা বলা যাচ্ছে। আলজির গিন্নীবান্নীর মতো ঠিক ঘরদোর ঝাঁট দিয়ে, গুছিয়ে, আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। ওপরে এখনও ঠাকুর্দা নাক ডাকাচ্ছে একনাগাড়ে।

খুব খুশী হল আলজির।—ও মা, কত জিনিস এনেছো! তোমাদের সকলের জন্ম স্যুপ তৈরি করব কি?

টেবিলে বোঝাই করে রাখা হয়েছে জামাকাপড়। দুটো বড় রুটি, আলু; মাখন, কফি, চিকোরি আর আট পাউণ্ড শুয়োরের মাংস।

ক্লান্ত গলায় ওর মা বলল, না না, ওসব কিছু করতে যাস না। কর্তারা ফিরলে দেখা যাবে'খন। এখন কয়েকটা আলু সেদ্ধ করতে দে। একটু মাখন দিয়ে খাবে সবাই। সঙ্গে কফি তো আছেই।

হঠাৎ কেকের কথা মনে পড়ল তার। লেনোব আর জঁরির হাত তো খালি। মাটিতে বসে দু'জনে মারামাবি কবছে। কি রাক্ষস রে বাবা! এর মধ্যে ঠিক গেলা হযে গেছে। দু'জনকে শাসন করতে যাচ্ছিল, আলজির থামালো।

—কেন শুধু শুধু মাথা গবম কবছ মা? আমার জন্য বকছ তো ওদের! কিন্তু এখন তো ওসব আমি খেতামও না। ওবা অতটা রাস্তা হেঁটে এসে খিদেয আর থাকতে পারছিল না।

ঘড়িতে বারোটা বাজলো। সব বাড়িতে স্কুল থেকে বাচ্চারা ফিরে আসতে শুরু কবেছে।

সেদ্ধ হয়ে এসেছে আলুগুলো। কফি আর চিকোরি মিশিয়ে গাঢ়, গরম একটা পানীয় তৈরি হযেছে। টেবিলেব একটা ধাব পরিষ্কার কবা হযেছে। তবে ঐখানে শুধু মা বসে। বাচ্চাবা হাঁটুর ওপর রেখেই দিব্যি খেযে নেয। জঁরির চোখ মাংসটার ওপর—লোভে চকচক করছে।

ওদের মা দু হাতে গ্লাস ধরে কফিতে চুমুক দিচ্ছিল। এই অতিরিক্ত উষ্ণতাটুকুও পযসা দিযে কেনা, অপচয করতে মন চায না।

বুড়ো বোন্মব সিঁড়ি দিযে নেমে এল। রোজই ওর ঘুম ভাঙতে দেরি হয। খাবার তৈরি করে রাখা থাকে টেবিলে। আজ স্যুপ তৈবি হযনি দেখে গজগজ করতে লাগল বুড়ো।

ছেলের বউ বলল, যা জুটছে, এও তো ভালো। বাজারের হালচাল দেখেছেন?

বুড়ো চুপচাপ আলু চিবোতে লাগল।

আলজির বলল, মা, বলতে ভুলে গেছি, পাশের বাড়ি থেকে এসেছিল···

বিরক্ত গলায মায়্যার বউ বলল, গোল্লায যাক।

পাশের ঘবের লেভাকের বউযের ওপব বেগে আছে সে। গতকাল মায়্যদের ধাব দেবার ভযে বজ্জাত মেযেমানুষটা কাঁদুনি গেযেছে। সব বাজে অজুহাত। বুতলু ভাড়ার টাকা মিটিযে দিযেছে। ও ইচ্ছে কবলেই ধার দিতে পাবত।

—ভালো কথা মনে করেছিস আলজির। খানিকটা কফি কাগজে মুড়ে দে তো। পিয়েরোঁর বউকে ফেরত দেব। পবশু দিন ধাব নিযেছিলাম।

মেয়ে মোড়কটা দেবার পব সে এস্তেলকে কোলে নিযে বেবোলো। ফিরে এসে স্যুপ বানাতে হবে। লেনোর আর জঁরি নিজেদের মধ্যে মারামাবি করছিল বুড়ো ঠাকুর্দার ফেলে দেওযা আলুব খোসাব ভাগ নিযে।

লেভাকের বউযের চোখ এড়াবার জন্য বড় রাস্তায় না গিযে বাগান পেরিযে হাঁটতে লাগল মায়্যার বউ। বেড়ার গাযে খানিকটা ফাঁক আছে। তার ভেতর দিয়ে দিব্যি পিয়েরোঁদের বাড়িতে যাওয়া যায। চারদিক নিস্তব্ধ। শুধু একজন লোক খুরপি হাতে বাঁধাকপির ক্ষেতে মাটি কুপিযে যাচ্ছে। খানিক দূরে গীর্জা থেকে [illegible] এনবোর সঙ্গে দু'জন সুবেশা মহিলা আর একজন মার্জিত চেহারার ভদ্রলোককে [illegible]—ওঁরা এ এলাকাটা ঘুরে দেখছেন।

কফি দেখে পিয়েরোঁর বউ বলল, কেন শুধু শুধু ব্যস্ত হলে? তাড়াহুড়ো ছিল না কিছু।

এই মহিলার বয়স আটাশ। গাঢ় রংয়ের চুল, ছোট্ট কপাল। বড় বড় চোখ আর পাতলা ঠোঁট। মোটের ওপর সুন্দরীই বলা যায়। কোনো ছেলেমেয়ে না হওয়াতে দেহের বাঁধুনী অটুট। ওর বাবা খনিতে কাজ করতে করতে দুর্ঘটনায় মারা যান। মা মাথার দিব্যি দিয়েছিলেন মেয়েকে যাতে সে ভুলেও খনির লোককে বিয়ে না করে। মেয়ে যাকে বিয়ে করল—সে দোজবরে, উল্টে তার আবার আগের পক্ষের আট বছরের একটা মেয়েও আছে।

এসব সত্ত্বেও কিন্তু দু'জনে খুব ভালোই আছে। যদিও কর্তার চরিত্র, গিন্নীর পুরুষবন্ধু—এসব নিয়ে মহল্লায় কানাঘুষো চলে কিন্তু মুখের ওপর কেউ কিছু বলতে পারে না। এদের বাড়িতে সপ্তাহে দু'বার মাংস আসে। বাসনপত্র এত ঝকঝকে যে মুখ দেখা যায়। অবসর সময়ে বউটি মিষ্টি আর বিস্কুট বিক্রী করে দু পয়সা বাড়তি রোজগারও করে। শুধু ওর বুড়ি মা 'মা ক্রুলে' আর সতীনের মেয়েটাই মাঝে মাঝে নানান অশান্তি করে।

—দেখেছো, তোমার এস্তেল কত বড হয়ে গেছে!

—আর বোলা না বাপু। বাচ্চাকাচ্চার ঝামেলায় প্রাণ গেল। ঝাড়া হাত পায়ে দিব্যি আছ তুমি। ছোট বাচ্চা না থাকলে ঘরদোরের ছিরিছাঁদই পাল্টে যায়।

—একটু কফি খাও না আমার সঙ্গে।

—না না, এই তো খেয়ে এলাম।

—তাতে কি।

দু'জনেই ধীরে ধীরে কফির কাপে চুমুক দিতে থাকল। উল্টোদিকে লেভাকদের বাড়ি। জানলায় নোংরা ছেঁড়া পর্দা।

গা মুচড়ে পিয়েরোঁর বউ বলল, পারেও বাবা এত নোংরা করে রাখতে।

—যা বলেছ। আসলে স্বভাবটাই নোংরা। নইলে বুতলু যা ভাড়া দেয়, আমি হলে হেসে খেলে চালিয়ে নিতাম আর তার জন্য বুতলুর সঙ্গে শোবার দরকার হত না আমার। বজ্জাত ছেনাল মাগী। ওর বরটাও শয়তান। ঠিক বাজারের মেয়েছেলের পিছু পিছু ঘোরে।

—ছি ছি! বোঝেও না যে ওরাই যত বদ রোগের ডিপো। আচ্ছা, তোমার কি কোনো আক্কেল নেই? কি হিসেবে ছেলেকে ফিলোমিনের মতো মেয়ের সঙ্গে মিশতে দাও?

—আমি কি দেবার মালিক নাকি? আজকালকার ছেলেদের তো জানো না। সব সময় ঝোপে-ঝাড়ে ফষ্টিনষ্টি। কতবার যে হাতেনাতে ধরা পড়েছে, তাতেও লজ্জা নেই।

এটা অবশ্য এ অঞ্চলের খুব সাধারণ ঘটনা। অন্ধকার গাঢ় হলে ঝোপে-ঝাড়ে আনাচে-কানাচে ছেলেমেয়েদের ভাব-ভালোবাসা চলতে থাকে। এই [illegible]

বুঝতে না বুঝতে কচি কচি মেয়েগুলো মা হয়ে যায়। অনেক সময় অবশ্য আগেই গর্ভপাত করিয়ে আসে। তা না হলে ওই বাচ্চা কোলেই বিয়ে হয় এবং বিয়ের পর বছর বছর কচিকাঁচার সংখ্যা বাড়তেই থাকে।

পিয়েরোঁর বউ বলল, জানো দিদি, তোমার জায়গায় আমি থাকলে করেই সাবধান হতাম। জাশারী তো তোমার গুণধর ছেলে। বিয়ের আগেই দুটো বাচ্চার বাপ হয়ে বসে আছে। এরপর ঠিক দুটিতে ছানাপোনা নিয়ে অন্যত্র ঘর বাঁধবে— তখন তোমার ভোগান্তির একশেষ।

—খেপেছ নাকি! ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলব তাহলে। জাশারী কি ভেবেছে মা-বাপের প্রতি কোনো কর্তব্য না করেই দিব্যি পার পেয়ে যাবে? ওর পেছনে টাকা খরচ করিনি আমরা? সে সব শোধ না দিয়ে ও যাবে কোথায়? যাক গে, এখন এসব ভেবে লাভ নেই। শুধু শুধু মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

আরও মিনিট পনেরো রসালো গল্প করবার পর স্যুপ বানানোর কথা মনে পড়ল এস্তেলের মায়ের। তড়িঘড়ি রওনা দিল সে। বাড়ি ফেরার পথে দেখে লেভাকের বউ পথ আগলে দাঁড়িয়ে। খনির বিনিপয়সার ডাক্তারবাবুকে পাকড়াও করেছে সে।

—ও ডাক্তারবাবু, আমার ঘুম হয় না রাতে। বড় যন্ত্রণা।

—অত বেশী কফি খেলে ওসব হবেই। ডাক্তার যেতে যেতে বলল।

মায়্যা-গিন্নী বলল, আর আমার স্বামী? ওর পায়ের ব্যথা তো সারেনি।

—হবে না? যা অত্যাচার কর ওর ওপর!

লেভাকের বউ ঘাড় ঘোরালো।

—এই যে মায়্যু-গিন্নী। হনহনিয়ে যাচ্ছো কোথায়? একটু এসো না, এক কাপ কফি খাবে।

খানিক না না করে ভেতরে এল এস্তেলের মা।

নোংরা হতশ্রী ঘর, তেলকালি আর ঝুলে ভর্তি। বুতলু আগুনের সামনে বসে কি একটা খাবারের পাত্রে চুমুক দিচ্ছে। পঁয়ত্রিশ বছরের চটপটে স্বভাবের জোয়ান। লেভাকের মেয়ে ফিলোমিনের বড় বাচ্চাটা দু বছরের—হ্যাংলার মতো তাকিয়ে আছে পাত্রটার দিকে। দুটো পা টলমল করে এখনও। খানিক পর পর বুতলু খুঁটে খুঁটে মাংসের টুকরো তুলে দিচ্ছে বাচ্চাটার মুখে। বাচ্চাটাকে 'অ্যাশিল' নামে ডাকে সবাই।

—একটু বোসো, চিনিটা নেড়ে দিই।

লেভাকের বউয়ের চেহারা দেখলে বিশ্রী লাগে। হাড় বের করা, স্তন দুটো যেন আলগা হয়ে ঝুলে পড়েছে পেটের ওপর—পেট ঠেকেছে উরুতে। সারা মুখে অসংখ্য বলিরেখা। উস্কোখুস্কো মাথার চুল। বুতলুর থেকে অন্তত বছর ছয়েকের বড়। বুতলু অবশ্য নির্দ্বিধায় পরের বউয়ের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে—একটা মেয়ে-[illegible]ের শরীর হলেই হল। বিস্বাদ ঝোল, নোংরা বিছানা—এ সবের সঙ্গে এটা তার [illegible]পাওনা। ভাড়ার টাকাটা পুষিয়ে নিতে হবে তো! লেভাক এ ব্যাপারে

খুব উদার। সে জানে ভালো খদ্দেরই ভালো বন্ধু হয়। নিজের বউয়ের সতীপনার নামে ন্যাকামির রোগ সে বহুদিন আগেই সারিয়ে দিয়েছে।

লেভাকের বউ ফিসফিসে গলায় বলল, শোনো, যে কথাটা বলব বলে তোমায় ডাকলাম। পিয়েরোঁর বউ কাল সিক্কের মোজার দোকানে গিয়েছিল। বুঝতেই পারছ কার সঙ্গে! একজন বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়ের পক্ষে দিব্যি রসালো ব্যাপার, কি বলো?

—আর বোলো না। আগে আগে তো পিয়েরোঁ বড়কর্তাদের খরগোশ ঘুষ দিত। এখন বউকে দিচ্ছে। বিনি পয়সার মাল!

বুতলু হো হো করে হেসে উঠে সামনে দাঁড়ানো বাচ্চাটার মুখে ঝোলমাখানো রুটির টুকরো গুঁজে দিল। মায়্যু আর লেভাকের গিন্নীরা পরচর্চার ঝড় বইয়ে দিল। তাদের মতে মোদ্দা কথাটা হল পিয়েরোঁর বউ রাস্তার একটা কুকুরীরও অধম। রূপের তো ওই ছিরি—দিবারাত্র নিজেকে যত্নআত্তি করলে সবাইকেই অমন ভালো দেখায়। অবশ্য স্বামীটিও যেমন মেনীমুখো! ওপরওয়ালার পেছনে তেল দেবার জন্য নিজের বউকে পর্যন্ত হাতে পায়ে ধরে রাজী করায়।

পাশের বাড়ির মেয়েটা ফিলোমিনের দ্বিতীয় বাচ্চাটাকে নিয়ে এল। এটার নাম দিস্তিরে—ন' মাস বয়স। দিব্যি আছে। পড়শীদের কাছে কাছে থেকেই মানুষ হয়ে যাচ্ছে।

মায়্যুর বউ কোলে ঘুমিয়ে থাকা এস্তেলের মুখের দিকে তাকিয়ে নিশ্বাস ফেলল।

—ইস্, আমার বাচ্চাটা আমায় না দেখলে এমন চিৎকার করে! এক মুহূর্ত একলা থাকার উপায় নেই।

ফিলোমিনের মা মানে লেভাকের বউ মনে মনে এইটাই চাইছিল। গম্ভীর গলায় বলল, ছাখো, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

আগে একবার জাশারী আর ফিলোমিনের বিয়ের ব্যাপারে কথাবার্তা হয়েও আবার ধামাচাপা পড়ে গিয়েছিল। জাশারীর মা তার ছেলের মাইনের টাকা ছাড়তে রাজি নয়। ফিলোমিনের মা-ও তাই। রোজগেরে মেয়েকে কেন সে খামোখা পরের ঘরে দেবে। তবে তখন ওদের বাচ্চা ছিল একটাই। লেভাক-গিন্নী তার দেখাশুনো করতে রাজী ছিল। এখন আশিল, ওই বড় বাচ্চাটা দিব্যি গুটগুট করে হাঁটে। রাক্ষসের মতো খায়। আবার ফিলোমিনের বেআক্কেলে হালচালের জন্য আরও একটা বাচ্চা এসেছে। অভাবের সংসারে এত সব চলে না। লেভাকের বউ এখন মেয়ের বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে গেছে।

—জাশারী তো চাকরিতে স্থায়ী হয়ে গেছে। বুঝলে মায়্যু-গিন্নী, চার হাত এবার এক করে দাও।

মায়্যুর বউ অপ্রস্তুত হল।

—এত খারাপ আবহাওয়া যাচ্ছে। শীতটা একটু কমুক। আর ওরা [illegible] বিয়ে না করেও দিব্যি ভালোই আছে। ওই বিয়ের জন্য কি কোনো [illegible]

আটকে ছিল ? আমার ক্যাথরিন কোনো ছেলের সঙ্গে এবকম লটঘট করলে তাকে তো জ্যান্ত পুঁতে ফেলতাম।

—আরে বাদ দাও। যুগের হাওয়া সব। তোমার আমার কথায় কি দিন চলছে ?

তরকারি কুচোতে কুচোতে হঠাৎ জানলার কাছে উঠে গেল লেভাকের বউ।

—আরে, ওখানে কি হচ্ছে ? মাদাম এনবো দেখছি অতিথিদের নিয়ে সোজা পিয়েরোঁদের বাড়িতে ঢুকছেন।

হিংসায় জলতে জলতে দু'জনে আবার পিয়েরোঁদের কেচ্ছা শুরু করল। যেহেতু ওদের বাড়িটা পরিষ্কার, ছিমছাম, তাই সবাই হাংলার মতো যায়। ওভারম্যানের সঙ্গে বাড়ির মালকিন পিয়েরোঁর বউয়ের কেলেঙ্কারীর কথা জানলে কেউ আর ওখানে পা-ও দিত না। তিন হাজার ফ্রা মাস মাইনের প্রেমিক! পিয়েরোঁর ঘরে ছপ্পর ফুঁড়ে টাকা আসছে। বাইরে থেকে যত পরিষ্কার, ভেতরের দিকে তাকালে তত নোংরা, ঘেন্নার আর লজ্জার। জানলার ফাঁকে চোখ সেঁটে বসেছিল দু'জনে।

শেষ পর্যন্ত লেভাকের বউ বলল, দেখ, ওরা বেরিয়েছে। ওকি! ওরা যে তোমার বাড়ির দিকেই যাচ্ছে গো!

—অঁ্যা, সর্বনাশ!

আতঙ্কে নীল হয়ে গেল মাহ্যুর বউ। তখন ঘরদোরে নোংরা ডাঁই হয়ে আছে, রান্নাবান্না হয়নি। এক ছুটে বাড়ির দিকে রওনা দিল সে।

আসলে সবকিছুই ঠিকঠাক ছিল। এত ভয় পাবার কারণ ছিল না কোনো। মায়ের দেরি দেখে আলজির নিজেই ঝাড়াপোঁছার কাজ শুরু করে দিয়েছে। বাগান থেকে মোটা মোটা পেঁয়াজকলি আর শাক তুলে নিয়ে তরকারি কুচোতে বসেছে। একটা বড় পাত্রে স্নানের জল গরম হচ্ছে। জঁরি আর লেনোর চুপচাপ মেঝের ওপর বসে পুরনো একটা ক্যালেণ্ডার কুটি কুটি করে ছিঁড়ছে। বুড়ো ঠাকুর্দার তামাকের ধোঁয়ায় ঘর ভর্তি।

মাহ্যু-গিন্নী ঘরে ঢুকে সবে একটু দম নিয়েছে কি নেয়নি, দরজায় ধাক্কা দেবার শব্দ হল।

মাদাম এনবো মধুঢালা গলায় বললেন, আমরা কি একটু ভেতরে আসব ?

ভদ্রমহিলা লম্বা, একটু মোটার দিকে। বয়স চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই। জোর করে ঠোঁটের কোণে হাসিটা ধরে রেখেছেন। এদিকে মনে সর্বদা ভয় এই বুঝি আস্তাকুঁড়ের নোংরা লেগে দামী পোশাকটা নষ্ট হয়ে গেল।

সঙ্গের অতিথিদেরও ভেতরে আসতে বললেন তিনি।

—তোমরা ভেতরে এস। এই বাড়ির গিন্নীটিকে দেখছ তো ? এর সাতটি ছেলে-মেয়ে। আমাদের এখানে সব একটা যৌথ পরিবারের মতো। মাসে ছ' ফ্রাঁ [illegible]য় এদের বাড়ি দেওয়া হয় কোম্পানি থেকে। নীচের তলায় একটা বড় ঘর, [illegible]দুটো ছোট ঘর। সঙ্গে একটা ভাঁড়ার ঘর। এ ছাড়া বাগানও আছে।

[illegible]কে সবাই অবাক চোখে চারদিক দেখছিলেন।

মাদাম এনবো বললেন, তাছাড়া কয়লা দেওয়া হয় কোম্পানি থেকে। সপ্তাহে দু'দিন ডাক্তার আসেন আর বুড়ো হলে পেনসন দেওয়া হয়। তার টাকা কিন্তু মাইনে থেকে কাটা হয় না।

সঙ্গের ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন।

—বাঃ বাঃ, দিব্যি ব্যবস্থা। আমার তো স্বর্গ বলে মনে হচ্ছে। এত কম খরচে এত সুখ!

মাহ্যু-গিন্নী ভয়ে ভয়ে বসবার চেয়ার এগিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু কেউই বসলেন না। মাদাম এনবো মনে মনে ভাবলেন—একেই দুর্গন্ধে নোংরায় দম বন্ধ হয়ে আসে, তার ওপর আবার বসা! কি যে এক ঝঞ্চাট হয়েছে—বাইরের বাবু-বিবিদের এই কয়লা-খনি দেখানো।

ভদ্রতার খাতিরে ভদ্রমহিলা বললেন, কি মিষ্টি বাচ্চাগুলো! মুখে বললেও মনে ভাবলেন মিষ্টি না হাতী! ওই তো গরুর মতো ড্যাবডেবে চোখ, শুকনো চিমড়ে হাড়-জিরজিরে চেহারা, ফ্যাকাশে রুক্ষ, নোংরা একমাথা চুল। ম্যাগো! ভাবলেও গা গুলিয়ে ওঠে।

কথা চালাতে হয়, তাই সকলে কথা বলছিলেন। বাচ্চাদের বয়স, কে কি রকম এই সব আবোলতাবোল খুঁটিনাটি। ঠাকুর্দাকে নিয়েই চিন্তা। যদিও সে সম্মানিত অতিথিদের সামনে পাইপ টানছে না কিন্তু একবার কাশির দমক উঠলে তো রক্ষা নেই। তার সঙ্গে কালো কালো কফ—কয়লার গুঁড়ো মাখা। দীর্ঘ চল্লিশ বছর মাটির নীচে কাজ করার উপহার।

সবচেয়ে বেশী প্রশংসা পেল আলজির। এই তো একরত্তি মেয়ে, তাও কত কাজের! আহা রে, তার ওপর আবার পঙ্গু।

মাদাম এনবো গর্বিত সুরে বললেন, তাহলে প্যারিসে যদি এরপর কথা ওঠে কয়লাখনি অঞ্চলে মজুরদের জীবনযাপন প্রসঙ্গে, তবে বলতে ভুলবেন না যেন এখানে আমরা সবাই একজোট হয়ে মিলেমিশে চমৎকার আছি। কোনো অভাব নেই, হিংসা নেই, নেই কোনো অভিযোগ।

সঙ্গী ভদ্রলোক শশব্যস্তে ঘাড় নাড়লেন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো ঠিকই।

সকলে বেরিয়ে গেলেন। আলজিরের মা দরজা পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এল। এদিকে বাইরে পিয়েরোঁ-গিন্নী আর লেভাকের বউ চিন্তায় অস্থির।—কি রে বাবা, তেনারা সব মাহ্যুদের আস্তাকুঁড়েই রাত কাটাবে নাকি!

—তুমি ক্ষেপেছ ফিলোমিনের মা! নিজে খেতে পায় না আবার শংকরাকে ডাকে!

—শুনলাম, সকালে লা পিয়োলেইন-এ ভিক্ষে চাইতে গিয়েছিল, আবার ফেরবার পথে মেইগ্রার কাছে ধার চাইতে। ভেতরে ভেতরে তো ফুটো কলসী অথচ বাইরে আমাদের কাছে দেমাকে মাগীর মাটিতে পা পড়ে না। দেখো না, মেইগ্রা কি ভাবে পয়সা উশুল করে।

—ওই সাত ছেলের মায়ের সঙ্গে ফুর্তি করার বান্দা নয় সে। ক্যাথরিনকেই ছিঁড়ে খাবে শকুনিটা।

—বেশ হবে তাহলে। ওঃ হারামজাদীর গুমোর কত! বলে কি না তোমার মেয়ের মতো আমার মেয়ে অমন নষ্ট স্বভাবের হলে আমি তাকে গলা টিপে মেরে ফেলতাম। শাভাল যেন ক্যাথরিনের ইজ্জত লুটতে কত বাকি রেখেছে!

—আঃ, চুপ কর। ঐ দেখ ওরা চলে যাচ্ছে।

রাজহংসীর ভঙ্গিমায় মাদাম এনবো আর তাঁর সঙ্গের ভদ্রমহিলাটি হাঁটছিলেন। ওঁরা দু'জন চোখের আড়াল হতেই লেভাক অরে পিয়েরোঁর বউয়েরা ইশারায় ডাকলো মাহ্যু-গিন্নীকে। তারপর তারা সবাই মিলে মাদাম এনবো আর তাঁর বান্ধবীর নামে নিন্দা কুৎসার ঝড় বইয়ে দিল।

—সঙ্গের মাগীটা তো পুরুষখেকো। প্রথমে এক ইঞ্জিনীয়ার—সেই যে, বুঝতে পারছ তো?

—কি! সেই চিমসে লোকটা! এই ডাইনীটা তো তাকে চুষে রক্ত খেয়ে একেবারে ছিবড়ে করে ফেলে দিয়েছে।

—হ্যাঁ, তা যা বলেছ। আর সে লোকটার সঙ্গে থেকে কি সুখটা ও পেত বলো তো? ওই তো শরীর স্বাস্থ্যর ছিরি। দেখলে না, আমাদের সামনে দিয়ে কেমন পাছা দুলিয়ে হেঁটে গেল। সমস্ত পৃথিবীর লোক যেন ওর বাপের চাকর।

খানিক পর দূরে এক ভদ্রলোকে আসতে দেখা গেল। চকচক করে উঠল লেভাক-গিন্নীর চোখ।

—ওই দেখ, মাদাম এনবোর বরটা! চেহারা দেখলেই বোঝা যায় মাগের ভেড়া বই কিছু নয়।

আসলে মাদাম এনবো আর তাঁর সঙ্গীরা এই নোংরা পরিবেশে এত বেমানান যে সবাই হাতের কাজকর্ম ফেলে ওঁদের হাঁ করে দেখছে। লেভাকের বাড়ির সামনে এখন অন্তত জনা কুড়ি নানান বয়সের স্ত্রীলোক। পিয়েরোঁর বউ অবশ্য বিশেষ মুখ খুলছে না এখন—কে জানে যদি কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে যায়। এস্তেল ঘুম ভেঙে উঠে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। মাহ্যুর বউ কোলের বাচ্চা সামলিয়ে পরনিন্দায় ব্যস্ত। সে এই কটকটে দিনের আলোয় একগাদা মানুষের চোখের সামনে জামার বোতাম খুলে বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে।

মঁসিয় এনবো গাড়ি চালিয়ে রওনা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সবার গলায় চতুর্গুণ জোর এসে গেল। সকলেই নিজের নিজের গল্পের ঝুড়ি উজাড় করে দিতে চায়। যেন মুহূর্তেই মাছের বাজার বসে গেছে চারদিকে।

বেলা প্রায় তিনটে বাজলো। একদল মজুর কাজ সেরে ফিরছে—অন্য দলের [illegible]লা শুরু। বাড়ির কর্তাদের ফিরতে দেখে গিন্নীদেরও টনক নড়েছে। [illegible] হয়েছে মুহূর্তেই, তাতে একটাই চাপা গুনগুনানি:

হা ভগবান, এতক্ষণ খেয়ালই ছিল না, রান্নাই যে চাপানো হয়নি আমার।

* * * *

এতিয়েনকে হ্রাসন্যরের আস্তানায় রেখে মাহ্যু বাড়িতে ফিরে এল। ততক্ষণে ক্যাথরিন, জাশারী আর জঁল্যাঁ স্যুপের বাটিতে চুমুক দিয়েছে। আসলে খনি থেকে ফিরে এসে সবাই এত ক্লান্ত থাকে আর খিদের ছটফট করে যে হাত মুখ ধুয়ে জামা-কাপড় ছাড়বারও তর সয না।

দরজা খুলে ভেতরে পা দিয়েই মাহ্যু দেখল সবাই খাচ্ছে। বুকের ভেতর এক ঝলক দমকা খুশীর বাতাস বয়ে গেল যেন। যাক, বউটা আমার কাজের আছে। সকালে যা শুনেছিলাম, কফি নেই, মাখন নেই, রুটি বাড়ন্ত—হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যায়। যাক গে পরে শোনা যাবে আলাদীনের দৈত্যটি কে! আপাতত তো খেয়ে নেওয়া যাক।

ক্যাথরিন আর জঁল্যাঁ খাওয়া শেষ করে টেবিল থেকে উঠে গিয়েছিল। জাশারীর তখনও পেট ভরেনি। একটা মোটা রুটিতে মাখন মাখিয়ে খাচ্ছিল সে। টেবিলের ওপর মাংসের টুকরো আগেই দেখেছে জাশারী। কিন্তু ও জানে বাবার খাওয়া হয়ে গেলে যদি অবশিষ্ট থাকে তবেই কপালে জুটবে। ছেলেমেয়েরা সবাই স্যুপ শেষ করে ঠাণ্ডা জল খেল খানিক।

মাহ্যুর বউ কাঁচুমাচু ভাবে বলল, বীয়ার কেনা হয়নি। যদি খাও তবে না হয় ক্যাথরিন এনে দিক।

মাহ্যুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কি কাণ্ড ছাখো। জব্বর মেয়েমানুষ যা হোক, হাতে টাকাপয়সাও মজুত!

—না না, দরকার নেই। খানিকটা খেয়ে এসেছি।

রুটি, স্যুপ, তরকারি তারিয়ে তারিয়ে খেতে লাগল সে। সঙ্গে টাটকা মাংস আর গরম কফিও বাদ গেল না।

এদিকে আগুনের সামনে গামলা ভর্তি গরম জল নিয়ে ক্যাথরিন স্নান করছে। একে একে সমস্ত জামাকাপড় সে খুলে ফেলল। আট বছর বয়স থেকে এভাবেই সে সব কিছু করতে অভ্যস্ত। নারীসুলভ লজ্জা এখনও দানা বাঁধেনি। আগুনের দিকে মুখ ফিরিয়ে গায়ে সাবান ঘষছিল ক্যাথরিন। কেউ তার নগ্ন দেহের দিকে দৃকপাতও করছে না। লেনোর আর অঁরিরও এ নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। চটপট স্নান সেরে ওপরে দৌড় দিল ক্যাথরিন। তার ভিজে জামাকাপড় ডাঁই হয়ে থাকল মেঝের ওপর। তারপর লেগে গেল দু ভাইয়ের মধ্যে গণ্ডগোল। জঁল্যাঁ তাল বুঝে টুক করে জলে নেমে পড়েছে। তার বক্তব্য: জাশারীর তো এখনও খাওয়াই শেষ হয়নি। জাশারী চটে গিয়ে তাকে ধাক্কা দিয়েছে। ক্যাথরিন মেয়ে বলে সে তাকে আগে ছেড়ে দিয়েছে দয়া দেখিয়ে কিন্তু জঁল্যাঁকে ছাড়বে কেন? শেষ পর্যন্ত অবশ্য দু'জনেই একই সঙ্গে স্নান সেরে নিল আর এ ওর গা পরিষ্কার করে দিল। আর ক্যাথরিনের মতো তারাও সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ওপরে।

মায়্যুর বউ জামাকাপড় সরাতে সরাতে বলল, ওঃ, ছেলেমেয়েদের নিয়ে আর পারা গেল না। আলজিব, কাপড়গুলো একটু নিংড়ে দিবি ?

পাশের ঘর থেকে দেওয়াল ভেদ করে চেঁচামেচির আওয়াজ পাওয়া গেল।

মায়্যু বলল, আবার লেভাকের বউ পিটুনি খাচ্ছে। বুতলুর এটা খুব অন্যায়। রান্না হয়ে গেছে, তবুও

মায়্যুর বউ বলল, পাগল নাকি! আমি যখন গেছি তখন ওর একটা তরকারিও কাটা হয়নি। সময়মতো খেতে দিতে না পারলে মারধর তো খাবেই।

চকচক করে এক গ্লাস জল খেয়ে মায়্যু মাংস খেতে শুরু করল। বড় বড় টুকরো করে ছুরিতে গেঁথে রুটির সঙ্গে মুখে পুরছিল। যখন মায়্যু খায়, কেউ কোনো কথা বলে না। সে একবার জিজ্ঞেস করল তার বাপের কথা। জবাব পেল তিনি হাঁটতে বেরিয়েছেন।

লেনোর আর অঁরি তো চুপ করে থাকবার পাত্র নয়। তারা নোংরা সাবান জল নিয়ে খেলছিল। এবার পায়ে পায়ে এগিয়ে এল তাদের বাবার দিকে। জুলজুল চোখে তাকিয়েই রইল মাংসের দিকে। জিভ দিয়ে লালা ঝরছে।

মায়্যু বিরক্ত হল।

—এ কি! বাচ্চাদের দাওনি ? না না, এসব আমি পছন্দ করি না। বাচ্চাদের না দিয়ে আমায় দাও কেন ? ওরা এমন হাভাতের মতো তাকিয়ে থাকে, আমার জঘন্য লাগে।

জোরে চেঁচিয়ে উঠল তার বউ

—বাজে কথা। ওরা এখুনি খেয়েছে। সব রাক্ষুসে খিদে। যতবারই তুমি খাবে, পেট ভরা থাকলেও ওরা অমনি করে তোমার খাবার দিকে নজর দেবে। রক্ত-চোষার ঝাড় সব, মরেও না। আলজির, আমরা তো সবাই মাংস খেয়েছি, বল্ ?

—হুঁ, মা।

আলজির দিব্যি নির্বিকারভাবে বড়দের মতো মিথ্যে কথা বলতে পারে। এ সব এই বয়সেই তাকে ঠেকে শিখতে হয়েছে

লেনোর আর অঁরির পিঠে দুম দুম করে কিল বসিয়ে দিল তাদের মা। কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠছিল সরল বাচ্চা দুটো। সবাই যখন খেয়েছে তখন তো তারা সেখানে ছিলই না।

মায়্যু-গিন্নী বিরক্তভাবে বলল, যা, দূর হ এখন এখান থেকে। হাড়েমাসে জ্বালিয়ে খেল! লজ্জাও করে না বাপের খাবারে নজর দিতে। লোকটা রক্ত জল করে টাকা কামাচ্ছে তোদেরই একটু সুখের জন্য। আর তোরা কি না এত নেমকহারাম! যদি বা কেউ মাংস নাও খাস, তাতে কি! যে পরিশ্রম করে তারই ওসব খাওয়া দরকার। তোরা তো শুধু খোদার খাসী। কাজের মধ্যে শুধু গাণ্ডেপিণ্ডে গেলা আর ঘরদোর নোংরা করা। যা যা, সরে যা।

মায়্যু লেনোর আর অঁরিকে ডেকে হাঁটুর ওপর বসালো। মাংস ভাগ করে দিল [illegible]। আনন্দে চকচক করে উঠল দু'জনের চোখ।

খাবার শেষ করে মাহ্যু মাথা নাড়লো।

—শোনো, এখন আমায় কফি দিও না। স্নান করে নিই আগে।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনে ধরাধরি করে গামলার নোংরা জলটা নর্দমায় ঢালছে, এমন সময় পরিষ্কার জামাকাপড় পরে ফিটফাট হয়ে শিস দিতে দিতে নেমে এল জ'ল'্যা।

—অ্যাই জ'ল'্যা, কোথায় যাচ্ছিস?

—এই একটু ঘুরতে, মা।

—কোথায়? তার চেয়ে বাগান থেকে সব্‌জি তুলে আন খানিকটা। রাতে স্যালাড হবে। কথা না শুনলে পিঠের ছালচামড়া আস্ত থাকবে না বলে দিলাম।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে।

এরপর নেমে এল জাশারী। চালিযাত ছোকরা। দাঁতের ফাঁকে পাইপ চেপে সে-ও বেরিয়ে গেল সুর ভাঁজতে ভাঁজতে।

—দেখিস বাবা জাশারী, বেশী রাত করিস না যেন।

গামলাটা নতুন করে গরম জলে ভর্তি করা হল। গায়ের জামা খুলতে ব্যস্ত মাহ্যু। তার বউ আলজিরকে চোখের ইশারা করল লেনোর আর অঁরিকে নিয়ে বাইরে যাবার জন্য।

মাহ্যু-গিন্নী আবার গলা তুললো।

—অ্যাই ক্যাথরিন, ওপরে কি করছিস?

—কালকের ছেঁড়া জামাটা সেলাই করছি মা।

—ঠিক আছে। এখন নীচে আসিস না। তোর বাবা স্নান করবে।

নীচে মাহ্যু আর তার বউ ছাড়া আর কেউ ছিল না। বাচ্চা এস্তেল অবশ্য ধর্তব্যের মধ্যেই নয় আর অবাক কাণ্ড! সে এখন একটুও কাঁদছে না। আগুনের তাতে দিব্যি চুপটি করে বসে ড্যাবডেবিয়ে তাকিয়ে আছে বাবা-মার দিকে। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে গায়ে সাবান মাখতে লাগল মাহ্যু।

তার বউ বলল, কি হয়েছে বলো তো? যখন ফিরলে তখন থেকেই দেখছি তোমার মেজাজ খারাপ। খাবার খেলে তবে তাও তেমন মন দিয়ে নয়। লা পিয়োলেইন-এর লোকগুলো একেবারে চামার। একটা কানাকড়িও সাহায্য করল না। কয়েকটা পুরনো গরম জামা অবশ্য দিয়েছে। লোকের কাছে হাত পাততে এত লজ্জা করে আমার।

মাঝপথে কথা থামিয়ে এস্তেলকে ঠিকভাবে চেয়ারে বসিয়ে দিল সে। একটু এদিক-ওদিক হলেই উল্টে পড়ে যেত। মাহ্যু এইসব অনুযোগ-অভিযোগের সময় চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করে।

ওর বউ বকবক করেই চলল।

—জানো, মেইগ্রাটা পাজীর পাঝাড়া। কিছুতেই ধার দিতে চায় না। যেন আমি একটা রাস্তার কুকুর। গরম জামাকাপড় পেয়েছি ঠিকই কিন্তু তাতে তো আর পেট ভরে না!

মায়্যু চোখ তুলে তাকালো, কোনো কথা বলল না। লা পিয়োলেইন থেকে পয়সা পাওয়া যায়নি, মেইগ্রাও মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। দিনের দিন অবস্থা খারাপ হচ্ছে।

মায়্যুর বউ পুরনো অভ্যাসে জামার হাতা তুটো গুটিয়ে নিল। কর্তার পিঠ, ঘাড় সব ডলে পরিষ্কার করে দিতে হবে। এটা বহুদিনের রেওয়াজ।

—বুঝলে তো! তারপর আবার আমি লাজলজ্জার মাথা খেয়ে মেইগ্রার কাছেই গেলাম। বললাম, ভগবান থাকলে ওর সর্বাঙ্গে কুষ্ঠ হবে। গরীবকে যারা দেখে না নরকেও তাদের ঠাঁই নেই। এইসব সাতসতেরো কথা। ও আমায় যা-তা বলল। যাক গে, আমাব কাজ হওয়া.নিয়ে কথা। তাবপর পাঁচ ফ্রাঁ ধার দিল। তা ছাড়াও অন্য জিনিস তো আছেই।

মায়্যুর বউ তোয়ালে দিয়ে স্বামীর গা মুছিয়ে দিচ্ছিল। এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মায়্যু। জোর গলায় হেসে উঠে তু হাতে জড়িয়ে ধবল বউকে।

—এই, এই, কি হচ্ছেটা কি! একেবাবে ভিজে গেলাম যে। আমার মনে হয় মেইগ্রার মনে কিছু বদ মতলব

—কি! কি মতলব?

—না না, কিছু না।

ক্যাথরিনেব ওপর মেইগ্রাব লোভের কথা বলতে গিয়েও চুপ করে গেল সে। সংসারের মেয়েলী ব্যাপারে পুরুষমানুষকে না টানাই ভালো।

বউকে শক্ত কবে জড়িয়ে ধরল মায়্যু। বরাবরই এমনটা হয়। তু-চারবার না না করে মায়্যু-গিন্নী সানন্দে আত্মসমর্পণ করে।

—ইস্ কি করছ! ছাড়ো না! এস্তেল দেখছে যে জুলজুল করে।

—বাজে বোকো না তো! মাত্র কয়েক মাসের বাচ্চা! ও বোঝেটা কি!

এরপর তরতাজা মায়্যু ফুর্তির মেজাজে থাকে খানিকক্ষণ। কোনো-কোনোদিন হয়ত বা একটু বাইরে গিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে হালকা রসিকতা করে। আশেপাশের সব মজুরেরাই এই সময়টা ঝরঝরে মেজাজে থাকে। বাচ্চারা বাপেদের মেজাজ বুঝে ফুটপাতে খেলে। নিজেদের মধ্যে মারামারি করে।

কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে সাংসারিক কথাবার্তা চালাচ্ছিল তু'জনে। ওপর থেকে চেঁচালো ক্যাথরিন।

—মা, আমি কি এবার নামব?

—হ্যাঁ। তোর বাবার স্নান হয়ে গেছে।

পুরনো, সেলাই করা কিন্তু পরিষ্কার জামাকাপড় পরে নেমে এল ক্যাথরিন।

—কি রে, বেরোবি নাকি?

—হ্যাঁ মা। বাজারে যাব। টুপির ফিতেটা ছিঁড়ে গেছে, পাল্টাতে হবে।

—পয়সা পাবি কোথায়?

—[illegible] দশ স্যু ধার দেবে বলেছে।

—খবরদার, মেইগ্রার দোকানে যাবি না কিন্তু। ওই শকুনিটার তো মেয়ে দেখলেই হল।

মায়্যু গমগমে গলায় বলল, বেশী রাত হলে একা একা রাস্তায় ঘুরিস না। বাড়ি ফিরে আসিস তাড়াতাড়ি।

সেই সন্ধ্যেটা বাগানে সব্‌জির তদারকী করবে, ঠিক করেছে মায়্যু। ইতিমধ্যে আলু, বিন, কড়াইশুটি লাগানো হয়ে গেছে। এখন বাঁধাকপি আর লেটুস বাকি। বাগানে যা তরিতরকারি হয়, তাতে বাইরে থেকে আলু ছাড়া আর বিশেষ কিছুই কিনতে হয় না। লেভাক পাইপ টানতে টানতে বাইরে এল। দু'জনের মধ্যে নানান কথাবার্তা চলতে লাগল। বউকে ঠেঙিয়ে এখন বীরদর্পে হেঁটে বেড়াচ্ছে লেভাক। নিজের পৌরুষে নিজেই বিমোহিত।

ফুর্তিতে ডগমগ হয়ে মায়্যুকে বলল, কি দোস্ত্‌, এক পাত্তর চলবে নাকি হ্রাস-গ্যবের দোকানে?

মায়্যু কিন্তু গোঁ ধরে বসে রইল। আজই না লাগালে লেটুসগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। আসল কারণটা অবশ্য অন্য। এত দুরবস্থার মধ্যে সে আর বউয়ের কাছ থেকে পয়সা চাইতে পারবে না।

পাঁচটার সময় পিয়েরোঁর বউ এল।

—হাঁ গো, আমার লিডি কি তোমার জ্যঁল্যার সঙ্গে বেরিয়েছে?

—না বোধহয়। জ্যঁল্যাকে ওর মা কি সব কাজের কথা বলেছে।

তারপর মায়্যু আর লেভাক পিয়েরোঁর বউয়ের সঙ্গে সস্তা রসিকতায় মাতলো। স্কুল ছুটি হয়েছে। বাচ্চারা দলে দলে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মারপিট করতে করতে রাস্তায় নেমে পড়েছে। মজুরেরা উবু হয়ে বসে পাইপ টানছে—সেই বস্তাপচা একই পুরনো দৃশ্য। লেভাক একাই শুঁড়িখানার দিকে পা বাড়ালো।

সন্ধ্যে নেমে এল। বাতি জ্বাললো মায়্যুর বউ। কি কাণ্ড! এখনও ছেলে-মেয়েরা বাড়ি আসেনি। একদিনও যদি একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া মিটিয়ে ফেলা যায়। স্যালাডের কি হল কে জানে! জ্যঁল্যাটা একেবারে বেযাড়ার হদ্দ। সারা বাড়িতে ম-ম করছে পেঁয়াজভাজার গন্ধ। রাত হয়ে এসেছে। মায়্যু বাড়ি ফিরে এসে চেয়ারে বসে ঝিমোতে লাগল। ঘড়িতে ঢং ঢং করে সাতটা বাজলো। আলজিরের সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে করতে এইমাত্র একটা কাঁচের থালা ভাঙলো লেনোর আর অঁরি। ঠাকুর্দা বোনমর খেতে এল। তার এখন খনিতে যাবার সময় হয়েছে। স্বামীকে তারপর ধাক্কা দিল মায়্যু-গিন্নী।

—ওঠো, খেয়ে নাও। ওরা কেউ এখনও ফেরেনি। যথেষ্ট বড় হয়েছে। নিজেদের ভালো নিজেরাই বুঝতে শিখেছে। আমিই শুধু শুধু ভেবে মরি। যত সব ঝকমারি!

* * * *

সরাইখানায় এতিয়েন পেট ভরে স্যুপ খেল, তারপর ওপরে উঠে সটান বিছানায়

জামাকাপড ছাডাবও তব সইল না। গত দু'দিনে ঘণ্টা চারেকও ঘুমোতে পারেনি। ঘুম যখন ভাঙলো, সন্ধ্যে গাঢ হয়ে এসেছে তখন। চট্‌কা ভাঙতে প্রথমে ঠাহরে এল না কোথায় আছে গা হাত পায়ে বড্ড ব্যথা। মাথাটা ভার হয়ে আছে। সোজা হয়ে দাঁডাতে গেলে পা টলমল করে। তা হলেও বাইরেব ঠাণ্ডা বাতাসে একটু পায়চাবী কবতে ইচ্ছে কবছে।

বাইবে ঝিবঝিবে ঠাণ্ডা বাতাস। তামাটে বংযের আকাশ—ঝড়ের পূর্বাভাস। দূব থেকে ধূসব ধোঁযাব মতো বাতেব অন্ধকাব নেমে আসছে। চারদিকে যেন গোব-স্থানেব নিস্তব্ধতা।

উদ্দেশ্যবিহীনভাবে হাঁটতে লাগল এতিযেন। মাথাব যন্ত্রণাটা ঝেডে ফেলতে হবে। ল্য ভোব'তে দিনেব কাজেব পালা শেষ। বাতের শিফ্‌ট এখনও শুরু হযনি। মনে হয এখন প্রায ছ'টা বাজে, কাবণ দলে দলে মজুবেবা কাজেব পালা শেষ কবে ঘবেব পথে পা বাডিযেছে।

প্রথমেই তাব চোখ পডল পিযেবোঁ আব তার শাশুডীর দিকে। অকথ্য ভাষায জামাইকে গালিগালাজ করছে বুডি। জামাই নাকি তাব হযে ওপরতলাব কর্তাদেব সঙ্গে কথা বলেনি, তাই তাব মজুবী কম হযেছে আজ।

খানিকক্ষণ চুপ করে শুনল পিযেবো। তারপব ঝাঁঝালো গলায বলল, তুমি ভাবলে কি বলে যে তোমাব জন্য আমি ওপরওযালার কাছে ধরাধবি কবতে যাব? তোমার মতো তো আব আমাব ভীমরতি হযনি।

—চুপ কব পা-চাটা কুকুব! পাছায লাথি খেযেও লেজ নাড়া স্বভাব যাবে কোথায। পোড়া কপাল আমার নইলে যে মেযেকে পেটে ধরলাম, সেও কি না আজ মুখ ঘুবিযে থাকে।

দু জনেব গলাব স্বব আস্তে আস্তে দূবে মিলিযে গেল। বুডিব ঈগল পাখিব ঠোঁটেব মতো বাঁকানো নাক, সাদা শনেব নুডিব মতো চুল আব হাড-জিবজিরে হাত। বাব্বাঃ!

পেছনে হঠাৎ দুটো পবিচিত গলার স্বব শুনে চমকে ঘাড ফেবালো এতিযেন। জাশারী আব মুকে।

—কি জাশাবী, আজ ববং খাওযাদাওযা সেরে চলো না ভলকাঁব দিকে? একটু ফুর্তি করে আসা যাক।

—পরে। এখন আমি একটু ব স্ত আছি।

—কেন? কি হযেছে?

ঘাড ফেরাতেই মুকের চোখ পডল ফিলোমিনেব ওপর—ছাউনীটার নীচ থেকে বেরিযে আসছে। ব্যাপারটা আন্দাজ করতে তেমন কষ্ট হল না মুকের। চোখ টিপে বলল, তাহলে আমি এগোই?

—হ্যাঁ। আমি পা চালিয়ে তোমায ঠিক ধরে ফেলব।

জাশারী প্রায় ধাক্কা মারতে মারতে ফিলোমিনকে পাশের নির্জন রাস্তায় নিয়ে

গেল। মেয়েটার ক্ষীণ আপত্তি ধোপে টিঁকলো না। দু'জনে বেশ বিবাহিত দম্পতির মতো ঝগড়া করছিল। না, মোটেই ফিলোমিন এই ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে জাশারীর সঙ্গে প্রেম করতে পারবে না। জাশারীও নাছোড়বান্দা।

—ঠিক আছে ফিলোমিন। ওসব থাক। কিন্তু তোমার সঙ্গে কতকগুলো কথা আছে আমার।

কোমর জড়িয়ে ধরে ফিলোমিনকে টানতে টানতে জঞ্জালের স্তূপের কাছে নিয়ে গেল জাশারী।

—তোমার কাছে কিছু টাকা হবে?

—কেন? কি দরকার?

—না, মানে দু ফ্রাঁ ধার দিতে হবে। ধার করে ফেলেছিলাম আগেই এখন শোধ দিতে পারছি না। বাড়িতে বললেও আবার অশান্তি শুরু হবে।

ফুঁসে উঠল ফিলোমিন।

—ওসব বাজে কথা বোলো না। একটু আগেই মুকের সঙ্গে গুজগুজ করছিলে। নিশ্চয় ভলকাঁতে যাবার তাল। ওই সব নোংরা, বাজারের মেয়েছেলে না হলে মন ওঠে না, না?

—না বাবা না। ওখানে আমি যাব না। আরে, তুমি থাকতে আমার আবার অন্য মেয়ের কি দরকার! বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? তাহলে তুমিও এখন আমার সঙ্গে চলো।

—না। বাড়িতে কচি বাচ্চা ফেলে রেখে বাইরে মজা লুটতে আমার ভালো লাগে না। আমাকে বাড়ি যেতে দাও

জাশারী পায় ঝুলোঝুলি করতে লাগল। দু ফ্রাঁ না পেলে সে মরে যাবে তার ইজ্জতের বুঝি কোনো দাম নেই ফিলোমিনের কাছে? তিতিবিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত জামার ভেতর থেকে পয়সা বার করল ফিলোমিন এটা তার মায়ের চোখের আড়ালে জমিয়ে রাখা।

—এই নাও। আমার কাছে পাচ ফ্রাঁ ছিল। তোমায় তা থেকে তিন দিলাম। তবে একটা শর্তে। প্রতিজ্ঞা কর, আমাদের বিয়ের ব্যাপারে তোমার মাকে যত তাড়াতাড়ি হয়, রাজী করাবে।

ক্লান্ত পোড়-খাওয়া গলায় কথাগুলো বলছিল ফিলোমিন। এই বয়সেই বেঁচে থাকার সব আনন্দ যেন ফুরিয়ে গেছে তার জীবন থেকে।

মৃদু স্বরে প্রতিজ্ঞা করল জাশারী। তারপর ফিলোমিনকে আদর করল, চুমু খেল।

নিস্পৃহ গলায় ফিলোমিন বলল, ঢের হয়েছে। এর বেশী কিছু নয়। এভাবে খোলা মাঠে হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে প্রেম করতে আমার আজকাল আর ভালো লাগে না। আমি বাড়ি যাচ্ছি।

এতিয়েন দূরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল। তার পা দুখানা যেন মাটির সঙ্গে আঠার মতো আটকে গেল।

একটু দূরে জঁলঁ্যা, বেবের আর লিডির মধ্যে অন্য এক নাটক চলছিল।

কর্তৃত্বের সুরে জঁলঁ্যা বলছিল,—বেশী বাজে বোকো না। বুদ্ধিটা কার মাথা থেকে বেরিয়েছে শুনি?

সত্যিই, জঁলঁ্যার মাথাতেই বুদ্ধিটা খেলেছিল। লিডি আর বেবেরকে সঙ্গে নিয়ে প্রচুর শাক তুলেছিল সে। এত কি আর বাড়ির লোক খেতে পারবে? তার থেকে বরং কিছুটা বেচে ফেলা যাক। মঁসুতে লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে লিডি শাক বিক্রী করে এসেছে—আর লোভে পড়ে সবটাই। জঁলঁ্যা বুদ্ধি খরচ করে লিডিকে পাঠিয়েছিল কারণ ও জানে মেয়েরা বললে সকলে চট্ করে রাজী হয়ে যায়, মুখের ওপর না বলতে পারে না। মোট এগারো সু পাওয়া গেছে। তার ভাগা-ভাগি নিয়ে গণ্ডগোল।

বেবের বলল, এটা ঠিক হচ্ছে না এগারো থেকে তুমি যদি একাই সাত নাও, আমরা পাবো মাত্র দুটো করে।

—ঠিক হচ্ছে না কেন শুনি? আমি তোদের থেকে অনেক বেশী শাক তুলেছিলাম।

বেবের বয়সে বড় হলেও অন্য সময়ে জঁলঁ্যাকে নিজের পাওনা ছেড়ে দেয়। আজ কাঁচা টাকা হাতে পেয়ে রক্ত গরম তার। বলল, লিডি ছ্যাখ, আমাদের ও ঠকাচ্ছে। যদি ঠিকঠাক ভাগ না করে, ওর মাকে বলে দেব।

সঙ্গে সঙ্গে বেবেরের নাকে দুম করে ঘুঁষি মারলো জঁলঁ্যা।

—ইঃ, বলে দেবে! আমিও তোর মাকে বলে দেব তুই আমার মায়ের জন্ত তোলা শাক বেচে পয়সা কামিয়েছিস। বদ্মা কোথাকার। এগারোকে সমান তিন ভাগে ভাগ কর তো দেখি!

মার খেয়ে বেবের ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দুটো সু হাত পেতে নিল। লিডি মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে ছিল জঁলঁ্যার দিকে।

জঁলঁ্যা বলল, লিডি, তোরটা আমার কাছে থাক। পয়সা দেখলে তো তোর মা আবার থাবলা দেবে। যখন দরকার হবে আমার কাছ থেকে চেয়ে নিস।

বাধ্য মেয়ের মতো ঘাড় নাড়লো লিডি। কোন্ এক অলিখিত অধিকারে জঁলঁ্যা সব সময়ই লিডির ওপর জোর খাটায়। এমন ভাব দেখায় লিডি যেন ওর বিয়ে করা বউ। লিডিকে জাপটে ধরে আদর করল জঁলঁ্যা। দু'জনে ফাঁক পেলেই ঝোপঝাড়ের আড়ালে গিয়ে ঠিক বড়দের মতো করে প্রেম করবার চেষ্টা করে। আসলে দেখে দেখে তো শেখবার বাকি নেই কিছু আর। দু'জনে আড়ালে 'বাবা-মা' সেজে খেলে। জান্তব উল্লাসে নিজের জোর খাটায় জঁলঁ্যা ওই খুদে মেয়েটার ওপর।

বেবেরের কাজ শুধু ড্যাবড্যাবে চোখ করে এসব দেখে যাওয়া। লিডির ওপর তার কোনো দখল নেই। জঁলঁ্যা মজা লোটে তার চোখের ওপর।

বেবের বলে উঠল, ওই ছ্যাখ, একটা লোক তোদের দেখছে।

অনতিকটা দূরে এতিয়েনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ধড়মড় করে উঠে দৌড়ে

পালালো ওরা। এতিয়েন নিজের মনেই শুকনো হাসি হাসল। এই বাচ্চাগুলো ছোট থেকেই এত অশ্লীল কদর্য পরিবেশে মানুষ যে এদের আটকে রাখবার চেষ্টা করাটাই বৃথা।

আরও একশো পা এগিয়ে গেলে দেখা যায় ছেলেমেয়েরা জোড়ায় জোড়ায় সব ফূর্তি করছে। মঁসু খনি অঞ্চলের মেয়েরা এখানেই সব প্রেম করতে আসে। শরীরসর্বস্ব-ভালোবাসা—ফলে বছর কাটতে না কাটতেই বাচ্চা হয়ে যায়। এ জায়গাটা নির্জন, পরিত্যক্ত। বেড়ার তারগুলো ভাঙা—যাতে দিব্যি এদিক ওদিক যাতায়াত করা যায়। কেউ কাউকে নিয়ে মাথা ঘামায় না। নির্বিকারভাবে চোখ কান বুঝে সব কিছু চালিয়ে যায়। মেয়েরা নিজেরা কৈশোর পেরোবার আগেই বাচ্চার মা হয়ে যায়।

অবশ্য এখানে দারোয়ান যে নেই তা নয়—তবে নামেমাত্র। বুড়ো মুক্য তার পরিবার নিয়ে এখানে থাকে। একটা ঘরে সে আর তার ছেলে 'মুকে', অন্য ঘরে মেয়ে 'মুকেত'। কোনো ঘরের জানলায় কাঁচ নেই। ইচ্ছে করলে বাইরে ছেলে-মেয়েদের অসভ্যতা দিব্যি দেখা যায় কিন্তু ওসবে আজকাল আর নজর দেয় কে। সবই দিব্যি গা-সহা হয়ে গেছে।

এই ভাবেই মুক্য দিন কাটিয়ে দিচ্ছে, চারদিকে ডব্‌কা ছোড়াছুঁড়ির কাণ্ডকারখানা দেখে। তার নিজের মেয়েই বা কম যায় কিসে। তবে সে লক্ষ্মী। কখনও ছোকরাদের ঘরে আনে না যা কিছু কারবার, অন্ধকার ঝোপঝাড়ে। তার বাড়ন্ত গড়ন দেখলে বুড়োদেরই বুকের রক্ত ছলাং করে ওঠে। তা ছেলেদের হবে না? আগে আগে এদিকটায় তো এমন অবস্থা ছিল যে মাটিতে পা ফেলা যেত না। সব জোড়ায় জোড়ায় গায়ে গা লাগিয়ে শুয়ে বসে আছে। যা খুশি তাই করছে, তুমি শুধু চোখে ঠুলি পরে থাকো। তাই থাকত বইকি মুক্য। কিন্তু এক-জোড়া ছেলেমেয়ে কিনা তার ঘরের দেওয়ালে পিঠ রেখে এমন প্রেম করতে শুরু করল যে কাঠের পলকা দেওয়াল মড়মড় করে ওঠে। মুক্য তখন বাধ্য হয়ে অবস্থা সামাল দিতে বাইরে বেরিয়ে আসে।

প্রতিদিন সন্ধে বেলা মায্যুর বুড়ো বাবা বোনময় আসে মুক্যর কাছে। দু'জনে ঠুকঠুক করে হাঁটে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে কথা হয় খুব কম, আধঘণ্টায় দশটার বেশী নয়। কিন্তু তবুও পুরনো দিনের কথা মনের মধ্যে ভীড় করে আসে। দু'জনের চোখেই বিধুরতা, বিষণ্ণতা গাঢ় হয় সন্ধ্যার ম্লান আলোয়। অনেক ক'টা বছর পিছনে ফেলে রেখে তারা মনে মনে হাঁটা দেয় অতীতের রাস্তায়, ঘা মারে স্মৃতির সিংহদুয়ারে। আজ থেকে তেতাল্লিশ বছর আগে বুড়ো বোন্‌মরও তার কিশোরী প্রেমিকা স্ত্রীকে নিয়ে ঠিক এমনিভাবেই এখানে নির্জনতা খুঁজতে আসত।

আজ এতিয়েন যখন এসে পৌছল, বোন্‌মর তখন ওঠবার জন্য তৈরি হয়েছে।

বুড়ো হঠাৎ গলা নামিয়ে মুক্যকে বলল, আজ যাই, বুঝলে?···আচ্ছা মুক্য, তুমি কসি বলে মেয়েটাকে চিনতে?

কিছু না বলে মুক্য কাঁধ ঝাঁকালো।

চুপ করে একখানা তক্তার ওপর বসল এতিয়েন। তার কি রকম খারাপ লাগছে। বড ভেঙে পড়েছে ওর তরতাজা মনটা। এই যে বুড়োটা এখুনি উঠে চলে গেল, কে বলতে পারে তারও জীবন এইভাবেই চলবে কিনা। বোকা হচ্ছে খনির মেয়েগুলো, যারা নতুন শিশুদের পৃথিবীর আলো দেখাচ্ছে খুশী মনে। একবার ভাবছেও না কতটা দুঃখ আর দারিদ্র্য এই সব বাচ্চাদের ওপর চাপিযে দেওয়া হচ্ছে। অবশ্য এও হতে পারে যে সে নিজে সঙ্গীহীন, নির্বান্ধব বলেই এত নিরাশার কথা তার মনে উঁকি দিচ্ছে। ঠিক এই সময একজোড়া ছেলেমেযে তার সামনে দিয়ে চলে গেল। মেযেটা কিছুতেই ঝোপের আডালে যাবে না, ছেলেটাও নাছোডবান্দা। অন্ধকারে একটু ঠাহর করতে পারলে এতিযেন বুঝতে পারত ওরা হল ক্যাথরিন আর শাভাল।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে একলা একলা বড রাস্তা ধরে মঁস্যুতে গিয়েছিল ক্যাথরিন। এতে ওর ভয় করে না। খনির ছেলেমেযেরা ছোটবেলা থেকেই স্বনির্ভর। আর এই যে পনেরো বছর বযস হওযা সত্ত্বেও কোনো ছেলেছোকরা তাকে ছোঁয়নি, এর কারণ একটাই—ওর শরীরে তেমন বাড নেই। মুকেত টাকা ধার দিতে পারল না। অন্য মেযেরা দিতে পারত, ক্যাথরিন নিল না। বাডি ফেরার পথে পিকেত-এর শুঁড়িখানার সামনে একটা লোক তাকে ডাকলো।

—এই ক্যাথরিন, এত জোরে ছুটছো কেন?

শাভালের গলা। ক্যাথরিন ভযে সিঁটিযে গেল। লোকটাকে তার ভালো লাগে না। আর সবচেযে বড কথা এখন তার নিজের কিছু ভালো লাগছে না।

—এস না ক্যাথরিন। গলাটা একটু ভিজিয়ে নেবে।

রাজী হল না ক্যাথরিন। সন্ধ্যে হযে এসেছে। তাড়াতাড়ি ওকে বাড়ি ফিরতে হবে। শাভাল এত সহজে ছাড়বার পাত্রই নয়। সে বারবার কাকুতি মিনতি করতে লাগল। তার ধান্দা একটাই—কোনোভাবে ক্যাথরিনকে নিজের শোবার ঘরে টেনে নিয়ে যাওয়া।

কথায় কথায় ক্যাথরিন বলে ফেলল নীল ফিতেটার কথা—যেটা সে কিনতে পারেনি। তার টুপির ফিতে।

—চলো ক্যাথরিন, আমি তোমায় একটা কিনে দিই।

অনেক তর্কাতর্কির পর ক্যাথরিন একটা শর্তে রাজী হল, শাভালকে পরে পয়সাটা ফেরত নিতে হবে।

—তাহলে চলো, মেইগ্রার দোকানে যাই।

—না না, মেইগ্রার দোকানে নয়। মা ওখানে যেতে বারণ করেছে।

—বোকার মতো কোরো না তো! সব কথা মাকে বলার কি দরকার?

মেইগ্রা তো দু'জনকে একসঙ্গে দেখে মাথার চুল ছিঁড়তে বাকি রাখল। ওঃ, মাহ্যুর বউ মাগীটা কি নচ্ছার! মেয়েকে ঠিক অন্যের পেছনে লেলিয়ে দিয়েছে। মাঝখান থেকে মেইগ্রার ফুর্তিটাই মাটি হল। সবটুকু রাগ তার গিয়ে পড়ল নিজের ভালোবাসুর [illegible] ওপর।

শাভাল সন্তর্পণে বড রাস্তা ছাড়িয়ে ক্যাথরিনকে নিয়ে সরু পথটায় নামলো। তার মুখে অনর্গল ভালোবাসার কথা। ক্যাথরিন যখন টের পেল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। শক্ত করে ওর কোমর জড়িয়ে ধরেছে শাভাল।

ছিঃ, ক্যাথরিন ভয় পাচ্ছে কেন? শাভাল তো ওকে ভালোবাসে। এই তুলতুলে মিষ্টি মেয়েটাকে কি সে কষ্ট দিতে পারে! মুখ নামিয়ে ক্যাথরিনের ঘাড়ে ঠোঁট ছোয়ালো শাভাল। দু চোখ বন্ধ করল ক্যাথরিন। ঠিক এই দৃশ্যটাই গত শনিবার রাতে ওর কল্পনায় এসেছিল। কই, তখন তো এত বিশ্রী অনুভূতি হয়নি, বরং··· হঠাৎ মনের কোণে উঁকি দিয়ে গেল আর একজন পুরুষের মুখ—এতিযেন।

তখনই চমক ভাঙলো ওর। শাভাল তাকে এ কোথায় নিয়ে এল?

—না না, ছেড়ে দাও আমাকে, বাড়ি যাব।

রকিযার-এর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করে একেবারে ভেঙে পড়ল ক্যাথরিন। ভয়ে, লজ্জায় গলা শুকিয়ে কাঠ। তার হাত-পা সব শক্ত হয়ে গেছে।

—এসব আমি চাইনি শাভাল। আমি এখনও তত বড হইনি তো!

—বাজে বোকো না। তোমার ভীষণ ভালো লাগবে দেখো।

সবল দু হাতে জড়িয়ে ধরে ক্যাথরিনের পালকের মতো হালকা নরম দেহটা সটান ছাউনী দেওয়া ঘরটার মধ্যে নিয়ে গেল শাভাল। তাকে বাধা দেওযার শক্তি পনেরো বছরের কিশোরীর ছিল না। খানিক বাদেই নেতিয়ে পড়ল সে।

যখন এত সব কাণ্ড হচ্ছিল, বাইরে চুপ করে বসেছিল এতিযেন। দু'জনের সব কথাবার্তাই কানে আসছিল। উত্তেজনায় তার গা হাত পা ঘেমে গেছে। সবাই কত মজা করছে আর সে একলা একলা ভূতের মতো ··। সে জোরে জোরে পায়চারি করতে লাগল কিন্তু শাভালের কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। খানিক পর দু'জনে উঠে দাঁড়ালো। ছেলেটা এখনও মেয়েটার কোমর জড়িয়ে ধরে কানে কানে কি সব বলে যাচ্ছে। মেয়েটার চলনে ব্যস্ত, বিরক্ত ভাব। ওরা দু'জন গ্রামের পথে পা বাড়ালো।

এতিয়েনের তীব্র ইচ্ছে হল ওদের মুখ দেখবার। রাস্তার প্রথম আলোটার সামনেই দু'জনকে চিনতে পেরে হিম হয়ে গেল সব রক্ত। ক্যাথরিন আর শাভাল! প্রথমে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে মন চাইল না। ওঃ, হারামজাদী কুত্তী! কি নাচানোটাই না নাচালো তাকে! খনির মধ্যে ছেলেদের পোশাকে দেখেছিল বলে এখন নীল ফ্রক পরা ক্যাথরিনকে পাশ দিয়ে চলে যেতে দেখেও ও একেবারে চিনতেই পারেনি। এবার আর সন্দেহ নেই কোনো—সেই চোখ। ভুল হয়নি দেখতে—ক্যাথরিনের সেই গভীর আর টলটলে সবুজ দুটি চোখ।

ক্যাথরিন আর শাভাল ধীর পায়ে হাঁটতে লাগল। তারা জানেই না এতিয়েন তাদের অনুসরণ করছে। হিংসায় জ্বলছে সে। শাভাল আবার ক্যাথরিনের কানের লতিতে চুমু খেল। ক্যাথরিন হাসছে খিলখিল করে। রাগে, অপমানে, দুঃখে এতিয়েনের চোখে জল এসে গেল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল সে। সকালে ক্যাথরিন যখন তাকে বলেছিল ওর কোনো প্রেমিক নেই তখনই এতিয়েন সেই মেয়েটার

সুযোগটা নিতে পারত। সে বোকার মতো হাত পা গুটিয়ে বসে থাকল আর ওই হারামজাদা বেজন্মা শাভালটা ঠিকই আখের গুছিয়ে নিল।

আধঘন্টা এভাবে হেঁটে ল্য ভোর‍্যাতে পৌছল ওরা। মাঝে পঞ্চাশবার দু'জনে জাপটাজাপটি করে পীরিত করেছে। এতিয়েন পারলে শাভালকে এখনই খুন করে। খুব শিক্ষা হল তার। ডাইনীদের পাল্লায় সে আর পড়ছে না। ক্যাথরিন বাড়ি চলে যেতে এতিয়েন নিজের ঘরের দিকে রওনা দিল। এলোমেলো পা পড়ছে তার। শরীর আর মনের ভেতরকার ঘুমিয়ে থাকা দানবটা অস্থির আক্রোশে পা দাপাচ্ছে। সারা বসতি ঘুমিয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে কয়েকটা টিমটিমে আলো।

রাসন্যরের দোকানে তখনও দু'জন লোক মাল টানছে। নিজের ঘরে যাবার আগে শেষবারের মতো জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখে নিল এতিয়েন। কালো, অবাধ্য জন্তুর মতো ল্য ভোর‍্য খনিটা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে রয়েছে। শুধু চাপ চাপ অন্ধকার যেন সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাত্রার টুঁটি টিপে ধরেছে। বৃষ্টি নামলো ঝমঝম করে। অন্ধকার আরও গাঢ় হল। শুধু ড্রেনেজ পাম্পের একটানা ঘরঘর শব্দ আর অঝোর বৃষ্টির ধারা—সব কিছু গ্রাস করে নিতে চায়।

তৃতীয় পর্ব

তার পরের দিনগুলো এতিয়েনের কাটতে লাগল একঘেয়ে কর্মব্যস্ততায়। ধীরে ধীরে খনির কাজে অভ্যস্ত হয়ে গেল সে। প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হত ঠিকই কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবই সয়ে যায়। প্রথম পনেরো দিন তো গায়ে হাত পায়ে এত ব্যথা যে নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। চোখ বুজলেই মনে হয় একটা অন্ধকার গুহার মধ্যে কয়লার বালতি টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

এই ভাবেই চলতে লাগল মাসের পর মাস। আজকাল আর ভোর তিনটেয় ঘুম থেকে উঠতে কষ্ট হয় না। তারপর কফি খেয়ে স্যাণ্ডুইচের মোড়ক বগলদাবা করে কাজে যাওয়ার পর্ব। মাদাম হ্রাসন্তর খাবার বানিয়ে রাখেন আগের দিন রাতেই। রোজ ভোরে দেখা হয় বুড়ো বোনমরের সঙ্গে—সে তখন বাড়ি ফেরে সারা রাতের ডিউটি সেরে—আর খনি থেকে ফেরার পথে দেখতে পায় বুতলুকে, তার তখন কাজে যাবার সময়। খনির অন্ধকার গর্ভ থেকে বেরিয়ে লকার-রুমে এসে প্রথমেই আগুনের তাতে হাত-পা গরম করে নিতে হয়—এখন আর আগের মতো হাঁ করে থাকা রাক্ষুসে ইঞ্জিনটার দিকে ফিরেও তাকায় না এতিয়েন। দেখে দেখে চোখ পচে গেছে। আজকাল আর খনিতে নামার সময় নিজের হৃদপিণ্ডের শব্দ নিজের কানে বাজে না। কখন যে দিনের আলোটুকু মরে যায়, ভালো করে নজরও করে না এতিয়েন। একবার ভয়ও হয় না যে এই বুঝি খনিতে নামবার পথে খাঁচাটা ভেঙে পড়ল। যতই নীচে নামে, কেমন একটা বিজাতীয় আনন্দ হয়। কেমন যেন মনে হয় এতক্ষণে ভালোলাগার জায়গায় এসে পৌঁছেছে। মঁসুর রাস্তার থেকে এখন এই খনির ভিন্ন ভিন্ন এলাকাগুলো অনেক বেশী চেনা লাগে, আপন মনে হয়। আলো ছাড়াই এমন কি দুটো হাতই পকেটে পুরে দিব্যি তাড়াতাড়ি প্রায় চোখ বুজেই সে খনির মধ্যে নড়াচড়া করতে পারে। শুধু কতকগুলো একই বস্তাপচা দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি: ওপরওয়ালার গালিগালাজ, বুড়ো মুক্য-এর খচ্চরের পিঠে মাল চাপানো, বেবের বাতাঈকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে, জঁলঁ্যা, মুকেত, লিডি সবাই ব্যস্ত নিজের নিজের কাজ নিয়ে।

এখন সব অসুবিধেগুলোর মোকাবিলা করবার দিব্যি অভ্যেস হয়ে গেছে। কয়লার গুঁড়ো নাকে মুখে ঢুকে গেলেও অস্বস্তিবোধ নেই। দরদর করে ঘামলে, ভিজে জামাকাপড় পরে ঘন্টার পর ঘন্টা থাকলেও কোনো বিকার হয় না।

পুরো দলটা অবাক চোখে দেখে নতুন মানুষটা দিব্যি কেমন সব কাজে রপ্ত হয়ে গেছে। চটপটে হাতে নিখুঁত ভাবে নিজের কাজ করে নেয়। চূড়ান্ত ক্লান্তিতেও কোনো অভিযোগ নেই—কে জানে হয়ত সেটা অহংকার। শুধু একটাই যা দোষ—ঠাট্টা জিনিসটা সে বরদাস্ত করতে পারে না।

এই নতুন ছেলেটিকে খুব ভালো লাগে মায়্যুর। কারণ সে কাজ বোঝে, ফাঁকি-বাজ নয়। আর সবচেয়ে বড় কথা, শিক্ষিত। যে সব বই পড়ে বা যা নিয়ে চিন্তা করে—তা সাধারণ খনিমজুরদের চিন্তার বাইরে। সত্যিই পুরুষকার আছে এতিয়েনের। খিদেয় রাস্তার কুকুর বেড়ালের মতো শুকিয়ে মরেনি। দুটো সবল হাত তাকে খাবার জুগিয়েছে। ভরসা করে কাজ দেওয়া যায় ওকে। তবুও কি ওপরওয়ালাকে সন্তুষ্ট করা যায়? এত করেও তো শ্রমিক-মালিক বিরোধ দানা বেঁধে উঠছে। মায়্যুর মতো ঠাণ্ডা মাথার লোকও মাঝে মাঝে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে।

প্রথম প্রথম জাশারী আর এতিয়েনের মধ্যে কিছুটা ঠাণ্ডা লড়াই চলছিল। একদিন তো প্রায় হাতাহাতি হবার যোগাড়। কিন্তু কি ভাগ্যিস, মাথা তেমন গরম নয় জাশারীর। এক গ্লাস বীয়ার খাইযে তাকে দিব্যি হাত করে ফেলল এতিয়েন। লেভাকের সঙ্গেও বেশ খাতির হয়ে গেছে। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মতো জটিল বিষয় নিয়েও নরম-গরম আলোচনা হয়। ক্যাথরিন সেই আগের মতোই আছে। চুপচাপ কাজ করে, মাঝে মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য। টুকরো কথাও বাদ যায় না। কিন্তু নিজের হঠাৎ জুটে যাওয়া প্রেমিকটিকে ভুলবার চেষ্টাও করে না। বাড়ির সবাইও অগত্যা ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে। শাভাল সুযোগ পেলেই ক্যাথরিনকে নিয়ে ছুতোয়-নাতায় নির্জনে যায়। তারপর প্রায় সমস্ত পাড়াকে জানিয়ে বাড়ির দরজার সামনে চুমু খেয়ে বিদায় নেয়। এতিয়েন এ নিয়ে সস্তা রসিকতাও করে। ক্যাথরিন রসিয়ে রসিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার গল্প করতে চায় কিন্তু মাঝে মাঝে এতিয়েনের চাউনি দেখে চোখ নামিয়ে ফেলে, কথা বন্ধ হযে যায়। তারপর ঘণ্টা দুযেক পারতপক্ষে কথা বলে না কেউ—যেন দু'জনে দু'জনের মনের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে যেখানে অকারণ বাক্যব্যয় করাটাই মূঢ়তা।

বসন্ত এসে গেল। একদিন কাজ থেকে ফেরার পথে এতিয়েনের মুখে লাগল মিষ্টি বাতাসের ঝলক, নাকে এল নতুন মাটির গন্ধ। অনেক দিন পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করেও ক্লান্তি আসছে না এতিয়েনের।

সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফেরবার পথে জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়েদের নির্লজ্জের মতো প্রেম করতে দেখে এখন আর লজ্জা পায় না সে। জাশারী আর ফিলোমিন প্রেম চালিয়ে যায় পুরনো অভ্যেসের বশে, জঁল্যা আর বাচ্চা লিডি পারলেই ঝোপের আড়ালে চলে যায়। মুকেত্ত তো সর্বদাই বেহায়াপনা করছে। এতিয়েনের এসব দেখে দেখে সয়ে গেছে। শুধু ক্যাথরিন আর শাভালকে একসঙ্গে দেখলে ওর মনে কেমন যেন একটা চাপা কষ্ট হয়। তাড়াতাড়ি সে হ্রাসন্যরের শুঁড়িখানায় গিয়ে বসে।

—মাদাম, আধ পাঁইট মাল খাবো। না না, আজ আর বাইরে বেরোব না। কি সুভারিন, চলবে নাকি এক পাত্তর?

—না।

পাশাপাশি বাস করার ফলেই বোধহয় এতিয়েন আর সুভারিনের মধ্যে বেশ

খানিকটা বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। স্থভাবিন ল্যা ভোর‍্যার ইঞ্জিনীযাব। এতিযেনের পাশের ঘরের ভাডাটে। বযস মনে হয বছর ত্রিশ। রোগা, ফর্সা, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। লম্বা চুল আর অল্প দাডি আছে। সরু সরু দাঁত, ছোট মুখ, পাতলা নাক আর গোলাপী গাযের রংযে তাকে অবশ্য মেযেলী চেহারার বলে মনে হয, কিন্তু কোথায যেন একটা পুরুষালি তীক্ষ্ণতাও লুকিযে আছে। তাব সম্পত্তিব মধ্যে বাক্সভর্তি কাগজপত্তব আব বই। জাতে বাশিযান। কখনও কিন্তু নিজেব সম্বন্ধে কোনো কথা বলে না। মাঝে তো এমন গুজবও ছডিযেছিল যে হযত বা ও কোনো খুনী আসামী—পুলিসের ভযে এখানে লুকিযে আছে।

প্রথমদিকে কযেকটা সপ্তাহ এতিযেন বিশেষ ভাব জমাতে পাবেনি স্থভারিনেব সঙ্গে। শুধু শুনেছিল ও নাকি টুলার এক অভিজাত পরিবাবের কনিষ্ঠতম সন্তান। ডাক্তারী পডবাব সময তরুণদের দেখাদেখি বিপ্লবের জোযারে মাতে। পডা ছেডে কাবিগরী শিক্ষা নেয দেশেব সাধাবণ মানুষদেব সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশাব আশায। দেশদ্রোহিতাব অভিযোগে অভিযুক্ত হলে দেশ ছেডে পালায তারপর অনেক ঘাটেব জল খেযে অবশেষে এই চাকবি।

কাজ ছাডা অন্য কোনো চিন্তা মাথাতেই নেই তাব। এমন কি মেযেদের প্রতিও সে নিবাসক্ত। যে সব মেযেরা সাহসী আব সহৃদয, একমাত্র তাদের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করা যায বলে সে ভাবে কাবণ সেক্ষেত্রে একজন পুরুষের সঙ্গে তার কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু প্রেম কবাব মতো মূঢতা স্থভারিনেব নেই। সুখে থাকতে তো আর তাকে ভূতে কিলোযনি। দিবি্য আছে, ঝাডা হাত পা। কি দরকাব উটকো ঝামেলাব? পাচটা মানুষেব সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে মিলেমিশে থাকতে পাবলেই যথেষ্ট।

প্রতিদিন বাত ন'টা আন্দাজ মদেব দোকানে ভীড কমে গেলে এতিযেন আব স্থভাবিনেব মধ্যে কথাবার্তা হত। এতিযেনের হাতে থাকত সফেন বীযাবের গ্লাস আব একটার পব একটা সিগাবেট টেনে যেতে স্থভাবিন। ধীবে ধীবে মনের পর্দা সবিযে ফেলত স্থভারিন। বাডিব কথা বলত, গল্প কবত। দু'জনেব পাযেব কাছে ঘুবঘুব করত ছোট তুলতুলে একটা খবগোশ ওটা সমানে নবম নখে আঁচডাতো স্থভারিনকে, কোলে উঠতে চাইত। তাকে বুকে তুলে নিযে আদব কবত স্থভাবিন। সম্ভবত ওব দেহের উষ্ণতায খুঁজে পেত নিজের দেশ-স্বজন-পবিজনেব সান্নিধ্য।

এতিযেন কিন্তু গত দু'মাস যাবৎ লিল-এব মেকানিক প্লুশারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছিল। সে বুঝতে পেবেছিল এই সব অর্ধমৃত খনিমজুরদের জাগিযে তুলে বিপ্লবের আলো দেখাতে গেলে আজকের দুনিযায প্লুশারের মতো মানুষেবই প্রযোজন।

—জানো স্থভাবিন, প্ল্যুশারের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম।

ব্রাসন্তর ছাডা দোকানে আর কেউ ছিল না। সে তড়িঘডি এগিযে এল দু'জনের কাছে।

—সত্যি এতিযেন? ও কি করছে এখন?

—ওদের ওখানে মজুরদের সংঘবদ্ধতা বাড়ছে। চারদিক থেকে সংগ্রামী মজুররা এক হচ্ছে।

হ্রাসন্তর স্থভারিনকে জিজ্ঞেস করল, এ ব্যাপারে তোমার কি মনে হয় ?

—ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।

এতিয়েন সোৎসাহে বলে চলল প্ল্যুশারের কথা। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, শোষণতন্ত্রের বিরুদ্ধে দুনিয়ার মজদুরদের এক হতে হবে। যারা আমাদের এতদিন ধরে পায়ের তলায় পিষে রেখেছিল, বাকশক্তি হরণ করেছিল, দু চোখ ভরে দিয়েছিল শুধু অসহায়তার অন্ধকার, তাদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার সময় এসেছে। লণ্ডনে শ্রমিক সমিতি সবেমাত্র গঠিত হয়েছে। এভাবে আস্তে আস্তে পৃথিবী জুড়ে গড়ে উঠবে সর্বহারাদের সংগঠন। বেঁচে থাকার লড়াই পরিণত হবে মর্যাদার লড়াইয়ে। দু'মুঠো ভাতের জন্য ওপরওয়ালাদের লাথি ঝাঁটা খেয়ে বেঁচে থাকবার দিন শেষ হয়ে এসেছে। মানবিকতা জিতে যাবে ধনতন্ত্রের বিপক্ষে। গণ-আদালত বিচার করবে সুবিধাবাদী দালালদের।

স্থভারিন বলল, তোমাদের বন্ধু আর পথিকৃৎ কার্ল মার্কস তো বলছেন আপনি-আপনিই ধনতন্ত্রের নিকেশ হয়ে যাবে। এর জন্য কোনো রাজনীতির দরকার নেই, সংগঠনের দরকার নেই, নিজেদের মধ্যে সলাপরামর্শও বাহুল্যমাত্র। শুধু মাইনে বাড়লেই তোমরা খুশী। শ্রমিক-মালিক আঁতাত হলেই আহ্লাদে দু হাত কচলাতে থাকবে, তাই না ? তার চেয়ে বরং পৃথিবীতে আগুন জ্বেলে দাও, সব কিছু জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাক। তারপর দেখবে সেই ধ্বংসস্তূপের ওপর মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে নতুন সবীজ পৃথিবী।

এতিয়েন হাসতে লাগল। কথায় কথায় স্থভারিনের এত মাথা গরম করা স্বভাব ! যেন ধ্বংসাত্মক পথ নিলেই মুক্তির উপায় আছে !

হ্রাসন্তর বলল, কি হে এতিয়েন, তুমি কি মঁস্থতে ইউনিয়ন তৈরী করবে বলে ভাবছো ?

প্ল্যুশারের আসলে তাই ইচ্ছে। এতিয়েনও বুঝেছে বারুদ জমেই আছে—এখন দরকার শুধু উড়ে আসা ছোট্ট একটা আগুনের ফুলকির।

বিজ্ঞের মতো হ্রাসন্তর বলল, মুশকিল হচ্ছে চাঁদার ব্যাপারে। কেন্দ্রীয় শ্রমিক-তহবিলখাতে বছরে পাঁচ সেন্টিম আর আঞ্চলিক তহবিলে দু ফ্রাঁ মতো—এইটুকু চাঁদা দিতেই অনেকে অপারগ হবে।

এতিয়েন বলল, আমি তো ভাবছিলাম প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের মতো কিছু একটা ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। আসলে আমি মানসিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ প্রস্তুত, এখন শুধু আর পাঁচজনের এগিয়ে আসার অপেক্ষা।

মাদাম হ্রাসন্তর খানিক আগে ঘরে এসে সব শুনছিলেন। এবার ক্ষুব্ধ গলায় বললেন, বাজারের দর যে আকাশছোঁয়া। বিপ্লব তো হল। মেহনতী মানুষগুলোর পেট ভরবে কিসে ?

এ বিষয়ে এতিয়েনরা সকলেই একমত। বড়লোকরা একচেটিয়া যা খুশি তাই

করে চলেছে। তারা খাবার পর পাতে যা পড়ে থাকে তাতে কুকুরের মতো চেটেও গলা পর্যন্ত কিছু পৌঁছয় না। আসলে মরার স্বাধীনতাটুকু ছাড়া সব মজুরেরই হাত পা বাঁধা। এই সব মালিকদের কারখানায় খানিতে এবার সত্যিই কিছু একটা করতে হবে। ভালো কথায়, মিষ্টি মুখে কাজ না হলে জুতোব বদলে জুতো, চাবুকের বদলে চাবুক ফিরিয়ে দিতে হবে। সমাজের ঘুণধরা মেরুদণ্ডটা শক্ত হাতে সোজা করে দেবার সময় এসে গেছে।

স্বপ্নের ঘোর লাগা গলায় বলল সুভারিন—বেতনবৃদ্ধি, সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকা—এসব কি কোনোদিন এই সোনার পৃথিবীতে সত্যি হয়ে দেখা দেবে? কখনও কি এমন হবে যে মজুররা শুকনো রুটি চিবিয়ে শুধু কলকারখানায় মাল আর টালির চালের বাড়িতে সন্তান উৎপাদন করা ছাড়া অন্য ভাবেও বাঁচতে শিখবে? যদি মাইনে কমে, মজুররা মরবে। তখন মজুরদের চাহিদা বাড়বে আর সেই সঙ্গে বাড়বে খানিকটা মাইনেও। যেই মাইনে বাড়বে, অমনি দলে দলে লোক মজুরীর লোভে ছুটে আসবে। মাইনে আবাব চট করে কমে যাবে। এই কি মুক্তির উপায়? খালি পেট, অস্থিচর্মসার শবীব আর আগ্রাসী খিদে নিয়েই কি আমরা প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রেখে যাব?

সুভারিন যখন এইভাবে কথা বলে, হ্রাসন্যর আব এতিয়েন বেজায় অস্বস্তিতে পড়ে যায়। এই নির্মম সত্যি কথাগুলোব উত্তর তো তাদের জানা নেই।

তীব্র গলায় বলল সুভারিন—বুঝতে পারছো না কেন এভাবে কিছুই হবার নয়। সব কিছু ধ্বংস কবে না ফেললে এই খিদে মিটবে না। তারপর রক্ত দিয়ে স্নান করে, অগ্নিশুদ্ধ হয়ে পৃথিবী আবার জন্ম নেবে পরিপূর্ণ শুচিতায়··

মাদাম হ্রাসন্যর বললেন, উনি তো ঠিকই বলছেন।

এতিয়েন উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙলো।

—চলো বাবা, শুতে চলো। প্রলয় হয়ে গেলেও তো কাল ঠিক ভোর তিনটেয় আবার উঠতে হবে।

প্রতিদিনই সন্ধে থেকে একই জিনিস চলে বাত দশটা পর্যন্ত। কান মাথা ঝিমঝিম না করা পর্যন্ত শুধু পরিকল্পনা ছকে যাওয়া হয়। এতিয়েন প্রথম প্রথম তার সীমিত জ্ঞান নিয়ে লজ্জাবোধ করত। অনেক বইপত্র আছে সুভারিনের কাছে কিন্তু সেগুলোর বেশীর ভাগই জার্মান আর রাশিয়ান। যে দু-চারটে অন্য বই ছিল, এতিয়েন চটপট সেগুলো পড়ে ফেলল।

জুলাই মাসে খনির শ্রমিকদের একঘেয়ে জীবনে একটা ঘটনা ঘটল। 'গীল্যুম' খনির এক অংশে কয়লার স্তরগুলোর মধ্যে গোলমাল দেখা দিল। আশ্চর্য ব্যাপার যে এই গোলমালগুলো দক্ষ ইঞ্জিনীয়ারদের চোখে আগে ধরা পড়েনি। বড় রকম বিপদের আশঙ্কায় খনির ঐ অংশে কাজ বন্ধ করে দিল কর্তৃপক্ষ। হঠাৎ কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে বেকার হয়ে পড়ল বেশ কয়েকদল মজুর। পেট চালাবার চিন্তায় চোখে অন্ধকার দেখল তারা। মালিক পক্ষের লোকেরা শিকারী কুকুরের মতো হাওয়া শুঁকছে

চেষ্টা করল—কি ভাবে ঘুরিয়ে মুনাফা লোটা যায়। কোম্পানী থেকে নোটিশ পড়ল নতুন শর্তে বেকার মজুরদের কাজ দেওয়া হবে।

এদিকে এতিয়েনের পদোন্নতি হয়েছে। পুরোদস্তুর শ্রমিকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাকে। ওভারম্যান আর খাদের ইঞ্জিনীয়ার এই চালাকচতুর ছোকরাটিকে ইদানীং বেশ পছন্দ করতে শুরু করেছে। সেই সুযোগে একদিন এতিয়েনকে লেভাকের জায়গায় তার নিজের দলভুক্ত করে নিল মায়্যু—কারণ অন্য দলে বদলী হয়েছে লেভাক। মায়্যুর চোখে নিজেকে উপযুক্ত প্রমাণ করতে পেরে এতিয়েন খুব খুশী।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা এতিয়েনকে সঙ্গে করে মায়্যু খনিতে গেল—নোটিশটা ভালো করে পড়ে দেখা দরকার। শর্তগুলো এতিয়েন পড়ে শোনালে মায়্যু মাথা নাড়লো।

—এ মোটেই সুবিধের হবে না।

যে নতুন খাদে কাজ করতে হবে বলে নোটিশ পড়েছে সেটা ল্য ভোর‍্যুর উত্তর অংশে—ফিলোঁনিয়ের-এ। পরদিন মায়্যু এতিয়েনকে সঙ্গে নিয়ে একেবারে খনি-গর্ভে গেল। খাদের অবস্থা মায়্যুর কাছে একটুও সুবিধেজনক বলে মনে হল না। এখান থেকে যথেষ্ট পরিমাণে কয়লা তোলা সম্ভব হবে না। এতিয়েনকে মায়্যু দেখালো—স্তরগুলো বিচ্ছিন্ন, খাড়া, সরু সরু আর কি শক্ত! বিপজ্জনকভাবে উঁচু এই পাথুরে স্তর থেকে কয়লা সংগ্রহ করা কি অমানুষিক ব্যাপার হবে—বোঝালো এতিয়েনকে। মোট কথা এখানকার পরিস্থিতি খুবই সাংঘাতিক। তবু পেটের দায়ে কাজ করতে হবে—প্রাণ হাতে করে।

রবিবার সকালে ডিভিশনাল ইঞ্জিনীয়ারের অনুপস্থিতিতেই নেগ্রেল আর দঁসের বেকার মজুরদের নতুন শর্তে এই খাদে কাজ দেবার তোড়জোড় শুরু করল।

পাঁচ-ছ'শো মজুর এক জায়গায় জড়ো হয়েছে। তারা নিজেরাই নিজেদের মজুরী নিলামে কমিয়ে ফেলছে—শুধু বেকারত্বের ভয়ে। শেষে দাঁও বুঝে নেগ্রেল সবচেয়ে কম দরটা হাঁকলো। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে ঝুড়ি প্রতি এক সেন্টিম কমে কাজ করতেও বুদ্ধু লোকগুলো রাজী। তাদের এই মজুরী কমিয়ে ফেলার আহাম্মকি দেখে এতিয়েন দাঁত কিড়মিড় করল। বাইরে বেরিয়ে প্রথমেই তার চোখ পড়ল শাভাল আর ক্যাথরিনের দিকে। এদিকে খনিতে এই অবস্থা, বুড়ো মায়্যু কোণঠাসা অবস্থায় আর ওদিকে ছুটিতে দিব্যি ফুর্তি মেরে এলেন।

এতিয়েন বলল, জানো, কি হয়েছে? মজুররা নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করছে কে কত কম মজুরীতে কাজ করবার হিম্মত রাখে।

শাভাল তো চটে লাল। ছি ছি, এভাবে কেউ নিজেদের ইজ্জত ধুলোয় মিশিয়ে দেয়! জাশারীও বিরক্ত, ক্ষুব্ধ।

এতিয়েন বলল, এভাবে চলতে পারে না, বুঝলে! এবার আমাদের হাতে চাবুক নিতে হবে।

এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি মায়্যু। এবার সে বিড়বিড় করল, তার দু চোখে [illegible]।

আমরা হাতে চাবুক নেব ? সত্যিই এবার তার সময় এসেছে ? নাকি বড় দেরি হয়ে গেল ?

*   *   *   *

জুলাই মাসের শেষ রবিবারে মঁস্থতে মেলা বসে। সেদিন সকাল হতে না হতেই চতুর্দিকে সাজ সাজ রব। ঘরদোর পরিষ্কার করে সবচেয়ে ভালো জামাকাপড় পরে সবাই দলে দলে মেলায় রওনা হয়।

রবিবার দিনগুলোতে মায়্যুর বাড়িতে ছ'টা-সাতটার আগে বড়রা কেউ ঘুম থেকে ওঠে না ; ছোটদের উঠতে প্রায় ন'টা বাজে।

যেদিনের কথা বলছি, সেইদিন ভোরে উঠে মায়্যু বাগানে খানিক তামাক টানলো, তারপর ভেতরে এসে একা একা একটুকরো রুটি দাঁতে কাটতে কাটতে অপেক্ষা করতে লাগল অন্যদের জন্য। খানিকটা সময় টুকটাক এটা ওটা করে কাটালো। ঘরের বেসিনটার পাইপ ফুটো হয়েছিল। সেটাকে সারিয়ে দেওয়ালঘড়ির নীচে একটা নতুন ছবি টাঙানোর কাজ সেরে ফেলল। ইতিমধ্যে বুড়ো বোন্‌মর উঠে একটা চেয়ার নিযে বাগানে রোদে গিযে বসেছে। মায়্যুর বউ আর আলজির খাবার তৈরী করতে ব্যস্ত। লেনোর আর অঁরিকে সাজিয়ে-গুছিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে নীচে নামল ক্যাথরিন। ঘড়িতে ঢং ঢং করে বেলা এগারোটা বাজলো। আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে নেমে গেল জাশারী, জঁলঁ্যা। বাড়ি জুড়ে ম-ম করছে খরগোশের মাংস আর আলুর ঝোলের গন্ধ।

সারা এলাকাটা জুড়ে ব্যস্ততা শুরু হযে গেছে। খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে দল বেঁধে সবাই রওনা হবে। প্রতিটি বাড়ির খোলা জানলা দিয়ে একই দৃশ্য চোখে পড়ে।

ঠিক বারোটায় মায়্যুরা সবাই খেতে বসল। আশেপাশের বাড়িগুলোর তুলনায় তাদের এখানে চেঁচামেচি অনেক কম। অন্য বাড়িগুলোতে মেয়েরা প্রতিবেশিনীর সঙ্গে চেঁচিয়ে গল্প করছে, ছোটাছুটি করছে বাচ্চাদের পেছনে·· লেভাকরা মায়্যুর প্রতিবেশী কিন্তু জাশারীর সঙ্গে ফিলোমিনের বিয়ের ব্যাপারে কথা ওঠার পর থেকেই দুই বাড়ির গিন্নীদের মধ্যে কথাবার্তা মোটামুটি বন্ধ। কর্তাদের মধ্যে অবশ্য বাক্য-বিনিময় হয়। লেভাকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কমেছে বটে কিন্তু তেমনি পিয়েরোঁদের সঙ্গে মাখামাখিটা বেড়েছে। আজ পিয়েরোঁর বউ নাকি কোন্ মাসতুতো বোনের কাছে বেড়াতে গেছে। মায়্যু-গিন্নী অবশ্য বলে—"মাসতুতো বোন না ছাই! ল্য ভোর‍্যুর ওই হুমদোমতো গোঁফওয়ালা ওভারম্যানটা! মাগীর চোখের চামড়া নেই গা! এই পরবের দিনে স্বামী আর বাচ্চাকে ফেলে কি না নাগরের সঙ্গে ফুর্তি করতে গেলি!"

এই যে খরগোশটা আজ কাটা হয়েছে, এটাকে গত এক মাস যাবৎ খাইয়েদাইয়ে মোটা করা হয়েছে। মাত্র গতকালই মাইনে পাওয়াতে আজ এর সঙ্গেও আছে পাঠার মাংসের স্যুপ আর গরুর মাংস। মাংস! আঃ ভাবলেও যেন জিভে জল আসে। কতদিন এমনি ভালো ভালো খাবার বাড়িতে রান্না হয় না। বুড়ো ঠাকুর্দা যার কিনা দাঁত পড়তে শুরু করেছে—সে থেকে শুরু করে সবে দাঁত উঠতে থাকা বাচ্চা

এস্তেল পর্যন্ত—দশ জোড়া চোয়াল কমবেশী শব্দ করে মাংস খেতে ব্যস্ত। রাতের জন্য সেদ্ধ করা অল্প খানিকটা গরুর মাংস রাখা থাকবে—দরকার বুঝলে রুটির সঙ্গে খেয়ে নেওয়া যাবে।

জ'ল্যা প্রথমে বেরিয়ে গেল। স্কুলের পেছনে বেবের ওর জন্য অপেক্ষা করবে। দু'জনে মিলে তারপর যাবে লিডির কাছে—বুড়ি দিদিমাটা তো শকুনির মতো ওৎ পেতে থাকে—নাতনী বেরোলে যদি ওকে ঘরে থাকতে হয়। আরে, লিডির পেছনে দৌড়নো কি সোজা কথা! বুড়ি চিল চিৎকার করে বাড়ি মাথায় করছে, লিডি ঠিক পেছনের দরজা দিয়ে চোঁ-চাঁ দৌড় মেরেছে। বচ্ছরকার দিনে এত ঝুটঝামেলা পিয়েরোঁর পোষায় না। শিস দিতে দিতে বেরিয়ে পড়ল।

মায়্যর বুড়ো বাপ হাঁটতে লাগল মেলার দিকে। মায়্যর ধান্দা ছিল বউয়ের সঙ্গে কোথাও দেখা করে একসঙ্গে যাবে। কিন্তু এতগুলো ছানাপোনাকে সামলে সে-ই বা বেরোয় কি করে।

মায়্য-গিন্নী বলল, তুমি রওনা হয়ে যাও, দেখি—পারলে তোমায় ঠিক কোথাও ধরে নেব।

রাস্তায় বেরিয়ে একটু দোনোমোনো করে লেভাকের দরজায় টোকা দিল মায়্য—যদি ও বেরিয়ে গিয়ে না থাকে, তবে একসঙ্গে হাঁটা যাবে।

ওখানে আবার জাশারী অপেক্ষা করছে ফিলোমিনের জন্য। দু'জনে একসঙ্গে বেরোবে। মায়্যকে দেখেই মাদাম লেভাক অভিযোগ-অনুযোগের ঝড় তুললো।

—আমি বুড়ি মেয়েছেলে, এখনও যদি অবিবাহিতা মেয়ের কাঁড়ি কাঁড়ি বাচ্চাকে সামলাতে হয় তবে তো নাজেহাল অবস্থা! মেয়েও তেমনি। উনি বিয়ে না করা ভাতারের সঙ্গে ফূর্তি লুটতে যাচ্ছেন। মায়্য-গিন্নীর মতলবটা তো ভালো ঠেকছে না। সারাজীবন এই সব এণ্ডিগেণ্ডির দায়িত্ব কি আমাকেই বয়ে মরতে হবে না কি! এই শেষ। বারবার এক কচকচি ভালো লাগে না।

চুপচাপ তৈরী হয়ে জাশারীর সঙ্গে দিব্যি বেরিয়ে গেল ফিলোমিন। মায়্যরই মুশকিল। সে বসতেও পারে না, উঠতেও পারে না। জাশারীটাও এমনি হতভাগা যে সব দোষ মায়ের ঘাড়ে দিব্যি চাপিয়ে দিল। বলে কি না 'মা রাজী হলেই হয়, আমি তো এখুনি বিয়ে করতে পারি।'

লেভাক বেরিয়ে গেছে। কোনোক্রমে দায়সারা জবাব দিয়ে বেরিয়ে এল মায়্য। ঘরের কোণে বুতলু স্যুপ খাচ্ছিল। সে কোথাও বেরোবে না। আহা রে, বশংবদ বেওয়ারিশ স্বামীটি! বসে বসে শুধু বিয়ে না করা বউয়ের তাঁবেদারি করা!

গ্রামটা আস্তে আস্তে খালি হয়ে যাচ্ছে। সবাই মঁসুর দিকে। ক্যাথরিন শাভালকে দেখে দৌড়ে বেরিয়ে এল। সব তরুণীরাই তাদের প্রেমিকের সঙ্গে। কোনো ঢাকঢাক গুড়গুড় নেই। বাচ্চাদের নিয়ে মায়্য-গিন্নী এখনও বাড়িতে। ঘর গুছিয়ে বেরোতে হবে। এসব কি আর একা হাতে সামলানো যায়!

...রের দোকানের দিকে হাঁটতে লাগল মায়্য। হ্যাঁ, ওই তো লেভাক,

দোকানের পেছনে বাগানটায় কতগুলো ছেলের মধ্যে ভিড়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে খেলছে। বোন্‌মর আর বুড়ো মুক্য হাঁ করে দেখছে। দোকানের সামনে ছাউনীটার নীচে এতিয়েন—একা একাই বীয়ার গিলছে। সুভারিনটা কি যে করে! এমন দিনে কি না ঘরের দরজা বন্ধ করে বই মুখে করে বসে আছে।

লেভাক মায়্যুকে বলল, কি দোস্ত, এক দান হবে নাকি?

মায়্যু বলল, না হে! বড় গরম।

এতিয়েন চেঁচালো।

—রাসন্যর, এদিকে এক পাত্তর দাও, আমি মায়্যুকে খাওয়াচ্ছি।

সকলের সঙ্গেই বেশ দহরম মহরম হয়ে গেছে এতিয়েনের। নীচু গলায় সে বলল, বুঝলে কর্তা, জায়গাটা ভালোই। এরা মানুষও ভালো। তবে কি না খাবার আর বীয়ার বড বাজে। এর থেকে কোনো পরিবারে যদি টাকা দিয়ে থাকতে পারতাম তো বেঁচে যেতাম।

মায়্যু ঘাড নাড়লো।

—তা ঠিক। তাতে তোমার এতটা কষ্ট হত না।

সবাই খেলায মত্ত। হঠাৎ দেখা গেল মুকেত হাসিমুখে উঁকি মারছে বেড়ার ওধার থেকে।

লেভাক বলল, কি রে ছুঁড়ি, একলা কেন? নাগর কই?

—আমার তো জোটেনি কেউ কপালে। দেখি যদি এখানে মেলে।

সবাই হো হো করে হেসে উঠল। চারদিকে ছেলেরা বুড়োরা নিজেদের হযে ওকালতিও করল কম নয়। বুড়ো মুক্য কিন্তু এত ফষ্টিনষ্টিতেও খেলার দিক থেকে চোখ সরায়নি।

লেভাক এতিয়েনের দিকে চোখের কোণে তাকালো।

—চালিয়ে যাও মুকেত। আরে, তোমার কাকে পছন্দ তা তো বুঝতেই পেরেছি' ও বড ছটফটে মুরগা। ঠিকমতো চেপে ধরে রাখতে পারবে তো?

এতিয়েন হেসে ফেলল। এটা খুবই পরিষ্কার যে সে-ই এইসব হাসিঠাট্টার মূল লক্ষ্য। মুকেত সত্যিই তার দিকে প্রশ্রয়ের ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে। এতিয়েন হাসিমুখে ভদ্রভাষায় প্রত্যাখ্যান করল আমন্ত্রণ। আসলে মুকেত তাকে মোটেই সেরকম ভাবে আকর্ষণ করতে পারে না। ঝোপের পেছনে চুপ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল মুকেত। তারপর হঠাৎই কেমন যেন গম্ভীর হয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে চলে গেল।

এতিয়েন আবার তার পুরনো কথার খেই ধরলো।

—অমি তো কিছুতেই বুঝতে পারছি না এতে এত চিন্তা করার কি আছে! একমাত্র পেনশন ছাড়া আমাদের ভবিষ্যতের ভাবনা ভাববার আর কোনো পথই তো কর্তৃপক্ষ বাতলায়নি। আমরা যদি একটা সাহায্য তহবিল নিজেদের গাঁটের পয়সা খরচ করে গড়েই তুলি তাতে তো কারও কোনো মাথাব্যথা থাকতে [illegible] না।

নিজেদের আখের সবাই গোছাতে চায়। আমরা মজুররা একে অন্যকে না দেখলে কি সেটা অনেক বেশী অন্যায় করা হবে না? দেখো, সংগঠনের অনেক কাজ আমি নিজে কাঁধ পেতে নেব।

মায়্যু ঘাড় নাড়লো।

—বুঝতে পেরেছি। আমি নিজে সম্পূর্ণ সমর্থনও করছি। কিন্তু আর সকলের মতটাও তো জানা দরকার।

লেভাক খেলায় জিতেছে। আরও খানিক বীয়ার গেলার ধান্দায় ছিল সে কিন্তু মায়্যু রাজী নয়। এখনও দিনের ঢের সময় পড়ে আছে, পরে খেলেও চলবে। পিয়েরোঁকে খুঁজে বের করা দরকার। সে গেল কোথায়! লেঁফাতে আছে হয়ত। এতিয়েন, মায়্যু আর লেভাক একসঙ্গে হাঁটতে শুরু করল।

রাস্তায় যেতে যেতে দু-চারটে শুঁড়িখানা পড়ে। সব জায়গাতেই চেনা মুখ। সবাই ডাকে। একসঙ্গে বীয়ার খেতেও বলে। খাওয়া মানেই দু পাত্তর। কারণ একবার খেলে তো ভদ্রতার খাতিরে আবার খাওয়াতেও হয়। লেঁফাতে গিয়ে পিয়েরোঁর দেখা মিলল। সুতরাং আবারও বীয়ার। তারপর চারজনে চলল জাশারীকে খুঁজতে। যদি তিসোঁর দোকানে তার দেখা মেলে। কিন্তু বিধি বাম। আবার পথ চলা, আর মাঝে মাঝে গলা ভেজাতে বীয়ার খাওয়া।

লেভাক হঠাৎ বলল, চলো, আমরা ভলকাঁতে যাই।

অন্যরা হাসল তারপর দ্বিধাগ্রস্তভাবে লেভাককে সঙ্গ দিল। রাস্তায় ভীড় বাড়ছে।

ভলকাঁর লম্বা সরু ঘরের একদিকে সরু কাঠের পাটাতন পেতে গান গাইবার মঞ্চ। অন্যদিকে ছোট ছোট টেবিলে খরিদ্দারদের বসবার ব্যবস্থা। অশ্লীল জামাকাপড় পরে, কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করে লিল-এর পতিতারা গান গেয়ে দর্শকদের সস্তা আমোদ দেয়। যদি কেউ এদের সঙ্গে নিরালায় কিছুটা সময় কাটাতে চায় তবে দশ সু দিতে হয়। নিতান্তই নীচু শ্রেণীর লোক আর যাদের ঘর ভেঙেছে তারা ছাড়া অবশ্য দশ সুর খদ্দের বড় একটা কেউ নেই। তবে অল্পবিস্তর সবাই আছে—মানে সব বয়সের—বুড়ো-হাবড়া থেকে শুরু করে গোঁফ ওঠেনি এমন সব বছর চোদ্দর ছোকরা পর্যন্ত।

টেবিলে বসেই এতিয়েন লেভাকের উদ্দেশ্যে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের উপযোগিতা সম্পর্কে বক্তৃতা করতে শুরু করল।

—বুঝলে, প্রত্যেক সদস্য যদি মাসে কুড়ি সু দেয়, তাতে নিশ্চয় কোনো অসুবিধে হবে না। চার-পাঁচ বছর এইভাবে সঞ্চয় করে গেলে তোমার হাতে একসঙ্গে বেশ কিছু অর্থ আসবে। দুর্যোগের দিনে এটা কি কম জরুরী? তুমিই বলো না?

অন্যমনস্ক গলায় লেভাক বলল, তা অবশ্য ঠিক। পরে একসময় এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে বরং।

আসলে একজন পৃথুলা বেশ্যা লেভাকের নজর কেড়েছে। মায়্যু আর পিয়েরোঁ উঠি-উঠি করছে। লেভাক হাত নাড়লো। তারা স্বচ্ছন্দে যেতে পারে, কিন্তু সে [illegible] না।

এতিয়েনও ওদেব সঙ্গে উঠে পড়ল। বাইবে বেরিয়েই আবার মুকেতের সঙ্গে দেখা। কি ব্যাপাব রে বাবা! মেয়েটা বুঝি তখন থেকে পিছু নিয়েছে। বড বড ভাবালু চোখ মেলে হাসল মুকেত। ভাবখানা এই : কি, আমাব সঙ্গে আসবে নাকি? এতিয়েন হেসে একটু ঠাট্টা করল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বাগী মুখে ভীড়ের মাঝে হারিয়ে গেল মুকেত।

পিয়েবোঁ বলল, শাভালকে দলে টানলে কেমন হয়?

মায্যু বলল, বেশ তো। ও বোধহয় পিকেত-এব শুঁড়িখানায আছে।

পিকেত-এব দোকানেব সামনে তুমুল হৈ-হল্লা হচ্ছে। জাশাবী ঘুঁষি পাকিয়ে একটা মোটাসোটা লোককে কি বলে যেন শাসাচ্ছে আর প্যান্টেব দু পকেটে হাত ঢুকিয়ে শাভাল তাই দেখছে।

মায্যু বলল, ঐ তো শাভাল, ক্যাথরিনেব সঙ্গে।

ক্যাথবিন আব তাব প্রেমিক অন্তত পাঁচ ঘণ্টা একনাগাড়ে হেঁটেছে। মঁসুর বড রাস্তা থেকে শুরু কবে অলিগলি কিছুই বাদ যাযনি। প্রখর সূর্যালোক। যেদিকে তাকাও, দেখবে দূব দূরান্ত থেকে সাব সার পিঁপড়েব মতো কালো কালো মানুষের মাথা শুধু। রাস্তাব দু ধাবেব মদেব দোকানগুলো উপচে পড়েছে।

মেয়েদের রেশমী রুমাল, আয়না আর প্রসাধনীব দোকান, ছেলেছোকরাদের জন্য টুপি, চাকু, এছাড়া মিষ্টি, বিস্কুট, রকমারি খেলনা—এ সব তো আছেই। গীর্জাব সামনে তীব ছোড়ার প্রতিযোগিতা দিব্যি জমে উঠেছে। অন্য একটা রাস্তার কোণে মোবগের লড়াইকে কেন্দ্র করে কিছু লোক দু দলে ভাগ হয়ে গিয়ে চিৎকাব করছে। মোরগগুলোর গায়ে পাতলা ছুরি বাঁধা। বুক কেটে রক্ত পড়ছে তবু ডানাব ঝটপটানি থামছে না। মেইগ্রার দোকানে চলছে বিলিযার্ড খেলা—জিততে পারলে মেয়েরা অ্যাপ্রন আব ছেলেবা প্যান্ট পাবে। চুপচাপ বসে বোতলের পর বোতল বীযার গিলছে, সে রকম লোকও নেহাত কম নেই।

ক্যাথরিনকে উনিশ সু দিয়ে একখানা আয়না আব তিন ফ্রাঁ দিয়ে মাথায বাঁধবার একটা রেশমী রুমাল কিনে দিয়েছে শাভাল। যতবারই দু'জনে মোড় ঘুরছে ততবারই বুড়ো মুক্যু আব ঠাকুর্দা বোন্‌মবেব মুখোমুখি। একবার আবার ক্যাথরিনেব চোখ পড়ল জ'লঁ্যাব ওপব—লিডি আর বেবেরকে নিয়ে জিনেব বোতল চুরি করছে। হাতেনাতে ধরতে পেরে জ'লঁ্যার কানটা আচ্ছা করে মুলে দিল ক্যাথরিন। ততক্ষণে লিডি একটা বোতল নিয়ে সটকে পড়েছে। নাঃ, এ হতচ্ছাড়াগুলোব জেলের ঘানি টানা ছাড়া কোনো গতি নেই।

শাভালের হঠাৎ মনে হল একটা জাযগায গানেব প্রতিযোগিতা হচ্ছে—সেখানে তবে ক্যাথরিনকে নিয়ে যাওয়া যাক। সমস্ত জায়গাটা জুড়ে ভীষণ হৈচৈ, চেঁচামেচি —প্রতিযোগিতা চলছে। একটা নির্দিষ্ট সময়—এক ঘণ্টায একটা গান কে সবচেয়ে বেশীবার গাইতে পারে। বিশৃঙ্খলার চূড়ান্ত একেবারে।

ক্যাথরিনরা সেখানে পৌঁছবার খানিক পরেই জাশারী আর বিলোমিল এল।

সবাই একসঙ্গে দিব্যি বসেছে এমন সময় প্রতিযোগিতার আহ্বায়ক একটা চ্যাংড়া ছেলে বন্ধুত্ব করবার অছিলায় ক্যাথরিনের উরুতে চিমটি কাটলো। ক্যাথরিন চেঁচা-মেচির ভয়ে চুপটি করে ছিল কিন্তু জাশারী তো ছাড়ার বান্দা নয়, আর পড়বি তো পড় তার চোখেই পড়েছে। মাথা গরম হয়ে গেল জাশারীর।

—হারামজাদা, শুয়ারকা বাচ্চা। ও কে জানিস? আমার বোন। একটু দাঁড়া, তোর শখ আমি জন্মের মতো ঘোচাচ্ছি।

অনেকে দৌড়ে এল দু'জনকে ছাড়াতে।

শাভাল বলল, ছেড়ে দাও না ওকে। এটা তো আমার ব্যাপার। এসব সস্তা ব্যাপার নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।

মাহ্যু আর তার সঙ্গীরাও ইতিমধ্যে এসে হাজির হয়েছে। ক্যাথরিন আর ফিলোমিনের চোখে জল। দু'জনকেই সান্ত্বনা দিল মাহ্যু। চ্যাংড়া লোকটা গণ্ডগোলের ফাঁকে তাল বুঝে সট্‌কে পড়েছে। শাভাল আবহাওয়াটা হালকা করবার আশায় সকলের জন্য বীয়ার দিতে বলল। হালকা মনে সফেন বীয়ারের গ্লাসে চুমুক দিতে লাগল সবাই।

মুকে-কে দেখে জাশারী শাভালকে বলল, বুঝলে শাভাল, তুমি মেয়েদের দিকে একটু নজর রেখো। আমি মুকে-কে নিয়ে হতচ্ছাড়া ছোঁড়াকে একচোট মজা দেখিয়ে আসি।

জাশারীর কাণ্ডকারখানা দেখে মনে মনে মাহ্যু খুশিই হল। যাক, ছোকরার তাহলে বোনের জন্য দরদ আছে।

এবার মাহ্যু বীয়ার আনতে বলল। ফিলোমিনের আর কিছু ভালো লাগছে না এখন। জাশারী নিশ্চিত মুকে-কে সঙ্গে নিয়ে ভলকাঁতে ফুর্তি মারতে গেল।

এই সব মেলা-পরবের দিনগুলো শেষ হয় নাচ দিয়ে। দিস্তিব নামে এক বিধবা এই নাচের ব্যবস্থা করে। তার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি কিন্তু দেহের বাঁধুনী এমনই আঁটোসাঁটো যে এই বয়সেও আধ ডজন ছোকরা তার কৃপালাভে ব্যগ্র। সপ্তাহের ছ'দিনে ছ'জন তার সঙ্গলাভ করে আর রবিবার দিন ছ'জনই একসঙ্গে সঙ্গ পায় তার। গত তিরিশ বছর ধরে মহিলাটির শয্যাসঙ্গী হয়নি এমন একটি খনি-মজুরকেও বোধহয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। এটাও তার গর্ব যে প্রতিটি মেয়েই নাকি প্রথম তার আস্তানাতেই ইজ্জত খুইয়েছে। এর বাড়িতে দুটো ঘর—একটায় মদ খাবার ব্যবস্থা, অন্যটা নাচঘর। এই মেলা উপলক্ষ্যে সেটা রঙিন কাগজের শিকল আর ফুল দিয়ে সাজানো। নীচু ছাদ—সোজা হয়ে দাঁড়ালে প্রায় মাথা ঠেকে যায়। চারটে সেজবাতি—আবছা আলো-আঁধারির খেলা।

এই রবিবার বিকেল পাঁচটা বাজতে না বাজতেই নাচের আসর জমজমাট। বাইরে দিনের আলো তখনও মরে যায়নি। সাতটা আন্দাজ তো ঘরে তিল ধারণের জায়গা নেই। মাহ্যু, এতিয়েন আর পিয়েরোঁ বসে ছিল একটা টেবিলে, ক্যাথরিন আর শাভাল নাচছিল বাজনার তালে তালে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল ফিলোমিন।

অনেকবার বসতে বলা সত্ত্বেও সে বসেনি। জোড়ায় জোড়ায় মেয়ে পুরুষ নেচেই চলেছে। ফাঁকে ফাঁকে টেবিলের ধারে ফিরে এসে বিশ্রাম নিচ্ছিল ক্যাথরিন। মুকেত একটা নতুন ছোকরার সঙ্গে নাচছিল। যাক, শেষ পর্যন্ত মেয়েটা ঠিক একজন না একজন কাউকে জুটিয়ে নিয়েছে।

রাত আটটা আন্দাজ এস্তেলকে কোলে নিয়ে মায়্যু-গিন্নী হাজির হল। সঙ্গে সার বেঁধে আলজির, অঁরি আর লেনোর। সকলেরই পেট ভর্তি, ফাঁকে ফাঁকে বীয়ার আর কফি গেলা হয়েছে তো কম নয়। কাজেই রাতের খাবারের জন্য তাড়া নেই তেমন। অন্য মেয়েরাও এল একে একে। মাদাম লেভাক এল বুতলুর সঙ্গে। বুতলুর হাত ধরে ফিলোমিনের বাচ্চা দুটোও হাজির হয়েছে। মায়্যু-গিন্নী আর মাদাম লেভাক কি সুন্দর কথাবার্তা চালাচ্ছে, যেন দুটিতে কত ভাব। আসলে রাস্তায় আসতে আসতে ফিলোমিন আর জাশারীর বিয়ের ব্যাপারে কথা হয়ে গেছে। মায়্যুর বউয়ের খুব কষ্ট হচ্ছিল বিয়েতে মত দিতে, কে না জানে বিয়ে হলেই সংসারে ও আর একটি পাইপয়সাও দেবে না। কিন্তু কি-ই বা করা যায়। গিন্নী হয়েছে যখন, ওই কম আয়েই গুছিয়ে সংসার চালাতে হবে।

সে মাদাম লেভাককে বলল, এস, এই টেবিলে বসি।

মায়্যুদের ঠিক পাশের টেবিলটাতেই বসল দু'জনে।

লেভাকের বউ বলল, আমার কর্তাটি কোথায়?

—এই এসে পড়বে এখুনি।

দুটো টেবিল জুড়ে সবাই ঘেঁষাঘেঁষি করে বসল। আবার পানীয় আনতে বলা হল। মা আর বাচ্চা দুটোকে দেখে ফিলোমিনও একটা চেয়ার টেনে নিল। কি আনন্দ আজ। তার বিয়ের ফুল তাহলে শেষ পর্যন্ত ফুটলো।

কে যেন জিজ্ঞেস করল, জাশারী কোথায়?

নরম গলায় ফিলোমিন বলল, এসে পড়বে নিশ্চয়ই।

মায়্যু তাকালো তার বউয়ের দিকে। তার মানে সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। এক মনে পাইপ টানতে লাগল সে। এইভাবে ছেলেমেয়েগুলো বিয়ে করে একে একে পর হয়ে যাবে, তাদের বুড়োবুড়ির দিন গুজরান হবে কি ভাবে?

এখনও সবাই নাচছে। ঘেমে নেয়ে একাকার একেবারে, তবুও পা ওঠানামা করছে তালে তালে···

আস্তে আস্তে একসময় নাচ শেষ হল। শাভাল ক্যাথরিনকে নিয়ে টেবিলের দিকে এগোতে লাগল ভীড় ঠেলে।

মায়্যু-গিন্নীর কানে কানে মাদাম লেভাক বলল, মনে আছে, তুমি বলেছিলে ক্যাথরিন বোকার মতো কিছু করে ফেললে তুমি ওর গলা টিপে মেরে ফেলবে?

ক্যাথরিনের মা বলল, জানোই তো! এসব দেখলে মাথার ঠিক থাকে না। নিশ্চিন্ত ভরসার কথা এই যে ও কোনোদিনই মা হতে পারবে না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আমি মোটামুটি নিশ্চিন্ত। একবার ভাবো তো, ক্যাথরিনও ওই রকম বাচ্চা হয়ে

বিয়ে করে চলে গেলে আমাদের কি দুর্দশাটাই না হত। বাচ্চাগুলোর হাত ধরে পথে দাঁড়াতাম যে একেবারে।

মায়্যু নীচু গলায় তার বউকে বলল, আচ্ছা, এতিয়েনকে আমাদের ভাড়াটে হিসেবে রাখলে কেমন হয়? ওরও থাকবার, খাবার একটা ভালো জায়গা দরকার আর আমাদেরও টাকার দরকার। জাশারী যখন চলেই যাচ্ছে, তখন তো ঘরেরও অসুবিধে নেই।

মায়্যু-গিন্নীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে লুফে নিল কথাটা। ওঃ, ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। না খেয়ে মরতে হবে না শেষ পর্যন্ত। মনের আনন্দে আর একপ্রস্থ ঢালাও পানীয়ের আদেশ দিল সে।

এদিকে এতিয়েন এতক্ষণ ধরে প্রাণপণে পিয়েরেঁাকে বোঝাচ্ছিল প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের কথাটা। শেষ পর্যন্ত তার সম্মতিও আদায় করে নিল।

এতিয়েন বলল, দ্যাখো, যদি ধর, ধর্মঘটও হয় তাহলে এই তহবিল কত কাজে লাগবে বলো তো! তুমি তাহলে আসছো তো?

পিয়েরেঁার মুখ বিবর্ণ হল।

—ধর্মঘট? আমি বরং আর একটু ভাবি, বুঝলে? কি দরকার বাড়তি ঝুট-ঝামেলায় যাবার?

মায়্যু সুযোগ বুঝে এতিয়েনকে বলল তার বাড়িতে ভাড়াটে হিসেবে থাকার জন্য। এতিয়েন রাজী হয়ে গেল এক কথায়। আসলে সে গ্রামের মধ্যেই থাকতে চায়, যাতে খনি-মজুরদের জীবনযাত্রার সঙ্গে আরও গভীরভাবে পরিচিত হওয়া যায়। ঠিক হল, জাশারীর বিয়েটা হয়ে গেলেই সে মায়্যুর বাড়িতে চলে আসবে।

এমন সময় জাশারী, মুকে আর লেভাক এল। দেখেই বোঝা যায় ভলকাঁ থেকে আসছে। মুখে সস্তা মদের তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ—সদ্য বেশ্যাবাড়ি থেকে ফুর্তি করে আসা চেহারা। তিনজনেই আকণ্ঠ মদ গিলে মাতাল। নিজেরা গা টেপাটেপি করে হাসছে, গল্প করছে। নিজের বিয়ের কথা শুনে জাশারীর সে কি কান-ফাটানো হাসি! কেঁপে উঠল ফিলোমিন। তবু ভালো, জাশারী হাসছে। মাতাল হোক আর যাই হোক, কান্নার থেকে এই বরং অনেক ভালো। সবাই ফুর্তির মেজাজে আছে। আর একপ্রস্থ বীয়ার আনতে বলল লেভাক।

রাত প্রায় দশটা বাজে। অনেকের বউরা এসে স্বামীদের বাড়িতে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে। দুধের বাচ্চারা ঘুমিয়ে কাদা। ছোট ছেলেমেয়েরা, যাদের সবে হাঁটি-হাঁটি পা-পা, তারাও খেলতে খেলতে শ্রান্ত হয়ে টেবিলের তলায় শুয়ে পড়েছে। ঘরে শুধু বীয়ারের স্রোত, মদের ফোয়ারা যেন। সবাই হাসছে, হৈ হৈ করছে। গরমে প্রাণ আইঢাই—এতগুলো লোক এক জায়গায় তো! ছেলেরা জামাটামা খুলে দিব্যি আরাম করে বসেছে। কমবয়েসী ছেলেমেয়েরা এই অন্ধকারে ফুর্তির জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়েছে—যথেচ্ছাচার চলছে পুরোদমে।

বাইরে থেকে এসে একজন পিয়েরেঁাকে খবর দিল যে তার মেয়ে লিডি বাইরে

ফুটপাতে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। আরে হবে না? চুরি করে যা মদ গিলেছে ঐটুকু মেয়েটা—তাকে কাঁধে করে বয়ে বাড়ি নিয়ে যেতে হবে এখন। পেছনে জ'ল্যাঁ আর বেবের চোরের মতো হাঁটছে—এদিকে মনে ভাবটা এমন যেন বিরাট কিছু একটা করেছে। একে একে সবাই বাড়ির পথ ধরেছে। মায়্যু আর লেভাকরা একসঙ্গে যাবে। বুড়ো ঠাকুর্দা আর মুক্যও বাড়ির পথে রওনা দিয়েছে। পুরনো দিনের স্মৃতিতে দু'জনের মনই ভাবাক্রান্ত। এইবারের মতো মেলা শেষ। ভাঙা হাট, এবার ঘরে ফেরার পালা। কাল থেকে আবার সেই পুরনো জীবন, দুঃখের দিন। নিজেদের মধ্যে গল্প করতে করতে সবাই গ্রামের পথ ধরেছে। এই উৎসবের রাত কতজন কুমারী মেয়েকে গর্ভবতী করল কে জানে! মায়্যুরা ভালো করে খেতেই পারলো না রাতে। সবাই ঘুমে ঢুলছে। থাক গে, মাংসটা কাল সকালে খাওয়া যাবে।

এতিয়েন শাভালকে নিয়ে রাসন্যরের দোকানে গেল শেষবারের মতো এক পাত্র বীয়ার খাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে।

—এতিয়েন, আমার নামটা তোমার তহবিলের তালিকায় লিখে রাখো। তুমি কত ভালো!

চকচক করে উঠল এতিয়েনের চোখ দুটো।

শাভাল বেশ জোরের সঙ্গেই বলল আবার, এস দোস্ত, আমরা হাত মেলাই। মদ, মেয়েমানুষ—কোনো নেশাই রাখব না আর। রক্তে দোলা দিয়ে যায় শুধু একটাই চিন্তা, চোখে ভাসে শুধু একটাই সোনালী স্বপ্ন—কবে আমরা এইসব পুঁজিবাদী দালালদের ধ্বংস করে দিতে পারব।

* * * *

আগস্ট মাসের মাঝামাঝি মায়্যুর বাড়িতে চলে এল এতিয়েন। জাশারী ইতিমধ্যে বিয়ে করে বউ আর বাচ্চাদের নিয়ে নতুন বাড়িতে উঠে গেছে। এতিয়েনের শুধু একটা বিষয়েই অস্বস্তি হত—সর্বক্ষণ ক্যাথরিনের উপস্থিতি।

এখন ঘনিষ্ঠতা অনেক বেড়েছে। একই ঘরে পাশাপাশি অন্য একটা খাটে ক্যাথরিন আর আলজিরে ঘুমোয়। জামাকাপড় ছাড়া বা পরার জন্য আলাদা বন্দোবস্ত বা আব্রু নেই কিছু। ক্যাথরিনের অনাবৃত বাহুমূল, সাদা শাঁখের মতো শরীরের গোপন অংশগুলো—যা এতদিন এতিয়েনের চোখের আড়ালে ছিল, আজ বিভ্রম ঘটায়। এতিয়েন চেষ্টা করে চোখ সরিয়ে নিতে, অন্যদিকে মনঃসংযোগ করতে তবু অবচেতন মন ফিরে দেখতে চায় অতি আকাঙ্ক্ষিত দৃশ্যগুলো। ক্যাথরিনের প্রায় অনাবৃত উরু, সুডৌল স্তনের অস্পষ্ট আভাস এতিয়েনের রক্তে নেশা ধরিয়ে দেয়। ক্যাথরিনও কি এ সব বোঝে না? সে তো আপ্রাণ চেষ্টা করে নারীসুলভ অস্বস্তিকে ঝেড়ে ফেলে খুব তাড়াতাড়ি পোশাক পরে তৈরী হয়ে নিতে। রাত-পোশাক পরেই শশব্যস্তে কোনো দিকে না তাকিয়ে বিছানায় চলে যায়। ততক্ষণে হয়ত এতিয়েনের জুতোটাও ছাড়া হয়নি। তবে ক্যাথরিন এখন বড় হয়েছে—সে ওপরে স্নান করে, অন্য সব পুরুষেরা নীচে।

তবে একটা কথা ঠিক, ক্যাথরিন এতিয়েনের সম্বন্ধে কখনই কোনো অভিযোগ করতে পারেনি। এতিয়েনের চোখ দুটো সময় সময় বিশ্বাসঘাতকতা করলেও শরীরটা কিন্তু সব সময় বিশ্বস্ত থেকেছে। কঠোরভাবে তার মনকে সে শাসন করেছে—এসব অনুচিত। শুধু পাশের ঘরে ওর বাবা-মা আছে বলেই নয়, সে কেন নিজের কাছে এত ছোট হবে? ক্যাথরিন তার সহকর্মিণী, বন্ধু—কিন্তু এই পর্যন্তই। সব ছাপিয়ে সে যে একজন নারী—সেই সোনালি সুখটুকু, কাঙ্ক্ষিত উপলব্ধিটুকু না হয় অন্য কোনো জন্মের জন্য তোলা থাক।

মাসখানেক কেটে যাবার পর সম্পর্ক আস্তে আস্তে অনেক সহজ হয়ে এল। ক্যাথরিন আর এতিয়েন পাশাপাশি থেকেও এখন অনেক সহজ, স্বাভাবিক। তারা কোনো রকম সঙ্কোচ না করেই জামাকাপড় বদলাতে পারে। ক্যাথরিনের অভ্যেস ঘুমোবার আগে পাতলা রাত-পোশাক পরে, জামাটা হাঁটু অবধি গুটিয়ে চুল বাঁধা। আজকাল এতিয়েন দিব্যি নীচু হয়ে তার হারিয়ে যাওয়া ক্লিপগুলো খুঁজে দেবার কাজটাও করে।

দু'জনেই শান্ত মনে অবস্থাটা মেনে নিয়েছে। এ ছাড়া উপায়ই বা কি! একটা ঘরে এতজন উঠতি বয়সের ছেলেমেয়ে থাকতে গেলে একটু অসুবিধে তো হবেই। দু'জনেই মনের রাশ টেনে রেখেছে শক্ত হাতে, তবু কে জানে কেন মাঝে মাঝে শিথিল হতে মন চায়। ক্যাথরিনের শরীর, যা অনেকবার দেখে দেখে চোখে পুরনো হয়ে গেছে—আজও তার রক্তে জাগায় মাদলের সুর। দু হাতে কঠোর নিষ্পেষণে ওর ছোট্ট পাখির মতো দেহটা বুকের সঙ্গে মিশিয়ে গুঁড়িয়ে দিলে যেন এতিয়েনের আশা মেটে। রোজকার অভ্যেসমতো এক ফুঁয়ে মোমবাতিটা নিবিয়ে দিয়ে অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে ক্যাথরিন ভাবে, কেমন করে একশোবার দেখা একজন পুরুষকে আজও নতুন করে চোখে পড়ে ওর? পরের দিন দু'জনেরই মন আর মুখ ভার হয়ে থাকে, কেউই যেন আর সহজ হতে পারে না।

এমনিতে এতিয়েনের যে থাকা-খাওয়া নিয়ে খুব অসুবিধে হচ্ছে, তা নয়। শুধু জঁল্যার শোওয়াটা এত বিশ্রী—কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে শোয়। তাছাড়া বাকি বাসিন্দারা ভালোই। আর মায়্যু বড় নাক ডাকে। সব দিক বিচার করলে আগের থেকে সে এখানেই বরং অনেক ভালো আছে। মাসে একবার বিছানার চাদর পাল্টানো হয়, খাবারের স্বাদও ভালো তবে মাংসটাংস মেলে না। অবশ্য পঁয়তাল্লিশ ফ্রাঁ ভাড়ায় রোজ রোজ মাংস জুটবে, এই বাজারে এটা তো আশা করাই অন্যায়। এই পঁয়তাল্লিশ ফ্রাঁ পেয়ে মায়্যুদের যথেষ্ট সাহায্য হচ্ছে। বস্তু-গিন্নী বাড়তি কাজও করে দেন কিছু কিছু যেমন এতিয়েনের জামাকাপড় কাচা, বোতাম সেলাই করা। আসলে অনেকটা নিজের বাড়ির মতোই পরিবেশ।

এতিয়েনের মাথায় বিপ্লবের পোকাটা আবার ঢুকেছে। মন চায় গতানুগতিক জীবন যাপনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সোচ্চার হতে, সব কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে [illegible] তাকে মদত দেবে তেমন সৈনিক কই, হাতিয়ারই বা কই! এর জন্য

নানান বইপত্রও পড়া দরকার। এই প্রথম এতিয়েনের আফসোস হল মন দিয়ে লেখাপড়া শেখেনি বলে। পাগলের মতো বিভিন্ন ধরনের বই আর পত্র-পত্রিকা পড়তে লাগল সে। প্লুশার ইতিমধ্যে সমাজসংস্কারক বিপ্লবী হিসেবে দিব্যি নাম করে ফেলেছে। ওর সঙ্গে এতিয়েনের নিয়মিত যোগাযোগ হচ্ছে চিঠিপত্রে। খনির মজুরদের জীবন-যাত্রা, তাদের অসুখবিসুখ—বিশেষ করে যে যে রোগগুলো খনি এলাকার বসতিকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দেয়, ইত্যাদি বিষয়ের ওপর কোনো বই পড়তে এতিয়েন বাদ দেয় না। নানা জায়গা থেকে প্রকাশিত সন্ত্রাসবাদী পত্র-পত্রিকায় তার ঘর ভরে উঠল। সে স্বপ্ন দেখে এক অনাগত ভবিষ্যতের, যেদিন পৃথিবীতে শুধুমাত্র দ্রব্য-বিনিময় প্রথা চলবে, টাকাপয়সার প্রয়োজন থাকবে না। এই প্রথম তার ভালো লাগছে—সে যেন নতুন করে চিন্তা করতে পারছে। গঠনমূলক কাজ যে খুব একটা কিছু করতে পারছে তা নয়, তবে যেদিন অবহেলিতের বুকচাপা কান্নার অনুরণন আকাশে বাতাসে আর শোনা যাবে না, সব মানুষ সমান অধিকার আর মর্যাদা পাবে—সেই সূর্যালোকিত দিনের প্রত্যাশায় তার মন সম্পূর্ণ প্রস্তুত। কি ভাবে সংগঠনের পরিকল্পনা করা যায়, এই চিন্তাতেই সে বিভোর। ঠিক কোন পথে বিপ্লব আসবে তা সে জানে না, সংগ্রাম অহিংস হবে না রক্তক্ষয়ী—তাও না, এখন শুধু সুযোগের অপেক্ষা।

প্রতি রাতে খাবার সময় মায়্যুদের খাবার টেবিলে আধঘণ্টা এই নিয়ে কথা হয়। এতিয়েন নিজে নানান বইপত্র পড়ে এখন স্বস্থ হয়েছে। এই গোঁয়ার মূর্খ খনি-মজুরদের মাথায় যে কেন কথাগুলো এত দেরিতে ঢোকে তাই সে বুঝতে পারে না। এইভাবে স্রোতে গা ভাসিয়ে, গরু ভেড়ার মতো জীবন যাপন করাটা কি চূড়ান্ত অপমানের নয়? উদয়াস্ত হাড়ভাঙা খাটুনি, দিনের শেষে নামমাত্র খাবার আর বছর বছর অপোগণ্ড ছেলেপুলের জন্ম দেওয়া ছাড়া এরা কি কিছুই শেখেনি?

মায়্যু বলে, ঈশ্বর তোমার সহায় হোন। সত্যি, আরও টাকাপয়সা ধরো যদি হাতে পাই, জীবন কত সুখের হবে। কিন্তু তার জন্য এত খেয়োখেয়ির কি দরকার? দিন আনি, দিন খাই, চলে তো যাচ্ছে ঠিক।

ব্যস্, তর্ক শুরু হয়ে যায়। এতিয়েন কিছুতেই মাথা ঠিক রাখতে পারে না। তেল পুড়ে পুড়ে বাতির চিমনি কালো হয়ে যায়, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে তবু কথা থামে কই? সে উত্তেজিত হয়ে সকলকে বোঝাতে চায় যে এই রকম মালবোঝাই বলদের মতো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা আর চাবুক খাওয়া—একে বেঁচে থাকা বলে না। জীবনকে উপভোগ করতে হয়, নিজের রুটি নিজেকে ছিনিয়ে আনতে হয়—এটা প্রত্যেক মানুষের জন্মগত অধিকার। জীবন ধারণের জন্য দুর্নীতির সঙ্গে আপোষ করা অনুচিত। কেউ এ সংসারে অন্যের জন্য ভাবে না। নিজের আখের নিজেকে গুছিয়ে নিতে জানতে হয়।

মায়্যু-গিন্নী বলে, সব চেয়ে মর্মান্তিক ব্যাপার কি জানো, এই যে এত কথা বলছো, তুমিও কিন্তু বোঝো যে এই পরিবর্তনটা সম্ভব নয়। যখন বয়েস কম থাকে, রক্তের জোর থাকে—তখন বড় বড় কথা বলা সহজ, বিপ্লব করা সহজ, স্বপ্নও দেখা যায়

সুন্দর ভবিষ্যতের কিন্তু দিনগুলো কেটে যায় যান্ত্রিকভাবে। বয়েস বাড়ে, নির্বিকার হয়ে যায় মানুষ, নতুন কিছু করার আর উৎসাহ থাকে না।

সবাই চুপ করে থাকে। এত বড় সত্যি কথার কি কোনো উত্তর হয়? বুড়ো ঠাকুর্দা শুধু অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। কই, তার সময়ে তো এত অভিযোগ, অনুযোগ ছিল না? তারা তো খুশী মনেই মালিকের পায়ের তলায় বসে কুকুরের মতো ল্যাজ নেড়েছে। বংশপরম্পরায় তারা কয়লার আস্তরণের মধ্যে জন্মেছে, বড় হয়েছে, সংসার করেছে আবার মরেও গেছে। তা নিয়ে কেউ তো মাথা ঘামায়নি। বুড়ো বিড়বিড় করে বলে, 'যারা মালিক তারা মালিকই থেকে যাবে। যত খারাপই হোক না কেন, তারা আমাদের দু'বেলা রুটি দিচ্ছে। ছি ছি, এত নেমকহারামি ভালো নয়।'

ব্যস্! এতিয়েনের মাথায় যেন আগুন জ্বলে যায়। এত দূর! মজুরদের কি একটু চিন্তা করবার স্বাধীনতাটুকুও নেই? এই জন্যই তো পুরো সমাজটার ঘুণধরা মেরুদণ্ডটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। আগে খনির শ্রমিকরা থাকত জন্তুর মতো। তারা শুধু কয়লা তোলার যন্ত্র বই আর কিছু নয়। খাদের নীচে থেকে থেকে বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল তারা। চোখ কান সব বন্ধ—শুধু অজ্ঞানতার নিকষ কালো অন্ধকার। ওপরতলার ধনী সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে দরাদরি করে, ওজন করে এইসব মানুষ নামধারী শ্রমিকগুলোকে কিনে নিত—কশাই যেমন পরখ করে পাঁঠা কেনে। কিন্তু এখন তো তা নয়। সকলের ঘুম ভাঙার, চোখ মেলবার সময় এগিয়ে এসেছে—বীজ থেকে নতুন অঙ্কুরোদ্গম হবে এবার, তারপর একদিন সোনালী শস্যের মতো পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে মানুষ, ধ্বংস হবে পুরনো চিন্তাধারা আর সেই ভাঙাচোরা স্তূপের ওপর গড়ে উঠবে নতুন মায়াবী পৃথিবী। সবাই তো নাগরিক অধিকারে বলীয়ান, সকলের ধমনীতেই একই রক্ত—তবুও কেন এই বৈষম্য? বড় বড় বুলডোজার দিয়ে সব কিছু ধ্বংস করে দেবার চেষ্টা করা যায় মাত্র। কিন্তু মরে যেতে যেতেও অবহেলিত মানুষ দু হাত মুষ্টিবদ্ধ করে আকাশের দিকে তুলে দেবে বিচারের আশায়। শুধু সবাইকে একজোট করা বাকি। বুড়োরা অবশ্য এ বিপ্লবে সামিল হবে না, কিন্তু একটি প্রৌঢ়, যুবক বা কিশোরও বাদ থাকবে না। আমরা শক্ত হাতে হাল ধরবো দুনিয়ার। একজন দু'বেলা পেট ভরে খেতে পেলে আর পাঁচজনও পাবে। আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়বে বিপ্লবের ইশারা, নতুন লাল সূর্য রাঙিয়ে দেবে চতুর্দিক।

মায়্যুর মন এইসব চিন্তায় গভীরভাবে সায় দেয়। কিন্তু সে ঘোর সংসারী আর বাস্তববাদী।

—দেখো এতিয়েন, যেই তুমি এই সব শুরু করবে, অমনি ওরা তার বিরুদ্ধে যাবতীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে। আমরা খনি-মজুরেরা শুধু গায়ের রক্ত জলই করে যাবো, বিনিময়ে পাবো না কিছুই—এটাই তো রীতি!

মায়্যু-গিন্নী এতক্ষণ চুপ করে ভাবছিল। হয়ত বা স্বপ্ন দেখছিল রঙিন বসন্তের। সে বলল, যদি কখনও এমন হত যে পরের জন্মে গরীবেরা বড়লোক হয়ে জন্মাতো...

হেসে উঠল সবাই। বাচ্চারাও কাঁধ ঝাঁকালো গম্ভীরভাবে—বাইরের কঠিন রুক্ষ জগৎ তাদের অনেক সহনশীল আর পরিণতমনস্ক হতে শিখিয়েছে। 'স্বর্গসুখ' শব্দটা এখন বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজের মতোই কানে ঠেকে।

মায়্যু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল, দূর, এসব বোকা বোকা কথা ধর্মযাজকদের মুখেই মানায়। ওদের মাথায় ছিটেফোঁটা ঘিলু থাকলে একটু কম খেয়ে আর বেশী পরিশ্রম করে অন্তত স্বর্গে যাবার পথটা প্রশস্ত করতে পারতো। আমরা জন্মেছি, এইভাবেই জীবন কাটাবো, মরে যাবো। পরের জন্মেও আবার যে কে সেই। বুঝলে?

মায়্যুর বউ বুকভরা শ্বাস নিল একটা।

—হা ভগবান। তাহলে আমরা কিসের আশায় বেঁচে থাকব?

প্রত্যেকে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকিয়ে, হতবাক। বুড়ো ঠাকুদা থুথু ফেলল রুমালে। মায়্যু ভুলে গেল যে তার পাইপটা নিভে গেছে। আলজির বসে ছিল চুপটি করে। লেনোর আর আঁরি ঘুমিয়ে পড়েছে। কাথরিন চিবুকে হাত রেখে বড় বড় চোখে তাকিয়ে ছিল এতিয়েনের দিকে। চারপাশে সব নিস্তব্ধ। গ্রামের সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে একে একে। মাঝে মাঝে বাচ্চার কান্না, মাতালের চিৎকার আর দেওয়াল-ঘড়ির টিকটিক শব্দ। বদ্ধ ঘরে গুমোট আবহাওয়া ছাপিয়ে প্রত্যেকের শিরদাঁড়া বেয়ে হিমশীতল স্রোত নেমে যাচ্ছে

এতিয়েনের গলার স্বরে নিস্তব্ধতা ভাঙলো।

—তোমাদের এই ধারণাটাই বাজে ভগবানের কাছে স্বর্গসুখ চাও কেন? মাটির পৃথিবীতে নিজেরা নিজেদের সুখের সন্ধান করতে পারো না?

এতিয়েন কথা বলেই চলল। হঠাৎ সেই অন্ধকার দিগন্ত বিদীর্ণ করে ফুটে উঠল নতুন ঊষার আলো। নিঃসীম দারিদ্র্য, পশুতুল্য পরিশ্রম আর বর্বরতা, দুঃখ—সব কিছু উধাও হল এক নিমেষে। লালচে সোনালী নরম আলো ধীরে ধীরে প্রখর হতে শুরু করল—আরও, আরও উজ্জ্বল হয়ে ভাসিয়ে দিল পৃথিবীকে। চোখের সামনে খুলে গেল অনাবিষ্কৃত স্বপ্নলোকের দরজা। সাম্য আর ভ্রাতৃত্বের মহান সাম্রাজ্যের দরবারে শুরু হল সুখদুঃখের বিচার, প্রতিষ্ঠিত হল নতুন মায়াময় জগৎ, যেখানে সবাই নিজের সুখ ভাগ করে দেয় সবাইকে, অন্যের দুঃখের ভাগ নেয়। আরও সুন্দর, মধুময় আর রঙিন হয় পৃথিবী—সেই অসম্ভব সম্ভব হয় এতদিনে।

প্রথমে মায়্যুর বউ এত কথা শুনতে চায়নি খুব সুন্দর কিছুর কামনা করা ঠিক নয়। স্বপ্ন বড় তাড়াতাড়ি ভেঙে যায়। তারপর রূঢ় বাস্তবকে আরও কঠিন বলে মনে হয়, বেঁচে থাকা দুষ্কর হয়ে ওঠে। সব কিছু ধ্বংস করে ফেলতে ইচ্ছে করে সেই স্বপ্নের সুখটুকুর সন্ধান পেতে, কিন্তু মরীচিকা ধরা দেয় কই? সে দেখল তার স্বামী ফাঁদে ঠিক পা দিয়েছে। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল তার।

চিৎকার করে বলে উঠল, ওগো, তুমি ওর কথা শুনো না। এ যে সর্বনেশে স্বপ্ন। ও তো পরীর দেশের গল্প বলছে তোমাকে!

কিন্তু আস্তে আস্তে সে-ও সম্মোহনের মায়াজালে জড়িয়ে পড়তে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যে তার চোখেও এসে পড়ল নতুন সূর্যের চোখ-ধাঁধানো আলো—তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল সেই বুকভরা আশা আর ভালোবাসার জগতে। কি যে ভালো লাগে অন্তত খানিকক্ষণের জন্যও দুঃখ কষ্ট সব ভুলে থাকতে! এই যে জন্তুর মতো বেঁচে থাকা, মাটিতে মুখ গুঁজে লাথি খাওয়া—এ সবের মাঝে তবু তো কোথাও আছে সেই মাটিরই বুক থেকে উঠে আসা সোনালী ফসলের গন্ধ! সুষম বিচার হবে যেদিন …মায়্যুর বউ অধীর হয়ে উঠল।

—তুমি ঠিক বলেছ এতিয়েন। সত্যি কিছুকে স্বীকার করে নেবার জন্য কেউ যদি আমায় টুকরো টুকরো করে কুকুরের সামনে ফেলে দেয়, তাতেও আমি পিছপা হব না। সব কষ্ট আর লাঞ্ছনার শেষে সুদিন তো আসবেই।

মায়্যু উজ্জ্বল হল এক মুহূর্তেই।

—ঠিক কথা। যেদিন আমি বুকভরা শ্বাস নিতে পারব, শুধু সেদিনের জন্য আমি একশো সু খরচ করতেও রাজী আছি। তার আগে যে আমি মরেও শান্তি পাবো না। কবে আসবে সেই দিন? আমরা কি ভাবে গড়ে তুলবো নিজেদের?

এতিয়েন আবার কথা বলতে শুরু করল। 'একটু একটু করে চারদিকে ভাঙন শুরু হয়েছে। পুরনো নিয়ম আর বেশীদিন চলবে না। বড় জোর কয়েক মাস।' নানান বইপত্র ঘেঁটে সে এই বিপ্লবের কথা জানতে পেরেছে। বিভিন্ন খাপছাড়া তথ্য জানাতে শুরু করল এতিয়েন। আসলে যারা শুনছে তারা এতই অজ্ঞ যে যাই বলা হোক না কেন, বিশেষ কিছুই যায় আসে না। 'শ্রেণীবৈষম্য ঘুচে যাবে একদিন। বিপ্লব এঁকে দেবে শান্তির চুম্বন প্রত্যেকের কপালে…'

মায়্যুরা সকলে অন্ধবিশ্বাসে মেনে নিল প্রতিটি কথা। তাদের নতুন পথে চলার, নতুন কথা ভাবার দিন এসেছে। ছোট্ট আলজিরও নিজের মতো করে স্বপ্নটা গড়ে নিয়েছে যেখানে শান্ত উষ্ণ একটা বাড়িতে সবাই মিলেমিশে থাকবে, আর ছোটদের জন্য থাকবে অপর্যাপ্ত খেলনা আর খাবার। ক্যাথরিন চুপ করে এতিয়েনের চোখে চোখ রেখে বসে ছিল। কথা থামতে সে একটু কেঁপে উঠল, ভয়ে বা আনন্দে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল মায়্যু-গিন্নী।

—কি সর্বনাশ! ন'টা বেজে গেছে! শীগগির শুয়ে পড় সবাই। কাল সকালে উঠতে হবে তো আবার।

মায়্যুরা সবাই এক মুহূর্তে স্বপ্নের জগৎ থেকে আছড়ে পড়ল রূঢ় কঠিন মাটিতে। ঝনঝন শব্দে চুরমার হয়ে গেল নতুন পৃথিবীটা। আবার কাল থেকে সেই দিনগত পাপক্ষয়। বুড়ো বোন্মর রওনা হল খনির দিকে। বাকিরা একে একে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। গ্রামের প্রতিটি বাড়ি গভীর ঘুমে অচেতন। সকলের শেষে মোমবাতি নিভিয়ে বিছানায় গেল ক্যাথরিন। এতিয়েন বিনিদ্র চোখে শুয়ে শুয়ে শুনতে লাগল তার অস্থিরভাবে এপাশ ওপাশ করার শব্দ।

প্রতিবেশীরাও মাঝে মাঝে এ ধরনের আলোচনায় অংশ নেয়। লেভাকের তো [illegible]তো আগ্রহ। পিয়েরোঁ এমনি শান্ত হয়ে শোনে কিন্তু মালিকপক্ষের সমালোচনা

শুরু হলেই সে উঠে চলে যায়। কখনও বা জাশারীও এসে দু-চার কথা শোনে, বসে—কিন্তু এসব রাজনীতির কচকচি তার ভালো লাগে না। তার থেকে এক পাত্তর বীয়ার খেলে কাজ দেয়। শাভাল রক্তাক্ত বিপ্লবে বিশ্বাসী। প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় এক ঘণ্টা কাটায় মাহ্যুদের বাড়িতে। বিপ্লবের কথা ছাড়াও অবশ্য তাতে ক্যাথরিনের ওপর ভালোমতো নজর রাখা যায়। আসলে ক্যাথরিন তার কাছে যথেষ্ট পুরনো হয়ে গেছে। কিন্তু এতিয়েন এখন সর্বদা কাছে কাছে থাকে তো, তাই বুঝি বা নতুন করে হারাবার ভয়।

এতিয়েনের কথার, চিন্তার প্রভাব ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ল গ্রামের প্রতিটি ঘরে ঘরে। সকলের মনেই নতুন উন্মাদনা। তার জনপ্রিয়তা বেড়েই চলল দিনে দিনে। সে মদ খায় না, জুয়া খেলে না, দিনরাত শুধু বইয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে আর মাসের শেষে নিয়মমাফিক ভাড়া মিটিয়ে দেয়। গ্রামের মেয়ে বউরা তাকে দিয়ে চিঠিপত্র লেখায়, সময়ে অসময়ে তার পরামর্শ নেয়।

সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সত্যি সত্যি প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা হয়ে গেল। প্রথমে অবশ্য খুব সীমিতভাবে কাজ শুরু করতে হল—শুধুমাত্র গ্রামের মজুরদের নিয়ে। কিন্তু আশা আছে অন্যান্য এলাকাগুলো থেকেও সাড়া মিলবে সকলে এতিয়েনকে কর্মসচিব হিসেবে নির্বাচিত করল। এমন কি এইসব কাজকর্ম করবার জন্য তার সামান্য কিছু মাইনেরও ব্যবস্থা হল। এতিয়েন এখন প্রায় বড়লোক। সে তো বিবাহিত নয়, আর অন্য কোনো নেশাও তার নেই কাজেই ইচ্ছে করলে টাকা জমাতেও পারে

এতিয়েনের চালচলনেও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন এল। সে হালফ্যাশানের কিছু জামা-জুতো কিনলো—সবাই তাকিয়ে থাকতে শুরু করল তার দিকে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে। সে যে এখন নেতৃত্ব দিচ্ছে মহান বিপ্লবের—গর্বে, আনন্দে বুকটা ভরে ওঠে তার। নিজের গমগমে গলার স্বরে, বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তায় নিজেই চমৎকৃত হয় দিনে দিনে নতুন উৎসাহে এগিয়ে চলার সাধ জাগে।

অক্টোবর মাস। বরফ পড়া শুরু হল শাকসব্জি কমে গেছে। শীতে হাত পা জমে যায়। আবার দুর্দিন শুরু হল। শীতকালটা এত কষ্টে কাটে।

এক রাতে বিছানায় চুপ করে শুয়ে ছিল এতিয়েন। তার ঘুম আসছিল না। দেখল ক্যাথরিন আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। খানিকক্ষণ কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। কিন্তু এতিয়েন জানে ক্যাথরিন ঘুমোয়নি। দু'জনেই দু জনের কথা ভাবছে, হয়ত বা চাইছেও পরস্পরকে—এত অস্থির তো আগে কখনও লাগেনি। দু-দুবার এতিয়েন ভাবলো ক্যাথরিনকে কাছে টেনে নেবে। বাচ্চারা সবাই গাঢ় ঘুমে অচেতন, চারপাশ চুপচাপ—অসুবিধে তো নেই কোনো। ও জানে ক্যাথরিনও ওকে মনে মনে চাইছে, একই রকম তীব্রতায়। সেই মূক আকুলতা মনে মনে টের পাচ্ছে এতিয়েন কিন্তু সে উঠে যেতে পারল না। ক্যাথরিনও বোবা হয়ে রইল। যন্ত্রই

দিন যাচ্ছে, দু'জন দু'জনকে বেশি করে চিনতে পারছে, চাইছে, ততই এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে দু'জনের মাঝে—সে বাধা বিনয়ের, ভদ্রতার, যন্ত্রণার।

* * * *

মায়্যু-গিন্নী তার স্বামীকে বলল, ওগো শুনছ, তুমি তো মাইনে আনতে যাচ্ছোই, ফেরার পথে এক পাউণ্ড কফি আর কিলোটাক চিনি কিনে এনো।

মায়্যু জুতোটা সেলাই করছিল। মুচির কাছে গেলেই তো আবার খানিক পয়সা নষ্ট।

—ঠিক আছে, নিয়ে আসব।

—ভেবেছিলাম, মাংসের দোকানেও যেতে বলব একবার, বহুদিন তো বাড়িতে ভালো খাওয়াই হয় না।

এইবার মায়্যু চোখ তুলে তাকালো।

—বলি, ভেবেছটা কি? আমি কি টাকার গাছ পুঁতেছি নাকি? যে কোনোদিন কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেলে তখন যে পেটে আর দানাপানি পড়বে না।

দু'জনেই চুপ করে রইল। অক্টোবর মাসের শেষ। খনির অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপের দিকে। কর্তৃপক্ষ যে কোনো সময় ছাঁটাই করে দিতে পারে। ভয়ে সবাই তটস্থ হয়ে আছে একেবারে।

মায়্যুর বউ বলল, হ্রাসন্তরের দোকানে এতিয়েন তোমার জন্য অপেক্ষা করবে বলেছে। ওকে সঙ্গে নিয়ে নিও। মাইনে আর বাজারের হিসেব ও তোমার থেকে অনেক চটপট করতে পারবে। তোমার তো সাধারণ হিসেব বুঝতেই ঘণ্টাখানেক সময় লেগে যায়।

মায়্যু মাথা নাড়লো। তার বউ বলে চলল, মালিকদের একবার তোমার বাবার কথাটাও বোলো। ডাক্তারটার সঙ্গে তো ম্যানেজারের সাঁট আছে। কি বাবা, আপনি তো এখনও কাজ করতে পারেন, তাই না? ডাক্তার জানেটা কি!

দশদিন যাবৎ বুড়ো বোনমর বাড়িতে বসা। তার নাকি পা চলছে না আর। কথাটা শুনে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠল সে।

—হ্যাঁ, কাজ আমি খুব করতে পারি।" পা দুটো একটু অকেজো হয়েছে বলে কি হাত পা গুটিয়ে বসে থাকব নাকি? ওরা তো এত কথা বলবেই, তাহলে যে আমার আর একশো আশি ফ্রাঁ পেনসন দিতে হয় না।

মায়্যুর বউয়ের মাথায় একটাই চিন্তা: বুড়ো চল্লিশ সু রোজগার করত, তা যদি বন্ধ হয়ে যায়! কাতর গলায় সে বলে উঠল, এইভাবে চললে তো এবার আমি মরেই যাবো!

মায়্যু নিরাসক্ত গলায় বলল, যদি মর, জানবে সেটাই অনেক ভালোভাবে বেঁচে থাকা। তখন তো আর খিদের জ্বালা থাকবে না।

জুতোয় কয়েকটা পেরেক ঠুকে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। দুশো চল্লিশ নম্বর [illegible]র সব বাড়িতেই এখন একই ধরনের ব্যস্ততা—কর্তারা মাইনে আনতে যাবে—

গিন্নীরা বারবার মাথার দিব্যি দিচ্ছে তাড়ির দোকানে না ঢুকে সোজা ঘরে ফিরে আসতে।

হ্রাসন্তরের দোকানে অপেক্ষা করছিল এতিয়েন। খবর ছিল তার কাছে। কোম্পানী কর্তৃপক্ষ নাকি কয়লা তোলার ব্যাপারে খুবই বিরক্ত। সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিতেই জরিমানা করা হচ্ছে। বারুদের স্তূপে এবার আগুন লাগল বলে। এইসব গণ্ডগোলগুলো বাইরের। আসল কারণটা অনেক—অনেক গভীরে শিকড় গেড়ে আছে।

এতিয়েন এসে বসবার পরই মঁসু থেকে মজুররা একে একে আসতে শুরু করল। ক্যাশিয়ারের অফিসে নাকি নোটিশ পড়েছে। সে নোটিশে যে কি লেখা আছে কেউই সঠিক বলতে পারছে না, একেকজন একেক কথা বলছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ যে কড়া রকম কিছু দাওয়াই দিচ্ছে এ কথা ঠিক।

একটা টেবিলে বসে চুপচাপ ধূমপান করছিল সুভারিন। তাকে গিয়ে ধরল এতিয়েন।

—কি হে, তোমার কি মনে হয়?

—ঠিক কি যে হবে, এখনই তা বলা মুশকিল। তবে এটা ঠিক যে কর্তৃপক্ষ তোমাদের জ্বলে ওঠার ব্যাপারে ইন্ধন যোগাচ্ছে। এও একরকমের চাল বলতে পারো।

সুভারিন আসলে খুব গভীর আর পরিষ্কারভাবে চিন্তা করতে পারে। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ চাইছে ছলছুতো করে মজুরদের ক্ষেপিয়ে তুলতে। এর জন্যই মাইনে কাটা, ছাঁটাই সব কিছু হচ্ছে। আর একবার এমনটি হলেই উপযুক্ত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তারা। গত দু মাস যাবৎ এ অঞ্চলের বহু কারখানা বন্ধ। ফলে কয়লার স্তূপ জমা হয়ে পড়ে আছে। কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে নতুন করে খনি চালু করবার অসুবিধার কথা ভেবে কাজ বন্ধ করতে দিতে রাজী নয়। কিন্তু মজুররা যদি ক্ষেপে গিয়ে ধর্মঘট করে, তাহলে তারা রাস্তার কুকুরের মতো না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরবে আর যে ক'জন বাঁচবে তারাও দিব্যি কম মজুরীতে কাজ করবে পেটের দায়ে। অতএব সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। এই প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ব্যাপারটাও গোলমেলে। এত কষ্ট করে এটা তৈরী হল, অল্প পুঁজি—যদি ধর্মঘট হয়, তবে এতে হাত পড়বেই আর ফাণ্ডের অবস্থা তো নামেই তালপুকুর, আসলে ঘটিও ডোবে না।

হ্রাসন্তর এতিয়েনের পাশে এসে বসল। দু'জনের চোখেমুখেই গাঢ় দুশ্চিন্তার ছায়া। ঘরে মাদাম হ্রাসন্তর ছাড়া কেউ নেই। ফলে নিজেদের মধ্যে স্বচ্ছন্দে কথা-বার্তা বলা যায়।

হ্রাসন্তর বলল, কি অদ্ভুত কাণ্ড দেখ। এইভাবে ধর্মঘট করে কোম্পানীরই বা লাভ কি আর মজুরদেরই বা ফায়দাটা কি! তার চেয়ে পারস্পরিক সমঝোতায় আসাই তো ভালো।

হ্রাসন্তর মানুষটাই এই রকম। সব সময় একটা মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করবার ধান্দা। আর এই যে ওর একদা ভাড়াটের এতটা প্রতিপত্তি, এটাও সে খুব ভালো

চোখে দেখে না। তার মতে বেশি বাড়াবাড়ি কোনো বিষয়েই ভালো নয়। অনেক কিছু একসঙ্গে চাইতে গেলে শেষ পর্যন্ত কপালে ফুটো পয়সাটিও জোটে না। আর এতিয়েনের উপদেশে মজুররা তার তাড়িখানায় গিয়ে তেমন ভীড়ও করে না। মদ খাবার গরজ কমে গেছে সকলের। তাই বাইরে লোক-দেখানো বন্ধুত্ব বা ভদ্রতা করলেও ভেতর ভেতর র‍্যাসনর হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছে। মাঝে মাঝে তো এতিয়েনের ওপর রাগের চোটে কোম্পানীর মালিকের পক্ষ নিয়ে দু-চার কথা শোনাতেও ছাড়ে না।

মাদাম র‍্যাসনর স্বামীর দিকে ফিরে তাকালেন।

—তুমি তাহলে ধর্মঘটের বিপক্ষে?

র‍্যাসনর বেশ জোরের সঙ্গে বলল, হ্যাঁ।

ভদ্রমহিলা এক দাবড়ানি দিয়ে থামিয়ে দিলেন স্বামীকে।

—থামো তো! তোমার মতো মেনীমুখো পুরুষমানুষ আমি জন্মে দেখিনি। মুরোদ নেই কানাকড়ির, খালি বড় বড় কথা। এঁরা তোমার চেয়ে ঢের বেশি বোঝেন, ওঁদের কথা বলতে দাও।

এতিয়েন বীয়ারের গ্লাসের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল।

—না মাদাম, না। উনি যা বলছেন, তার পেছনেও খানিকটা যুক্তি আছে। ধর্মঘটে নামার আগে আমাদের মাথা ঠাণ্ডা করে সব কিছু ভেবে দেখতে হবে। প্লুশারকেও ধর্মঘটের বিপক্ষেই বলতে পারেন, কারণ এতে দু'পক্ষের কারুরই তেমন লাভ হবে না। ও শুধু চায় সাধারণ মানুষ, নীচের তলার মানুষ নিজের অবস্থা সম্বন্ধে, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্পর্কে একটু সচেতন হোক। এই দেখুন না ওর চিঠি।

সত্যি কথাটা হল—প্লুশার এইসব মজুরদের দোনোমোনো ভাব দেখে খুবই হতাশ হয়েছে। এদের কোনোভাবে জাগিয়ে তোলাই তার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তা আর হচ্ছে কই? এদের একজনকেও আন্তর্জাতিক মজদুর ইউনিয়নের সদস্য করতে পারেনি এতিয়েন। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ব্যাপারে সে অবশ্য যথাসাধ্য গলাবাজি করেছে, আর মজদুররাও বেশ খুশিও হয়েছে। প্লুশারের এখন একটাই আশা—ধর্মঘটের ফলে ফাণ্ডের পুঁজিতে টান পড়বেই আর তখন সবাই ইউনিয়নে যোগদান করবে কারণ সব মজুরই একাত্ম হয়ে যাবে ততদিনে—প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দেবে।

র‍্যাসনর বলল, তোমাদের তহবিলে কত আছে?

—হাজার তিনেক ফ্রাঁও হয়ত নয়। আর জানো তো, মালিকরা সেদিন আমায় ডেকে পাঠিয়ে ঠারেঠোরে দিব্যি কথা শুনিয়ে দিয়েছেন। ভবিষ্যতের ভাবনা আমরা ভাবছি, এতে ওঁদের আপত্তি নেই কিন্তু ওঁরা চান এ ব্যাপারে ওঁদের হস্তক্ষেপ এবং মতামতই চূড়ান্ত হোক। কাজেই ঠাণ্ডা লড়াইটা আর আটকানো যাচ্ছে না।

শিস দিতে দিতে পায়চারি করছিল র‍্যাসনর। অবজ্ঞাভরে বলল, তিন হাজার ফ্রাঁ! এই পুঁজি নিয়ে বিপ্লব করা যায়? ধর্মঘট করলে তো ঐ সামর্থ্যে সকলের [illegible] রুটির খরচটাও উঠবে না। ফুঃ! এই অবস্থায় এসব ভাবাটাই মূঢ়তা।

এই প্রথম এতিয়েন আর হ্রাসন্তরের মধ্যে প্রকাশ্য মতবিরোধের সূচনা হল। দু'জনেই পুঁজিবাদের বিপক্ষে, তাই এতদিন পাশাপাশি থাকলেও ঠোকাঠুকি লাগেনি।

এতিয়েন রাগত স্বরে সুভারিনকে জিজ্ঞেস করল, আর তোমার বক্তব্যটা কি শুনি একবার ?

সুভারিন তার স্বভাবসিদ্ধ তাচ্ছিল্যে উত্তর দিল, ধর্মঘট ? এই রেস্ত নিয়ে ? ছোঃ!

তারপর মৃদু গলায় বলল, আসলে এভাবে তোমায় আঘাত করাটা হয়ত আমার উচিত হয়নি। ধর্মঘট হলে কিছু ধ্বংস হয়, সমাজের জঞ্জালও সাফ হয় বইকি কিন্তু সেই পরিবর্তনের গতি এত কম যে গোটা পৃথিবীটা বদলাতে হাজার বছর লেগে যাবে। এই যে নরকের কারাগারটায় এই মুহূর্তে তোমরা সবাই বন্দী, সারা পৃথিবীর জেগে ওঠার অপেক্ষায় না থেকে সেটাকে সবাই একসঙ্গে জোট বেঁধে উড়িয়ে দিতে পারে না তোমরা ?

সে দূরে ল্য ভোর‍্যর দিকে আঙুল তুলে দেখালো।

হঠাৎ 'পোলাণ্ড' নামের খরগোশটা খুবখুব করে দৌড়ে এসে তার পায়ের ফাঁকে মুখ গুঁজে থরথর করে কাঁপতে লাগল। বাইরের দুষ্টু ছেলেগুলো তাকে তাড়া করেছে। সুভারিন নরম হাতে আদর করতে লাগল পোলাণ্ডকে।

এই সময় দোকানে এসে ঢুকল মায়্যু। দাঁড়িয়ে এক পাত্তর টানার ফুরসত দিল না তাকে এতিয়েন। দু'জনেই ব্যস্ত পায়ে মঁসুব দিকে বেরিয়ে পড়ল।

মাইনে পাওয়ার দিনগুলোতে কোম্পানীর অফিসের সামনে দিব্যি মেলা বসে যায়। দোকানীরা পসরা সাজায়। বীয়ার আর কফির ফোয়ারা চলে। মজুররা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে অপেক্ষা করে—কখন ভেতরে ডাক পড়বে তার জন্য। কেউ কেউ পকেটের সব পয়সা তাড়ির দোকানে ঢালে। অনেক বুদ্ধিমান আবার সবটুকু নিয়ে ভলকাঁতে ছোটে বাজারের মেয়েমানুষের পেছনে।

মায়্যু আর এতিয়েন পৌঁছেই বুঝতে পারল হাওয়া গরম। অন্য বারের মতো গল্পগুজব হচ্ছে না। সবাই বিরক্ত, ক্ষুব্ধ। যা-তা গালিগালাজ শোনা যাচ্ছে।

মায়্যু শাভালকে নীচু গলায় জিজ্ঞেস করল, কি, অবস্থা খারাপ তাহলে ?

রাগে গরগর করছে শাভাল। একবার আড়চোখে তাকালো এতিয়েনের দিকে। এই উটকো লোকটা এসেই যত সর্দারি করতে শুরু করেছে। গ্রামসুদ্ধ লোক এর পা চাটে। রাগে গা জ্বলে যায় শাভালের। আর অদ্ভুত এক ঈর্ষাও কাজ করে তার মনের মধ্যে। ক্যাথরিনকে রোজ কথা শোনায় এই নচ্ছার ভাড়াটের সঙ্গে একঘরে রাত কাটানোর জন্য। কুৎসিত ইঙ্গিত করতেও ছাড়ে না।

মায়্যু শাভালকে জিজ্ঞেস করল, কি হে, এবার কি কর্তাদের কোপটা ল্য ভোর‍্যর ওপর এসে পড়বে ?

কাঁধ ঝাঁকিয়ে অন্যদিকে চলে গেল শাভাল। মায়্যু আর এতিয়েন চত্বরে এসে ঢুকল।

ক্যাশিয়ারের ঘরটা আয়তাকার। তাতে লোহার শিক দিয়ে ভাগ করা আছে।

জন্য পাঁচ-ছয় মজুর বেঞ্চিতে বসে। ক্যাশিয়ার আর তার সহকারী মাইনে দিচ্ছে একে একে মজুরদের ডেকে। বাঁ দিকের ধোঁয়াটে রংয়ের দেওয়ালে একটা হলুদ-রঙা নোটিশের কাগজ। দেখলেই বোঝা যায় সদ্য টাঙানো হয়েছে। সকাল থেকেই যারা আসছে, একবার করে দাঁড়াচ্ছে ওটার সামনে, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলে যাচ্ছে। দৃঢ়মনা দু'জন মানুষ এখন ওই নোটিশটার সামনে দাঁড়িয়ে। একজন তরুণ আর অন্যজন অকালবার্ধক্যে জর্জরিত। যুবকটি ঠেকে ঠেকে পড়তে চেষ্টা করছিল। ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন সেখানে জমায়েত হয়েছে।

মায়্যু বলল, একটু পড়ে শোনাও না!

এতিয়েন পড়তে শুরু করল। 'সমস্ত খনি অঞ্চলের যাবতীয় শ্রমিকদের কোম্পানীর তরফ থেকে জানানো হচ্ছেঃ টিম্বারিং-এর কাজে শ্রমিকদের গাফিলতি এবং শৈথিল্য লক্ষ্য করে এই মর্মে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে যে এবার থেকে নতুন পদ্ধতিতে বেতনক্রম নির্ধারিত হবে। আলাদা আলাদা ভাবে যে যেমন টিম্বারিং-এর কাজ করবে, মাথাপিছু হিসেবে সেইমতো মজুরী পাবে। প্রতি ঝুড়ি কয়লা তোলার মজুরী পঞ্চাশ সেন্টিম থেকে কমিয়ে চল্লিশ করা হল।' তারপর বিশাল এবং জটিল এক হিসেব দেখানো হয়েছে যে এইভাবে বেতন দিলে আগে যা দেওয়া হত তার সমানই দেওয়া হচ্ছে। তবে কাল থেকেই নয়, আগামী পয়লা ডিসেম্বর, সোমবার থেকে এই নিয়ম কার্যকরী হবে।

ক্যাশিয়ার চেঁচিয়ে উঠল।

—ওহে ছোকরা, এত চিৎকার করে পড়বার কি আছে? বলি, বাকিরা কি কানের মাথা খেয়েছে! তোমাদের আহাম্মকির জ্বালায় তো নিশ্চিন্তে কোনো কাজ করা যাবে না দেখছি!

এতিয়েন এ হেন মন্তব্যে কান না দিয়ে পড়েই চলল। তার গলা কাঁপছিল। সে থামলে পর সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল কাগজটার ওপর। সেই বুড়োটা আর যুবকটি, কে জানে কিসের জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল, এবার তারা বিধ্বস্ত অবস্থায় গুটিগুটি এগোল।

মায়্যু বিড়বিড় করল, ভগবান, কপালে আর কত দুর্ভোগ লিখে রেখেছো!

সে আর এতিয়েন বসে পড়ল। সামনে দিয়ে স্রোতের মতো বেতনভুক কর্মচারীর দল চলে যাচ্ছে। তারা দু'জন জটিল অঙ্ক নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে তখন। কর্তৃপক্ষ ভেবেছেটা কি। টিম্বারিং-এর জন্য বাড়তি যা রোজগার হবে, তাতে ঐ দশ সেন্টিমের ঘাটতি পোষাবার নয়। মেরে কেটে আট সেন্টিম উঠতে পারে। তার মানে ঝুড়ি প্রতি দু সেন্টিম লোকসান। উপরন্তু যথেষ্ট সতর্ক হয়ে টিম্বারিং করতে গিয়ে সময়ও খরচ হবে অনেক। অর্থাৎ মাইনে কমছে। এভাবে গরীবের পকেট মেরে বড়-লোকদের ইমারত তৈরি হবে।

মায়্যু বলল, যদি এই অবিচার বিনা-প্রতিবাদে মেনে নিই, তাহলে আমরা জন্তুরও

মায়্যুর মাইনে নেবার পালা এল। এই রকমই নিয়ম যে দলের প্রধান পুরো টাকাটা নেয়, তারপর তার অধীনস্থ মজুরদের মধ্যে তা ভাগ করে দেয়। এতে দু পক্ষেরই খানিক সময় বাঁচে।

ক্যাশিয়ার খাতা খুলল। সেখানে মায়্যুর দলের কাজের হিসেব (অর্থাৎ দিনে কত ঝুড়ি কয়লা ওঠায) লেখা আছে।

—এই নাও, তোমাদের একশো পঁযত্রিশ ফ্রাঁ।

মায়্যু বলল, আমাব মনে হয, আপনার হিসেবে কোথাও একটা ভুল হয়েছে।

টাকাটা তখনও হাত পেতে নেয়নি মায়্যু। ভুরু কুঁচকে হিসেব মেলাবার চেষ্টা করছিল। তার সমস্ত শরীর বেয়ে শীতল স্রোত নেমে গেল। পনেরো দিনের মাইনে—খুব বেশী হবার কথা অবশ্য নয—কিন্তু হিসেবে ভুল না হলে তো এত কমও হয না। জাশারী, এতিয়েন আর শাভালের জাযগায আনা নতুন লোকটাকে তাদের পাওনা টাকা পযসা মিটিযে দিলে তো বুড়ো বাবা, ক্যাথরিন, জঁলঁ্যা আর তার নিজের জন্য মেরে কেটে মোট পঞ্চাশ ফ্রাঁ-ও থাকছে না।

ক্যাশিযার জবাব দিল, না না, হিসেব ঠিকই আছে। দুটো রবিবার আর চারটে ছুটির দিন বাদ দাও। তার মানে ন'দিন কাজ করেছ।

মনে মনে হিসেব করল মায়্যু। ন'দিনে তার পাওনা হয তিরিশ ফ্রাঁর মতো। ক্যাথরিনের আঠারো আর জঁলঁ্যার নয। আর তার বুড়ো বাপ তো তিনদিনের বেশী কাজই করেনি। তাহলেও যদি জাশারী আর বাকি দু'জনের মাইনে এর সঙ্গে যোগ করা যায তাতে একশো পঁযত্রিশ ফ্রাঁর বেশী ছাড়া কম হয না।

ক্যাশিযার তড়িঘড়ি বলল, ও হো, জরিমানার কথাটা ভুলো না। খারাপ টিম্বারিং-এর জন্য কুড়ি ফ্রাঁ জরিমানা হযেছে।

হতাশায হাত মোচড়ালো মায়্যু। কুড়ি ফ্রাঁ জরিমানা, তার ওপর চারদিন কাজ হযনি—এ ভাবে হিসেব হলে তো ঠিকই আছে। যখন তার বাবা নিযমিত কাজ করছিল আর জাশারী বিযে করে আলাদা সংসার পাতেনি তখন সে দেড়শো ফ্রাঁ হাতে পেত।

ক্যাশিযার অধৈর্য হযে উঠল।

—বলি ব্যাপারটা কি? টাকাটা নেবে কি না তা মনস্থির করতে পারছ না? দরকার না থাকলে ঝেড়ে কাশোই না বাপ! তোমার পেছনে যে লম্বা লাইন পড়ে গেছে।

মায়্যু কাঁপা কাঁপা হাতে টাকাটা তুলে নেবার মুহূর্তে ক্যাশিয়ারের সহকারী তাকে আঙুল নেড়ে ডাকলো।

—এদিকে একবারটি শোনো তো! তুমিই তো তুস্যাঁ মায়্যু? সেক্রেটারী তোমাকে ভেতরে ডাকছেন।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো মায়্যু ঢুকল সাজানো-গোছানো অফিসে।

সেক্রেটারীর টেবিলে লম্বা, ক্যাকাশে চেহারার একজন ভদ্রলোক বসে।

মায়ুর সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করছিল।

কাগজপত্র নিয়ে এক নাগাড়ে কথা বলে গেলেন ভদ্রলোক। মোদ্দা ব্যাপারটা হল এই—তার আটান্ন বছরের বুড়ো বাবা আজ পঞ্চাশ বছর খনির কাজ করছে। হিসেবমতো তার একশো পঞ্চাশ ফ্রাঁ পেনসন পাবার কথা। কিন্তু বুড়োর গুণধর ছেলে (তুসঁ!) মায়ু যেভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধাচরণ করছে তাতে কোম্পানী শেষ পর্যন্ত পেনসনের ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারে। আর মায়ু বহুদিন হল খনিতে আছে, কাজকর্মও ভালো জানে। তারই বা এতদূর মতিভ্রম হল কি করে? জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করলে তার ফল তো ভোগ করতেই হবে। তাই ভালোয় ভালোয় ওসব কুচিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললেই মঙ্গল।

আমতা আমতা করল মায়ু।

—হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পারছি স্যার।

বাইরে এতিয়েন অপেক্ষা করছিল।

মায়ু এসে একেবারে ফেটে পড়ল।

—আমি একটা শুয়োরের বাচ্চা, বুঝলে? আমার তো উচিত ছিল মুখের ওপর জবাব দেওয়া। রুটি কেনার পয়সা নেই, তার ওপর আবার অপমান। ও বলেছে তুমিই আমাদের ক্ষেপিয়ে তুলেছ। এখন আমরা কি করি বলো তো? চিরকাল যা চলে এসেছে তাতে তো কুকুরের মতো পা চাটা আর ল্যাজ নাড়া উচিত আমাদের।

চুপ করে গেল মায়ু। রাগে আর ভয়ে তার সমস্ত ভেতরটা যেন ওলোটপালোট হয়ে যাচ্ছিল।

এতিয়েন চিন্তা করছিল একমনে। এত দিনে সত্যি সত্যি কিছু একটা করবার সময় এসেছে। প্রতিটি মজুরের মনেই জমে উঠেছে বিদ্রোহের চাপা আগুন। ঝুড়ি প্রতি দু সেন্টিম মজুরী কমে যাবার কথাও চাউর হয়ে গেছে। বেকারত্ব আর জরিমানার বিরুদ্ধে অন্তহীন দারিদ্র্য আর অনাহারের জেহাদ ঘোষণা করার দিন এসেছে। এখনই তো উনুনে হাঁড়ি না চড়ার অবস্থা। এর পর একেবারে না খেয়ে থাকলে কি আর এমন বেশী খারাপ দাঁড়াবে পরিস্থিতি?

বাড়ি ফেরার পথে এতিয়েন আর মায়ু নিজেদের মধ্যে কোনো কথা বলল না।

মায়ুর বউ দরজা খুলেই চেঁচিয়ে উঠল।

—এ কি! রুটি, চিনি, মাংস কিছু আনোনি? সংসারের ব্যাপারে কোনো কথাই কি তোমার কানে যায় না?

মায়ু কোনো উত্তর দিল না। সে মনের অবরুদ্ধ আবেগ গোপন করতে চেষ্টা করছিল। ভাগ্যের এতই নির্মম পরিহাস যে খনিতে দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু নিঃশেষ করে দিয়েও দু' বেলা পেট ভরাবার মতো খাবারটুকুও জোটে না।

শেষ পর্যন্ত আর থাকতে পারল না সে। অত বড় শক্তসমর্থ মানুষটা ফুঁপিয়ে [illegible]।

—ছ্যাখো, সবাই মিলে রক্ত জল করে মাত্র পঞ্চাশ ফ্রাঁ ঘরে আনতে পেরেছি।

মায়্যুর বউ এতিয়েনের দিকে তাকালো। তার মুখেও কোনো কথা ছিল না।

মায়্যুর বউ কান্না চাপতে পারল না। মাত্র পঞ্চাশ ফ্রাঁ দিয়ে ন'টা মানুষের রাক্ষুসে খিদে সে মেটাবে কি করে? তাও আবার এক আধ দিনের ব্যাপার নয়—টানা পনেরো দিন। বড় ছেলে আলাদা হয়ে গেছে। বুড়ো শ্বশুর অকর্মণ্য। এবার সবাই মিলে গলায় দড়ি দিয়ে মরা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

আলজির তার মাকে জড়িয়ে ধরল। এস্তেল কিছু না বুঝেই কাঁদছে। লেনোর আর অঁরিও থেমে নেই।

আস্তে আস্তে সমস্ত বসতি জুড়ে কান্নার রোল উঠল। সব পরিবারেই তো এক অবস্থা!

সব বাড়ি থেকেই মেয়েরা, বউরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। চিৎকার করে নিজেদের দুর্দশার কথা জানাচ্ছে একে অন্যকে। বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা। বৃষ্টি পড়ছে ঝিরঝির করে। তাতেও ভ্রূক্ষেপ নেই কারও।

—ছ্যাখো তো, মালিকরা আমাদের শুষে একেবারে ঝাঁঝরা করে দিল। এ ভাবে তিলে তিলে না মেরে কামান দেগে সব উড়িয়ে দিলেই পারে।

—আমার কি হবে বলো তো? পনের দিন তো শুধু রুটির খরচটুকুও উঠবে না।

—এবার বাচ্চাদের জামাকাপড় বেচে খেতে হবে।

মায়্যুর বউও বাইরে বেরিয়ে এসেছে। মাদাম লেভাককে ঘিরে ছোটখাটো একটা ভিড়। সেই-ই সবচেয়ে বেশী চেঁচাচ্ছে। তার মত্তপ স্বামী এখনও ফেরেনি। যা পয়সা পেয়েছে তার সবটাই নিশ্চয়ই মদ আর মেয়েমানুষের পেছনে ওড়াতে গেছে।

ফিলোমিন জাশারীর জন্য অপেক্ষা করছিল। অপেক্ষাকৃত শান্ত ছিল একমাত্র পিয়েরোঁর বউ। পিয়েরোঁটা যা হারামজাদা! ওপরওয়ালার নেকনজরে থাকে সর্বক্ষণ। যতটা না কাজ করে, হিসেবে তার থেকে বেশী লেখায় (নিজের বেলায়) খাতাতে। ওর শাশুড়ী 'মা ব্রুলে'র মতে এই নোংরা কারসাজিতে নির্ঘাত তার জামাইয়ের হাত আছে। সে মঁস্যুর দিকে হাত বাড়িয়ে অকথ্য গালিগালাজ বর্ষণ করছিল। মালিক পক্ষের উদ্দেশ্যে অশ্রাব্য কটূক্তির ঝড় বইয়ে দিচ্ছিল।

এনবোদের উদ্দেশ্যে বুড়ি বলল, এদিকে তো আমাদের ঘরে উনুন জ্বলে না, ওদিকে ওনার ঝি জুড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে বাজার গেল। নির্ঘাত মাছ কিনতে।

সবাই আবার একপ্রস্থ বিষোদ্গার শুরু করল। একদল খেতে পাচ্ছে না আর অন্যরা এদেরই মাথার ওপর চেপে বসে ফেলে ছড়িয়ে খাচ্ছে—ভগবানের এ কেমন একচোখো বিচার!

এই প্রথম এতিয়েন আর তার বিপ্লবের কথা সকলের মাথার মধ্যে ঘা দিল। সোনালী ভবিষ্যৎ আর কতদূরে? সেদিনের জন্য সবুর সইছে না কারুরই। সাধারণ মানুষও সুখ চায়, শান্তি চায়। এক জীবনে অন্তত কয়েকটা দিনের জন্যও সুখী হবার অধিকার তো প্রত্যেকেরই আছে। অবিচার আর অত্যাচারের পরিমাণ দিনের দিন

যে বেড়েই চলেছে। পুরুষেরা তো বটেই মেয়েরাও এখন বীতস্পৃহ। তারাও হাতিয়ার নিয়ে লড়াইয়ে নামতে তৈরি।

সন্ধ্যের অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে। বৃষ্টি পড়ছে ঝমঝম করে। সব কিছুকে ছাপিয়ে সকলের হতাশা, খেদোক্তি আর শিশুদের কান্না কানে যেন তালা ধরিয়ে দেয়।

আ লাভঁতাজ-এ সেই রাতেই ধর্মঘটের প্রস্তাব সর্বসম্মিতক্রমে গৃহীত হল। রাসন্তর আর প্রতিবাদ করল না। স্বভাবিন বিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এই ধর্মঘটকে মেনে নিল।

সকলের উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলল এতিয়েন, কোম্পানী যদি চায় আমরা ক্ষুব্ধ হয়ে ধর্মঘট করি তবে তাই হোক। আমাদের জীবনের লড়াই, বাঁচার লড়াই কাল থেকে নতুন করে শুরু হবে।

* * * *

এক সপ্তাহ কেটে গেছে এর মধ্যে। কাজ চলছে ঠিকই কিন্তু বিদ্রোহ আর অসন্তোষের চাপা আগুনও জ্বলেছে ধিকি ধিকি করে।

পনেরো দিন পর আবার মাইনে পেল মাহ্যু। টাকাটা কেন কে জানে আরও কম বলে মনে হয়। কষ্ট করে সংসার চালাতে চালাতে তার বউয়ের খিটখিটে মেজাজ দিনের দিন বেড়েই চলেছে। একেই তো বিপদের অন্ত নেই তার ওপর ক্যাথরিন আবার পুরো একটা রাত বাইরে কাটিয়ে এসেছে এরই মধ্যে। পরের দিন মেয়েটা তো এত অসুস্থ অবস্থায় ফিরলো যে কাজেই যেতে পারলো না। সবই নাকি শাভালের দোষ। সেই-ই ক্যাথরিনকে আটকে রেখেছিল। বলেছিল, বাড়ি যাবার নাম করলে ঠ্যাং ভেঙে দেবে। হিংসেয় শাভাল জ্বলে পুড়ে মরছে—সে নাকি খুব ভালো করেই জানে, ক্যাথরিনের মা প্রতি রাতে মেয়েকে এতিয়েনের সঙ্গে শুতে পাঠায়।

মাহ্যু-গিন্নী রাগে লাল হয়ে গেল।

—খবরদার! হারামজাদী, তুই আর ওই শয়তানটার কাছে পিরীত করতে যাবি না। জুতিয়ে আমি ওর মুখ ছিঁড়ে দেব।

কিন্তু তাতে লাভটা কি। ক্যাথরিনের এক দিনের মাইনেও কাটা গেল, উপরন্তু সে এখন তার প্রেমিককে ছাড়তে রাজী নয়।

দু'দিন পর আবার আর এক কাণ্ড। সোম আর মঙ্গলবার খনির কাজে না গিয়ে জ্যাঁলিন্যা কোন বনজঙ্গলে ঘুরতে গিয়েছিল। বেবের আর লিডিও বাদ যায়নি। উস্কানিটা জ্যাঁলিন্যাই দিয়েছিল। কি কুকীর্তি করবার মতলব ছিল কে জানে! পাড়ার সমস্ত বাচ্চাগুলোর সামনে ফুটপাতের ওপর মাহ্যু-গিন্নী ছেলেকে ধরে চোরের মার মারল। সব বাচ্চাগুলো দূরে দাঁড়িয়ে ভীতু চোখে তাকিয়েছিল দু'জনের দিকে। [illegible]ল্যাঁর এত সাহস যে কাজে না গিয়ে ফূর্তি করতে, বেড়াতে যায়! অমন নচ্ছার [illegible]কে তো আঁতুড়ে নুন দিয়ে মেরে ফেলা উচিত। সেই কোন ছোট্টবেলা থেকে [illegible]নে যে বড় হলে কাজকর্ম করে বাবা-মার ঋণ শোধ করতে হয়!

পরের দিন সকালে সবাই যখন খনিতে যাচ্ছে, ক্যাথরিনের মা বিছানায় বসে বলল, জঁল্যা, আবার যদি কোনো বেয়াদবি করেছ তো মেরে পাছার ছাল ছাড়িয়ে নেব।

খনির নতুন অঞ্চলে এখন মায়্যুদের কাজ পড়েছে। এখানে এত সঙ্কীর্ণ, অপরিসর জায়গায় কাজ করতে হয় যে সমস্ত প্রাণশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। মাথা, পিঠ কনুই ছড়ে যায় ছাদে আর দেওয়ালে ঘষটানি লেগে। এমনিতেই জায়গাটা ভেজা ভেজা, তার ওপর যখন-তখন হুড়হুড় করে জল পড়ে। মাঝে মাঝে তো এত তোড়ে জল পড়ে যে একটা লোককে মুহূর্তে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আগের দিন একটা কয়লার চাঙড়ে জোরে আঘাত করাতে এতিয়েনের সমস্ত মুখ হাত পা জলের ঝাপটায় ভিজে গিয়েছিল। এখন আর সে উটকো দুর্ঘটনা নিয়ে মাথা ঘামায় না। যখন যা হবার, ভাগ্যে থাকলে তা হবেই সময় সময় বিষাক্ত গ্যাসের ঝাপটাও এসে লাগে নাকে। কিন্তু এসবে ভ্রূক্ষেপ করলে তো আর রুটি জুটবে না।

সেদিন তিন তিনবার মায়্যু তার লোকজন সমেত টিম্বারিং মজবুত করবার কাজ করেছে। বেলা আড়াইটের সময় সবাই ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল। হঠাৎ বাইরে থেকে হুড়মুড় করে কিছু একটা ধসে পড়ার শব্দ শোনা গেল।

—কি হল, কি হল?

এতিয়েনের মনে হল পেছনের পুরো গ্যালারিটাই হয়ত বা ধসে পড়েছে।

মায়্যু বলল, চলো শীগগির, গিয়ে দেখি কি হল।

সবাই গুঁড়ি মেরে এগোতে লাগল। বলা তো যায় না, হয়ত অন্য মজুরদের জীবন বিপন্ন। সাহায্যের দরকার। শব্দটা নীচ থেকে এসেছিল। মনে হয় কয়লার টব ভর্তি ট্রেন যেখানে চলে সেখান থেকে।

জঁল্যার মাথাটা সেদিন কেমন ঝিমঝিম করছিল। বেচারী আগের দিন বড্ড মার খেয়েছে তো! সে ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিল। একের পর এক টবের দরজা বন্ধ করছিল। কর্তাদের সাড়াশব্দ না পেলে ট্রেনের শেষ টবটায় চেপে বসে বেবেরের সঙ্গে খুনসুটি করছিল।

দুপুরের দিকে মুক বাতাঈকে নিয়ে এল একসঙ্গে কাজ করবে বলে টাট্টুটা উসখুস করছিল সমানে।

জঁল্যা বেবেরকে বলল, খচ্চরটা কেমন দাবড়ানি দিচ্ছে ত্যাখ্। পারলে এক্ষুণি যেন এক চাঁটে আমার ঠ্যাং খোঁড়া করে দেয়।

কথার জবাব দিল না বেবের। আর একটা ট্রেন আসছে। ওই ঝনঝন আওয়াজে বাতাঈ কেমন যেন খেপে যায়। সে প্রাণপণে ওর রাশ টেনে ধরে রইল। এদিকে বাতাঈ দূরে তার বন্ধু ত্রোঁপেতের গন্ধ পেয়েছে। দুটোতেই খালি পরস্পরের কাছে আসতে চায়।

বেবের বলল, ওঃ, ত্যাখো কাণ্ড! এ দুটো আবার এ ওর গা চাটতে শুরু করছে!

ত্রোঁপেত চলে যাবার পর বেবের কথার খেই ধরল।

—বুঝলি জঁল্যা, বাতাঈ কিন্তু এমনি এমনি এমনটা করে না। ও [illegible]

বিপদের গন্ধ পেয়েছে। ওই দরজাটার সামনে গেলেই কেমন যেন গোঁযাতু́মি করছে। তোর কি মনে হয় ওখানে ধস নামবে?

—কে জানে বাবা। তবে দেখলাম জায়গাটায় প্রায় হাঁটু জল।

পরের বার কিন্তু বাতাঈ ওই দরজাটার সামনে এসে কোঁকাতে লাগল, পা ঠুকতে লাগল। তারপর হঠাৎ এক ঝটকায লাগাম ছাডিযে বিদ্যুৎ গতিতে এক ছুট লাগালো অন্য দিকে।

দরজাটা বন্ধ করে দিতে গেল জঁলঁা। সে একটু ভেতরে ঢুকে বাতিটা উঁচু করে টিম্বারিং দেখতে লাগল। সমানে জল লেগে লেগে কেমন যেন সরে গেছে কাঠের ঠেকাগুলো। ঠিক সেই সময় বার্লোক ওরফে শিকো নামে একজন মজুর হুডোহুডি করে বাড়ি যাচ্ছিল। খবর এসেছে, তার বউয়ের ব্যথা উঠেছে—বাচ্চা হবে। সে-ও এক মুহূর্ত দাঁডালো টিম্বারিং দেখতে। দু'জনেই ঠিক দরজার বাইরে পা রাখবে, এমন সময় হুড়মুড করে পুরো ছাদটা ধসে পডল ওদের ওপর।

আওয়াজ শুনে সব দিক থেকে ছুটে এল অন্যান্য মজুরবা। সবাই দেখল ছাদটা ধসে পডেছে। কেউ কিন্তু স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে দু-দুটো তরতাজা জীবন চাপা পডে গেছে ধ্বংসস্তূপের নীচে। হঠাৎ ক্ষীণ গলার অওয়াজ পাওযা গেল। বেবের চমকে উঠল, 'জঁলঁা, ও তো বযে গেছে পাথরের চাঙডের মধ্যে।'

চিৎকার করে উঠল বেবের, জঁলঁা, জঁলঁা চাপা পডেছে নীচে।

ততক্ষণে মায্যু জাশাবী আর এতিযেনকে নিযে চলে এসেছে ঘটনাস্থলে। সে হাউমাউ করে চেঁচিযে উঠল। ক্যাথরিন, লিডি, মুকেতও এসে গেছে। অন্ধকারে তারাও চেঁচিয়ে কাঁদছে। পুরুষেরা থামাতে চেষ্টা কবছে কিন্তু চাপা পডা মানুষগুলোর আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে এদের কান্নাও জোরদার হচ্ছে।

রিশোম এসে গেল কিন্তু তখনও নেগ্রেল বা দঁসের-এর পাত্তা নেই। কান পেতে গলার স্বর শুনে রিশোম বল্ল, 'যে চাপা পডেছে তার গলার আওয়াজে মনে হচ্ছে সে প্রাপ্তবয়স্ক।' মায্যু এর মধ্যে অন্তত একশোবার জঁল্যার নাম ধরে ডেকেছে কিন্তু সাড়া পায়নি। ও হয়ত পিষে মারা গেছে এতক্ষণে।

রিশোম উদ্ধার করবার কাজে নেমে পড়ল কোমর বেঁধে।

—সবাই হাত চালাও, কথা পরে হবে।

সকলে দু'দিক থেকে দু'দলে ভাগ হযে গিযে পাথর, বালি, কাঠ আর কযলার স্তূপ সরাতে লাগল। শাভালও নীরবে কাজ করে যেতে লাগল মায্যু আর এতিয়েনের পাশাপাশি। জাশারী জঞ্জাল সরাতে লাগল দু হাতে। কেউই খাবার খায়নি আজ কিন্তু ওসব পরে হবে। চাপা পড়া কমরেডদের এখুনি উদ্ধার করা দরকার। সময় বয়ে যেতে লাগল দ্রুত। সকলেরই মনে হল ঠিক সময়ে না ফিরলে ...ডির লোক অযথা চিন্তা করবে। একবার প্রস্তাব এল মেয়েরা না হয় ফিরে যাক ...ক্যাথরিনরা ফিরতে রাজী নয়। তারাও হাত লাগিয়েছে পুরুষদের সঙ্গে। ঠিক ...াকই সব জায়গায় খবর দেবে। প্রায় চারটে বাজে। মজুররা পাগলের

মতো কাজ করে চলেছে। ভূতে পাওয়া মানুষের মতো বিড়বিড় করছে আর জঞ্জাল সরাচ্ছে মায়্যু এক মুহূর্তও বিশ্রাম না নিয়ে।

রিশোম বলল, সাবধান! এবার দেখেশুনে হাত চালাও। ওদের গায়ে যেন না লাগে।

ভয়ে হাত পা কাঁপছে সকলের। কার পরিবারের কপাল পুড়ল কে জানে! প্রথমে নজরে এল একটা পা। তারপর আস্তে আস্তে পুরো শরীরটা। মাথায় কোনো চোট লাগেনি শিকোর। তবে শিরদাঁড়াটা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে পাথরের আঘাতে। তাকে সরিয়ে নেওয়া হল নিরাপদ জায়গায়। জঁলাঁকে উদ্ধার করা হল সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থায়। তার দুটো পা-ই ভেঙে গেছে তবে এখনও প্রাণটা ধুকধুক করছে। ক্যাথরিন কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

বাতাঈকে নিয়ে এল বেবের। কয়লা ভরে রাখার টবের সঙ্গে জুতে দেওয়া হল তাকে। দুটো টবের একটায় জঁলাঁকে শোওয়ানো হল, অন্যটায় শিকোকে, জঁলাঁর সঙ্গে তার বাবা আর শিকোকে নিয়ে এতিয়েন—পেছন পেছন আরও পঞ্চাশজন মজুর, তারা জন্তুর মতো ধুঁকছে।

সবাই ওপরে উঠে এল। দু মিনিট মাত্র সময় লাগে ওপরে আসতে কিন্তু কখনও কখনও সেই সময়টুকুই এত দীর্ঘ বলে মনে হয়! কপাল ভালো যে এর মধ্যেই ডাক্তার চলে এসেছেন। মালিকের ঘরে বয়ে নিয়ে যাওয়া হল দু'জনকে। মায়্যু আর এতিয়েনও ঘরে ঢুকল।

শিকোকে এক পলক দেখলেন ডাক্তার। তারপর বললেন, ওকে সরিয়ে নাও; ও শেষ হয়ে গেছে।

শিকোর ঝুলকালি মাখা ঠাণ্ডা নিথর দেহটা সরিয়ে নেওয়া হল।

ডাক্তার পরীক্ষা করতে লাগলেন জঁলাঁকে।

—ওঃ হো, সব চোটটাই পা দুটোর ওপর দিয়ে গেছে।

ডাক্তার একে একে জঁলাঁর সব পোশাক খুলে ফেললেন। কয়লার কালি আর রক্তের ছোপ শরীরের সর্বত্র। কি হালকা রোগা হাড়-জিরজিরে গড়ন। সাদা চামড়ার নীচে সমস্ত পাঁজরাগুলো যেন গোনা যায়। উপোসী বিধ্বস্ত মজদুর শ্রেণীর উপযুক্ত প্রতিভূ!

জ্ঞান ফিরে এসেছে জঁলাঁর। যন্ত্রণায় সে আর্তনাদ করছে। মায়্যুর দু গাল বেয়ে অঝোরে নেমেছে জলের ধারা।

ডাক্তার বললেন, তুমিই এর বাবা? কাঁদছো কেন? ও তো মারা যায়নি। তার চেয়ে আমায় সাহায্য কর।

দুটো ভাঙা হাড় তিনি নিপুণ হাতে জোড়া দিলেন। তারপর প্লাস্টার। কিন্তু ডান পায়ের একটা হাড় ভেঙেছে বড় বিশ্রীভাবে। অপারেশন না করে উপায় নেই। অবস্থা বেগতিক হলে পা-টা কাটতেও হতে পারে।

এর মধ্যে নেগ্রেল আর দঁসের এসে হাজির হয়েছে। মজুরদের আত্মী[illegible]

জন্যই তো এত বড় কাণ্ডটা হল। কতবার বলা হয়েছে টিম্বারিং মজবুত করবার জন্য, তা না করে নবাব খাঁজ, খাঁর বাচ্চারা সব ধর্মঘট করবেন! এবার যে ক্ষতিপূরণটা দিতে হবে সেটা কোন শালার পকেট থেকে যাবে শুনি?

চূড়ান্ত অভদ্রভাবে গালিগালাজ করতে লাগল নেগ্রেল। খানিক পর শিকোর দেহটা দেখিয়ে দঁসেরকে বলল, এটা আবার কে?

—ও শিকো। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে কাজের। ইস্, তিন তিনটে বাচ্চার বাপ।

ডাক্তার বললেন তাড়াতাড়ি জঁল্যাঁকে বাড়িতে নিয়ে যেতে। প্রায় ছ'টা বাজে সন্ধ্যে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। আর শিকোর মৃতদেহও নিয়ে যাওয়া হোক। কোম্পানী থেকেই গাড়ির ব্যবস্থা হল। মেয়েরা সব বাইরে দাঁড়িয়ে। সবাই একে একে নীরব শোকযাত্রার অংশীদার হল।

এতিয়েন যেতে যেতে মায়্যকে বলল, ক্যাথরিন বরং আগে গিয়ে ওর মাকে খবর দিক তাতে আঘাতটা সয়ে যেতে পারে কিছুটা।

নীরবে সায় দিল মায়্য। ক্যাথরিন দৌড় দিল বাড়ির পথে। সব বাড়ি থেকে মেয়েরা বউরা পথে নেমে পড়েছে। বুঝতেই তো পারা যাচ্ছে না কোন হতভগিনীর সর্বনাশ হয়েছে। লেভাক তো আগে কিছু বলেনি। ভয়ে আতঙ্কে সবাই বিবর্ণ হয়ে গেছে।

ক্যাথরিন তার মায়ের দিকে দৌড়ে গেল। সে কোনো কথা বলার আগেই মায়্য-গিন্নী বলল, জানি, জানি, তোদের বাবা আর নেই।

ক্যাথরিন বার বার তার মায়ের ভুল ভাঙতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল।

মৃতদেহ নিয়ে গাড়িটা ক্যাথরিনদের বাড়ি পেরিয়ে গেল। মায়্য-গিন্নী দেখল জঁল্যাঁকে নামানো হচ্ছে স্ট্রেচারে করে। সে বেঁচে আছে কিন্তু পা দুটো ভেঙে গেছে তার।

রাগে, ক্ষোভে, ভয়ে, দুঃখে চেঁচিয়ে উঠল সে, বেশ, বেশ! আমাদের দুখের বাচ্চাদের ঠ্যাং খোঁড়া না করে দিলে কর্তাদের আর শান্তি হবে কেন? দুটো পা-ই গুঁড়িয়ে দিয়েছে। হা ভগবান, আমি এখন কি করি!

ডাক্তার বিরক্ত হলেন।

—চুপ কর। তুমি কি চাও ও বাইরে রাস্তায় পড়ে থাকুক? তুমি না মা?

কিন্তু কে শোনে কার কথা! জঁল্যাঁর মার পাগলের মতো অবস্থা। ছেলেকে ওপরে নিয়ে গিয়ে সে নিজের ভাগ্যকে অভিসম্পাত দিতে লাগল বারবার। কে এখন এই ল্যাংড়া ছেলের রুটির যোগাড় করবে? একেই তো বুড়ো শ্বশুর অকেজো হয়ে পড়েছে। দেশের কোন্ মায়ের তার মতো এমন পাথর-চাপা কপাল? পরিবারের অন্যরা কাঁদছিল। এদিকে শিকোর মৃতদেহের ওপর আছড়ে পড়েছে তার বউ আর [redacted]টে বাচ্চা। তাদের করুণ আর্তনাদে মথিত হচ্ছে আকাশ বাতাস।

[redacted] জঁল্যাঁর পা-টা অবশ্য কেটে বাদ দিতে হল না কিন্তু

সে সারা জীবনের মতো খোঁড়া হয়ে গেল। তদন্ত করে কোম্পানী তাকে পঞ্চাশ ফ্রাঁ খেসারত দিল। আর বলা হল একটু সুস্থ হলে তাকে খনির হালকা কাজকর্ম করতে দেওয়া হবে। মোটের ওপর সংসারের আয় আরও কমে গেল। এর মধ্যে মায়্যু জ্বরে পড়ল।

বৃহস্পতিবার থেকে কাজে যোগ দিয়েছে মায়্যু। সেদিন রবিবার। এতিয়েন আর মায়্যুরা সবাই ঘরে বসে আগামী পয়লা ডিসেম্বরের কথা আলোচনা করছিল। তাদের আশঙ্কা—সত্যিই কি কর্তৃপক্ষ অদ্ভুত শর্তসাপেক্ষ প্রস্তাবটা কার্যকরী করবে? ক্যাথরিন অকারণ দেরি করছে ফিরতে। সবাই তার জন্য অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত। রেগে গিয়ে সদর দরজা বন্ধ করে দিল তার মা। অনেক রাত পর্যন্ত বিছানায় এপাশ ওপাশ করল এতিয়েন। ক্যাথরিনের বিছানাটা খালি। এক কোণে গুটিশুটি মেরে ঘুমোচ্ছে আলজির।

পরের দিন সকালেও ক্যাথরিন ফিরল না। সেদিন দুপুরের পর আসল খবরটা পেল মায়্যু। শাভাল ক্যাথরিনকে আটকে রেখেছে। সে এত জোরজবরদস্তি করেছে যে ক্যাথরিন তার কাছে থেকে যাওয়াই মনস্থ করেছে। ল্য ভোর্য্য ছেড়ে মঁসিয় দ্যন্যলঁার খনিতে কাজ নিয়েছে শাভাল। সেখানে কাজ নিয়ে ক্যাথরিনও গেছে। কিন্তু দু'জনেই এখনও মঁসুতেই আছে—পিকেতের সরাইখানায়।

প্রথমে মায়্যু বলল সে শাভালকে রাম ধোলাই দিয়ে ক্যাথরিনকে পাছায় লাথি মেরে হিড়হিড় করে টেনে আনবে। কিন্তু তারপরই হতাশ হল সে। তাতে লাভ কি! এভাবে তো মেয়েকে বেঁধে রাখা যাবে না। তার চেয়ে তাড়াতাড়ি ওদের বিয়ে হয়ে যাওয়াই ভালো। কিন্তু তার বউ সব কিছু এত শান্ত ভাবে মেনে নেবার পক্ষপাতী নয়।

সে চেঁচাতে লাগল।

—তোমরা বলো তো, ক্যাথরিন যখন শাভালের সঙ্গে প্রেম করছিল তখন কি আমি তাকে বাধা দিয়েছিলাম? এতিয়েন, তুমি তো অনেক জানো, বোঝো। তুমিই বলো না হয়—আমরা তো ওকে পুরো স্বাধীনতাই দিয়েছিলাম। এখানে সবাই এ রকমই করে। যখন আমার বিয়ের কথা চলছিল তখন কি আমি আহ্লাদে আটখানা হয়ে ঘরদোর, বাবা, মা সব ছেড়ে চলে এসেছিলাম? পুরো মাইনেটা আমি বাবাকে দিতাম। এই জন্যই লোকে সন্তান চায় না। যত সব নেমকহারাম জন্তুর দল!

এতিয়েন চুপ করে রইল।

মায়্যুর বউ এক নাগাড়ে বকে চলল, ও তো রোজ সন্ধ্যেয় বাইরে যেত। আর এক্ষুণি কি বিয়ে না করলে, ঘর না ছাড়লে ওর চলত না? যখন ও জানে বাড়ির এই রকম অবস্থা, কত বড় হারামজাদী হলে আমাদের জলে ভাসিয়ে ও চলে যায়! আসলে ওকে বাড়িতে শিকল দিয়ে আটকে রাখাই উচিত ছিল আমার। সারাক্ষণ শুধু

করেও শখ মেটে না, আবার দিনেও গায়ে গা লাগিয়ে ঝুটিতে থাকা চাই। আব তার জন্য বাবা, মা, ভাই, বোন সব চুলোব দোরে যাক।

মাথা নেড়ে সায় দিল আলজিব। লেনোব আর অঁবি ভয়ে চুপ করে ছিল। মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল ফিসফিস করে।

ওদেব মাযের আক্ষেপেব অন্ত নেই।

—প্রথমে জাশারী বিয়ে কবে আলাদা হল। তাবপব বুড়ো ঠাকুর্দা পঙ্গু। এবপর জ ঁল ঁ্যা—সে তো অন্তত আবো দশদিন বাইবে কাজে বেবোতে পাববে না। তার পর ক্যাথরিন—নোংবা কুত্তীটা। এই ভাবে সাংসাবটা ছাবখার হয়ে গেল। এখন শুধু মায্যুর বোজগাব ভরসা। সাতজন লোক—আয তিন ফ্রাঁ। এস্তেলকে তো তবু হিসেবে ধবাই হয়নি। এব চেয়ে সবাই মিলে বিষ খেয়ে মবলেই হয়।

মায্যু বলল, চিৎকার চেঁচামেচি কবে লাভ কি। হয়ত দুর্দিন এখনও শেষ হয়নি কপালে আবও কি ভোগান্তি লেখা আছে কে জানে।

এতিয়েন মাটিব দিকে চোখ নামিয়ে বসে ছিল সে উদাস ভাবে তাকালো সামনেব দিকে। তাবপব বলল, হ্যাঁ, এইবাব সব কিছুব মোকাবিলা কববাব সময় এসেছে। আব অপেক্ষা কবলে বড় বেশী দেবি হয়ে যাবে।

চতুর্থ পর্ব

সোমবার দুপুরে মঁসিয় এনবোর বাড়িতে গ্রেগোয়ারদের নেমন্তন্ন ছিল। এবং সপরিবারে। ঠিকই ছিল সারাটা দিন একসঙ্গে হৈ হৈ করে কাটানো হবে। খাওয়া-দাওয়ার পরই পল নেগ্রেল মেয়েদের নিয়ে 'সেন্ট-টমাস' খনির দিকে যাবে—জায়গাটা বড়াতে যাবার পক্ষে বেশ মনোরম। আসলে ব্যাপারটা হল পল আর সেসিলকে নিষ্ঠভাবে মেলামেশা করার সুযোগ দেওয়া।

ঠিক সেই সোমবারেই ভোর চারটে থেকে শ্রমিক ধর্মঘট শুরু হল। গত পয়লা ডিসেম্বর থেকেই নতুন বেতন সীমা আর নিয়মাবলী কার্যকরী করা হয়। তার পর পনেরো দিন কেটে গেছে, শ্রমিকদের নির্বিকার মুখ দেখে মালিক পক্ষ তো দূরের কথা, অফিসের অধস্তন কর্মচারীরা পর্যন্ত ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি তলে তলে জল এত দূর গড়িয়ে গেছে। এখন অবশ্য ব্যাপারটা পরিষ্কার যে এই ভাবে আট-ঘাট বেঁধে ধর্মঘট করার ব্যাপারে নির্ঘাত কোনো পাকা মাথা কাজ করছে।

ভোর পাঁচটায় দঁসের, মঁসিয় এনবোকে প্রায় ঘুম থেকে টেনে তুলে জানিয়েছে একটি লোকও লা ভোরো খনিতে কাজে নামেনি। সে নিজে এইমাত্র ১'শো চল্লিশ নম্বর কলোনী থেকে আসছে। সেখানে প্রতিটি বাড়ির জানলা দরজা বন্ধ, যেন সবাই ঘুমোচ্ছে। তারপর থেকে পনেরো মিনিট অন্তর অন্তর ম্যানেজারের (মঁসিয় এনবো) কাছে লোক এসে সাম্প্রতিকতম পরিস্থিতির খবর দিতে লাগল। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন বিদ্রোহ শুধুমাত্র লা ভোরোতেই কেন্দ্রীভূত আছে। কিন্তু প্রতি মিনিটেই দেখা যেতে লাগল অবস্থা উত্তরোত্তর অবনতির দিকে। মিহু আর ক্রেভ্‌কার পুরোপুরি ধর্মঘটীদের আওতায় চলে গেছে। ম্যাদলেন-এ একমাত্র মাল টানার ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ান ছাড়া কেউ আসেনি। লা ভিক্তোয়ার আর ফ্যুত্রি কাতে যেখানে অসম্ভব নিগমাফিক কাজ চলে সেখানেও মাত্র এক-তৃতীয়াংশ লোক কাজে যোগ দিয়েছে। একমাত্র সেন্ট টমাস-এ এখনও পর্যন্ত বিদ্রোহের ছায়া ঘনিয়ে আসেনি। সকাল ন'টা পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন জায়গায় কোম্পানীর পরিচালকদের খনির অবস্থা জানালেন। তারপর সঠিক খবর আনবার জন্য নেগ্রেলকে একবার কাছাকাছি খনিগুলোতে অবস্থা খতিয়ে দেখে আসতে বললেন।

হঠাৎ মঁসিয় এনবোর মনে পড়ল গ্রেগোয়াররা দুপুরে খেতে আসবেন। একবার ভাবলেন নেমন্তন্নটা বাতিল করে দিলে হয়। তারপর একটু ইতস্তত করে ওপরে গেলেন স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে। ভদ্রমহিলা তখন সবেমাত্র পরিচারিকার সহায়তায় প্রসাধন শেষ করে উঠেছেন।

নিরাসক্ত গলায় মাদাম এনবো বললেন, ওরা তাহলে সত্যি সত্যি ধর্মঘট করল!

কিন্তু তাতে আমাদের কি এসে যায় ? আমরা কি তা বলে নাওয়া খাওয়া ছেড়ে বসে থাকব নাকি ?

মঁসিয় এনবো অসহায় ভাবে স্ত্রীকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন এই রকম একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে খাওয়াদাওয়া করার হাঙ্গামাটা করা ঠিক হবে না। তার ওপর সেণ্ট টমাস-এ বেড়াতে যাবার পরিকল্পনাও বাতিল করতে হবে। ভদ্র-মহিলা কিন্তু নাছোড়বান্দা। তাঁর মতে রান্না করা খাবারগুলো শুধু শুধু নষ্ট করে কি লাভ ? আর খনিতে যাবার ব্যাপারটা ? সে না হয় অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হবে। তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা নেগ্রেল আর সেসিলের বিয়ের বিষয়টা নিয়ে কথাবার্তা যত তাড়াতাড়ি হয় পাকা করে ফেলা দরকার।

ভদ্রলোক স্ত্রীর দিকে তাকালেন। এখনও পর্যন্ত দেহের বাঁধুনী কি অটুট। মঁসিয় এনবো বহুদিন বাদে স্ত্রীর প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করলেন নতুন করে। আজ দশ বছর হল তাঁরা আলাদা ঘরে রাত্রি যাপন করেন।

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে মঁসিয় এনবো বললেন, ঠিক আছে, তুমি যা বলছ তাই হবে।

জন্মসূত্রে মঁসিয় এনবো 'অর্ডেন' অঞ্চলের লোক। প্রথম জীবনে তিনি অনাথ এবং কপর্দকশূন্য অবস্থায় প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। চব্বিশ বছর বয়সে স্কুল অব মাইনিং থেকে পাস করে বেরিয়ে ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে 'সান্ত-বার্ব' খনিতে যোগ দেন। তিন বছর বাদে 'পা-দ্য-কালে'র 'মার্নে' খনিতে ডিভিশনাল ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে নিযুক্ত হন এরপর ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায়। বিয়েও হয় এক ধনী তাঁত-ব্যবসায়ীর মেয়ের সঙ্গে। তারপর পনেরো বছর মঁসিয় এনবো আর পেছন ফিরে তাকাননি। একঘেয়ে কর্মব্যস্ত জীবন-যাপন শুধু—তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে কোনো সন্তানের প্রয়োজনীয়তা ভুলে থেকেই। মাদাম এনবো টাকা ছাড়া আর কিছু বোঝেন না। মহার্ঘ বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া আর সব কিছু তাঁর কাছে অর্থহীন। তিনি স্বামীর এই গাধার মতো খাটুনি আর সেই অনুপাতে বেতনের পরিমাণ—এ দুয়ের কোনোটাতেই সন্তুষ্ট নন। তাঁর কেবলই মনে হয় যে জীবনের কোনো সাধ আহ্লাদই পূরণ হল না। অত্যন্ত সৎভাবে কাজ করেন মঁসিয় এনবো আর কঠোর পরিশ্রম করেন। যে কোনো সাধারণ সৈনিকের মতোই তাঁর জীবন ছকে বাঁধা। ফলে দু'জনের মধ্যে দূরত্ব দিনের দিন বেড়েই চলেছে। ভদ্রলোক স্ত্রীকে প্রায় পুজো করেন। ভদ্রমহিলাও নিজের রূপ-যৌবনের তীব্র আবেদন সম্পর্কে সদা সচেতন, পারস্পরিক সমঝোতা করার সময় কই!

এরই মধ্যে ভদ্রমহিলার একজন প্রেমিক জোটে এবং সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তিটি কিছুদিন মজা লুটে অবশেষে চাকরি নিয়ে প্যারিস চলে যায়। এতে মাদাম এনবোর দাম্পত্য জীবনকে আরও বেশী বিষবৎ বলে মনে হতে থাকে। প্যারিস! স্বপ্নের [illegible]! আর তাঁর স্বামী কি না সারাজীবন ছোটলোকদের তদারকি করেই কাটিয়ে [illegible] তাছাড়া প্রেমিকপ্রবরটির জন্য অহরহ বিরহ জ্বালা তো আছেই। নানা

দাম্পত্য বিবাদ-বিসম্বাদের পর স্ত্রীর মন ফেরাতে মঁসিয় এনবো এই মঁসু কয়লাখনি অঞ্চলে চাকরি নিয়ে চলে আসেন।

মঁসুতে আসবার পর এনবোদের জীবন হয়ে পড়ল আরও একঘেয়ে, গতিহীন—ঠিক বিয়ের পর প্রথম প্রথম যেমনটা ছিল। প্রথম দিকে অবশ্য এই শান্ত পরিবেশে এসে মাদাম এনবো কিছুটা স্থির হলেন। এমন ভাবে তিনি থাকতেন যেন জীবনের প্রতি সব আকর্ষণই তাঁর ফুরিয়ে গেছে। নিজের রূপ যৌবন ধরে রাখার ব্যাপারেও হয়ে পড়লেন উদাসীন। হঠাৎই কে জানে কেন, আবার তাঁর মনে জোয়ার এল, বাঁচবার তাগিদে অস্থির হয়ে উঠলেন মাদাম এনবো। অপর্যাপ্ত অর্থব্যয়ে পুরো বাড়িটা ঢেলে সাজালেন রকমারি সৌখিন আর দামী জিনিসপত্র দিয়ে। তাঁর আবার মনে হতে লাগল এই পুরনো পচা একঘেয়ে জায়গায় জীবনের সোনালী দিনগুলো এমনি এমনি শুকিয়ে, ফুরিয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় মন খুলে মেশবার মতো সভ্য লোকজন তেমন নেই। স্বামীকে দোষারোপ করতে শুরু করলেন। টাকার লোভে নাকি বুড়ো বয়সে মঁসিয় এনবো এখানে পড়ে আছেন। বেতনভুক কর্মচারী হিসেবে না থেকে তিনি কেন এত বড় ব্যবসায়ে অংশীদার হবার চেষ্টা করছেন না? মঁসিয় এনবো আপাতদৃষ্টিতে শীতল স্বভাবের মানুষ ছিলেন। কিন্তু শেষ যৌবনে স্ত্রীর প্রতি আবার যেন নতুন করে আকৃষ্ট হন। প্রতিদিনই আশা করতেন মাদাম তাঁকে কাছে ডেকে নেবেন কিন্তু মাদাম এক অসহ্য বিরক্তিতে স্বামীর প্রতি তীব্র অনীহা প্রকাশ করতেন। ভদ্রলোক বাড়িতে কোনো শান্তি বা সুখ পেতেন না। এইভাবে ছ'মাস কাটবার পর মাদাম তাঁর সাজানো সংসারের প্রতিও বীতস্পৃহ হয়ে পড়লেন। তখন তাঁর মনে হত এই নিষ্ঠুর পৃথিবী আর জীবন ছেড়ে কবে তিনি চিরকালের মতো পালাতে পারবেন।

ঠিক এমনি সময়ে মঁসুতে এল পল নেগ্রেল।

পলের মা ছিলেন প্রভেন্সে এক ক্যাপ্টেনের বিধবা স্ত্রী। ছেলেকে মানুষ করার আশায় নিজে অশেষ দুঃখ দারিদ্র্য সহ্য করেও পলকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন পলিটেকনিক স্কুলে। সেখানে অত্যন্ত খারাপ ফল করার পর মঁসিয় এনবো তাকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন—ল্য ভোরাার ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে। পরিবারের একজন হিসেবে তাকে গ্রহণ করা হয়। সকলে একসঙ্গেই থাকতেন। মাকে মাইনের অর্ধেকটা পাঠাতো পল। মঁসিয় এনবোই জোর করেন এক বাড়িতে থাকবার জন্য। মুখে বলেছিলেন পলের আলাদা ছোট্ট বাড়িতে একলা থাকার কোনো মানেই হয় না। মনে ভেবেছিলেন—এই ব্যবস্থা হলে সে মাকে মাসে মাসে সাহায্য করতে পারবে। মাদাম এনবো পলের উপস্থিতিকে সাগ্রহে মেনে নেন। প্রথম কয়েকটা মাস মাতৃসুলভ স্নেহ, ভালবাসা আর উপদেশে ভরপুর ছিল তাঁর ব্যবহার। কিন্তু তাঁর দেহে আর মনে যৌবন তখনও যাই যাই করেও যায়নি। ফলে যা অনিবার্য, তাই হল।

ছেলেটি এত অল্পবয়েসী আর চমৎকার! একদিন পল দেখল সে তার মামীর [illegible] বাহুবন্ধনে আবদ্ধ। মামীমা তাকে চান, সে-ও উঠতি বয়সের [illegible]

ছাড়বে? কোন নির্বোধ? মামীমা মাঝে মাঝে খনির মেয়ে-মজুরদের নিয়ে ঠাট্টা করেন —পল কখনও হেসে, কখনও বা বিরক্ত হয়ে উড়িয়ে দেয়। কিছুদিন পর কোনো বিশিষ্ট ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে পলের বিয়ে দেবার জন্য ক্ষেপে ওঠেন মাদাম এনবো। অবশ্য এমন নয় যে দু'জনের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক শেষ হয়ে গিয়েছিল—আসলে ভদ্রমহিলা নিছক মজা পাবার জন্যই এমনটা করেছিলেন। তিনি তো এমনিতেও বেশীদিন পলকে ধরে রাখতে পারবেন না। এইভাবে বরং সময় থাকতে থাকতে নিজের হারিয়ে যাওয়া সম্ভ্রমবোধটুকু পুনরুদ্ধারের চেষ্টা!

মঁসিয় এনবো সবই বুঝেছিলেন। এমন কি রাতে স্ত্রীর ঘরের দিকে হালকা পায়ের আওয়াজও শুনতে পেতেন। শুধু পারিবারিক কেলেঙ্কারীর ভয়ে তাঁর চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। ঠিক এমন সময়েই মাদাম এনবো সেসিলের সঙ্গে পলের বিয়ের কথা তোলেন। এই প্রথম মঁসিয় এনবো স্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করেন, বুড়ো বয়সে তাঁকে লোকের চোখে হেয় করে কোনো কেলেঙ্কারী না করার জন্য।

যাক, যে দিনের কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম সেই প্রসঙ্গেই ফিরে যাই বরং।

স্ত্রীর ঘর থেকে বেরোবার মুখে মঁসিয় এনবোর সঙ্গে পলের দেখা হল। ধর্মঘটের ব্যাপারে ছোকরা যেন বেশ মজা পেয়েছে।

তার মামা বললেন, কি হে, খবর কি?

—এলাকাটা মোটামুটি ঘুরে দেখে এলাম। সবাইকে তো বেশ চুপচাপ মনমরা বলেই মনে হল। হাবভাব দেখে মনে হল আপনার কাছে প্রতিনিধি হিসেবে ওদের তরফ থেকে কাউকে পাঠানো হবে।

মাদাম এনবো ওপর থেকে বললেন, কে, পল? এদিকে এসে আমায় সব গল্পটা বলো না লক্ষ্মীটি! কি বোকা ওরা, না? এত সুখে থাকে, তবুও এসব ঝামেলা করা চাই!

মঁসিয় এনবো বুঝলেন পলকে এখন আর আটকে রাখার চেষ্টা করা বৃথা। তিনি নিজের অফিসঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

বেলা এগারোটার সময় গ্রেগোয়াররা সপরিবারে এসে হাজির হলেন। তখন বাইরে একমাত্র কোচোয়ান ছাড়া কেউ ছিল না। বসবার ঘরের পর্দাগুলো সব টানা। সবাই মঁসিয় এনবোর অফিসে এলে তিনি বললেন, এ ছাড়া আর উপায় ছিল না। আজকে এই গণ্ডগোলের মধ্যে জানলা দরজা হাট করে খুলে ফূর্তি করাটা তো ঠিক নয়।

গ্রেগোয়াররা কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। তারপর ধর্মঘটের ব্যাপার শুনে মঁসিয় গ্রেগোয়ার কাঁধ ঝাঁকালেন। তাঁর মতে এসব কিছুতেই বেশীদিন চলবে না। মজুররা এমনিতে খুব সরল আর সাদাসিধে ভালো লোক। মাদাম গ্রেগোয়ারও মাথা নেড়ে স্বামীর কথায় সায় দিলেন, হ্যাঁ, এদের ভালোত্বের প্রতি তাঁর বেশ আস্থা আছে। সেসিল বেশ মজা পেল। আগুনরঙা জামা তার পরনে, ঠোঁটের কোণে [illegible]শ হয়েছে! এবার সে দিব্যি বস্তিতে-বস্তিতে ঘুরে সাহায্য আর উপহার [illegible]।

কালো. বেশমী পোশাক পরে মাদাম এনবো ঘরে এলেন। তাব পেছন পেছন পল নেগ্রেল।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে মাদাম এনবো বললেন, কি জঘন্য ব্যাপাব দেখুন, যেন আজই এমনটা না কবলে ওদেব ভাত হজম হচ্ছিল না। পল এখন কেমন করে আমাদেব সেণ্ট টমাস-এ নিয়ে যাবে ?

মঁসিয এনবো সৌজন্য আর বিনযেব হাসি হাসলেন।

—না না, তাতে কি ! আমবা এখানেও দিবি৷ গল্পগুজব কবতে পাববো।

আগন্তুক মহিলাদেব প্রতি মাথা ঝাঁকিযে অভিবাদন জানালো পল। তার মামীম চোখেব ইশাবা করলেন। পলটা হাঁদাবাম ! মেযেটাকে একটু সঙ্গ দেবে তো ! ইঙ্গিত বুঝল পল। খানিক পবই দু'জনকে একসঙ্গে হাসি-গল্প কবতে দেখে সস্নেহ প্রশ্রযেব উজ্জ্বল হাসি দেখা গেল মামীমাব মুখে।

কথাবার্তাব ফাঁকে ফাঁকে মঁসিয এনবো হাতেব কাজ সাবছিলেন। মাদাম এনবো একাই দিবি৷ আসব জমাতে পাবেন। মিনিট পঁযতাল্লিশ বাদে যখন সবাই খেতে যাবেন, পরিচাবক খবব দিল মঁসিয দ্যন্সলাঁ এসেছেন। বিব্রত ভঙ্গিতে ত্রস্ত পায়ে ভেতরে এলেন ভদ্রলোক। গ্রেগোযাবদেব দেখে বললেন, ও, তোমবাও আছো ?

তাবপব ম্যানেজাবকে (মঁসিয এনবো) বিস্তাবিত খবব দিলেন। হাত-পা নেড়ে উঁচু গলায সমস্যাব কথা জানাচ্ছিলেন তিনি

—বুঝলেন মঁসিয এনবো, যদিও আমাব সব লোক খাদে নেমেছে, তবু যে কোনো মুহূর্তে গণ্ডগোল ছড়িযে পডতে পাবে

মঁসিয এনবো সবে কথা বলতে শুরু কববেন, এমন সময খানসামা ঘবে এল। খাবাব তৈরি।

মঁসিয এনবো বললেন, চলুন, আমাদেব সঙ্গে খেযে নেবেন। খেতে খেতেই বরং কথা বলা যাবে।

দ্যন্সলাঁ অনমনস্ক ভাবে সায দিলেন।

হঠাৎ দ্যন্সলাঁর মনে হল গৃহকর্ত্রীব সঙ্গে সৌজন্যমূলক ব্যবহাবটুকুও তিনি করেননি। ত্রুটিটুকুব জন্য তিনি ক্ষমা চাইলে মাদাম এনবো মিষ্টি করে হাসলেন।

সকলে খেতে বসলেন। মঁসিয এনবোব দু'পাশে মাদাম গ্রেগোযাব আর সেসিল। মাদাম এনবোব দু পাশে মঁসিয গ্রেগোযার আব দ্যন্সলাঁ। পল বসেছে সেসিল আর মঁসিয গ্রেগোযারেব মাঝখানে।

মাদাম এনবো বললেন, জানেন, আজ তো সোমবাব, ভেবেছিলাম আপনাদেব অযেস্টার খাওযাবো। ঝিটাকে পাঠাতামও কিন্তু ও কেমন ভয় পেল। বলল, মজুররা নাকি পাথর ছুঁডতে পারে।

সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

মঁসিয় এনবো বললেন, একটু আস্তে! বিশ্বসুদ্ধ লোককে জানাবার দরকারটাই বা কি যে আমরা দিব্যি ভোজ খাচ্ছি।

মঁসিয় গ্রেগোয়ার বললেন, সসেজ খান মশাই।

এবারও সকলে হাসল। তবে আগের বারের চেয়ে আস্তে।

ঘরের ভেতরটা খুবই মনোরম, আরামদায়ক। বিলাসিতার ছোঁয়া রয়েছে প্রতি ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে। দেওয়াল-আলমারীর দামী কাঁচের ভেতর ঝিলিক দিচ্ছে রূপোর পিরিচ, বড় কারুকাজ করা তামার ঝাড়বাতিদান, দামী সৌখিন কাঁচ আর চিনে-মাটির জিনিসপত্র। পাত্র উপচে পড়া খাবার আর ফল। টাটকা আনারসের গন্ধ।

নেগ্রেল (পল) গ্রেগোয়ারদের ভয় দেখাবার জন্য বলল, কি, পর্দাগুলো সরিয়ে দেবো নাকি?

যে পরিচারিকাটি খাবার পরিবেশন করছিল, সে ভাবলো সত্যিই বোধহয় তাকে পর্দা সরাতে বলা হচ্ছে। সে এক টানে সরিয়ে দিল সব ক'টা পর্দা। তারপর হাসি, মস্করা, কাঁটা-চামচের টুংটাং, খাবারের পাত্র রাখার শব্দ। কিন্তু কেমন যেন জোর করে এত আনন্দ করা হচ্ছে, ভেতরে ভেতরে সবাই সন্ত্রস্ত। এই বুঝি বা বাইরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা বুভুক্ষু মানুষগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ল সকলের ওপর।

ডিমের ডালনা খাবার পর ট্রাউট মাছ এল।

শিল্পাঞ্চলের পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হচ্ছে—এই সব নিয়েই কথা চলছে সকলের মধ্যে।

দ্যনুলাঁ বললেন, জানাই ছিল এ রকমটা হবে। যখনই দেখেছি চড়চড় করে ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠেছে, তখনই বুঝেছি কপাল চাপড়াবার সময় এল। ইস্, কত জায়গায় টাকাপয়সা লগ্নী করা আছে, ভেবে দেখুন। শুধুমাত্র আমাদের খনি অঞ্চলেই তো বিরাট বিরাট তিনটে চিনিকল—কত কয়লা তো তাতেই লাগে। সুদের টাকার ওপর ভরসা করে জীবন কাটালে এই হয়।

মঁসিয় এনবো এ কথায় ঠিক সায় দিতে পারলেন না। তবে এটা তিনিও জানেন যে অতিরিক্ত লাই পেয়ে পেয়ে মজুরগুলো মাথায় উঠেছে। তিনি বললেন, এদের যা ক্ষমতা তাতে হেসে-খেলে আমাদের খনিতে দিনে ছ' ফ্রাঁ রোজগার করতে পারে। এখন তো আয় দৈনিক তিন ফ্রাঁ। তাতেই দেখুন কেমন দিব্যি থাকছে, খাচ্ছে, পরছে—এই যে আলসেমি করা স্বভাব হয়ে গেছে, এ সব কি মরলেও যাবে ভেবেছেন?

মাদাম এনবো ঝর্ণার মতো কলকল করে উঠলেন।

—মঁসিয় গ্রেগোয়ার, আর একটু মাছ নিন। রান্নাটা কি ভালো হয়নি?

মঁসিয় এনবো কথা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

—বলুন আপনি, এটা কি আমাদের দোষ? একের পর এক কলকারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমাদেরও তো নিজেদের আখেরটা গোছাতে হবে। ন্যায্য দামের চেয়ে কম দামেই মালগুলো বেচে দিতে হচ্ছে—মজুরদের আয়ের ওপর চাপ তো পড়বেই। এই সহজ কথাটা ছোটলোকগুলোর মাথায় ঢোকে না কিছুতেই।

পাখির মাংস এল। তারপর মিষ্টি মদ।

নীচু গলায় দ্যনুলাঁ বললেন, ভারতবর্ষে একটা দুর্ভিক্ষ হয়েছে। আমেরিকানরা

লোহা বা ঢালাই-লোহা আমদানী করা বন্ধ করেছে যার ফলে নিষ্কাশনের কাজে আমরা খুব বেশীরকমই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। এইভাবে কোনো দেশে, তা সে যত দূরেই হোক না কেন, অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়ের সূচনা দেখা দিলেই পৃথিবীর নানান অংশে তার প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য।

আর সবচেয়ে সত্যি কথাটা কি জানেন? কয়লার দর নামিয়ে বেচতে গেলে উৎপাদন বাড়াতে হবে। তা না হলে ঐ টাকাটা মজুরদের মাইনে থেকে কাটা যাবে। কাজেই এই যে মজুররা আজ বলছে যত দুর্ভোগ তাদের কপালেই হয়—সেটাও ঠিক।

এই কথাটা নিয়ে আবার তর্ক শুরু হল। মহিলারা বিরক্ত। এমন জমাটি আড্ডাটা কেউ নীরস আলোচনায় মাটি করে?

সবাই খেতে ব্যস্ত, এমন সময়ে পরিচারক এসে দাঁড়ালো। একটু ইতস্তত করে বলল, মঁসিয় দঁসের এসেছেন। বাইরে হলঘরে আছেন। আপনারা খাচ্ছেন শুনে ভেতরে আসতে চাইছেন না।

মঁসিয় এনবো বললেন, না না, ওকে ভেতরে আসতে বলো।

কাঁচুমাচু মুখে দঁসের ভেতরে এল। টেবিল থেকে কয়েক পা দূরে দাঁড়িয়ে রইল। খবর আছে: এমনিতে গ্রামের পরিস্থিতি শান্ত। ওরা দাবীদাওয়া নিয়ে খানিকক্ষণের মধ্যে লোক পাঠাবে—বোধহয় সমঝোতায় আসতে চায়।

মঁসিয় এনবো বললেন, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। দিনরাতের সমস্ত খবর আমার চাই।

দঁসের চলে যাবার পর হাসি ঠাট্টা শুরু করল সবাই। রাশিয়ান স্যালাড এল। নেগ্রেল পরিচারিকাকে ডেকে রুটি আনতে বলল। পরিচারিকার এমন সন্ত্রস্ত ভাব যেন এক্ষুণি লাঠিসোঁটা নিয়ে লোক এসে পড়বে।

একতাড়া চিঠি নিয়ে লোক এল। মঁসিয় এনবো একটা চিঠি জোরে জোরে পড়তে লাগলেন। পিয়েরোঁ লিখেছে—তার নাকি এই সব ধর্মঘটের ঝুটঝামেলায় যাবার একেবারেই ইচ্ছে নেই। শুধু প্রাণের দায়ে সে রাজী হয়েছে নইলে অন্য মজুররা তাকে মারধর করতে পারে। মজুরদের প্রতিনিধি দলেও সে মনোনীত হয়েছে—যদিও এসবে তার কোনো হাত নেই।

মঁসিয় এনবো বললেন, দ্যাখো কাণ্ড! লোককে স্বাধীনভাবে কাজ করবার সুযোগটুকুও এরা দেবে না। কেউ না চাইলেও তাকে জোর করে দলে টানা হবে।

ঘুরেফিরে আবার ধর্মঘটের কথা। সবাই মঁসিয় এনবোকে ধর্মঘটের ব্যাপারে তাঁর মত জিজ্ঞেস করল। তিনি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, ওঃ, এসব ঢের দেখা আছে। একটা সপ্তাহ কাজ না করার ধান্দা। মেরেকেটে পনেরো দিন। দিনরাত তাড়ি টানবে সব—তারপর পেটের জ্বালায় ধর্মঘট মাথায় তুলে রেখে সুড়সুড় করে খনিতে ফিরে আসবে।

মঁসিয় গ্রেগোয়ার্ মাথা নাড়লেন।

—না মশাই, এবার ব্যাপারটা অত সহজ নয়। অন্যান্য বারের তুলনায় এবার অনেক আটঘাট বেঁধে নেমেছে ওরা। শুনেছি প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড করেছে।

—দূর মশাই! ব্যাঙের আধুলি। পুঁজি তো মাত্র তিন হাজার ফ্রাঁ। তা দিয়ে কোন কাজটা বেশীদিন চলবে? সবাইকে উস্কানোর মূলে আছে এতিয়েন লঁতিয়ে নামে এক ছোকরা। কাজেকর্মে দিব্যি চালাকচতুর কিন্তু ওকে বোধহয় ছাঁটাই করতে হবে—যেমন হ্রাসন্থরকে করেছিলাম। হ্রাসন্থর অবশ্য ল্য ভোরাতে মদের দোকান খুলে মজুরদের দিব্যি তাতিয়ে যাচ্ছে। কিছু চিন্তা করবেন না। সপ্তাহখানেকের মধ্যে অর্ধেক মজুর আর পনেরো দিনের মধ্যে সব্বাই আবার খনিতে ফিরে আসবে।

ধর্মঘটের ব্যাপারে মঁসিয় এনবোর কোনো মাথাব্যথাই নেই। তাঁর একটাই চিন্তা—মালিকপক্ষ হয়ত এইসব বাজে ঝুটঝামেলার ব্যাপারে তাঁকেই দায়ী করবেন। চামচ দিয়ে খাবার খেতে খেতে নিজের উন্নতির কথা ভাবছিলেন তিনি।

ভদ্রমহিলারাও এবার যোগ দিলেন আলোচনায়।

মাদাম গ্রেগোয়ার বললেন, মজুররা খিদেয় বড় কষ্ট পাবে।

সেসিল তো এখনই মনে মনে নিজেকে ত্রাণকর্ত্রীর ভূমিকায় কল্পনা করে পুলকিত। মাদাম এনবো বিরক্ত—এরা দিব্যি কোম্পানীর পয়সায় বাড়িতে আছে। জ্বালানি খরচ, চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত সব পায় তবুও মজুরদের এত নেমকহারামি! কুকুর-বেড়ালের মতো মার খেলে তবে ওদের শিক্ষা হবে।

নেগ্রেল সমস্ত সময়টা মঁসিয় গ্রেগোয়ারকে ভয় দেখাচ্ছিল। সেসিলকে ওর খারাপ লাগেনি। মামীমাকে খুশী করবার জন্য সে বিয়ে করতেও গররাজী নয় কিন্তু ঐ পর্যন্তই। নিজেকে সাচ্চা রিপাবলিকান হিসেবে দাবী করলেও মজুরদের ব্যাপারে সে খুব কড়া।

নেগ্রেল হেসে বলল, আমি অবশ্য মামার মতো অতটা আশাবাদী নই। আমার মনে হয় গণ্ডগোল একটা বাধবে। মঁসিয় গ্রেগোয়ার, আপনি বরং লা পিয়োলেইন্-এ বাইরের লোককে ঢুকতে দেবেন না হয়ত সবই লুটেপুটে নেবে।

সস্নেহ প্রশ্রয়ের ভঙ্গিতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন মঁসিয় গ্রেগোয়ার। নেগ্রেলের কথায় চমক ভাঙলো তাঁর।

বললেন, আমার বাড়িতে ভাঙচুর, লুটপাট হবে? কিন্তু কেন?

—কি আশ্চর্য! আপনি তো খনির একজন অংশীদার। আপনি নিজে কাজ করেন না। মজুরদের মেহনত ভাঙিয়ে খান—এ সব কি কম অন্যায় ভেবেছেন? আপনি হলেন গিয়ে পুঁজিপতি, ধনতন্ত্রের বাহক। বিপ্লব সফল হলে গণ-আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আপনাকে বলতে হবে এ সবই চুরির পয়সা, অধর্মের ধন।

মঁসিয় গ্রেগোয়ার এতক্ষণ পর ধৈর্য হারালেন।

—চুরির পয়সা! ওরা জানে না আমার বাপ-ঠাকুর্দা কতদিনের সঞ্চয় এতে লগ্নী করেছিলেন। একটা সময় আমরা কত কষ্টে দিন কাটিয়েছি!

মাদাম গ্রেগোয়ার আর সেসিল আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় বিবর্ণ।

তাড়াতাড়ি মাদাম এনবো বললেন, রাখুন তো, পল খালি ঠাট্টা করে।

মঁসিয় গ্রেগোয়ার সত্যিই খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। খেয়াল না করেই নিজের প্লেটে পরপর তিনটে মাছ তুলে নিলেন।

বললেন, আমি অবশ্য এ কথা অস্বীকার করি না যে কিছু কিছু লোক সত্যিই ধনতান্ত্রিক মনোবৃত্তির শিকার। গরীবদের শোষণ করে যে টাকা তারা পায়, তা বিলাসিতা, মদ আর মেয়েমানুষের পেছনে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু আমরা, যারা সাধারণভাবে থাকি, গরীবদের প্রতি সহানুভূতিশীল, তাদের প্রতি এই অন্যায় অত্যাচার কেন? এদের সাধ্য কি আমাদের ঘরদোর তছনচ করে।

নেগ্রেল পড়েছে আচ্ছা ফ্যাসাদে। অতিকষ্টে ভদ্রলোককে শান্ত করল সে। কথাবার্তার মোড় ঘুরল এরপর। দেশের পক্ষে কি ধরনের সরকার ভালো তাই নিয়েই আলোচনা। দ্যুভলঁ্যা সমাজতন্ত্রের পক্ষে, তাঁর মতে রাজতন্ত্রের দিন শেষ হয়ে এসেছে।

—উননব্বই সালের কথাটা ভাবুন একবার। তখন অভিজাত সম্প্রদায়ের পোয়াতুঁমিতে দেশটা ডুবতে বসেছিল। এখন মধ্যবিত্তরা যত গণ্ডগোলের মূলে। এইসব বিপ্লবের কথা বলে নীচের তলার লোকদের খেপিয়ে না দিলে যেন চলছে না। এই করে করেই সব সাধারণ মানুষগুলো মরবে।

ভদ্রমহিলারা এই অস্বস্তিকর আলোচনা থামিয়ে দিলেন। তাঁরা দ্যুভলঁ্যাকে তাঁর মেয়েদের কথা জিজ্ঞেস করলেন।

মঁসিয় দ্যুভলঁ্যা বললেন, ল্যুসি এক বন্ধুর সঙ্গে গান গেয়ে বেড়াচ্ছে, আর জান্ একটা বুড়ো ভিখিরীর ছবি আঁকছে।

ভদ্রলোক সাংসারিক কথার জবাব দিলেন বটে কিন্তু তাঁর মন পড়ে আছে মঁসিয় এনবোর দিকে। কারণ ধর্মঘটের ব্যাপারে বড়কর্তারা যা আদেশ দেবেন, তাই মেনে নিতে হবে আর সে আদেশ আসবে মঁসিয় এনবোর মারফত।

তিনি হঠাৎ বললেন, আপনি তাহলে কি ঠিক করলেন?

একতাড়া কাগজের ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে ধড়মড় করে উঠে বললেন মঁসিয় এনবো, দেখা যাক।

দ্যুভলঁ্যা বললেন, আপনার আর কি মশাই, কিন্তু ধর্মঘট যদি ভঁদাম পর্যন্ত পৌছায় তাহলে আমি তো ধনেপ্রাণে মারা যাব। আমার খনিতে কয়লা তোলা বন্ধ করলে চলবে না। অনেক খরচাপাতি করে আধুনিক যন্ত্রপাতি আনিয়েছি।

এই সব কথা শুনে এনবো একটু চিন্তান্বিত হলেন। তাঁর চিন্তাধারা এক নতুন খাতে বইতে শুরু করল: একটা কাজ করলে কেমন হয়? ধর্মঘটীদের তাতিয়ে দিয়ে যদি পরিস্থিতি এমন খারাপ করে দেওয়া যায় যে দ্যুভলঁার খনিটা জলের দরে কিনে নেওয়া যাবে—তাহলে মন্দ হয় না। আর তাতে ওপরওয়ালার সুনজরেও পড়া যাবে ওঁরা তো ভঁদামের ওপর বহুদিন ধরেই নজর রেখেছেন।

তিনি স্তন্যল্যাকে বললেন, যদি জাঁ-বার্ খনি আপনার এতই মাথাব্যথার কারণ তবে সেটা আমাদের কাছে বেচেই দিন না মশাই।

স্তন্যল্যা বললেন, প্রাণ থাকতে সেটি হতে দিচ্ছি না।

স্তন্যল্যার মাথা গরম করা দেখে সবাই হাসছিলেন। ফল-মিষ্টি এসে গেছে। আপাতত ধর্মঘটের প্রসঙ্গ মুলতুবী থাক। মহিলারা আপেল, আনারস ইত্যাদি দিয়ে নানা ধরনের রান্নার কথা আলোচনা করছিলেন। সকলেই যেন এই মুহূর্তে সব রকম বিপদের কথা ভুলেই গেছেন।

ইতিমধ্যে বিয়ের ব্যাপারেও তো কথাবার্তা পাকা করে ফেলা দরকার। মামীমার ইশারা পেয়ে পল পাত্রীপক্ষের সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে প্রায় বাজিমাত করে ফেলল। মঁসিয় এনবো আর কথা বাড়ানো যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচনা করলেন না।

কফি পান করছিলেন সকলে, হঠাৎ পরিচারিকা হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির হল। তার চেহারায় ভীতসন্ত্রস্ত ভাব।

—বাবু, ওরা সব এসে গেছে।

দাবীদাওয়া নিয়ে মজুররা এসে পড়েছে। ভয়ে কাঠ হয়ে বসে রইলেন সবাই। কে জানে কি গণ্ডগোল হয়।

এনবো বললেন, ওদের বসবার ঘরে আসতে বলো।

খাবার টেবিলে সবাই পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছিলেন। সকলের চোখেমুখেই শঙ্কার ছাপ। মঁসিয় এনবো গম্ভীর, চিন্তান্বিত।

ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল বসবার ঘরের দরজার দিকে।

মাদাম এনবো নীচুগলায় স্বামীকে বললেন, কফিটা খেয়ে যাবে তো ?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়। ওরা অপেক্ষা করুক।

এনবো এমন ভাব দেখাচ্ছিলেন যেন একটুও ভয় পাননি, কফির কাপের দিকেই তাঁর অখণ্ড মনোযোগ।

পল নেগ্রেল আর সেসিল উঠে দাঁড়িয়েছে। দরজার ফুটোয় চোখ লাগালো সেসিল। তার বেশ মজাই লাগছে।

পল ফিসফিস করে বলল, কিছু দেখতে পাচ্ছো ?

—হ্যাঁ, একটা মোটা লোক। সঙ্গের দু'জন শুকনো চেহারার।

—ওদের কি খুব রাগী রাগী দেখাচ্ছে ?

—না না। দিব্যি স্বাভাবিক।

মঁসিয় এনবো সশব্দে চেয়ারটা ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন। কফিটা নাকি বড্ড গরম, পরে খাওয়া যাবে। সবাইকে চুপচাপ থাকতে বলে দরজার দিকে পা বাড়ালেন। খাবার টেবলটা ঘিরে বসে থাকা কয়েকজন ভীতসন্ত্রস্ত মানুষ—একটু কান পাতলে তাদের হৃদপিণ্ডের ধুকপুকুনির শব্দও যেন শুনতে পাওয়া যায়।

* * *

[illegible]রের ওখানে আগের দিনই একটা সাধারণ সভা হয়ে গেছে। এতিয়েন

আর অন্যান্য সদস্যরা কয়েকজন প্রতিনিধি মনোনীত করেছে যারা ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

মায়ুর বউ সেদিন সন্ধ্যেবেলাই খবর পেল যে প্রতিনিধি দলে তার স্বামীও আছে। অমনি মেজাজ বিগড়ে গেল তার। এই বুড়ো বয়সে লোকটার ভীমরতি হল নাকি। বনে বাস করে বাঘের সঙ্গে বিবাদ করার কোনো মানে হয়? শেষে কাচ্চাবাচ্চা সব নিয়ে পথে বসতে হবে। আসলে মায়ু নিজেও খুব দায়ে পড়েই রাজী হয়েছিল। যত অত্যাচার, অবিচারই তারা ভোগ করুক না কেন, মালিকের সামনে ঘাড় গুঁজে রত খাওয়ার অভ্যেসটা যে মজ্জাগত। সাধারণত বউয়ের পরামর্শ কানে নেয় মায়ু, কারণ সাংসারিক আর পারিপার্শ্বিক যাবতীয় ভালমন্দ ব্যাপারে তার চোখ কান খোলা। কিন্তু এবারেই তার ব্যতিক্রম ঘটেছে।

অনেকক্ষণ ধরে মায়ুর বউ ঘ্যান ঘ্যান করছিল তার স্বামীর গোঁয়ার্তুমি নিয়ে। শেষে বিরক্ত হল মায়ু।

—চুপ করো তো! এই রকম একটা পরিস্থিতিতে কি তীরে এসে তরী ডোবাবো নাকি? সবাই আমার ওপর ভরসা করে আছে। এটুকু কর্তব্য আমায় করতেই হবে।

বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল মায়ুর বউ। শেষে বলল, তুমি ঠিকই বলেছো! তোমায় যেতেই হবে। কিন্তু জানো, আমাদের চরম সর্বনাশ ঘনিয়ে এসেছে।

পরদিন দুপুর বারোটায় খাওয়াদাওয়া মিটিয়ে নিল সকলে। কারণ আভতাজ-এ বেলা একটায় সকলের জমায়েত হবার কথা। সেখান থেকে মঁসিয় এনবোর বাড়ি যাওয়া হবে। ঘরে আছে শুধু আলু, মাখন বাড়ন্ত তাও ওইটুকুই রাতের সম্বল।

এতিয়েন মায়ুকে বলল, বুঝতেই পারছো, তোমার কথার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।

আবেগে গলার স্বর বুজে এল মায়ুর। তার ওপর এতটা নির্ভর করে এরা!

তার বউ বলল, না না, এতটা বোলো না। ও যাচ্ছে বলে আমি কিছু বলছি না। কিন্তু ওকে এই দলের পাণ্ডা হতে আমি কিছুতেই দেব না। এত লোক থাকতে আমার ঘরের মানুষের দিকেই বা তোমাদের এত নজর কেন?

এতিয়েন অগত্যা সব কিছু বিস্তারিত ভাবে বুঝিয়ে বলতে আরম্ভ করল—মায়ু সবচেয়ে ভালো শ্রমিক। সবাই ওকে খুব পছন্দ করে, সম্মান করে। ওর বিচার বিবেচনার ওপর সকলেরই আস্থা আছে। মায়ু যদি কোনো দাবী নিয়ে যায় মজুরদের তরফ থেকে তবে কর্তারা তা নিশ্চয়ই মাথা ঠাণ্ডা করে শুনবেন। প্রথমে ঠিক ছিল এতিয়েনই কথাবার্তা বলবে কিন্তু ও তো বেশীদিন মঁসুতে আসেনি। ওর মতামত তেমন প্রাধান্য পাবে না। আর মায়ু হল গিয়ে পাকা মাথা—আজন্ম এখানেই আছে। সবাই চায় মায়ুই যাক, এতিয়েন কেন শুধু শুধু তাতে বাদ সাধবে? মায়ু রাজী হয়েছে কারণ না হলে সেটা কাপুরুষের কাজ হত।

মায়্যুর বউ অধৈর্যভাবে হাত নাড়লো তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে।

—ঠিক আছে। তুমি যাও। অন্যদের জন্য যখন সব কিছু ছেড়ে শহীদ হতে যাচ্ছো, আমি কেন বাধা দেবো?

মায়্যু আমতা আমতা করছিল।

—কিন্তু আমি ঠিক গুছিয়ে কি আর কথা বলতে পারবো? যদি বোকার মতো কিছু বলে ফেলি?

যাই হোক, মায়্যুকে শেষ পর্যন্ত রাজী হতে দেখে খুশী হল এতিয়েন। পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, এতে তো ভয় পাবার কিছু নেই।

বুড়ো ঠাকুর্দা বোন্‌মর কথাগুলো গিলছিল। তার জখম পা দুটো সাবার মুখে। ধীর, মৃদু গলায় সে বলল, হ্যাঁ, যা মনে হয় বলে যেও—কিন্তু সেও ওই কিছু না বলারই সামিল হবে। এক জীবনে তো কম দেখলাম না। ও কিছুতেই কিছু হবার নয়। তোমার কথায় কেউ কানই দেবে না। চল্লিশ বছর আগে হলে ম্যানেজারের ঘরে ঢোকবার মুখেই গলাধাক্কা খেতে। সমাজ পাল্টেছে, এখন হয়তো ভদ্রতা করে ঢুকতে দেবে কিন্তু ঐ পর্যন্তই। একটা কাঠের দেওয়ালকে বললেও সে হয়ত বা শুনতো। আর ওরা হাতে কাঁচা টাকা পেয়েছে, গরীবের ওপর ছড়ি তো ঘোরাবেই।

ইতিমধ্যে সকলেরই খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। এতিয়েন আর মায়্যু বেরোবার জন্য পা বাড়ালো। বাইরে দেখা হল পিয়েরোঁ আর লেভাকের সঙ্গে। চারজন হাঁটা দিল স্থাসন্তরের দোকানের দিকে। কুড়িজন প্রতিনিধি সদস্য জমায়েত হবার পর কি কি নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা হবে সে ব্যাপারে প্রস্তাব গৃহীত হল। ঠাণ্ডা উত্তুরে বাতাস রাস্তার লোকগুলোকে যেন উড়িয়ে নিয়ে যায়। ঠিক দুটো আন্দাজ সকলে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে পৌছল।

চাকরটা প্রথমে সবাইকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। মালিকের সঙ্গে অত সহজে নাকি দেখা হবে না। আবার খানিক বাদেই সে ফিরে এল। সবাই বৈঠক-খানায় এসে দাঁড়ালো। হাজার হোক মনিবের ঘর। মজুররা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামাকাপড় পরেছে। নিখুঁত ভাবে দাড়ি কামিয়েছে, চুল আঁচড়িয়েছে। টুপিটা খুলে হাতে ঘষতে ঘষতে ইতিউতি দেখছে। ঘরটা দিব্যি গরম! কেমন সব সাবেকী আসবাবপত্র! কাঠের, রেশমের আর পুরনো সোনার নক্সাকাটা জিনিসগুলো যেন চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। বাইরে ঠাণ্ডায় এক পা হাঁটা যায় না, কি কষ্ট! অথচ ফায়ারপ্লেসের আগুনে ঘরটা কি সুন্দর গরম! মেঝের নরম কার্পেটে পা ডুবে যায়। এত সুখও কপালে ছিল? পাঁচ মিনিট পরই কিন্তু তাদের প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠল। বাইরের ওই কনকনে ঠাণ্ডা, হিমেল বাতাসই ভালো—এখানে জানলা দরজা সব বন্ধ, দম যেন আটকে আসে।

পরিপাটি পোশাক আর গাম্ভীর্যের হাল্কা আবরণ নিয়ে মঁসিয় এনবো হাজির হলেন।

—ও, তোমরা এসে গেছ? কি এত বিদ্রোহ, অ্যাঁ? আরে বোসো বোসো। তোমাদের সঙ্গে গল্প করতে আমার ভালোই লাগবে।

সবাই একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল। দু-চারজন সাহস করে বসেও পড়ল। তবে বেশীর ভাগই রইল দাঁড়িয়ে, যদি ঘরদোর নোংরা হয়ে যায়!

এরপর খানিকক্ষণ চুপচাপ। মঁসিয় এনবো আগুনের সামনে আরামকেদারাটা টেনে নিয়ে বসলেন। তারপর চটপট সকলের মুখগুলো দেখে নিতে লাগলেন। কে কে দলে আছে জেনে নেওয়া দরকার। পিয়েরোঁ একেবারে পেছনের সারিতে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে। এতিয়েন ঠিক সামনের সারিতে তাঁর সামনে বসে।

—বলো, তোমাদের কি বক্তব্য আছে।

এনবো ভেবেছিলেন, দলের পাণ্ডা হিসেবে এতিয়েনই কথা বলবে। কিন্তু তাকে অবাক করে মাহ্যু কথা বলতে শুরু করাতে তিনি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না।

—কি ব্যাপার, তুমি! তুমি আমাদের সেরা কর্মচারী। তোমার তো যথেষ্ট বিচার বিবেচনা আছে। ছেলেবেলা থেকেই এখানে কাজ করছ। ছি ছি, তুমিও যে শেষে এদের দলে ভিড়বে, এ আমি আশাই করিনি।

মাহ্যু মাটির দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎই কথা বলতে শুরু করল সে।

—স্যার, আমি খুব নির্বিরোধী লোক। আমার সহকর্মীরা চাইছে আমিই সকলের বক্তব্যটা আপনাকে জানাই। এটা আপনি ভাববেন না শুধু শুধু ঝামেলা বাড়াবার জন্য আমরা ধর্মঘট করছি। আসলে না খেতে পেয়ে মরাটা আর বরদাস্ত করা যাচ্ছে না। এখনও যদি আমাদের অসুবিধেগুলো আপনাদের না জানাই তবে বউ বাচ্চা নিয়ে বেঘোরে প্রাণ দিতে হবে। আর তো আমরা কিছুই চাই না, শুধু পেট ভরাবার মতো রুটিটুকু।

আস্তে আস্তে মাহ্যুর গলার জোর বাড়তে লাগল। তার সব ভয় সঙ্কোচ ভেঙে গেছে।

সে বলে চলল, এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে নতুন বেতনক্রমটা আমরা ঠিক মেনে নিতে পারছি না। আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে আমরা ঠিকমতো টিম্বারিং করছি না। আর এ অভিযোগ কিছুটা ঠিকও বটে। কিন্তু নিজেদের কথা ভেবেই আমরা ফাঁকি দিই। আসলে টিম্বারিং-এ এত সময় লাগে যে কয়লা তোলার পরিমাণও কম হয়। আর আমরা মজুরী কম পাই। আবার নতুন নিয়ম কার্যকরী করা হলে কয়লার ঝুড়ি পিছু মজুরী কমে গিয়ে টিম্বারিং অনুযায়ী মজুরী বাড়বে বটে কিন্তু তাহলেও আমাদেরই ক্ষতি। কারণ টিম্বারিং-এর কাজে মজুরীর অনুপাতে সময় আর খাটুনির পরিমাণ অনেক বেশী আর এতে আপনারা ঝুড়ি পিছু দু সেন্টিম করে আমাদের ঠকাচ্ছেন। আমরা সব হিসেব করে দেখেছি।

অন্যান্য মজুররা বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, ও ঠিকই বলেছে।

মঁসিয় এনবো জোরে হাত নাড়লেন বিরক্তির ভঙ্গিতে। তিনি চাইছিলেন এদের

জোর পেয়ে গেছে। নিজের গলার স্বরে নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছিল সে—মনে হচ্ছে ভেতরে অন্য কোনো শক্তিশালী মানুষ সব কথার যোগান দিয়ে যাচ্ছে। অভাব, অভিযোগ, আবেগ আর দুঃখের কথাগুলো লাভাস্রোতের মতো বেরিয়ে আসছে। অন্তহীন দারিদ্র্যের কথা, কঠোর পরিশ্রম আর কষ্টের কথা, বাড়িতে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার অনাহারে মৃতপ্রায় অবস্থার কথা—সে এ সব কিছুরই জলন্ত বিবরণ দিতে শুরু করল। পনেরো দিন অন্তর মাইনে। নুন আনতে পান্তা ফুরোয় এমনই অবস্থা। তারপর জরিমানা, মাইনে কাটা, অসুখবিসুখ এসব তো আছেই। কর্তৃপক্ষ কি চান সবাই বেঘোরে প্রাণ দিক?

মায়্যু তার বক্তব্য শেষ করল।—সুতরাং স্যার, বুঝতেই পারছেন আমাদের নিরুপায় অবস্থার কথা। এ ভাবে ভারবাহী জন্তুর মতো আমরা ধুঁকতে ধুঁকতে মরতে চাই না। মরতে যদি হয়ই, নিশ্চিন্তে বাড়ির বিছানায় শুয়ে শুয়ে মরব। সে ভাবে যদি না খেতে পেয়েও মরি, সেও অনেক বেশী নিরাপত্তার। আমরা কাজ বন্ধ করেছি। কোম্পানি এখন অভাব-অভিযোগগুলোর বিষয়ে ব্যবস্থা না নিলে আর একজনও খনিতে নামবে না। আমরা চাই মজুরীর হার আগে যেমন ছিল তেমনই থাকবে। টিম্বারিং-এর বাজে ছুতো বাদ দিন। বরং কয়লার ঝুড়ি প্রতি মজুরী পাঁচ সেন্টিম করে বাড়ান। এখন আপনারা সুবিচার করবেন কি না বা গরীবদের সহায় হবেন কি না সেটা আপনাদের ব্যাপার।

অন্য মজুররা সমস্বরে বলল, হাঁ, ও ঠিকই বলেছে। আমরা সবাই এ কথাই বলতে চাই। যা সত্যি, যা উচিত, আমরা তারই দাবী জানিয়েছি।

যারা মুখে কিছু বলেনি, তারাও ঘাড় নেড়ে সায় দিল। ঘরের আরামদায়ক আবহাওয়া সরে গেছে—এক মুহূর্তেই সেখানে যেন অসন্তোষের জমাট কালো মেঘ।

মঁসিয় এনবোর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তিনি চিৎকার করে বললেন, আমাকে কিছু বলার সুযোগ তো দেবে। প্রথম কথা, কোম্পানী যে ঝুড়ি প্রতি দু সেন্টিম করে লাভ রাখছে, এটা সর্বৈব মিথ্যে কথা। এস, হিসেব মেলানো যাক।

ব্যস্, তর্কাতর্কি বেধে গেল। মঁসিয় এনবোর উদ্দেশ্যই ছিল মজুরদের প্রতিনিধি-দলে একটা বিভেদ সৃষ্টি করা। তিনি পিয়েরঁকে ডাকলেন। সে হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। লেভাকও তীরে এসে তরী ডোবালো। সে নাকি এত সব খবরই রাখে না। মজুররা নিজেদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি শুরু করে দিল।

এনবো বললেন, তোমরা যদি সবাই একসঙ্গে চেঁচামেচি শুরু কর তাহলে তো ঠাণ্ডা মাথায় কোনো আলোচনাই করা যাবে না।

এতক্ষণে এনবো নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর মাথায় এক চিন্তা: তিক্ততা এড়িয়ে কি করে কোম্পানীর স্বার্থের গোছানো যায়।

এতিয়েনের ওপর থেকে চোখ সরাচ্ছিলেন না তিনি। এই ছোকরার মুখ দিয়ে [illegible]ার করা নিতান্তই দরকার। এইবার নিজ মূর্তি ধরলেন তিনি। হিসেবপত্তর [illegible] একেবারে খোলাখুলি আক্রমণ:

বুঝতেই পারছি কোন মাথা তোমাদের দুর্বুদ্ধি যোগাচ্ছে। কই, এতদিন তো কোনো অসন্তোষ ছিল না? তোমাদের বোধহয় বোঝানো হয়েছে যে এই রকম চাপে থাকলে আমরা তোমাদের মাথায় করে রাখবো। তোমরাই খনির মালিক হয়ে বসবে একদিন। তোমরা যে কি করে সমাজের দুষ্টু লোকদের খপ্পরে পড়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে চাইছ, তাই ভাবি। ওই আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘের সদস্য হয়েছ, তাই না?

এতিয়েন এতক্ষণে কথা বলল।

—আপনি ভুল করছেন স্যার। মঁস্যুর একজন মজুরও সদস্যপদে নাম লেখায়নি। কিন্তু আপনারা বাধ্য করলে প্রতিটি খনির প্রতিটি মজুর সংঘে নাম লেখাতে বাধ্য হবে। এখন যা ভালো বুঝবেন তাই করবেন।

ব্যস্। এরপর মঁসিয় এনবো আর এতিয়েনের মধ্যে কথাবার্তা চলতে লাগল। অন্য মজুররা একেবারে চুপ।

—ছাখো, কোম্পানি যথেষ্ট চেষ্টা করে তার মজুরদের যথাসম্ভব সুখ সুবিধে দেওয়ার জন্য। আর এই ব্যাপারে যদি তুমি ওদের খেপিয়ে তোলার চেষ্টা কর, তাহলে খুব ভুল করেছ। এই তো, এই বছরই কোম্পানি তিন লক্ষ ফ্রাঁ খরচ করেছে নতুন আবাসন তৈরি করার জন্য। তাতে নিশ্চয়ই আর যাই হোক কোম্পানির পকেট ভর্তি হয়নি? পেনসন, চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত আর বিনে পয়সায় জ্বালানীর কথা তো ছেড়েই দিলাম। তোমাকে দেখলে তো মনে হয় মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। মন দিয়ে কাজ করলে উন্নতিও করবে। তা কাজের দিকে নজর দিলেই তো পারে.। দলে পড়ে এ সব উটকো ঝামেলায় মাথা গলাও কেন? হাঁ হাঁ, আমি হ্রাসন্তরের কথাই বলছি। জানো তো, বেয়াদপির জন্যই শেষ পযন্ত ওকে চাকরিটা খোয়াতে হয়েছে। ওর ওখানে তো সব সময় আড্ডা হয়—কাজেই এসব দুর্বুদ্ধি যে ওই-ই দিচ্ছে তাও বুঝতে পারি। হ্রাসন্তর এই প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের কথা তোমাদের মাথায় ঢুকিয়েছে, তাই না? আমরা যদি বুঝতাম যে এতে সব দিক থেকে লাভ হবে তাহলে তো অনেক আগেই ব্যবস্থা করা যেত। কিন্তু এতে ক্ষতি বই লাভটা হচ্ছে কি? এই ধরনের ফাণ্ড ভবিষ্যতে আমাদেরই বিরুদ্ধে মজুরদের হাতের অস্ত্র হিসেবে কাজে লাগবে। এই ভেবেই আমরা এগোইনি। আর এ প্রসঙ্গে বলে নিই, কোম্পানি এই ফাণ্ডের ব্যাপারে তদন্ত করবে।

কথা বলার সময় মঁসিয় এনবোকে কোনো বাধা দিল না এতিয়েন। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল এনবোর দিকে। কিন্তু তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল। একটু কি দুর্বল লাগছে নিজেকে? শেষ কথাটা শুনে সে হাসল।

—এটা স্যর আপনাদের চিন্তাধারায় নতুন সংযোজন। কারণ আগে তো এমন কখনও হয়নি, তাই না? মানে এই তদন্ত-টদন্তের ব্যাপার। কিন্তু আমরা চাই কোম্পানি আমাদের ভালোমন্দ নিয়ে একটু কম মাথা ঘামাক। আমাদের সুখ নিয়ে চিন্তা না করে বরং যেটুকু ন্যায্য প্রাপ্য সেটুকু দিক। ধরুন, এমন যা [illegible]

তিনি বললেন, তড়িঘড়ি কোনো কাজ করবার আগে ভালো করে ভেবে দেখো।

সবাই চুপ। মঁসিয় এনবোর একটু হয়ত বা অস্বস্তি হল।

পিয়েরোঁ মাথা নীচু করে সম্ভাষণ জানালো। লেভাক টুপিটা মাথায় চাপিয়ে নিল। মাহ্যু ভাবছিল যাবার আগে ভদ্রতা করে কিছু বলবে। এতিয়েনের খোঁচা খেয়ে সে আশা ত্যাগ করতে হল। সবাই শীতল নীরবতার মধ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে এল একে একে। দরজা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

এনবো খাবার ঘরে ফিরে গেলেন। অতিথিরা তখনও চুপচাপ গম্ভীর হয়ে চেয়ারে বসে। দ্যলোঁ তাকে সংক্ষেপে সব কথা জানালেন। দ্যলোঁ্যাও হতাশ। ঠাণ্ডা কফি খেতে খেতে আলোচনার গতি পাল্টাবার চেষ্টা করলেন সবাই। কিন্তু গ্রেগোয়াররা বারবার ধর্মঘটের কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তুলতে লাগলেন। সবাই হতচকিত। এমনটা যে হবে, কেই বা ভেবেছিল। আচ্ছা, এমন কোনো আইন কেন নেই যে মজুররা কাজে ইস্তফা দিলেও তাদের কাঁধে জোয়াল চাপিয়ে কাজ আদায় করা যায়? পল নেগ্রেল সেসিলকে আশ্বাস দিল। তেমন হলে পুলিসে খবর দেওয়া হবে।

শেষ পর্যন্ত মাদাম এনবো চাকরকে ডেকে বললেন, ইপোলিত, আমরা বৈঠকখানায় যাবার আগে জানলাগুলো সব খুলে দাও তো, ঘরের গুমোট ভাবটা কাটুক।

* * * *

পনেরো দিন কেটে গেছে তৃতীয় সপ্তাহের শুরুতে অর্থাৎ সোমবার ম্যানেজারের কাছে আরও নতুন তালিকা এসে পৌছল। তালিকায় সেইসব মজুরদের নাম যারা ধর্মঘটের সামিল হয়েছে সবাই আশা করেছিল শ্রমিক-মালিক সমঝোতা হবে, ভেবেছিল আবার কাজ শুরু হয়ে যাবে কিন্তু কর্তৃপক্ষের একগুঁয়েমিতে মজুররা ক্ষুব্ধ। ল্য ভোর্য়, ক্রেভক্যর, মিত্রু আর মাদলেন—শুধু এগুলোতেই যে কাজকর্ম বন্ধ হয়েছে তা নয়, লা ভিক্তোয়ার আর ফ্যুত্রি কঁ্যতে-র মোট মজুর সংখ্যার এক-চতুর্থাংশও কাজে যাচ্ছে না। এমন কি সেন্ট টমাসেও হাওয়া গরম। দাবানলের মতো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় আগুনটা ছড়িয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

ল্য ভোর্য়র পুরো এলাকায় যেন কবরখানার নিস্তব্ধতা। বড় বড় বাষ্প্রসে চিমনিগুলোর খিদে মিটে গেছে। সব কিছু কেমন শান্ত, নির্জীব। খোলা আকাশের নীচে তিন-চারটে কয়লা তোলার টব এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে। শেডের সব খড়খড়িগুলো বন্ধ। হেড গীয়ারের একটানা ঘর্ঘর শব্দ কতদিন কানে আসে না। বয়লারের ঘরটা ঠাণ্ডা বরফের মতো। ওয়াইণ্ডিং ইঞ্জিনটা সকালের দিকে খানিকক্ষণ চালু থাকে। কারণ মালবাহী পশুগুলোর খাবার অন্য জায়গা দিয়ে তাদের রক্ষকদের নীচে নামতে হয়। তাছাড়া ঠিক মজুর নয় এমন কয়েকজনকে এখন খনিগর্ভে নেমে সাধারণ মজুরদের কিছু কিছু কাজ চালাতে হচ্ছে। বলা তো যায় না, যদি কখনও কোনো দুর্ঘটনা ঘটে গিয়ে খনির ভেতরে কোনো রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। সেদিকে তাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয় সব সময়। কানে আসে শুধু নিকাশী-পাম্পের একঘেয়ে

বড় রাস্তার ওধারে দু'শো চল্লিশ নম্বর কালোনীতেও কোনো প্রাণের সাড়া মেলে না। পুলিস এসেছিল যদি প্রয়োজন হয় অবস্থা আয়ত্তে আনবার জন্ত। কিন্তু পরিস্থিতি এতই শান্ত যে তারাও ফিরে গেছে। পুরুষমানুষগুলো সব সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমোয় যাতে ইচ্ছে হলেও শুঁড়িখানায় যেতে না পারে। তাদের স্ত্রীরা অনেক বেশী অর্থকষ্টে আছে বটে কিন্তু আগের চেয়ে অনেক সহনশীল হয়েছে। নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটিও কম করে। অবস্থাটা বাচ্চারাও যেন বেশ বুঝতে পেরেছে। ওরা আস্তে আস্তে কথা বলে, খেলা করে, নিজেরা মারামারি করে না।

লক্ষ্য সকলের একটাই: শান্তিপূর্ণ বিরোধিতা।

মায়্যদের বাড়িতে অবশ্য সর্বক্ষণই মানুষের আনাগোনা। এই বাড়িটাকে এতিয়েন সমিতির প্রধান কার্যালয় করেছে। তহবিল থেকে পরিবারপিছু প্রয়োজনমতো অর্থ-সাহায্য দেওয়া হয়। দু চারটে বাইরের সমিতি থেকেও কয়েকশো ফ্রঁ। অর্থসাহায্য এসেছে। তবে আস্তে আস্তে তো পুঁজি ফুরিয়ে আসে। পুরুষমানুষগুলো যে ধর্মঘট করবে তার জন্ত তো কিছু রেস্ত দরকার। 'খিদে' নামের রাক্ষসটা চেপে বসেছে সকলের গলার ওপর। মেইগ্রা প্রথমে বলেছিল পনের দিনের খাবারদাবার ধারে দেবে। কিন্তু এক সপ্তাহ পরেই ব্যবসার ক্ষতি হবে বুঝতে পেরে চশমখোরটা জিনিসপত্র ধারে দেওয়া বন্ধ করেছে। অবশ্য এর পেছনে হয়ত কোম্পানি-কর্তৃপক্ষের হাত আছে কারণ মেইগ্রা জিনিসপত্র দেওয়া বন্ধ করে দিলে সকলে না খেতে পেয়ে সুড়সুড় করে খনির কাজে যোগ দেবে। মেইগ্রা এমনই হারামজাদা লোক যে মেয়ে-খরিদ্দারদের চেহারা আর স্বাস্থ্য অনুযায়ী জিনিসপত্র ধার দেওয়াতে রকমফের করে। মায়্য-গিন্নীকে জিনিস দেওয়া তো একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছে। ক্যাথরিনকে তার কাছে পাঠানো হয় না বলে মহা রাগ। বোঝার ওপর শাকের আঁটি হয়েছে যে কয়লার পরিমাণ ঘরে ঘরে কমে এসেছে। এদিকে হাড়-কাঁপানো শীত। আর কাজে যোগ না দিলে কয়লাও পাওয়া যাবে না। এটাও সবাই বোঝে। শুধু না খেতে পেয়ে মরা নয়, শীতে জমে শুকিয়ে মরতে হবে এবার।

মায়্যদের চরম দুর্গতি চলছে। লেভাকরা তবুও কিছু না কিছু খেতে পাচ্ছে কারণ বুতলুর ভাড়াটা তো ঠিকমতো পাচ্ছে। পিয়েরোঁদের অবস্থাও ততটা খারাপ নয় কিন্তু পাছে কেউ ধার চায় সেই ভয়ে তারা হাভাতের মতো দিন কাটাচ্ছে। মেইগ্রার কাছে তারাও ধারে জিনিস কেনে—তবে পিয়েরোঁর বউয়ের সামান্তত্তম স্পর্শ পাওয়ার জন্ত মেইগ্রা তার ব্যবসা লাটে তুলতেও রাজী আছে।

শনিবার নাগাদ অবস্থা এমনই হল যে অনেক বাড়িতেই হাঁড়ি চড়ে না। সবাই বুঝতে পারছে ঘোর দুর্দিনের মুখোমুখি হতে হবে কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো অভিযোগ নেই। সবাই দলপতির নির্দেশ পালন করে চলেছে মুখ বুজে, যন্ত্রের মতো। সমস্ত দুঃখ কষ্ট আর যন্ত্রণার বিনিময়ে এ এক অদ্ভুত বর্ণোজ্জ্বল আত্মসমর্পণ। সোনালী ভবিষ্যতের আশায়, তা যতোই সুদূর হোক না কেন, সবাই একই সঙ্গে বুক বেঁধেছে অসীম সাহসে। খিদের দম যেন বন্ধ হয়ে আসে। চাওয়া-পাওয়ার সঙ্কীর্ণ দিগন্তরেখা

চোখের সামনে হঠাৎই যেন আজ সুবিশাল হয়ে ধরা দেয় নতুন সূর্যের মায়াবী আলোয়। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ···তবু···এ যে···নতুন জগৎ—সুখের, স্বপ্নের যেখানে দু'টুকরো রুটির অভাব নেই, বঞ্চনার গ্লানিও নেই···ফিরে যাবার পথও নেই। অনেক—অনেকদূর এগিয়ে গেছে সবাই, প্রতিরোধের কাঁটাতারের বেড়া ভেঙে, রক্তাক্ত শরীরে এগিয়ে চলা শুধু।

তহবিলের টাকা প্রায় শেষ। কোম্পানি-কর্তৃপক্ষ উদাস, নিষ্ঠুর। তবুও মজুররা নিজেদের অভিযোগ আর অধিকারের খুঁটিটা আঁকড়ে ধরে আছে দু হাতে, অসীম মমতায় আর দৃঢ় আত্মবিশ্বাসে। দু'বেলা জলটুকু ছাড়া পেটে দেবার কিছু নেই। সবাই যেন কি একটা ঘোরের বশে একে অন্যকে মদত জুগিয়ে যায়।

এতিয়েন সর্বসম্মতিক্রমে নেতা নির্বাচিত হয়েছে। নানা ধরনের বই পড়ে পড়ে এখন সব রকম আলোচনায় সে দিব্যি পোক্ত হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যেবেলায় যখন বৈঠক বসে, সে একাই কেমন গড়গড় করে বক্তৃতা দিয়ে যায়।

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে সে পড়াশুনো করে। বিভিন্ন জায়গা থেকে তার নামে তাড়া তাড়া চিঠিপত্র আসে। একটা বেলজিয়ান সমাজতান্ত্রিক কাগজের গ্রাহক পর্যন্ত হয়েছে সে। কলোনীর সমস্ত লোক তাকে সম্মান করে, অন্য চোখে দেখে। তার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা দেখে সে নিজেই অবাক হয়ে যায়। সমস্ত কয়লাখনি অঞ্চলের ধর্মঘটটা সে দিব্যি কেমন ঠাণ্ডা মাথায় হিসেব কষে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। শুধু একটা বিষয়েই এখনও অস্বস্তি হয়। কেতাদুরস্ত ভদ্রলোকদের সঙ্গে যেন ঠিক মন খুলে কথাবার্তা বলতে পারে না। আসলে স্কুল-কলেজে নিয়মমাফিক পড়াশুনো করেনি তো—তাই নিজেরই কেমন বাধো-বাধো ঠেকে। এই হীনমন্যতার হাত থেকে বাঁচবার জন্য আরও বই পড়তে শুরু করে কিন্তু তাতে দেখা যায় অনেক কিছু সে না বুঝেই জেনে ফেলেছে। যখন নিজের দোষত্রুটি, কাজকর্মের ফলাফল সে মনে মনে যাচাই করে, বড় ভয় হয় তার। সে ঠিক পথে এসেছে তো? তার মুখ চেয়ে বসে থাকা এই সব সরল মানুষগুলোর বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে পারছে তো? এক এক সময় তার মনে হয় একজন আইনজীবী হয়তো এ কাজ আরও অনেক ভালোভাবে করতে পারতো। তারপরই মনে হয়, না না, মজুরদের ভালোমন্দ মজুররাই ভালো বুঝবে। উকিলগুলো রক্তচোষা—খালি টাকার শ্রাদ্ধ! বলা যায় না, এই ভাবেই সে হয়তো একদিন বড় হবে, সুনাম প্রতিপত্তি হবে, সারা অঞ্চলের লোক এক ডাকে তাকে চিনবে, মন্ত্রিসভার সদস্যপদ···আঃ সবাই বলবে, দ্যাখো দ্যাখো, শ্রমিকদের জন্য লড়াই করে সর্বহারার নেতা আজ ক্যাবিনেটে নিজের জায়গা করে নিয়েছে। ও আমাদের সকলের নেতা, জনগণের নেতা।

প্লুশার ঘন ঘন চিঠি লিখছে এতিয়েনকে—প্রয়োজন হলে সে নিজে এসে এতিয়েনের পাশে দাঁড়িয়ে তাকে মদত দেবে। একটা গোপন সভা হোক এতিয়েনের নেতৃত্বে। আসলে প্লুশার চাইছে এইভাবে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমিতির সভ্যসংখ্যা বাড়াতে। এতিয়েন হয়তো প্লুশারকে আসতেও বলতো যদি রাসনর এর বিরোধিতা

না করত। আর এখনও হ্রাসন্তরের সমর্থক মজুরের সংখ্যা নগণ্য নয়। কাজেই এতিয়েন চায় না হ্রাসন্তরকে চটাতে।

সোমবারের কথা। বিকেল চারটে আন্দাজ লিল থেকে এতিয়েনের কাছে আরও একটা চিঠি এল। তখন নীচের ঘরে সে আর মায়্যু-গিন্নী ছাড়া কেউ নেই। ঘরে বসে থেকে মায়্যুর হাতে পায়ে খিল ধরে গিয়েছে—তাই সে গেছে মাছ ধরতে। যদি কপাল ভালো হয় তবে মাছ বেচে রুটির যোগাড় হবে। বুড়ো বোন্‌মর আর জঁল্যাঁ তাদের সেরে ওঠা পায়ের জোর পরখ করতে রাস্তায় বেরিয়েছে। ছোট বাচ্চারা আলজিরের কাছে। মায়্যু-গিন্নী জামার বোতাম খুলে বাচ্চা এস্তেলকে দুধ খাওয়াচ্ছে।

এতিয়েন চিঠি পড়ে ভাঁজ করে রাখলো।

মায়্যু-গিন্নী বলল, কি খবর? আমাদের জন্য টাকাপয়সা আসছে কি?

এতিয়েন মাথা নাড়লো।

—বলো তো এতিয়েন, সপ্তাহটা চালাই কি ভাবে? যে ভাবেই হোক, দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়াই আমাদের চালিয়ে যেতেই হবে, তাই না? সত্যের সহায়তা আমরা পেয়েছি—এখন আর মরতে ভয় কি? শেষ পর্যন্ত আমরাই জিতে যাবো, কি বলো?

মায়্যু-গিন্নী এখন কিছুটা সমর্থন করে ধর্মঘট। আসলে যদি এমন হত যে কাজকর্ম করেও সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া যেত, তাহলেই সবচেয়ে সুখের হত। কিন্তু যেভাবেই হোক, একবার যখন কাজ বন্ধ হয়েছে তখন দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আপোষহীন লড়াই চালিয়ে যেতেই হবে। হেরে গিয়ে মাথা নীচু করার চেয়ে না খেতে পেয়ে মরে যাওয়াও ভালো।

এতিয়েন বলল, যদি এমন হত, কলেরায় এইসব 'কর্তৃপক্ষ' নামে রক্তবীজের দল ঝাড়ে বংশে নিকেশ হয়ে যেত!

—না না, অন্য লোকের মৃত্যুকামনা করাটা ঠিক নয়। তাতে আমাদের লাভ তো নেই কিছু। এক দল যাবে, আর এক দল আসবে। আমি শুধু চাই ওরা একটু ঠাণ্ডা মাথায় আমাদের অবস্থাটা বিবেচনা করুক। ওরা কত লেখাপড়া শিখেছে, নানা রকম বইপত্তর পড়ে, তাও মনের দিক থেকে এত ছোট কেন? তবে তোমার এই রাজনীতির দিকটা আমার ঠিক পছন্দ হয় না।

আসলে মায়্যু-গিন্নী নানাভাবে এতিয়েনের মতামতের প্রতিবাদ করেছে। মজুরী বাড়ানোর জন্য বিক্ষোভ কর, ঠিক আছে কিন্তু তাতে দেশের রাজনীতি, মন্ত্রীদের বড় বড় কথা—এগুলো আনা কেন? একেই তো সমস্যার অন্ত নেই, তার ওপর অকারণে বড় বড় বুকনি ঝেড়ে জল ঘোলা করা শুধু! যাক গে, যতক্ষণ মদ খেয়ে হল্লা না করছে আর মাসে মাসে পঁয়তাল্লিশ ফ্রাঁ ভাড়া দিয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ তারই বা মেয়েছেলে হয়ে যা বোঝে না, জানে না, সে কথায় কথা বলার কি দরকার! পুরুষমানুষ যতক্ষণ নেশাভাং না করে, ততক্ষণ তার সাত খুন মাপ।

ক্যাথরিনের মাকে বোঝাতে চেষ্টা করল এতিয়েন—এ ভাবে রাজনীতি না করলে

সকলের সমান অধিকার আসবে না। কিন্তু মহিলা বোঝবার পাত্রই নয়। তার মনে আছে বিয়ের পরের সেই দুঃখের দিনগুলোর কথা। এতিয়েনকে বলে যাচ্ছিল সেইসব কথা বিষণ্ণ স্বরে। এস্তেল ঘুমিয়ে পড়েছে মায়ের কোলে। এতিয়েন মাহ্যু-গিন্নীর বিশাল স্তনের ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছিল না। এদিকে না খেতে পেয়ে সমস্ত শরীর শীর্ণ হয়ে গেছে, চামড়া কুঁচকে হলদে হয়ে গেছে তবুও বুক দুটো···

মাহ্যু-গিন্নী ফিসফিসে গলায় বলল, ১৮৪৮ সাল। আমরা একটা ফুটো পয়সারও মালিক ছিলাম না। সব খনিতে কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে যে কি ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের দিন, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।

হঠাৎই ঘরের দরজাটা খুলে গেল। দু'জনেই অবাক চোখে দেখল দরজায় ফ্রেমে আঁটা ছবির মতো দাঁড়িয়ে আছে ক্যাথরিন। শাভালের সঙ্গে ঘর ছাড়ার পর এই প্রথম তার বাড়িতে আসা। থরথর করে কাঁপছিল ক্যাথরিন। ভেবেছিল বাড়িতে মাকে একলা পাবে কিন্তু এতিয়েনকে দেখে তার সব বোধশক্তি যেন হারিয়ে গেছে এত দিন ধরে যা যা কথা বলবে বলে মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল, সব ভুলে গেছে সে।

ওর মা রূঢ় গলায় বলে, কি চাই এখানে? সব সম্পর্ক তো চুকিয়ে ফেলেছিস হারামজাদী!

ক্যাথরিন আমতা আমতা করে বলল, মা, খানিকটা কফি আর চিনি এনেছি· বাচ্চাদের জন্য বাড়তি খেটে কিছুটা পয়সা পেয়েছিলাম।

এক পাউণ্ড কফি আর পাউণ্ডখানেক চিনি টেবিলে রাখতে গেল ক্যাথরিন। ল্য ভোরয়াতে ধর্মঘট শুরু হবার পর থেকে বাড়ির সকলের কথা ভেবে দারুণ দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে তার আর সেই সঙ্গে খানিকটা অপরাধবোধও ·তার পরিবারের সবাই না খেয়ে দিন কাটাচ্ছে আর জাঁ-বার খনিতে সে তো দিব্যি কাজ করে যাচ্ছে। এ ছাড়া বাবা-মাকে সাহায্য করার উপায় যে আর কি আছে তা তার মাথায় আসেনি ·কিন্তু মাহ্যু-গিন্নী ওসবে ভোলার পাত্রীই নয়।

—এভাবে লোকদেখানো উপহার না এনে বাড়িতে থেকে দু'পয়সা রোজগার করলে তো আমাদের মুখে চুনকালি পড়ত না।

ব্যস্! এরপর সে কি বাক্যযন্ত্রণা আর গালিগালাজ! মেয়ে সম্বন্ধে এ যাবৎ যত কথা মায়ের মনে এসেছে—সব বিষটুকু ঢালতে লাগল সে। একটা লোকের সঙ্গে ঘর ছাড়তে মনে এতটুকু বাধলো না মেয়ের? তাও কিনা বয়েস যখন মাত্র ষোলো বছর আর সারা পরিবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে? বোকামি করে কোনো কাজ করলে তা ক্ষমা করা যায় কিন্তু এ তো ঠকানো, বঞ্চনা করা! যদি বা বলে-কয়ে যেত তাও সইত কিন্তু কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি। অথচ ওকে তো অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল! বিনিময়ে সবাই শুধু চেয়েছিল ও আরও কিছুদিন মা-বাবার সঙ্গে ·থাকুক, অন্তত রাতে নিজের বাড়িতে শুতে আসুক।

—বল, বল হারামজাদী, কি এমন হল যে এই বয়সেই তোকে ঘর ছাড়তে হল?

টেবিলের ধারে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিল ক্যাথরিন। তার সমস্ত শিরদাঁড়া বেয়ে ভয় আর অপমানের একটা ঠাণ্ডা কনকনে অনুভূতি নেমে যাচ্ছে।

—মা মাগো, তোমরা খালি খালি আমার দোষ দাও কেন? আমি তো এমনটা চাইনি। আমার কষ্ট হয়। শাভাল পুরুষমানুষ। সব কিছু সে গায়ের জোরে আদায় করে নিতে পারে। তাকে বাধা দেবার মতো মনের জোর কই আমার? যা হবার তা তো হযেই গেছে। ও এখন আমায় বিয়ে করবে বলেছে।

নিজের হয়ে ওকালতি করছিল ক্যাথরিন। চিরকালই তো মেয়েরা পুরুষমানুষের দাসত্ব করে এসেছে—তাহলে সে কি দোষ করল? ছোটবেলা থেকেই দেখে এসেছে জঞ্জালের স্তূপের পেছনে কত কিশোরীকে ধর্ষণ, মাটির পুতুল নিয়ে খেলার বয়েস পেরোতে না পেরোতেই মেয়েদের কোলে একটা জ্যান্ত পুতুল এসে যাওয়া, কপাল ভালো হলে 'বিয়ে' নামের স্বপ্ন সফল হওয়া ব্যস্। এ ছাড়া জীবনে আছেই বা কি? তবু এতিয়েনের সামনে ও লজ্জা পাচ্ছে। মনে হচ্ছে তার নিজের মা একজন বাইরের লোকের সামনে মেয়েকে বেশ্যারও অধম বানিয়ে দিল।

এতিয়েন এর মধ্যে নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে পড়েছে। আগুনের চুল্লীটা অকারণে খানিক খোঁচাচ্ছে। সে বুঝেছে ক্যাথরিন তার সামনে অপ্রস্তুত হচ্ছে। একবার চোখাচোখিও হল। ইস্, কি ফ্যাকাশে চেহারা হয়েছে মেয়েটার · কিন্তু এখনও কি সুন্দর, কোমল আর মায়াবী চোখ দুটো। হঠাৎ অদ্ভুত আবেগে মনটা ভরে উঠল এতিয়েনের। আহা, ও সুখী হোক, ওর ভালোবাসার জনকে কাছে পেয়ে। যদি ক্ষমতা থাকত, এতিয়েন জোর করে সমস্ত মজুর লোকদের, যারা ক্যাথরিনের বিপক্ষে, ওর পায়ের তলায় এনে ফেলে দিত। ক্যাথরিন কিন্তু ভাবছে এতিয়েন ওকে দয়া দেখাচ্ছে, তার দৃষ্টিতে যেন শুধুই অনুকম্পা। দুঃখে, অপমানে হঠাৎই চুপ করে গেল ক্যাথরিন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ পোড়ারমুখি, বড় মুখ করে আর কথা বলতে আসিস না। যদি সারা জীবনের জন্য এই ছাদের তলায় ফিরে আসতে পারিস তবেই আয়, নইলে দূর হয়ে যা। কোলে বাচ্চাটা আছে তাই, নইলে আমি লাথি মেরে তোকে

কেঁপে উঠল ক্যাথরিন। সত্যিই কেউ তাকে লাথি মেরেছে পেছনে। ব্যথায় ককিয়ে উঠল সে। শাভাল। খোলা দরজা দিয়ে লাফিয়ে ঘরে ঢুকেছে। খানিক আগে থেকেই বাইরে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল শাভাল।

ক্যাথরিনের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল শাভাল।

—কুত্তী কোথাকার! ঠিক এখানে এসে ভিড়েছিস। বাজারের মেয়েছেলে, বারোভাতারি—দশটা পুরুষমানুষ না হলে তোর মন ওঠে না, না? আমার পয়সায় বাপের বাড়ির লোকদের কফি খাওয়াবি আবার অন্য লোকের সঙ্গে বিছানায় শুবি?

মায়্যু-গিন্নী আর এতিয়েন এত অবাক হয়ে গেছে যে কিছু বলতেই পারছে না। শাভাল ধাক্কা দিতে দিতে ক্যাথরিনকে দরজার দিকে নিয়ে গেল।

—বেরো, বেরো বলছি। আর মায়্যু-গিন্নী, তোমাকেও বলি, মেয়ের শরীর বেচা

পয়সায় ভালোমন্দ খেতে বেশ লাগে, না? ওরা ফুর্তি করে আর তুমি মা হয়ে তাই পাহারা দাও! না কি মেয়েকে না পেলে এ ছোঁড়ার মায়ের সঙ্গেই পিরীত চলে, অ্যাঁ? জামাকাপড়ের অবস্থা ছাখো না। ছি ছি! থুথু দিতে হয় গায়ে। যা পাই তাই সই, না এতিয়েন? একটা মেয়েছেলের শরীর হলেই হল!

মায়্যুর বউ শাভালকে দেখে বুকের কাপড়টা টানতেও ভুলে গিয়েছিল। এত চিৎকারেও এস্তেলের ঘুম ভাঙেনি। এতিয়েন মারতে গেল শাভালকে। কিন্তু শুধু শুধু লোক-জানাজানি করে লাভ কি? দু'জনেই দু'জনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে···চোখে জ্বলন্ত দৃষ্টি। এত দিনের সুপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা নতুন করে দানা বাঁধতে শুরু করেছে। পারলে দু'জনেই দু'জনকে খুন করে ফেলবে।

দাঁতে দাঁত চেপে এতিয়েন বলল, সাবধান শাভাল! মুখ সামলে কথা বলো।

—আরে যা যা, কত দেখলাম।

ক্যাথরিন তার প্রেমিকের হাত ধরে টানতে টানতে বেরিয়ে গেল।

এতিয়েন দরজাটা জোরে বন্ধ করে দিয়ে বলল, কি ছোটলোক রে বাবা!

মায়্যুর বউ নির্বাক হয়ে চেয়ারে বসে ছিল। আজ চড়ান্তভাবে অপমানিত হয়েছে সে। এতিয়েন ভাবছিল: আজ অকালবার্ধক্যে মায়্যু-গিন্নী জীর্ণ হয়ে গেছে কিন্তু বয়েসকালে সত্যিই সুন্দরী ছিল। জামার বোতাম আস্তে আস্তে বন্ধ করল মায়্যুর বউ। তারপর ক্লান্ত গলায় বলল, শুয়োর একটা! একটা নীচ জানোয়ার ছাড়া কেউ এভাবে কথা বলতে পারে? ওর কথার উত্তর দেওয়া মানে নিজেরই মান খোয়ানো। জানো এতিয়েন, বলছি না যে আমি খুব ভালো বা সতী সাবিত্রী। দু'জন পুরুষ আমার এ শরীরটাকে ভোগ করেছে। একজন···যখন আমার পনেরো বছর বয়স, তারপর আমার স্বামী মায়্যু। ও আমায় বিয়ে না করলে আমি হয়তো অন্ধকারেই হারিয়ে যেতাম। বিয়ের পর অন্য কোনো পুরুষমানুষকে সঙ্গ দিইনি। তার কারণ এও হতে পারে যে আমি সেই সুযোগ পাইনি। অনেক প্রতিবেশীর বউরা তো স্বামী থাকতেও·· যাকগে।

—তা ঠিক।

এতিয়েন বাইরে বেরোল। মায়্যু-গিন্নী এস্তেলকে শুইয়ে দিল সাবধানে। আজ মাছ ধরতে পারলে কিছু পয়সা ঘরে আনবে তার স্বামী।

বাইরে রাত বাড়ছে। এতিয়েন মাথা নীচু করে হাঁটছিল। সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। শাভালের ওপর রাগ, ক্যাথরিনের প্রতি দয়া···এটাই শুধু নয়, হঠাৎই এই অশিক্ষিত সরল জাতটার প্রতি সমবেদনায় বুকটা ভরে উঠল। ঘরে ঘরে সবাই না খেতে পেয়ে মরছে। হায় ভগবান, এ কি দায় সে ঘাড় পেতে নিল! শেষ পর্যন্ত পারবে কি নিজের মান রাখতে? কিন্তু সবাই যদি শেষে হেরে যায়? বাচ্চারা মরছে, মায়েদের কান্না, পুরুষগুলো মাথা নীচু করে খনিতে যাচ্ছে···চোখের সামনে অদূর ভবিষ্যতের ছবিগুলো যেন পরপর ভেসে উঠল। ওঃ, এত কষ্টের জন্য সেই-ই ভোগাদী!

হাঁটতে হাঁটতে ল্য ভোর‍্যুর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এতিয়েন। কেমন নিশ্চুপ, নির্জীব জায়গাটা! আজ কতদিন হল এখানে প্রাণের স্পন্দন নেই। তা হোক, দেখা যাক কে জেতে—টাকা না পরিশ্রম! কিন্তু জয়ের জন্য যে দামটা ধরে দিতে হবে তা যে বড় বেশী। মরতে ভয় নেই তবু বিনাযুদ্ধে এক কণা মাটিও ছাড়বো না। নতুন করে মরারই বা কি আছে! অন্যায় অবিচারের দৌলতে সকলে তো তিলে তিলে মরছিলই। সেই মরার আগেই একবার নতুন করে জ্বলে ওঠা। বাঁচবার জন্য শেষবারের মতো জেহাদ ঘোষণা।

শত্রুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য কত লোক তো নিজেদের প্রাণের চেয়েও প্রিয় শহরকে নিজের হাতে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। কত মা তো নিজের সন্তানকে দাসত্ব করতে না দিয়ে নিজের হাতে আছাড় মেরে ফুটপাতে তাদের মাথা চৌচির করে দিয়েছে। কত মানুষ তো অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে অনশন করে প্রাণ দিয়েছে। মনটা উৎসাহে ভরে গেল তার। ছি ছি, এতক্ষণ কি সব ভেবে ভয় পাচ্ছিল সে। সব বুর্জোয়া পুঁজিপতির দল একদিন মজুরদের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে, আর সেই দিন মজুরদের নেতৃত্ব দেবে সে নিজে

মায়্যুর গলার স্বরে চমক ভাঙলো তার। চমৎকার ট্রাউট মাছ ধরেছিল সে। বেচে তিন ফ্রাঁ পেয়েছে। অর্থাৎ রাতে খাওয়াটা জুটছে আজ। মায়্যুকে ঘরে ফিরতে বলল এতিয়েন। তারপর আভঁতাজ-এ গিয়ে বসল। খদ্দেরের ভিড় একটু হালকা হতে সরাসরি রাসন্যরকে বলল, প্ল্যুশারকে একবার আসতে লিখি। একটা গোপন সভা হোক। সকলে হাতে হাত মিলিয়ে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমিতির সদস্য হই। দলের জোর বাড়লে জয় নিশ্চিত

* * * *

বিধবা মহিলা দিস্যির-এর বাড়িতে এক সভার ব্যবস্থা হল বৃহস্পতিবার বেলা দুটোয়। মহিলাটি তো সাংঘাতিক রেগে আছে—খনির লোকগুলোর রোজগারপাতি না হওয়ায় তার ব্যবসাতেও মন্দা যাচ্ছে। এই রকম যাচ্ছেতাই ধর্মঘট করার মানেটাই বা কি? পাঁড় মাতালগুলো পর্যন্ত এক ফোঁটা মদ না গিলে বাড়িতে বউয়ের আঁচলে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। আগে আগে এই অঞ্চলে হৈ-হুজ্জুতির সীমা থাকত না—এখন যেন এখানে শ্মশানের নিস্তব্ধতা। সেই সফেন বীয়ারের ছলকানি নেই, নর্দমাগুলো শুকনো—শুধু মদের দোকানের মেয়েগুলোর খদ্দেরের আশায় সতৃষ্ণ চাউনি ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না। সার সার দোকানগুলোয় একটাও খরিদ্দার নেই, একমাত্র সেণ্ট-এলোয়া ছাড়া—সেখানে বড়বাবুরা মাঝে মাঝে ফুর্তি করতে আসেন, দু চার বোতল ওড়ে। ভলকাঁর বেশ্যা মেয়েগুলো দর কমিয়ে প্রায় অর্ধেক করে ফেলেছে, কিন্তু কই? তবুও তো সন্ধ্যের অন্ধকারে কোনো পুরুষ চুপিসাড়ে এসে উঁকি মারে না!

দিস্যির দু উরুতে চাপড় মারলো

—হে ভগবান! সব অনাসৃষ্টির জন্য পুলিসগুলোই দায়ী। হ্যাঁ হ্যাঁ, কেউ আমায় ধরে হাজত ঘরে পুরলেও সত্যি কথা বলতে আমি ডরাই না।

দিস্থিরের কাছে সব বড়বাবুরাই পুলিস—অর্থাৎ সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের শত্রু। তাই এতিয়েনের প্রস্তাব সে সানন্দে মেনে নিয়েছে। তার পুরো বাড়িটাই তো খনির মজুরদের জন্য—সে বিনা ভাড়ায় নাচ ঘরটা সভার কাজে নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবে সেই-ই সবাইকে নেমন্তন্ন করবে। যদি পুলিস বাধা দেয়, সে-ও বড় শক্ত মেয়েমানুষ। তাকে পঞ্চাশটা হাতে লেখা চিঠি এনে দিল এতিয়েন। ওগুলোর নীচে দিস্থির-এর নাম সই করে পাঠাতে হবে—কিছু সমিতি সদস্যদের, কিছু বা অন্য খনির শ্রমিকদের। কলোনীতে যারা যারা লিখতে পড়তে জানে, তারাই সবাই মিলে চিঠিগুলো লিখে দিয়েছে। সভায় আলোচনার বিষয় হল ধর্মঘট ক'দিন চলবে। আসলে আরও একটা উদ্দেশ্য আছে—প্ল্যুশার এসে পড়তে পারে আর তাহলে তার নরম গরম বক্তৃতা শুনে অনেকেই আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমিতিতে নাম লেখাবে।

বৃহস্পতিবার সকালে খুব দুশ্চিন্তায় ছিল এতিয়েন। প্ল্যুশার এসে পৌঁছয়নি। যদিও সে আগেই তার করে জানিয়েছিল যে বুধবারেই পৌঁছে যাবে কিন্তু হলটা কি? আগে এসে গেলে এখানকার পরিস্থিতিটা এতিয়েন তাকে সভা আরম্ভ হবার আগেই বুঝিয়ে বলতে পারতো। যাক, সকাল ন'টার মধ্যেই এতিয়েন মঁস্যুতে পৌঁছে গেল। কে জানে, প্ল্যুশার হয়তো বা হাতে সময় বেশী না থাকাতে ল্য ভোর্‌য়্যতে না এসে সোজা এখানেই চলে এসেছে।

দিস্থির বলল, কই না, উনি তো এখনও আসেননি। তুমি ভেতরে এস। কি রকম ব্যবস্থা হয়েছে, দেখে যাও।

এতিয়েনকে নাচঘরে নিয়ে গেল সে। ওই মেলার সময় যেরকমভাবে সাজানো হয়েছিল, সেরকমই আছে—রঙিন কাগজের শিকল, নকল ফুল, সোনালী দেওয়াল-আলমারি। কিন্তু ঘরের মাঝখানে, যেখানে আগে বাজনদাররা দাঁড়াতো সেখানে একটা টেবিল আর তাকে ঘিরে তিনটে চেয়ার পাতা হয়েছে। তার মুখোমুখি সারি-সারি বসবার আসন।

এতিয়েন বলল, চমৎকার!

—হ্যাঁ। যথাসম্ভব আরাম দেওয়ার চেষ্টা করেছি যাতে বেশ বাড়ি বাড়ি বলে মনে হয়। চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করতে পারো ইচ্ছে করলে। যদি পুলিস উটকো ঝামেলা করতে আসে, আমার মরা শরীরটার ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে।

এতিয়েন হেসে ফেলল। তার হঠাৎ মনে পড়ল এই স্থূলাঙ্গী মহিলাটি একই সঙ্গে দু-দু'জন প্রেমিককে সঙ্গ দেন।

এতিয়েন অবাক চোখে দেখল রাসন্যর আর স্যুভারিন ঢুকছে। তিনজনকে ঘরে রেখে দিস্থির বেরিয়ে যাচ্ছিল। এতিয়েন বলল, এখনই এলে তোমরা?

—ভোর্‌য়্যতে রাতের শিফ্‌টের কাজ বন্ধ হয়নি। স্যুভারিনের কাজ ওই রাতের

শিফ্‌টেই। ধর্মঘট না করলেও সে এসেছে কৌতূহলবশত। গত দু'দিন যাবৎ হ্রাসস্তরের মেজাজ ভালো ছিল না। ঠিক সহজভাবে কথাও বলতে পারছিল না যেন।

এতিয়েন বলল, প্লুশার এখনও এসে পৌছল না। আমি একটু চিন্তায় আছি। তাই এদিকের অবস্থাটা দেখতে এলাম।

হ্রাসস্তর অন্যদিকে তাকিয়ে একটু ইতস্তত করে জবাব দিল, আমি অবশ্য খুব একটা অবাক হইনি। ও যে নাও আসতে পারে. তা আমি আগেই আন্দাজ করেছিলাম।

—কি ?

হ্রাসস্তর এবার সোজাসুজি এতিয়েনের দিকে তাকিয়ে বলল, আসলে আমিও ওকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। বারবার অনুরোধ করেছিলাম যাতে ও না আসে। হ্যাঁ, কারণ আমার মনে হয় নিজেদের ভালোমন্দ ব্যাপারগুলো নিজেরাই বুঝেশুনে মিটিয়ে নেওয়া ভালো।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে এতিয়েন বলল, তুমি—তুমি এই কাণ্ডটা করলে।

—হ্যাঁ। জানো, প্ল্যুশারের ওপর আমারও যথেষ্ট আস্থা আছে। ও বুদ্ধিমান, বিশ্বাসভাজন আর ওর সঙ্গে খুব ভালোভাবে কাজ করা যায়। কিন্তু আসলে এই সব সরকার, রাজনীতি—এসবে আমার ঘেন্না ধরে গেছে! আমি শুধু চাই খনির মজুররা সুবিচারটুকু পাক, ব্যস। খনির নীচে আমিও জীবনের কুড়িটা বসন্ত পার করে এসেছি। এত দুঃখ, কষ্ট আর নরকযন্ত্রণা ভোগ করেছি যে এই সব খেটে-খাওয়া নীচের তলার মানুষগুলোর কিছুটা সুখের জন্য আমি সারা জীবন লড়াই করতে রাজী। ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এভাবে শুধু কথা বলে আর আলোচনা করে কিছু হবে না। শ্রমিকদের অবস্থা আরও খারাপ হবে। তারপর পেটের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে যেই খনিতে ফিরে যাবে অমনি মওকা বুঝে কর্তারা আরও বেশী করে শোষণ করতে শুরু করবেন, চাবুক মারবেন, রাস্তার নেড়ীকুত্তারও অধম করে রাখবেন। আর আমি সেটাই আটকাতে চাই, বুঝলে ?

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গলা চড়িয়ে কথা বলছিল হ্রাসস্তর। তার বক্তব্য যথেষ্ট প্রাঞ্জল : এটা ভাবা নিশ্চয়ই মূঢ়তা যে বিপ্লব করলে এক দিনেই পৃথিবী বদলে যাবে। হাজার বছরও লাগতে পারে সাম্যবাদী বিপ্লবকে সফল করতে। একটা আপেল টুকরো টুকরো করে ছেলেপুলেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়ার মতো শ্রমিক মালিক সকলেই লাভের সমান অংশীদার হবে, এ আকাশকুসুম এই পরিস্থিতিতে চিন্তা করাও মূর্খতা। তার থেকে অনেক সোজা হল মজুরদের যাতে যথার্থ ভালো হয় সেই পথে যাওয়া। সুযোগ বুঝে নিজেদের দাবীদাওয়া পেশ করা আর তারও আগে কোম্পানিকে ভরাডুবির হাত থেকে বাঁচানো। কারণ খনিতে কাজ বন্ধ হয়ে গেলে, কোম্পানি লালবাতি জ্বাললে এতগুলো পরিবার না খেতে পেয়ে মরবে।

এতক্ষণ এতিয়েন চুপ করে কথাগুলো শুনছিল। এবার ধৈর্য হারিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে, হা ভগবান! তোমার শরীরে কি মানুষের রক্ত নেই নাকি ?

এতিয়েনের তীব্র ইচ্ছে হচ্ছিল হ্রাসন্তরকে ধরে আচ্ছা করে মার দেয়। কিন্তু তা তো অসম্ভব। মনের ঝাল মেটাতে অস্থির পায়ে সারা ঘর পায়চারী করতে লাগল অসহায় আক্রোশে।

স্থভারিন বলল, দরজাটা বন্ধ করে দাও না। মিছে চেঁচামেচি করে লোককে জানিয়ে কি লাভ?

তারপর নিজেই দরজাটা বন্ধ করে চেয়ারে এসে বসল। সিগারেটের কাগজে তামাক ভরে পাকাতে পাকাতে সকৌতুকে তাকিয়ে রইল দু'জনের দিকে।

হ্রাসন্তর ঠাণ্ডা গলায় বলল, যদি মাথা গরম করতে চাও করতে পারো। প্রথমে আমার মনে হয়েছিল তোমার মাথায় কিঞ্চিৎ বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। ভেবেচিন্তে একটা কাজ তো ভালোই করেছিলে যে শুধু শুধু মাথা গরম করে সবাইকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে বলোনি। আজ হঠাৎ ওদের অকূলে ভাসাচ্ছো কেন?

এতিয়েন আর থাকতে পারল না। অসহিষ্ণুভাবে এগিয়ে এসে হ্রাসন্তরের দু কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে চেঁচিয়ে উঠল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি চেয়েছিলাম যাতে ওরা শান্তি বজায় রাখে। কিন্তু আর পারছি না শান্ত হয়ে থাকতে। রক্তচোষা বাদুড়গুলো! সারা জীবন আমাদের ভয় দেখিয়ে যাবে আর মুখ বুজে তাই সইব, তেমন মরদের বাচ্চা আমি নই।

এবার নিজের কথা বলতে শুরু করল এতিয়েন: সে নিজেও একদিন অলীক মায়ায় ভুলেছিল। ভেবেছিল সুবিচারের দিন আসবে। অন্যায়, অরাজকতার আধিপত্য খর্ব হবে, সার্বিক ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু আর কতদিন এভাবে চোখ বুজে থাকা যায়? মানুষগুলো একে অন্যের ওপর ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে—তখন কি মনে হয় না চুলোয় যাক শান্তিপূর্ণ বিপ্লব, সবকিছু ছারখার করে দিই? সারা জীবন কি বড়লোকগুলো গরীবের রক্ত চুষে খাবে? তাই তো সে জোর গলায় বলতে পারে না 'রাজনীতি' জিনিসটা একেবারে ফালতু। বই পড়েছে অনেক, কিন্তু কথাগুলো ঠিকমতো সাজাতে পারছে না সে। কার্ল মার্কস তো বলেছেন সংগ্রামই সাফল্যের চাবিকাঠি, পুঁজিবাদ তস্করতার নামান্তর মাত্র। শ্রমজীবীদের পুরো ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে সেই হৃত ধনসম্পদ পুনরুদ্ধার করবার, ভালো করে খেয়ে পরে বাঁচবার। একবার ভেবেছিল বিরাট একটা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত হোক। আর একবার ভেবেছিল সমবায় প্রথার ভিত্তিতে লেনদেন হোক। কিন্তু দূর দূর, সব বাজে বুকনি! এখন পর্যন্ত বুঝতেই পারছে না কি করে স্বপ্ন সফল হবে, কোন পথে লুকিয়ে আছে মুক্তির উপায়। তাই তো সে চায় শোষণতান্ত্রিক সরকারকে প্রথমে অবদমিত করতে, তারপর অন্য সব চিন্তা।

—কিন্তু হ্রাসন্তর, তুমি হঠাৎ মত বদলাতে গেলে কেন? তুমি তো বলেছিলে যে তুমিও এর শেষ দেখতে চাও?

হ্রাসন্তর একটু লাল হল।

—হ্যাঁ, এককালে তা বলেছিলাম বটে। যদি কখনও তেমন দিন আসে আমিও বুক দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব। কিন্তু অকারণ জল ঘোলা করার পক্ষপাতী আমি নই। যাদের পায়ের তলায় মাটি নেই তাদের উস্কে দিয়ে নিজের আখের গোছানো, নেতাগিরি করা…

এতিয়েনের এবার সঙ্কোচ হল। দু'জনেরই গলার স্বর নেমে এসেছে। ঠাণ্ডা লড়াই শুধু। একজনের 'চাই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম', অন্যজনের 'চাই আপোষ'।

সুভারিন চুপটি করে সব দেখছিল আর শুনছিল।

চাপা হিসহিসে গলায় এতিয়েন বলল, এটা বোধকরি আমাকেই ঠোকা হচ্ছে? তুমি কি আমায় হিংসে করো?

—কিসের হিংসে? নিজেকে আমি একজন বিরাট বোদ্ধা বলে জাহির করিনি কখনও। সেক্রেটারী হবার বাসনায় মঁসুতে সমিতিও গড়িনি।

এতিয়েনের আপত্তিতে ভ্রূক্ষেপ না করে হ্রাসন্যর বলে চলল, তুমি এখনও কেন সত্যি কথাটা স্বীকার করছো না এতিয়েন? আন্তর্জাতিক ব্যাপারে তোমার থোড়াই মাথাব্যথা। তুমি চাও শুধু আমাদের নেতা হতে আর ফেডারেল অ্যাসোসিয়েশানে আমাদের মুখপাত্র হয়ে ভদ্দরলোক বনতে!

একটু পরে এতিয়েন কথা বলল। তার গলা কাঁপছে।

—ঠিক আছে। তোমার সঙ্গে আমি ভালো ব্যবহারই করতে চেয়েছিলাম। এখানে অনেক দিন ধরে আছো, তোমার অভিজ্ঞতাও বেশী, সেইজন্যই। নিজেকে এতটা জড়িয়ে ফেলাই কাল হয়েছে আমার। কিন্তু তুমি চাও না তোমার কর্তৃত্ব কেউ কমিয়ে দিক। তাই তো তোমার এত গায়ে জ্বালা! ঠিক আছে, এবার থেকে আমার পথে আমি চলব। তাই প্রথমেই জানিয়ে রাখি প্লুশার আসুক বা নাই আসুক, আজকের সভা হবেই। তুমি না চাইলেও সকলে তাতে যোগও দেবে।

হ্রাসন্যর বিড়বিড় করে বলল, ওঃ যোগ দেবে! বলাটা খুব সোজা। চাঁদাটি আদায় করতে যাও না, বুঝবে ঠেলাটা!

—জানি জানি! আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমিতি আমায় অঢেল সময় দিয়েছে। টাকা আমরা পরে দিলেও ক্ষতি নেই। আমরা চাইলেই ওরা সাহায্য করবে।

ব্যস্! হ্রাসন্যর আবার রেগে গেল।

—বেশ তো, দেখা যাবে কত ধানে কত চাল হয়! আমিও তো সভার একজন বক্তা। কিন্তু আমি একটি কথাও বলছি না। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি বাক্যিবাণে সকলের মাথাটি চিবিয়ে খাবে, সেটি আমার দ্বারা হবে না। ওদের আমি বুঝিয়ে দেব আসল অবস্থাটা কি। দেখাই যাক না ওরা কার কথা শেষ পর্যন্ত মেনে নেয়, তোমার না আমার। ওরা আমার হাড়হদ্দ জানে গত তিরিশ বছর ধরে আর তুমি ভেবেছো এক বছরের মধ্যেই সব কিছু উল্টে দেবে? তুমি কে হে বাপু হরিদাস পাল? হয় তুমি থাকবে, নয় তো আমি। এর শেষ দেখতেই হবে।

দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে গেল হ্রাসন্তর। তার রাগী পায়ের

শব্দ মিলিয়ে গেল দূরে। কাগজের শিকলগুলো দুলে উঠল। ঘরটা আবার নিস্তব্ধ। একটা ছুঁচ পড়লেও তার শব্দ বুঝি বা কান পাতলে শোনা যাবে।

টেবিলের সামনে চুপটি করে বসে সিগারেট টানছিল সুভারিন আর অস্থির পায়ে পায়চারী করছিল এতিয়েন। এই যে মজুররা হ্রাসন্যরকে ছেড়ে তার সহায় হয়েছে, এটা কি তার দোষ? জনপ্রিয়তা অর্জন করবার জন্য তো সে এত সব করেনি। কি করে যে সবাই তাকে ভালোবেসে ফেলল সেটা তার নিজের কাছেও এক পরম রহস্য। সবাই তাকে আজ বন্ধু বলে মানে, বিশ্বাস করে বলে যে ও সেই সুযোগে তাদের ওপর কর্তৃত্ব করে, এটাও সম্পূর্ণ মিথ্যে অভিযোগ। নিজের জন্য অথবা নেতাগিরি করে সাধুবাদ কুড়োনোর জন্য কি এতিয়েন এই ধর্মঘটে উস্কানি দিয়েছে নাকি?

হঠাৎ সুভারিনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল এতিয়েন।

—সুভারিন তুমি জানো না, এই ধর্মঘটের জন্য আমার কর্মী বন্ধুদের কারও যদি এক ফোঁটাও রক্তপাত হয় তবে সেদিনই আমি সব ছেড়ে আমেরিকায় চলে যাবো।

চাপা হাসিতে একটু বুঝি বা বেঁকে গেল সুভারিনের ঠোঁট।

—ওঃ রক্ত! তা পৃথিবীতে কিছু রক্তপাতের প্রয়োজন আছে বৈকি। তা নিয়ে এত মাথা ঘামালে চলে?

শান্ত হল এতিয়েন। চেয়ার টেনে বসে পড়ল সুভারিনের মুখোমুখি, কনুই দুটো টেবিলে ভর দিয়ে। তার সামনে বসে থাকা সুভারিনের মুখে, স্বপ্নালু চোখ দুটোতে কি যেন সম্মোহনী মায়া আছে। মাঝে মাঝে এতিয়েন ভয় পেয়ে যায় আবার মাঝে মাঝে এক অদৃশ্য ইচ্ছাশক্তি তাকে টেনে নিয়ে যায় সুভারিনের দিকে। সুভারিন চুপ করে থাকলেও তার গম্ভীর নীরবতা এতিয়েনকে বশীভূত করে এক লহমায়।

এতিয়েন বলল, বলো তো, তুমি আমার জায়গায় থাকলে কি করতে? এই যে সকলের জন্য কিছু করার তীব্র ইচ্ছেটা—এটা তো ভুল নয়? নিশ্চয়ই আমাদেব সকলের পক্ষে এখন সমিতিতে যোগ দেওয়াটাই সবচেয়ে ভালো?

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে সুভারিন বলল, আসলে সবই বাজে আবার কিছুটা ঠিকও বটে। সবচেয়ে বড় কথা ওদের আন্তর্জাতিক সংস্থা কাজে হাত দেবে কিছুদিনেব মধ্যেই কারণ সেটাই তাঁর ইচ্ছে।

—কার?

—তাঁর।

ফিসফিসে গলায় কথা বলছিল সুভারিন। তার চোখে মুখে নীরব আনুগত্যের ছাপ। সে সন্ত্রাসবাদী নেতা 'বাকুনিন'-এর কথা বলছে।

—বুঝলে এতিয়েন, উনিই সকলকে সঠিক পথ দেখাবেন। যে পথে বিপ্লব আসবে বলে তোমরা সবাই ভাবো তা ঠিক নয়। খালি বড় বড় কথা! কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর হস্তক্ষেপ আগামী তিন বছরের মধ্যে কি নিপুণভাবে পৃথিবীটাকে পাল্টে দেবে তাই দেখো।

এতিয়েন খুব মন দিয়ে শুনছিল। সব কিছু শোনবার, জানবার আগ্রহ তার প্রবল। এই সন্ত্রাসবাদী বিপ্লব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া দরকার। সুভারিন তো এমনিতে খুব চাপা, এ সব গোপন খবর বলেও না কাউকে।

—পরিষ্কার করে বলো তো, তোমাদের উদ্দেশ্যটা কি ?

—ধ্বংস, বুঝলে ধ্বংস। সব কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাবখার করে দাও। কোনো দেশ থাকবে না, সরকার, সম্পত্তি কিচ্ছু থাকবে না এমন কি ধর্ম বা ভগবানও নয়।

—বুঝলাম। কিন্তু এতে আখেরে লাভটা কি হবে ?

—সৃষ্টি হবে নতুন পৃথিবী—আবার সেই আদিম যুগের আলোয়

—তা এই মহান বিপ্লবের হাতিয়ার কি ?

—আগুন, বিষ আর ছোরা। মানুষ খুন করতে পারাটাই অবশ্য আসল হিম্মতের কাজ। এ তো গল্প উপন্যাস নয়, বইয়ের পাতার নায়ক নয়—এ এক চলমান জীবন্ত কিংবদন্তী। বর্তমান সরকারকে সন্ত্রস্ত করে তুলতে হবে, সাধারণ মানুষের ঘুম ভাঙাতে হবে।

সুভারিনের চোখমুখ ধীরে ধীরে ভয়াবহ হয়ে উঠছিল। উত্তেজনায় সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। ধক ধক করে জ্বলছে চোখ দুটো। টেবিলটা এত শক্ত করে ধরেছে যে মনে হয় এখুনি ওটা ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। এতিয়েন ভয় আর সম্ভ্রমের চোখে তাকিয়ে ছিল তার সঙ্গীর দিকে। মনে পড়ছিল টুকরো টুকরো ছবি : জারের প্রাসাদের তলায় লুকিয়ে রাখা বিস্ফোরক দ্রব্য, ছুরিতে ফালা ফালা করে দেওয়া পুলিসের বড় কর্তাদের মুখ ; সুভারিনের প্রিয় পাত্রী, একমাত্র যাকেই সে ভালোবেসেছিল—সে মেয়েটিকে মস্কোতে হাজার হাজার লোকের চোখের ওপর ফাঁসি দেওয়া হয়। জনতার ভীড়ে দাঁড়িয়ে থাকা সুভারিনের করুণ দৃষ্টি শেষবারের মতো মেয়েটির বিবর্ণ ললাটে ভালোবাসার স্পর্শ দিয়ে যায়

এ সব কিছুই সুভারিনের মুখ থেকে শোনা।

আর সহ্য করতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠল এতিয়েন।

—চুপ কর ! চুপ কর ! এখানে অবস্থা এখনও অতটা খারাপ হয়নি। এ ঠিক নয়। সে রকম বদ্ধ পাগল কোনো খুনী এখানে এলে আমার কর্মী বন্ধুরা তাকে শেষ করে দেবে।

এতিয়েন কিছুতেই বুঝতে পারছিল না কি করে এত রক্তক্ষয়ী পথে বিপ্লব আসবে। এত ভয়ঙ্কর ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা থেকে কেমন করে জন্ম নেবে নতুন পৃথিবী ?

—বলো তো সুভারিন, কি ভাবে এগোতে চাও তোমরা ?

—দ্যাখো এতিয়েন, এ ভাবে নরম হয়ে কার্যকারণ বিচার করতে যেও না। তাতে মুক্তির দিন আরও পিছিয়ে যাবে।

ভয়ে হাড় হিম হয়ে গেল এতিয়েনের। কি শীতল নিস্পৃহ গলা সুভারিনের। তবু কয়েক মুহূর্ত বাদে হেসে ফেলল সে। এ কথা ঠিক যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা যা

দাঁড়িয়েছে, তাতে কোনো মানুষ এই ভাবে চিন্তা করতে শুরু করলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। আর কি সহজভাবে কথাগুলো বলছে স্থভারিন কিন্তু এতিয়েন তো এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগোতে পারে না। তাহলে হ্রাসঙ্করই জিতে যাবে শেষ পর্যন্ত।

দিস্থির এসে দু'জনকে দুপুরের খাবার খেয়ে নিতে বলল। ওমলেট আর চিজ খাবার পর চলে যেতে চাইল স্থভারিন। এতিয়েন যখন তাকে থেকে যাবার জন্য খুব ঝুলোঝুলি করছে, স্থভারিন বিরক্ত গলায় বলল, কি করতে থাকব? কতগুলো নীরস, অর্থহীন কথা শুনতে? দূর, তোমাদের সব কথাই তো শুনলাম, আমি বরং চলেই যাই।

ধীর, নির্বিকার পায়ে বেরিয়ে গেল স্থভারিন।

এতিয়েনের উদ্বেগ বাড়ছিল। বেলা একটা বাজে। প্লুশার তাকে সত্যিই ডোবালো।

দেড়টা আন্দাজ শ্রমিক প্রতিনিধিরা একে একে আসতে শুরু করল। এতিয়েন নিজে তাদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল কারণ বলা তো যায় না, এদের মধ্যে কোম্পানির ভাড়া করা চরও থাকতে পারে।

প্রতিটি পরিচয়পত্র খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখছিল। অবশ্য যাদের সে ব্যক্তিগত-ভাবে চেনে তাদের কথা আলাদা।

বেলা দুটোয় হ্রাসঙ্কর এল। তার নির্বিকার ভাব দেখে মনে মনে চটে গেল এতিয়েন। তারপর এল জাশারী, মুকে। এই সব বাজে ছোকরাগুলো—এরা যেন ধর্মঘটে বেশ মজা পেয়েছে। কাজকর্ম নেই, শুধু উড়ে বেড়াও আর ফুর্তি কর! ওরা এসেই দলের অন্য সব সদস্যদের টিটকিরি দিতে শুরু করল যেন এ সব সভা সমিতি খুব মজার ব্যাপার।

আরও পনেরো মিনিট কেটে গেল। সবাই উসখুস করছে। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে এতিয়েন সভার কাজ আরম্ভ করতে যাবে এমন সময় দিস্থির চেঁচিয়ে উঠল।

—ঐ তো ভদ্রলোক এসে গেছেন!

প্লুশার। গাড়ির দরজা খুলে লাফিয়ে নামলো প্লুশার। তার সুঠাম দেহে তারুণ্য উপচে পড়ছে। রীতিমতো ভদ্রলোক। চুলের কায়দা দ্যাখো না। এত পরিপাটি সাজ কিন্তু মোটা মোটা আঙুলের মাথায় নখগুলো সব সমানে লোহার কারখানায় কাজ করার জন্য ক্ষয়ে ভোঁতা হয়ে গেছে। চমৎকার বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা আছে তার। ঘুরে ঘুরে নানান জায়গায় নিজের মতামত প্রচার করে।

—না না এতিয়েন, আমার ওপর রাগ কোরো না। কাল সকালে জরুরী একটা বৈঠক ছিল। সন্ধ্যেবেলা ব্যস্ত ছিলাম এক সভার কাজে। আজও সকাল থেকে জায়গায় জায়গায় ঘুরতে হয়েছে চরকির মতো। কি ভাগ্যিস, সময়মতো গাড়িটা পাওয়া গেল। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে, গলা শুনে বুঝতে পারছো না? কিন্তু তবুও তোমার সহকর্মীদের যা বলার আমি বলবো। ওঃ হো, কাণ্ড দ্যাখো, কার্ডের বাক্সটা গাড়িতেই পড়ে রইল।

এক দৌড়ে গাড়ি থেকে কালো কাঠের একটা ছোট বাক্স নিয়ে এল প্ল্যুশার।

এতিয়েন হাঁটতে লাগল প্ল্যুশারের পিছু পিছু। জয়ের আনন্দে তার চোখ মুখ উজ্জ্বল। হ্রাসন্যর একটু ম্রিয়মান। সে প্ল্যুশারের সঙ্গে হাত মেলাতেও ভুলে গেল। প্ল্যুশার কিন্তু দিব্যি হেসে হেসে কথা বলছে তার সঙ্গে। তার চিঠির কথাটাও উঠল। কি আশ্চর্য, সভার কাজ বন্ধ থাকবে কেন? যখন খুশি সভা করা যেতে পারে। সকলের ভালোর জন্য যা দরকার, তাই তো করতে হবে। না না, প্ল্যুশার এখন কিছু খাবে না। তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করা দরকার। এখানকার কাজ সেরে আবার অন্য জায়গায় যেতে হবে।

সবাই বড় হলঘরটায় ঢুকলো। পেছনে মায়্যু আর লেভাক। দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। জাশারী আর মুকে হাসাহাসি করতে লাগল নিজেদের মধ্যে।

শ'খানেক লোক জমায়েত হয়েছে। এবার সভার কাজ শুরু হবে। সব চুপচাপ। সকলের চোখ প্ল্যুশারের দিকে। আগে সভাপতি ঠিক করা দরকার। সর্বসম্মতিক্রমে প্ল্যুশারকে সভাপতি করা হল। এতিয়েন আর মায়্যু কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হল। চেয়ারে বসল তিনজন। হঠাৎ টেবিলের নীচে ঢুকে গেল প্ল্যুশার। কাঠের বাক্সটা সযত্নে রাখলো সেখানে। তারপর টেবিলে আঙুল ঠুকে ভরাট পুরুষালী গলায় বলে উঠল, হে নাগরিকবৃন্দ!

ঠিক সেই সময়ে খুলে গেল ঘরের দরজাটা। ছ'টা বীয়ারের গ্লাস ট্রেতে সাজিয়ে হাজির হল বিধবা দিস্যির।

—না না, আমার জন্য বক্তৃতায় ব্যাঘাত ঘটবে না। জানি তো, কথা বলতে বলতে সকলের তেষ্টা পেয়ে যায়।

মায়্যু তার হাত থেকে ট্রেটা নিল। প্ল্যুশার কথা থামালো না। সে বলল যে মঁসুর মজুরদের কাছ থেকে এই আন্তরিক উষ্ণ অভ্যর্থনা তাকে অভিভূত করেছে। তার আসতে দেরি হয়ে যাবার জন্য সে ক্ষমা চাইতেও ভুলল না। কি করবে, সত্যিই সে নিরুপায়। বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত। তারপর সে ডাকলো হ্রাসন্যরকে। হ্রাসন্যর আসলে আগেই অনুমতি চেয়ে রেখেছিল বক্তৃতা করবার জন্য।

হ্রাসন্যর পৌঁছে গেল টেবিলের পাশে। চেয়ারে ভর দিয়ে, গলাখাঁকারি দিল। তারপর বলল, 'বন্ধুগণ!'

আসলে হ্রাসন্যরের এই যে মজুরদের ওপর প্রবল প্রতিপত্তি তা শুধুমাত্র তার সাজিয়ে কথাবার্তা বলার গুণে। ঠাণ্ডা মাথায় নিজের বক্তব্য সহজ ভাষায় সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলে যেতে পারে; যতক্ষণ না শ্রোতাদের মনে একটা স্থায়ী ছাপ পড়ে যায়। অকারণ হাত পা নেড়ে উত্তেজিত হয় না। শুধু মিটিমিটি হাসে মাঝে মাঝে, যতক্ষণ না তার কথার তোড়ে ভেসে গিয়ে ডুবন্ত মানুষের খড়কুটো আঁকড়ে বেঁচে থাকবার মতো অদম্য ইচ্ছেয় সব শ্রোতারা একসঙ্গে গলা মেলায়, 'ঠিক বলেছ ভাই, ঠিক বলেছ।'

কিন্তু আজ হ্রাসন্যরের মেজাজটা ঠিক নেই। সে প্রথম থেকেই গরম গরম কথা

বলতে শুরু করল। এই ধর্মঘটের ভালোমন্দ দিক নিয়ে সে বলতে চায়। শ্রোতাদের মন জয় করে নিয়ে তারপর আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ। সত্যিই তো, বিন্দুমাত্র আত্মসম্মান-বোধ থাকলে কোম্পানি-কর্তৃপক্ষের কথা মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু যদি এভাবে ধর্মঘট চলতেই থাকে তাহলে তার পরিণতি যে কি হবে, তা কি কেউ ভেবে দেখেছে? সোজাসুজি হার স্বীকার করে নিয়ে কাজে যোগ দেওয়ার কথাটা সন্তর্পণে এড়িয়ে গেল হ্রাসন্নর। তার বদলে আঁকলো ধর্মঘটের জন্য শ্রমিক-বসতিগুলোতে যে ভয়াবহ দারিদ্র্য আর যন্ত্রণা আসবে তারই ছবি: হু হু করে লোক মরছে অনাহারে, কান্নার রোলে উথালপাথাল আকাশ বাতাস!

কিন্তু এ কি! বেশীর ভাগ লোকই পাথরের মূর্তির মতো চুপ করে বসে আছে কেন? তারা কেউই তো ওকে সমর্থন করছে না?

রাগে অপমানে অন্ধ হয়ে গেল হ্রাসন্নর। বলে উঠল, এ ব্যাপারে দেখছি বাইরেব লোক সকলের মাথাটা চিবিয়ে খেয়েছে।

এর মধ্যে সভার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ লোক উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে হ্রাসন্নরকে থামিয়ে দেবার জন্য।

'লোকটা ভেবেছে কি? আমরা যা করছি, বুঝেশুনেই করছি। দুগ্ধপোষ্য শিশু তো নই যে ওর পরামর্শমতো চলতে হবে।'

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢকঢক করে বীয়ার খেতে লাগল হ্রাসন্নর আর বলতে লাগল তার কাজে আর কথায় বাধা দেবে এমন ছেলে এখনও মায়ের পেটে আছে।

প্ল্যুশার উঠে দাঁড়ালো। টেবিল চাপড়ে বলল, সবাই চুপ করুন, চুপ করুন।

অবশেষে পরিস্থিতি খানিক আয়ত্তে এল। বিভিন্ন খনি থেকে অনেকে প্রতিনিধি হিসেবে এসেছে। তারা এই ধর্মঘটের বিষয়ে আলোচনা করতে চায়।

লেভাক তো প্রায় মেরেই বসে হ্রাসন্নরকে। সে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি তো আপোসের কথা বলবেই, তোমার ঘরে তো দানাপানির অভাব নেই।

এতিয়েন মায়্যুর দিকে ঝুঁকে পড়ল। হ্রাসন্নরের এই বিশ্বাসঘাতকতায় রেগে লাল হয়ে গেছে মায়্যু। মজুরদের সভায় ঢুকে উল্টো গীত গায় লোকটা!

প্ল্যুশার বলল, বন্ধুগণ! এবার কি আমি আপনাদের কিছু বলতে পারি?

ঘরে আবার নিস্তব্ধতা। গম্ভীর খসখসে গলায় প্ল্যুশার কথা বলছিল। আস্তে আস্তে তার গলার স্বর বক্তব্যের গভীরতা অনুযায়ী ওঠানামা করতে লাগল। দরকার-মতো হাত মুখ নেড়ে সে জনসাধারণের সামনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে ব্যাকুল।

এই আন্তর্জাতিক সমিতি যে কি বিশাল কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত, সবিস্তারে তারই ফিরিস্তি দিতে শুরু করল সে। আস্তে আস্তে ছোট ছোট বিক্ষিপ্ত অঞ্চল থেকে সমগ্র জন-মানসে এই বিপ্লবের ব্যাপ্তি ঘটবে। বিভিন্ন দফা কর্মসূচী নিয়ে বিশদ আলোচনা করল। সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আনতে এই ধরনের সমিতির প্রয়োজন আছে। কে বলতে পারে, আস্তে আস্তে হয়তো এই দিনমজুরী ব্যবস্থা উঠে যাবে। তখন মজুর মালিক এক হয়ে যাবে। ঘুণধরা সমাজের মেরুদণ্ডটা ভেঙে পড়বে।

ধীরে ধীরে উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল প্লুশার।

অনেকে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল।

—আমরা তোমার সঙ্গে আছি।

প্লুশার বলে চলল, এইভাবে বিপ্লব চললে আগামী তিন বছরের মধ্যে সমস্ত সমাজজীবন পাল্টাতে বাধ্য। মজদুররা উঠে আসবে সমাজের ওপর তলায়। এত দিনকার অভিশপ্ত জীবন থেকে তারা মুক্তি পাবে তাদের বিদ্রোহ-কঠোর হাতের চাপে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হবে মালিকপক্ষের কণ্ঠনালী।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই হারামজাদাগুলো তখন ঘাড় গুঁজে খনিতে নামবে।

—এবার ধর্মঘটের কথা। নৈতিক দিক দিয়ে আমি ধর্মঘটের বিরোধী। কারণ এ পথে এত ধীরে ধীরে বিপ্লব আসে যে মানুষ শেষ পর্যন্ত ঝিমিয়ে পড়ে কিন্তু এর থেকে ভালো উপায় যখন আপাতত নেই তখন ধর্মঘট ছাড়া উপায় কি? আর পুঁজি তো কম, তাই আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমিতি মজুরদের সাধ্যমতো মদত দেবে

প্যারিসে যখন ব্রোঞ্জ কারখানার কর্মীরা ধর্মঘট করে তখন এই সমিতি তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। একবার শুধু সদস্য হলেই সমিতি তোমাদের সকলের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যাবে। সম্মিলিত বিদ্রোহে মালিকপক্ষ হবে হতচকিত। সারা জীবন দাসানুদাস হয়ে, বেঁচে মরে থাকার চেয়ে এই তো অনেক সম্মানের।

সবাই সানন্দে হৈ হৈ করে উঠল। রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছলো প্লুশার বীয়ার খেতে রাজী হল না সে। আবার কথা বলতে যাবে, একপ্রস্থ হাততালি পড়ল।

সে ফিসফিস করে এতিয়েনকে বলল, ব্যস, কেল্লা ফতে! এবার কার্ডগুলো বের কর।

চোখের পলকে টেবিলের নীচ থেকে কার্ডের বাক্সটা টেনে বার করা হল

—বন্ধুগণ! এই যে সদস্যপদের কার্ড একে একে আপনারা সব আসুন। কয়েকজন না হয় বিলি করুন।

লাফিয়ে উঠে প্রতিবাদ করতে গেল র‍্যাসনুর। এতিয়েন মনে মনে উত্তেজিত হচ্ছিল। তারও বক্তৃতা দেবার সময় এগিয়ে এসেছে। সবাই একই সঙ্গে কথা বলছে, উত্তেজিত হচ্ছে। লেভাক তো অদৃশ্য কারও সঙ্গে হাতাহাতি করে ফেলল। মায়্যু কি যেন বলতে চেষ্টা করছে, চেঁচামেচিতে তার গলার স্বর চাপা পড়ে গেল।

ছোট্ট দরজাটা খুলে গেল।

দিস্থির বলল, আস্তে, সবাই চুপ কর। পুলিস এসেছে

স্থানীয় সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। সভা চলার শুরুতেই তার আসার কথা। নির্দেশ আছে যাতে সভা না হতে পারে। তার সঙ্গে চারজন অফিসার। প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে ছুতোয়নাতায় দিস্থির তাদের দরজার সামনে আটকে রেখেছিল। তার নিজের বাড়িতে সে নেমন্তন্ন করে হাজারটা লোক আনতে পারে। তাতে কোন হারামজাদার বাপের কি? কিন্তু তারা দিস্থিরকে ধাক্কা মেরে ঢুকে পড়েছে।

দিস্তির বলল, শীগগির তোমরা পেছনের কাঠের চালাঘরটা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাও দেখছ না, টিকটিকিগুলো ভেতরের দরজায় ধাক্কা মারছে।

সুপারিনটেণ্ডেণ্ট দুমদুম করে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। হুমকিও আছে সেই সঙ্গে।

—ভালোয় ভালোয় দরজা না খুললে গায়ের জোরে ভেঙে ঢুকবো

নিশ্চয়ই কোনো শালা গোপন সভার খবরটা কর্তাদের কাছে ফাঁস করেছে। তাইতেই এত বিপত্তি। এ সভা নাকি বে-আইনী। অনেক উটকো লোকও এসে বসে আছে।

নাচঘরে তখন জোর হৈচৈ চলছে। এভাবে তো কুকুরের মতো ল্যাজ গুটিয়ে পালানো যায় না। সমিতির সদস্যপদ নিয়ে বা ধর্মঘট ক'দিন চলবে তাই নিয়ে কোনো ভোটাভুটিই হল না। সবাই একসঙ্গে নিজের মতামত জাহির করতে ব্যস্ত। শেষে তড়িঘড়ি সকলের মতামত নেওয়া হল। হাত তুলে নিজেদের সম্মতি জানালো কমরেডরা। শেষ পর্যন্ত হিসেব করে দেখা গেল মঁসুর প্রায় দশ হাজার শ্রমিক আন্তর্জাতিক সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করেছে। অবশ্য সবাই তো উপস্থিত ছিল না— তাদের প্রতিনিধিরা মতামত জানালো।

এবার সকলের বেরিয়ে যাবার পালা। দিস্তির আড়াল করে দাঁড়ালো। এ পাশের দরজায় ক্রমাগত ধাক্কা পড়ছে। রান্নাঘর আর কাঠের চালাঘর দিয়ে একে একে বেরিয়ে গেল সবাই চুপিসাড়ে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি।

হ্রাসন্যর বেরোল সকলের আগে। তার ঠিক পেছনেই লেভাক। দু'জনেই পুরনো ঝগড়া ভুলে ঠেলাঠেলি করে পালাতে ব্যস্ত। এতিয়েন কার্ডের বাক্সটা গুছিয়ে রেখে মায়্য আর প্লুশারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। ওরাও সবে বেরিয়েছে, এমন সময় হুড়মুড় করে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, শাগরেদদের নিয়ে।

চিল চিৎকার করে উঠল দিস্তির।

—মুখপোড়া অলপ্পেয়ে, আমার সাধের দরজাটা ভাঙলে তো? দেখছ ঘরে কেউ নেই, হল তো শান্তি?

সুপারিনটেণ্ডেণ্ট একটু অলস প্রকৃতির। অকারণ ঝুটঝামেলা পছন্দ করে না। দিস্তিরকে একটু শাসিয়ে বেরিয়ে গেল। আড়াল থেকে তাকে টিটকিরি দিল জাশারী আর মুকে।

বাইরে রাস্তায় এতিয়েন কার্ডের বাক্সটা নিয়ে ছুটছে, তার পেছনে অন্যরা। হঠাৎ তার পিয়েরোঁর কথা খেয়াল হল। কই, সে আসেনি তো?

মায়্য বলল, পিয়েরোঁ অসুস্থ, আসলে অসুখের ভান করে পড়ে আছে।

সবাই প্লুশারকে আরও খানিকক্ষণ থেকে যেতে বলল। কিন্তু প্লুশার ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তার আরও ঢের কাজ বাকি পড়ে রয়েছে।

প্লুশারকে বিদায় জানিয়ে সকলে মঁসুর দিকে এগোল। নিজেদের মধ্যে টুকটাক কথা বলছে। এতিয়েন আর মায়্যর মনে জয়ের আনন্দ। তারা হাসছে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমিতি সাহায্য পাঠালে তারা নতুন উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়বে কোম্পানি-

কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। কর্তাদের এবার হাঁটু গেড়ে মাপ চাওয়ার পালা, যাতে মজুররা সবাই কাজে যোগ দেয়।

নতুন আশায়, পূর্ণ উদ্যমে বুক বাঁধলো সবাই কিন্তু কেউ কি তাকিয়ে দেখল আকাশের কোণে জমে উঠেছে দুর্ভাগ্য আর দুর্যোগের কালো মেঘ?

*   *   *   *

আরও পনেরোদিন কেটে গেছে। জানুযারী মাসের শুরু। ঠাণ্ডা কুয়াশা। গ্রামে গ্রামে অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হয়ে চলেছে। প্রতিটি মুহূর্ত আসে নিঃসীম ক্ষুধা আর দারিদ্র্য নিয়ে। লণ্ডন থেকে আন্তর্জাতিক সংস্থা সাহায্য পাঠিয়েছিল। চার হাজার ফ্রাঁ। তা তো সমস্ত শ্রমিক পরিবারকে দিন তিনেকের রুটি যোগাতেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। সকলেরই মন ভেঙে যাচ্ছে ক্রমশ। কার ওপর ভরসা করে বিপ্লব চালিয়ে যাওয়া যায়? পৃথিবীর সমস্ত উষ্ণতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এরা যেন মৃত্যুর দিন গুনছে।

তৃতীয় সপ্তাহের শুরুতে মঙ্গলবার আন্দাজ দু'শো চল্লিশ নম্বর কলোনীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়ল। এতিয়েন আর অন্যান্য প্রতিনিধিরা চাঁদা তুলে সবচেয়ে দুঃস্থ পরিবারগুলোকে সাহায্য করছে। অন্য সমস্ত বাড়িতে ঘটি বাটি বন্ধক দেওয়ার অবস্থা। গরম জামা, লেপ কম্বল, বিছানার চাদর, রান্নার বাসনপত্র এমন কি আসবাবও দেনার দায়ে আর পেটের জ্বালায় বিকিয়ে যাচ্ছে। প্রথম প্রথম মেইগ্রার প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য দোকানদাররা ধারে জিনিসপত্র দিচ্ছিল। এখন বেগতিক বুঝে সবাই সরে পড়েছে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়ে। অবস্থা এমন দুর্বিষহ যে এখন ঘরের এক কোণে পড়ে থেকে আস্তে আস্তে মরে গেলেই হয়।

এতিয়েন পারলে নিজের গায়ের মাংস বিক্রী করে এই অনাহার মেটাতো। সমিতি থেকে তাকে যে মাইনে দেওয়া হত, তা সে এখন আর নেয় না। পরনের সবচেয়ে দামী কোট আর প্যান্টটা বিক্রী করে মায়্যদের টাকা দিয়েছে। শুধু একজোড়া জুতো ছাড়া শৌখিন জিনিস বলতে ওর আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এখন মনে হয় খানিক সবুর করে তহবিলে টাকাপয়সা জমিয়ে নিয়ে ধর্মঘট শুরু করলেই বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ হত। হাতে টাকা থাকলে মজুরদের মনের জোর বাড়তো, তারা নতুন উৎসাহে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারত। এখন মনে পড়ে সুভারিন বলেছিল মজুরদের তিলে তিলে মারবার জন্যই কোম্পানি ছুতোয়নাতায় ধর্মঘট করতে বাধ্য করেছে।

সকলের দুঃখদুর্দশা দেখে এতিয়েনের মনটা হু হু করে। সে জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলতে লম্বা পথ পাড়ি দেয়। উদ্দেশ্যবিহীনভাবে মাইলের পর মাইল হাঁটে।

একদিন সন্ধ্যেবেলা দেখল পথের ধারে মুমূর্ষু অবস্থায় একটা বুড়ি পড়ে ধুঁকছে। বোঝাই যাচ্ছে দীর্ঘদিন না খেতে পেয়ে তার এই অবস্থা। দু হাতে তাকে কোলে তুলে নিল এতিয়েন। বেড়ার ধারে উঁকি মারলো একটা মেয়ের মুখ। মুকেত। ও এখানেই থাকে।

—এদিকে এসো মুকেত। একটু হাত লাগাও। একে কিছু খেতে দেওয়া দরকার।

মুকেতের দু চোখ জলে ভরে গেল। দৌড়ে বাড়ি থেকে খানিকটা রুটি আর গ্লাসে কিছুটা জিন নিয়ে এল। জিন খেয়ে একটু সুস্থ বোধ করল বুড়ি। উঠে বসল সে। তারপর রুটিটা নিয়ে গবগব করে খেতে লাগল।

বুড়িটার বাড়ি 'কুন্তি'র রাস্তার ওপর, এক গাঁয়ে। ওর ছেলে কাজ করে খনিতে। বুড়ি গিয়েছিল বোনের কাছে দশ সু ধার পাবার ব্যর্থ চেষ্টায়। খাওয়া শেষ হতে টালমাটাল পায়ে সে বাড়ির দিকে হাঁটা দিল।

এতিয়েন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে মুকেত বলল, এসো না, একটু কিছু পান করবে।

এতিয়েন ইতস্তত করল।

মুকেত বলল, তুমি এখনও আমাকে ভয় পাও, তাই না?

ওর পিছু পিছু এতিয়েন ভেতরে গেল। ওর হাসিমাখা মুখ, বুড়িটার প্রতি দয়া—সবই এতিয়েনকে মুগ্ধ করেছে। সোজা তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল মুকেত। চমৎকার সাজানো গোছানো। মনেই হয় না অভাবের সংসার। এ নিয়ে মুকেতকে খোলামনে প্রশংসাও করল এতিয়েন। অবশ্য মুকেতের বাবা এখনও খনি দেখাশুনোর কাজ করে বলে পয়সা পায়। মুকেত নিজেও জামাকাপড় কাচার কাজ করে। দিনে তিরিশ সু মতো রোজগার হয়।

মুকেত হঠাৎ এতিয়েনের কোমর দু হাতে জড়িয়ে ধরে আদুরে গলায় বলল, বলো তো, তুমি আমাকে একেবারে দু চক্ষে দেখতে পারো না কেন? আমাকে চাও না, না?

হেসে ফেলল এতিয়েন।

—কই না, চাই তো।

—ছাই চাও! আমি যেমনটি করে চাই, তেমনটি তো নয়। জানো, তোমার জন্য আমি মরে যাচ্ছি। আমি চাই তুমি আমায় ভালোবাসো, গ্রহণ কর।

সত্যি কথা। খোলা মনেই বলেছে মুকেত। গত ছ'মাস ধরে এতিয়েনের জন্য ও পাগল হয়ে গেছে। ওর দিকে তাকালো এতিয়েন। জোরে জড়িয়ে ধরল মুকেত এতিয়েনকে। ঈষৎ তুলে ধরল তার মুখ। এতিয়েন বিভ্রান্ত হল, বুঝি বা কিছুটা মুগ্ধও। হয়তো মুকেত সুন্দরী নয়। তার ভরাট মুখে বুদ্ধির ছাপও নেই কিন্তু কি যেন সম্মোহনী শক্তি আছে ওই সহজ সরল হাসিমাখা চোখ দুটোতে। হঠাৎ খুব তাজা, ছোট্ট মেয়ের মতো মনে হল তাকে। কি করে এতিয়েন তাকে প্রত্যাখ্যান করবে?

ফিসফিসে গলায় মুকেত বলল, আমায় নাও এতিয়েন, দয়া কর।

এতিয়েন গ্রহণ করল মুকেতকে, পরিপূর্ণভাবে। ঠিক কুমারী মেয়ের মতো আনাড়ি মনে হচ্ছিল মুকেতকে। কিন্তু কেন? আজ পর্যন্ত কম পুরুষ তো ওর সঙ্গ পায়নি? আসলে মুকেতের এত দিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে, স্বপ্ন বাস্তব হয়েছে

তো··· । ওর সমস্ত সত্তা যেন বিবশ হয়ে গেছে··· । এতিয়েন বিদায় চাইল। বার-বার তার হাতে চুমু খেয়ে নীরব কৃতজ্ঞতা জানালো মুকেত।

বাড়ি ফেরার পথে সব কথা ভেবে এতিয়েন একটু লজ্জা পেল। মুকেতকে পেয়েছে বলে নয়। মুকেতের মতো মেয়ে যে কোনো পুরুষের পক্ষেই সহজলভ্য। নাঃ, এ সব ব্যাপার বাড়তে দেওয়া উচিত হবে না। এতিয়েন এবার থেকে সমঝে চলবে। কিন্তু মুকেত যে ওকে সত্যিই ভালোবাসে!

বাড়ি ফিরেই একটা দুঃসংবাদ পেল সে। জোর গুজব—প্রতিনিধিরা আর একবার ম্যানেজারের কাছে গেলে হয়তো কোম্পানি আপোস করতে রাজী হবে। কর্তাব্যক্তিদের সহকারীরা অন্তত সেই ধরনের কথাই রটাচ্ছে। আসল কথাটা হল ধর্মঘট চলছে, মজুরদের দুর্ভোগের চেয়েও খনিতে কাজ বন্ধ থাকায় মালিকপক্ষের লোকসান হচ্ছে বেশী। দু'পক্ষই নিজেদের মাটি কামড়ে বসে থাকায় জল ঘোলা হচ্ছে। শ্রমিকরা ধুঁকছে ঠিকই কিন্তু মালিকরাও খুব শান্তিতে নেই। একদিন কাজ না হওয়া মানেই এক লাখ ফ্রাঁ ক্ষতি। একটা যন্ত্র চলছে না মানেই সেটা মৃত। সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ, যন্ত্রপাতিগুলো সব অকেজো হয়ে যাচ্ছে। আর্থিক ক্ষতির কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। মজুত কয়লার পরিমাণও শেষ হয়ে আসছে। ক্রেতারা বলছে বেলজিয়াম থেকে কয়লা কিনবে। তার মানেই মঁসুর ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কিন্তু কোম্পানি-কর্তৃপক্ষের মাথায় একটাই চিন্তা যদিও সেটা গোপন আছে যে খনির ভেতরকার বিভিন্ন গ্যালারীর অবস্থা যতই দিন যাচ্ছে আস্তে আস্তে খারাপ হচ্ছে। মেরামতির খরচা চালানো যাচ্ছে না। ফাটল ধরছে সর্বত্র। শেষে তো যেখানে-সেখানে ধস নেমে এমন অবস্থা হল যে দীর্ঘদিন ধরে মেরামতির কাজ না চালালে কয়লা তোলার কাজ আরম্ভ করা অসম্ভব। চারদিকে নানান ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়ছে। ক্রেভকার্-এ তিনশো মিটার রাস্তা নাকি ধস নেমে বসে গেছে আর সেই জন্য স্যাংক-পন খনির কাজ পুরোপুরি বন্ধ। ম্যদলেন-এ ম্যগ্রেতু খনি জলের তোড়ে ভেসে যায়। কোম্পানি-কর্তৃপক্ষ অবশ্য এ সব কথা স্বীকার করতে চাইছে ন তবে পর পর দু'দিনে দুটো বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়াতে তারা বেকায়দায় পড়ে গেছে। প্রথম দিন, সকালে লা পিয়োলেইন-এর কাছে মিহ্রুর উত্তর দিকের গ্যালারীর ওপরে মস্ত বড় ফাটল দেখা গেল। পরের দিনই আবার ল্য ভোর‍্যাতে এমন ধস নামলো যে পাশের বসতির কোণার দিকের দু-দুখানা বাড়ি ভূগর্ভে তলিয়ে গেল। কর্তৃপক্ষ এই বেসামাল অবস্থাটা আর ধামাচাপা দিতে পারছে না।

এতিয়েন আর তার সহকর্মী প্রতিনিধিরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মতিগতি না জেনে ধর্মঘট চালিয়ে যেতে ভয় পাচ্ছিল। দঁসেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে তারা হতাশ হয়েছে। দঁসের চালাক লোক। দিব্যি পাশ কাটিয়ে গেছে। সবাই মিলে ঠিক করল মঁসিয় এনবোর কাছে আর একবার যাবে। কোম্পানির বিপদের সময় কথাবার্তা বলে যদি সমঝোতায় আসা যায়। কিন্তু সকলেই মোটামুটি একমত হল যে নিজেদের সর্তের ব্যাপারে তারা অবিচল থাকবে।

মঙ্গলবার সকালে তারা মঁসিয় এনবোর সঙ্গে দেখা করল। সমস্ত পরিবারগুলো দারিদ্র্য আর অনাহারের জ্বালায় ধুঁকছে। প্রথম বারের চেয়ে মঁসিয় এনবোব ব্যবহাব অনেক কম সৌহার্দ্যপূর্ণ।

মায়্যু এবারও প্রথম কথা বলতে শুরু করল। তার সহকর্মীবা জানতে চেয়েছে কোম্পানির তরফ থেঁকে নতুন কিছু বলার আছে কি না।

প্রথমে তো মঁসিয় এনবো ঘাড শক্ত করে রইলেন।

—না না, সমঝোতার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। মজুররা যা খুশি তাই কববে, নেমকহারামী করবে—এ কি মগের মুলুক না কি!

আস্তে আস্তে অবশ্য একটু নরম হলেন তিনি। জানালেন, যদিও ওপব মহল থেকে কোনো নির্দেশ আসেনি, তবু দু'পক্ষের সুবিধার জন্য তিনি আপোসের ব্যাপাবে আলোচনা করতে রাজী: যেমন ধরা যাক মজুররা টিম্বাবিং বাবদ আলাদা মাইনে পাবে আর কোম্পানি এই মজুরী দু সেন্টিম বাডিয়ে দেবে। কিন্তু আসলে এটা মঁসিয় এনবো নাকি নিজেই উপযাচক হযে বলছেন, মালিকপক্ষ এ ধবনেব আপোসেব পক্ষে কি বিপক্ষে সে খবর তিনি এখনও জানেন না।

শ্রমিক প্রতিনিধিরা কিন্তু এই ধরনের সমঝোতায বাজী নয। তারা চাইছে সুবিচার হোক, সব সর্তগুলো কোম্পানি মেনে নিক। সমস্ত পুরনো চালু নিযম বহাল তো থাকবেই, উল্টে কযলার টব পিছু পাঁচ সেন্টিম মজুরী বাডাতে হবে।

মঁসিয এনবো অনেক বোঝালেন ওদেব, এ ভাবে স্বার্থপবেব মতো বউ-বাচ্চাদেব তিলে তিলে মারাটা কি ঠিক? কিন্তু মজুররা গোঁ ধবে বসে রইল। না খেতে পেযে মরলেও তারা নিজেদের মত পাল্টাবে না।

আর কিছু আলোচনা করার ছিলও না। মঁসিয এনবো রাগ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। এতিয়েনরাও সদলবলে বাগী পা ফেলে সদর্পে বেরিয়ে এল।

বেলা দুটো আন্দাজ সব মেযেরা গেল মেইগ্রার কাছে। এই দুর্দিনে ওই-ই ভবসা। খোসামোদে কাবু করে যদি আরও এক সপ্তাহ ধাবে জিনিসপত্র পাওযা যায। বুদ্ধিটা মায়্যু-গিন্নীর। মা ব্রুলে আর লেভাক-গিন্নীকে সে রাজী করিয়েছে। পিযেরোঁব বউ অবশ্য কিছুতেই যেতে রাজী হল না। অসুস্থ স্বামীকে এক মুহূর্তেব জন্যও ফেলে রেখে কোথাও যাওযা তাব পক্ষে নাকি অসম্ভব। আস্তে আস্তে মেযেবা অনেকেই জড়ো হল, তা সংখ্যায় প্রায জনা কুডি হবে। মঁস্যুর বড মানুষের দল এই সব গরীব হাঘরে বউগুলোকে দেখল শুকনো মুখে, ধুলোমাখা পাযে এগিযে আসতে। ব্যস, পটাপট সব জানলা দরজা বন্ধ হয়ে গেল। এক মহিলা তো তার রুপোর বাসনপত্র সব সরিয়ে ফেললেন। যা দিনকাল পডেছে, কে জানে বাবা, চোর-ছ্যাচডের উৎপাত হতে পারে।

মেইগ্রার দোকানে এক বিশ্রী দৃশ্য। মেইগ্রা তো খুব আহ্লাদ করে সবাইকে দোকানে ঢুকিয়েছে এই ভেবে যে সকলে মোটা টাকা শোধ করতে এসেছে। কিন্তু [illegible] যে মুহূর্তে মায়্যুর বউ গাওনা গাইতে গেছে, রেগে লাল হয়ে গেল

মেইগ্রা।—ইয়ার্কি নাকি? আবার ধার? না না একটা আলু নয়, রুটির গুঁড়ো পর্যন্ত নয়। ঢের শিক্ষা হয়ে গেছে তার। কেন, অন্য দোকানীরা কি দোষ করল? সব দায় কি তার একার? সব মেয়েরা, গিন্নীরা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে তার হাতে পায়ে ধরতে লাগল। মেইগ্রাই এখন তাদের কাছে ভগবান।

মেইগ্রার অসভ্যতা কম নয়। সে মা ব্রুলেকে বলল নতুন পুরুষমানুষ হিসেবে তাকে পছন্দ করলে বুড়িকে সে দোকান পাট সব দিয়ে দেবে। প্রাণের দায়ে লেভাকের বউ বলল, সে তো মেইগ্রার প্রস্তাবে নিজেই রাজী আছে। অশ্রাব্য গালিগালাজ দিয়ে মেইগ্রা সকলকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিল। সবাই কাকুতি মিনতি করলেও তার মন গলল না। আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে তাকে অভিসম্পাত দিল মায়ুর বউ। ছি ছি, এত চামার! মুখে রক্ত উঠে মরবে রক্তচোষা বাদুড়টা!

সবাই শ্রান্ত পায়ে ফিরে এল ঘরে। সমর্থ পুরুষমানুষগুলো—বেকার মজুরগুলো খালি হাতে বউকে, মেয়েকে ফিরতে দেখে চোখ নামালো। আর কোনো আশা নেই। আজও স্যুপ জুটবে না, অন্য কিছু তো স্বপ্ন মাত্র। কিন্তু তবুও সমঝোতা নয়, কিছুতেই নয়। এই কষ্ট, যন্ত্রণা কোন এক অদৃশ্য মন্ত্রবলে তাদের আরও—আরও মনের জোর যোগাচ্ছে। ভয় পাওয়া, তাড়া খাওয়া জন্তুর মতো অবস্থা সকলের। দরকার হলে নিজের গর্তে না খেতে পেয়ে মরব, তবু বাইরে বেরিয়ে শিকারীর বন্দুকের সামনে পডব না। প্রত্যেকে প্রতিজ্ঞা করেছে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলবে, যেমনটি খনিতে কাজ চলার সময় ছিল। কে হাসিমুখে কত বেশী কষ্ট সহ্য করতে পারে, তাই নিয়ে যেন নীরব প্রতিযোগিতা চলছে!

মায়ুদের বাড়িতে সেদিনের সন্ধ্যেটা কেমন কাটছে এবার দেখা যাক।

নিভু নিভু আগুনটা ঘিরে সকলে বসে, কারও মুখে কথাটি নেই। ঘরের কোকিল-ঘড়িটার টিকটিক শব্দ এখন আর শুনতে পাওয়া যায় না: সেটাকে তিন ফ্রাঁতে বিক্রী করা হয়ে গেছে। শুধু চকচকে গোলাপী কার্ডবোর্ডের বাক্সটা যেটা কোনো এক'দিন মায়ু তার বউকে উপহার দিয়েছিল, সেটা এখনও বিক্রী হয়নি। হয়নি মানে মায়ুর বউ প্রাণে ধরে বিক্রী করতে দেয়নি। দু'খানা মাত্র ভালো চেয়ার ছিল, সব—সব গেছে। বুড়ো ঠাকুর্দা আর বাচ্চারা বাগান থেকে আনা নড়বড়ে কাঠের বেঞ্চটায় বসে আছে।

ধূসর গোধূলির ম্লান আলো। শীতটা এবার জাঁকিয়ে পড়বে।

উনুনের এক ধারে জড়োসড়ো হয়ে বসে মায়ুর বউ বলল, কি করি বলো তো?

এতিয়েন দাঁড়িয়ে ছিল। ঘরের দেয়ালে রাজারাণীর ছবি ঝোলানো আছে। ইচ্ছে করে টান মেরে ফেলে দিতে। আপদ বিদায় হোক! কিন্তু এরা ফেলতে দেবে না। ঘর সাজানো হয়েছে!

আপন মনেই বলল এতিয়েন, আর হারামজাদাগুলোর চোখের চামড়াও নেই। দেখছে পাশের ঘরের সব না খেতে পেয়ে মরছে—তবু দুটো স্যু ধার দিতে বুক ফেটে যায়।

অনেক চেষ্টা করে বিবর্ণ মুখে মায়ু-গিন্নী বলল, যদি গোলাপী বাক্সটা নিয়ে যাই?

টেবিলের ধারে বসে পা দোলাচ্ছিল মায়্যু। লাফিয়ে উঠে বলল, খবরদার না! আমার দিব্যি!

ওর বউ খুব ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। হা ভগবান, এত দুর্ভোগও কপালে ছিল! রুটির এক কণা গুঁড়োও নেই, বিক্রী করার মতো কোনো জিনিসও নেই। কি করে খাবার যোগাড হবে, ভেবে মাথায় আসছে না কিছু। এই ঠাণ্ডা! এদিকে জ্বালানীর অভাবে আগুনটাও নিভে এল। তার সমস্ত রাগটা গিযে পডল আলজিরের ওপর। সকালে তাকে কযলা কুডোতে পাঠানো হয়েছিল। খনির চারপাশে ঘুরঘুর করেছিল কিন্তু সুবিধে হযনি। তাড়া খেয়ে খালি হাতে কুকুরের মতো পালিযে এসেছে। কোম্পানি চুলোয় যাক! মেয়েটাকে দু-চার টুকরো বাতিল করা কযলা দিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত? কেঁদে ফেলেছিল আলজির। একটা লোক নাকি তাকে মারতেও এসেছিল। কিন্তু মারুক আর ধরুক, কাল সে আবার যাবে।

ধৈর্য হারিয়ে চেঁচিয়ে উঠল আলজিরের মা।

—হতচ্ছাড়া জঁলঁ্যাটাই বা কোথায়? ওর না খানিক সবজি তুলে আনার কথা? গরুর মতো ওই জাবনাই তো চিবোতে হবে! ও ফিরবে না তোমরা দেখে নিও। কাল রাতের মতো আজও বাইরে কাটাবে। কি করে কে জানে! মুখ দেখে তো মনে হয় না যে না খেযে থাকে। বাইরে কে খাওয়ায় ওকে?

এতিয়েন থামাতে চেষ্টা করল মায়্যু-গিন্নীকে।

—হয়ত রাস্তায় দু-চার স্যু

—কি! আমার ছেলেরা ভিক্ষে করবে? তাহলে সেদিন আমি ওদের গলা টিপে মেরে রেখে পরে নিজে মরব।

মায়্যু হতাশভাবে টেবিলের ওপর বসে পড়ল। লেনোর আর অঁরি খাবার না পেয়ে ঘ্যানঘ্যান করছে। বুড়ো বোন্‌মর বার বার মুখের মধ্যে জিভটাকে নাড়াচাড়া করছে —খিদেটাকে যদি ভুলে থাকা যায। বুড়োর বারোমেসে কাশি। মাছ ধরতে গিযে মায়্যুর হাতে-পায়ে হাজা ধরে গেছে, মা আর বাচ্চারা না খেতে পেয়ে রক্তশূন্য এ অবস্থা বেশী দিন চোখে দেখাও কষ্টকর। কিন্তু করার তো কিছু নেই। এ সব ক্ষতি স্বীকার করে নিতেই হবে। নইলে তো কুকুরের মতো ল্যাজ গুটিয়ে সুড়সুড করে মালিকের লাথি ঝাঁটা খাবার জন্য ফিরে যেতে হয়। এমনিতেই গ্রামে লোক মরছে দু-চারজন করে। কিন্তু এখন খাবার চাই। যা হোক কিছু খাবার।

অন্ধকার আরও গাঢ হয়ে এল। খানিকক্ষণ দ্বিধা করে শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়ালো এতিয়েন।

—দাঁড়াও, বাইরে যাই। দেখি যদি কিছু উপায় হয়।

সে বেরিয়ে গেল। মুকেত্তের কথা মনে পড়ে গেছে হঠাৎ। মেয়েটার মনটা ভালো। চাইলে রুটি দিতে পারে। তবে একটাই দোষ, বড় শরীরসর্বস্ব। ন্যাকা ন্যাকা গলায় প্রেম নিবেদন করবে। তা করুক, তবু মায়্যুদের পরিবারের জন্য এতিয়েন শেষ পর্যন্ত যেতে রাজী আছে।

মায়্যু-গিন্নী বলল, আমিও যাই। দেখি চেষ্টা-চরিত্র করে। সেও বেরোল এতিয়েনের পিছু পিছু। ঘরের বাকি মানুষগুলো মোমবাতির টিমটিমে আলোয় বসে রইল চুপ করে, ভূতের মতো।

বাইরে বেরিয়ে এক মুহূর্ত চিন্তা করে লেভাকদের বাড়ির দিকে পা বাড়ালো মায়্যুর বউ।

—ছাখো, ক'দিন আগে তোমাদের একটা রুটি ধার দিয়েছিলাম। আজ যদি সেটা শোধ···

এর বেশী কিছু বলতে পারল না সে। ঘরের দৃশ্যটা এতই করুণ যে মুখ ফুটে আর কিছু বলা যায় না। এত বড় দুর্দিনেও। তার নিজের বাড়ির থেকেও করুণ অবস্থা।

লেভাকের বউ নিভে যাওয়া ঠাণ্ডা চুল্লীটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। তার স্বামী আকণ্ঠ মদ গিলেছে বোধহয়। টেবিলের ওপর শুয়ে ঘুমোচ্ছে। বুতলু কি করবে কিছুই বুঝতে পারছে না যেন।

লেভাকের বউ বলল, একটা রুটি! ওঃ ভগবান! আমি তো নিজেই ভেবেছিলাম আবার ধার করতে বেরোব।

ঠিক সেই সময় ঘুমের মধ্যে ককিয়ে উঠল লেভাক। তার বউ রেগে তার মাথাটা টেবিলের সঙ্গে ঠুকে দিল।

—ঘুমোও, জন্মের শোধ ঘুমোও। শুয়োরের বাচ্চা, সারা জীবন আমায় হাড়ে-মাসে জ্বালিয়ে খেলে! তোমার পাছায় গরম গনগনে শিকের খোঁচা দেওয়া উচিত। বেজন্মা কোথাকার! কেন, বন্ধুদের পয়সায় ফুর্তি করে এসেছ, বাড়ির কথা মনে ছিল না?

যা-তা মুখ খারাপ করতে লাগল লেভাকের বউ। ছোট ছেলেটা, বেবের—সে হারামজাদা তো সকাল থেকে বেপাত্তা। যাক, যাক সব নিপাত যাক! রাবণের গুষ্টি! ও আর না ফিরলেই বাঁচা যায়। তবু একটা হাঁ বন্ধ হবে। মরুক গে—সে এখন শুতে যাবে। তবু খানিকটা শরীর গরম হবে বিছানায়। বুতলুকে ঠেলা দিল একটা।

—কি হল, শোবে চলো। আগুন নেই, খাবার নেই, এখানে বসে থেকে হবেটা কি? বিছানায় গেলে তবু গা গরম করা যাবে। এই মোদো মাতালটা পড়ে থাকুক গে!

মায়্যুর বউ বেরিয়ে এল। এবার সে পিয়েরোঁর বাড়ি যাবে। ওই তো, ভেতর থেকে হাসির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। দরজায় টোকা দেওয়া মাত্রই শব্দটা থেমে গেল। প্রায় এক মিনিট বাদে দরজা খুলল পিয়েরোঁর বউ।

—ওঃ তুমি, আমি ভেবেছিলাম ডাক্তার এসেছে।

মায়্যুর বউকে কথা বলার সুযোগ দিল না পিয়েরোঁর বউ। নিজের স্বামীর কথা বলতেই ব্যস্ত।

—ইস, ওর কি অবস্থা দেখ! মুখটা দেখে বুঝতেই পারবে না ভেতর ভেতর কি

অসুস্থ। ওর পেটটা ভালো যাচ্ছে না। শরীরে কাঁপুনি, তাই তো যা ছিল ঘরে তাই দিয়ে আগুন জ্বালাতে হচ্ছে।

পিয়েরোঁর চেহারা কিন্তু দিব্যি শাঁসে জলে। গায়ে বেশ গত্তি লেগেছে। ভাব দেখাচ্ছে যেন কতো অসুখ। ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলছে। ঘরে ঢুকেই মায়্যু-গিন্নী খরগোশের ঝোলের গন্ধ পেয়েছিল। তার সাড়া পেয়ে নচ্ছার মেয়েমানুষটা মাংসের পাত্রটা নির্ঘাত সরিয়ে ফেলেছে। টেবিলময় রুটির গুঁড়ো। এক বোতল মিষ্টি মদ টেবিলে—নিশ্চয়ই তাড়াহুড়োয় সরাতে ভুলে গেছে।

পিয়েরোঁর বউ বলল, মা মঁসুতে গেছে, রুটি যোগাড়ের ধান্দায়। আমরা মার জন্যই অপেক্ষা···

মুখ দিয়ে পরের কথাটা বেরোল না তার। ক্যাথরিনের মায়ের দৃষ্টি অনুসরণ করে সে দেখল টেবিলের ওপর বোতলটা। একটু দ্বিধা, তারপরই মনে মনে শক্ত হল পিয়েরোঁর বউ: হ্যাঁ, ওটা মদের বোতল। লা পিয়োলেইন-এর বাসিন্দারা তার স্বামীকে দিয়েছে। ডাক্তার বলেছে ওষুধ হিসেবে অল্প অল্প খেতে। সত্যি, ওঁরা কত মহানুভব! এত ধনী হয়েও তাদের মতো মরা গরীবের বাড়িতে এসেছিলেন। আর মেয়েটি! সে তো নিজের হাতে ওকে উপহার দিয়েছে।

মায়্যুর বউ বলল, হ্যাঁ, আমিও চিনি ওদের।

বুকে বড় বাজলো তার। তারাই তো সবচেয়ে গরীব। অথচ চিরটা কাল সমাজের ধর্মই হল তেলা মাথায় তেল ঢালা। কিন্তু আশ্চর্য। ওঁদের তো কেউ আসতে দেখল না? পিয়েরোঁর বউ জাঁহাবাজ মেয়েছেলে। কি করে আদায় করল কে জানে।

মায়্যুর বউ বলল, আসলে একটু কাজে এসেছিলাম। তোমার কাছে একটু ছাতু হবে? ক'দিন পরে আবার শোধ করে দিতাম।

পিয়েরোঁর বউ হতাশ মুখ করে বলল, না না, এমন কি খুদও নেই। মা এখনও আসছে না মানে আজ রাত্তিরেও পেটে কিল মেরে পড়ে থাকতে হবে।

এমন সময় ওপরের চিলেকোঠা থেকে একটা মেয়ের চিৎকার আর কান্নার শব্দ ভেসে এল। দুম দুম করে দরজা ঠেলছে সে।

পিয়েরোঁর বউ সাফাই গাইল।

—লিডি। সারাদিন টই টই করে ঘুরে বেলা পাঁচটায় মেয়ে বাড়ি ঢুকেছে। লাই পেয়ে পেয়ে মাথায় উঠেছে একেবারে। কিছুতেই বাড়ি থাকতে চায় না। ঘরে আটকে রেখেছি। হোক একটু শিক্ষা।

মায়্যুর বউ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। গনগনে আগুনের আঁচ তার গায়ে এসে লাগছে। কি আরাম, আঃ! যতই মনে হচ্ছে এ বাড়িতে কত খাবার, তত যেন পেটের ভিতরটা পাক দিয়ে দিয়ে উঠছে। বোঝাই যাচ্ছে, বুড়ি মাকে বাড়ি থেকে ছুতো করে হটিয়ে দিয়ে, সতীনের বাচ্চা মেয়েটাকে ওপরের ঘরে বন্ধ করে রেখে কর্তাগিন্নীতে ভোজ খাওয়া হচ্ছিল। হে ভগবান, মেয়েছেলে একবার যাহোক করে

চরিত্তির খোয়ালেই তার ছপ্পড় ফুঁড়ে টাকা আসে। ভাত-কাপড়ের চিন্তা করতে হয় না।

হঠাৎ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল সে।

—আমি চলি, বুঝলে!

বাইরে তখন বেশ রাত। মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ উঁকি মারছে। বাগানের পায়ে-চলা পথ ধরল না মায়ুর বউ। বড় রাস্তা দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে আসতে লাগল। শরীর যেন চলছে না আর। সব কটা বাড়িতে কেমন দুর্ভিক্ষের গন্ধ, শ্মশানের নিস্তব্ধতা। কি হবে বাড়ি বাড়ি ঘুরে? সর্বত্রই অনাহারের তীব্র জ্বালায় মানুষ ধুঁকছে। দারিদ্র্য তার সব সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে ঘরে ঘরে জাঁকিয়ে বসেছে দিব্যি। বেশীর ভাগ কেন, প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই কয়েক সপ্তাহ ধরে পেট ভরে খাওয়া জোটেনি। এমন কি একটু পেঁয়াজের গন্ধও ভেসে আসে না কারও রান্নাঘর থেকে। চারদিকে শুধু কেমন মৃত্যুর হিমেল ছোঁয়া। হয়ত বা সকাল হলেই দেখা যাবে ঘুম কারও ভাঙেনি, বিছানাতেই সব মরে পড়ে আছে।

চার্চের পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ তার চোখে পড়ল দূরে আবছামতো মানুষের ছায়া। ধর্মযাজক। মনে আশা হল একটু। উনিই প্রতি রবিবার ধর্মের উপদেশ দেন তাদের। মাথা নীচু করে দ্রুত পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন তিনি। মোটাসোটা সুখী চেহারা, যেন সর্বদাই সন্ত্রস্ত এই বুঝি বা জীবন থেকে সুখ এক্ষুণি চলে গেল। দিনের আলোয় লোকের চোখে পড়ে গেলে তাদের অভাবের গল্প শুনতে হবে, তাই অন্ধকার ঘনিয়ে এলে তবেই কাজকর্ম সারতে বের হন। তিনি এখানে আর একজন রোগামতো যাজককে এনেছেন, তাঁর উত্তরসূরী—যার চোখ দুটো যেন জ্বলন্ত অঙ্গার।

মায়ুর বউ ভাঙা গলায় চেঁচালো।

—একটু দাঁড়ান, স্যর।

ভদ্রলোক তিলার্ধ দাঁড়ালেন না।

—না না, আজ তাড়া আছে।

ধীরে ধীরে বাড়ির দরজায় পৌঁছল মায়ুর বউ। শরীরের এমন অবস্থা যেন এক্ষুণি পড়ে যাবে।

মায়ু তখনও টেবিলের ধারে বসে। বুড়ো ঠাকুর্দা আর বাচ্চারা গা ঘেঁষাঘেঁষি করে পরস্পরের শরীর থেকে উত্তাপ চুরি করবার আশায় বসে আছে। কেউ কোনো কথা বলল না। মোমবাতিটা পুড়ে পুড়ে প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। দরজার আওয়াজ শুনে বাচ্চারা একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়েছিল বটে কিন্তু মাকে খালি হাতে ফিরে আসতে দেখে হতাশ হয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। মায়ু-গিন্নী বসে পড়ল কিন্তু তাকে কেউ কোনো প্রশ্ন করল না। কি দরকার অযথা কথাবার্তা বলে, শুধু শুধু শক্তিক্ষয়। এখন ওদের এতিয়েনের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া কিছুই করার নেই।

এতিয়েন ফিরল। তার হাতে কাগজে জড়ানো এক ডজন ঠাণ্ডা সেদ্ধ আলু।

—এই সব। আর কিছু পেলাম না।

মুকেতের কাছে রুটি ছিল না। কিন্তু সে নিজের মুখের খাবারটা এতিয়েনের হাতে তুলে দিয়েছে।

মায়্যুর বউ তাকে কিছুটা দিতে গেলে এতিয়েন বলল, না না, আমি যাহোক খানিকটা খেয়ে এসেছি।

খুবই বাজে কথা। এতিয়েনের পেটে এক দানা খাবারও নেই। বাচ্চাগুলো আর বুড়ো বোন্মর খাবারের ওপর একেবারে হামলে পড়ল। শেষে তো এমন হল, একটা আলু বুড়োর হাত থেকে প্রায় জোর করে কেড়ে নিতে হল আলজিরের জন্য।

এতিয়েন বলল সে কিছু খবর পেয়েছে। কোম্পানি মজুরদের অবাধ্যতা দেখে এখন উল্টো চাল চেলেছে। আপোসের কোনো সম্ভাবনাই নেই। শোনা যাচ্ছে ল্য ভোর‍্য আর ফ্যত্রি কাঁতেতে সব লোক কাল থেকে কাজে নামবে। ম্যদলেন আর মিত্রুতেও নাকি অনেকে কাজে যোগ দেবার কথা ভাবছে।

রাগে চিৎকার করে উঠল মায়্যু।

—নেমকহারামের দল! ওদের টিট করে দেব। কাল তাহলে আমরা শুধুমাত্র আমরাই গোপন সভায় যাব।

তার কথায় জেগে গেল বোন্মর। ঐখানে সভা হবে, বনের মধ্যে, যেখানে অনেককাল আগে শ্রমিকেরা রাজার সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছিল।

বুড়ো বলল, ভঁদাম-এ তো? তোদের সঙ্গে আমিও যাব।

মায়্যুর বউ দু হাত নেড়ে বলল, আমরা সবাই যাব। এ রকম অত্যাচার আর অবিচারের একটা সীমা আছে।

এতিয়েনের মনে হল বাড়ি বাড়ি গিয়ে সভার খবর দিতে হবে। কিন্তু এখন আর তার শরীর চলছে না। আগুনটা নিভে গেছে। মোমবাতিটাও এইমাত্র নিভে গেল দপ্ করে। কয়লা নেই, তেল নেই। অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে সবাই শুতে গেল। হাত পা শীতে যেন জমে যায়। বাচ্চাগুলো একটানা সুরে কাঁদছিল।

* * * *

জঁলঁ্যার অবস্থা এখন আগের চেয়ে ভালো। হাঁটাচলা করতে পারছে। কিন্তু ডাক্তার পা দুটো পুরোপুরি সারাতে পারেনি। এখনও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়। তবু একবার যদি জোরে দৌড়তে শুরু করে, কে বলবে ওর পায়ে চোট আছে। তাড়া খাওয়া জন্তুর মতো ছোটে যেন।

একদিন সন্ধ্যেবেলা জঁলঁ্যা তার দুই সঙ্গী বেবের আর লিডিকে নিয়ে রকিযার-এর রাস্তায় নজর রাখছিল। আবর্জনার গাদার পাশে বেড়ার ধারে শুয়ে ছিল সে—নজর ছিল ওপারের মণিহারী দোকানটার ওপর। একটা বুড়ির দোকান, সে আবার চোখে প্রায় দেখে না বললেই চলে। দু-তিন বস্তা মুসুরীর ডাল আর শুকনো বিনের বীচি সে বাইরে এনে রেখেছে। জঁলঁ্যার চোখ কিন্তু সেদিকে নেই। সে [illegible] বড় শুকনো কড মাছটা, রোদে শুকোতে দেওয়া হয়েছে একটা দড়ি বেঁধে

হুকে ঝুলিয়ে। দু-দু বার সে বেবেরকে পাঠিয়েছিল মাছটা চুরি করে আনবার জন্য। দু বারই অন্য লোক এসে পড়ায় আড়ালে সরে আসতে হয়েছে। কোনো একটা কাজ যদি শান্তিতে করা যায়!

ঘোড়ায় চেপে মঁসিয় এনবো এলেন। তাঁকে দেখেই তিনজন ঘাপটি মেরে বসে রইল। এই ধর্মঘট শুরু হবার পর থেকেই উনি যখন-তখন এভাবে ঘুরতে বেরোন। সম্ভবত চারপাশের হালচাল বোঝার জন্যই। কিন্তু কখনই তাঁকে উটকো উপদ্রব সহ্য করতে হয়নি। সব কিছুই খুব আশ্চর্য রকমের শান্ত। শুধু কর্মচারীরা, দেখা হলে আজকাল বেশ দেরি করে সেলাম ঠোকে। যত্রতত্র আগের মতোই প্রেমিক-প্রেমিকার গুঞ্জন। কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা ঘোড়া ছুটিয়ে দেন তিনি কিন্তু এই সব প্রেমালাপ দেখলে এই বয়সেও তাঁর বুকের মধ্যে কেমন যেন করে। নিজের স্ত্রীর কথা মনে পড়ে যায়। আজকাল নেহাত বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরাও কেমন শরীর নিয়ে জীবনটাকে উপভোগ করতে শিখেছে।

জঁল্যাঁ বলল, দূর ছাই, শালার ঘোড়াটা আর নড়ে না। যা তো বেবের, ল্যাজটা মুচড়ে দিয়ে আয়।

এখন আবার আরও দুটো লোক এসে গেছে। দাঁতে দাঁত চেপে একটা অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করল জঁল্যাঁ। ও বাবা, এ যে জাশারী আর মুকে! জাশারী সাড়ম্বরে বলছে কেমন করে বউয়ের জামার পটির ভেতর থেকে চল্লিশ স্যু হাতিয়েছে। দু'জনেই হাসছে আর পরস্পরের পিঠ চাপড়াচ্ছে।

মুকে বলল, চলো দোস্ত্, পয়সাটা দিয়ে দুটো বাজি জুয়ো খেলে আসা যাক কাল।

রাজী হল জাশারী। দূর, ধর্মঘট নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? দু'জনে সবে মোড়টা ঘুরেছে, এতিয়েন এসে কথা বলতে শুরু করল।

জঁল্যাঁ রাগে কাঁধ ঝাঁকালো।

—তিন মূর্তি কি এখানেই রাত কাটাবে না কি? ওদিকে বুড়িটা তো দোকানের ঝাঁপ ফেলল বলে! দ্যাখ, বস্তাগুলো সব ভেতরে তুলছে।

একটু পরে আরও একজন মজুর এল। তাকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল এতিয়েন। দু'জনের ফিসফিস কথা কানে এল জঁল্যাঁর: গোপন সভাটা ক'দিন পরে হবে। এত তাড়াতাড়ি সকলকে জানানো সম্ভব নয়।

অবশেষে জায়গাটা ফাঁকা হল। জঁল্যাঁ আবার বেবেরকে পাঠালো।

—যা, যা না হতভাগা, মাছের লেজটা ধরে শুধু টেনে নামিয়ে নিবি। ব্যস, কেল্লা ফতে! খেয়াল রাখিস, বুড়ি আবার টের পেয়ে ঝাঁটা নিয়ে মারতে না আসে।

কপাল ভালো। অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে এসেছে। বেবের লাফ দিয়ে উঠে দড়িটা ছিঁড়ে ফেলল। তারপর লাফাতে লাফাতে চলে গেল তিনজন। বুড়ি আওয়াজ শুনে বেরিয়ে এসেছিল কিন্তু অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করতে পারেনি।

জঁল্যাঁ আর তার সঙ্গীসাথীরা দোকানগুলোতে যে হারে চুরিচামারি করতে শুরু করেছে তা বলার নয়। সকলেই এই ছিঁচকে চোরদের ভয় পায়। প্রথম প্রথম

ওরা শুধুমাত্র কয়লার টুকরো চুরি করেই ক্ষান্ত হত। কিন্তু এখন অভাব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভয় কমেছে। নানান জায়গায় চুরি করবার ধান্দায় থাকে। বুনো ফল খায়, বনে বাদাড়ে ঘোরে আর সুযোগ পেলেই এটা ওটা সরায়। জঁলঁ্যাই পালের গোদা। পেঁয়াজ খেত, সবজি খেত, ফলের বাগান, মণিহারী পশরা কিছুই তার শ্যেন দৃষ্টি এড়ায় না। এমন চুপিসাড়ে কাজ সারে যে দোকানীরা কিছু বুঝতে পারে না। তারা ধর্মঘটী শ্রমিকদের গালিগালাজ দেয়, সন্দেহ করে—এই চুরিচামারির পেছনে নিশ্চয়ই কোনো বড় দল আছে। জঁলঁ্যার এতই সাহস যে সে লিডির ওপর জোর করে তারই মায়ের ভাঁড়ারে হামলা চালাতে। চিনির কৌটো থেকে এক ডজন চিনির ড্যালা চুরি করে আনতে বলে। আর লিডিও তেমনি। ধরা পড়ে চোরের মার খাবে তবু মরে গেলেও জঁলঁ্যার নাম মুখে আনবে না। হাতিয়ে যা পাওয়া যায় তার বেশীর ভাগই জঁলঁ্যা নিয়ে নেয়। বেবের ভয়ে চুপ করে থাকে। জঁলঁ্যা যে মেরে তার হাড় গুঁড়ো করে দিচ্ছে না এই বরং তার বাপের ভাগ্যি।

গত ক'দিন যাবৎ জঁলঁ্যা কিন্তু বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। লিডির ওপর এমন অত্যাচার করে যেন মেয়েটা ওর বিয়ে-করা বউ। তাছাড়াও ওর যাবতীয় খিদ্‌মৎগারি করে বেবের। দু'জনের সঙ্গেই জঁলঁ্যা এমন ব্যবহার করে যেন তারা ওর চাকর আর সে নিজে নবাব খাঞ্জা খাঁ। সব সময় হামবড়াই ভাব। আবার বলে, ওর একজন প্রেমিকা আছে—রাজকন্যা—তবে এই নোংরা ছেলেমেয়ে দুটো তার সামনে যাবার উপযুক্ত নয়। সত্যিই, ক'দিন যাবৎ মাঝে মাঝেই সে না বলে-কয়েই উধাও হয়ে যায়। যেমন ধর, মোড়টা ঘুরে এদের দু'জনকে বাড়ি যেতে বলেই নিজে কিন্তু অন্য পথ ধরে। বেবের আর লিডির সাহসই নেই ওর কথা অমান্য করে।

আজ বিকেলেও তাই হল।

দৌড়তে দৌড়তে হাঁপ ধরে গেল তিনজনের। বেবেরের হাত থেকে হ্যাঁচকা টানে কড মাছটা ছিনিয়ে নিল জঁলঁ্যা।

বেবের মৃদু আপত্তি জানালো।

—আমায় একটু দে। আমিই তো আনলাম।

—কি! যদি আমার মর্জি হয় তবেই পাবি, নইলে নয়। আর আজকে তো নয়ই। আমি খেয়ে বেশী থাকলে কাল তোদের কপালে একটু জুটতেও পারে।

লিডি আর বেবেরকে সামনে রেখে সে নিজে তাদের পেছনে চলতে লাগল।

—ব্যস, এবার তোরা দু'জনে ভালোমানুষের মতো চুপচাপ বাড়ি চলে যা। একবারও পেছন ফিরবি না। পেছনে ফিরলেই তোদের জ্যান্ত চিবিয়ে খাবে বুনো জানোয়াররা। আর বেবের, যদি তুই লিডির গায়ে হাত দিস, তোকে আমি আস্ত রাখবো না জেনে রাখিস।

তারপর অন্ধকারে মিলিয়ে গেল জঁলঁ্যা। এত আস্তে যে তার পায়ের শব্দও শোনা গেল না। বেবের আর লিডি মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। ভয়ে

তারা পেছন ফিরে দেখতে পর্যন্ত পারছে না। আর এই ভীতি থেকেই এই দুটো ছেলেমেয়ের মধ্যে এক আশ্চর্য সখ্যতা আর ভালোবাসার জন্ম হয়েছে। বেবের মনে মনে চায়—একবার, শুধু একবার লিডিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আদর করতে, আবাল্য ঠিক যেমনটি সে বড়দের করে আসতে দেখেছে। লিডিরও কি খুব অনিচ্ছা? বাধা দেবে? মনে তো হয় না। কিন্তু জঁলাঁর কথা ভাবলেই বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। ঘোর অন্ধকারে দু'জনে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল, কিন্তু একবারের জন্যও পরস্পরকে স্পর্শ না করে। সব সময়ই মনে হয় এই বুঝি জঁলাঁ পিছু পিছু আসছে। বেচাল দেখলেই দেবে ঘাড়ে এক রদ্দা।

রকিয়ার-এ পৌঁছে গেছে এতিয়েন। আগের দিনই মুকেত তাকে বহু অনুনয় বিনয় করেছিল একবার অন্তত আসবার জন্য। সেই জন্যই আসা। কিই বা করে! মেয়েটা এমন পাগলের মতো তাকে ভালোবাসে, পূজো করে যেন সে দেবতা। কিন্তু এই দুর্বলতা বেশীদিন প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। এবার এসব বন্ধ করতে হবে। মেয়েটাকে ভালো করে বুঝিয়ে বলা দরকার যে আমোদ ফুর্তির সময় এটা নয়। অনেক বড় কাজ বাকি পড়ে আছে। কত লোক না খেতে পেয়ে মরছে আর তারা এই বিপদের সময় সস্তা আমোদে মাতবে! কিন্তু মুকেত বাড়িতে ছিল না জানলার পাশে ঝোপের পেছনে এতিয়েন তার জন্য অপেক্ষা করছিল। মাঝে মাঝে লোকজনের চলাফেরার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

রকিয়ার-এর প্রায় সবটা জুড়েই ঝোপঝাড়। উঁচু-নিচু ঢিবিও আছে। একটা বিরাট জায়গা ঢালুমতো। আগে ওখানে খাদ ছিল। এখন সেটা বাতিল। ওখানে আর কয়লা তোলা হয় না বহুদিন যাবৎ। খাদের একেবারে গহ্বর থেকে উঠে এসেছে তার পুরনো শ্যাফ্‌ট। বিশাল হাঁ-মুখের চোঙটা যেন হাই তুলছে। দীর্ঘদিন ধরে অকেজো বলে ভেতরের প্রায় অর্ধেকটা গাছপালায় বুজে গেছে। চাপড়া চাপড়া নরম ঘাসও কম গজায়নি। ওর কালো গর্তটার ওপর ঠিক ফাঁসিকাঠের মতো দেখতে লম্বা খুঁটিটার মাথায় একটু ছাউনী! দুটো বড় গাছ যেন পৃথিবীর গর্ভ থেকে উঠে প্রচুর ডালপালা মেলে দিয়েছে চারদিকে। বসন্তকালে পাখিরা এসে বাসা বাঁধে তার ডালে। রকিয়ার-এর বাতিল খাদটা ল্য ভোরা খনির দুটো চালু খাদকে জুড়ে রয়েছে। সে দুটোর ভেতরে বাতাস চলাচলের প্রয়োজন খানিকটা মেটায় এই শ্যাফ্‌টটা। গত দশ বছর যাবৎ কোম্পানি এর গর্তটা বুজিয়ে ফেলার কথা বলছে কিন্তু অন্য দুটো খাদের পক্ষে এটা চিমনির মতো কাজ করে বলে নতুন কোনো ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত তা করা যাচ্ছে না। মই দিয়ে এর নীচে নামার ব্যবস্থাও আছে কিন্তু দীর্ঘদিনের অব্যবহারে তা জীর্ণ। দরকার পড়লে ঝোপঝাড় মুঠো করে ধরে সাবধানে খাড়া গা বেয়ে নামতে হবে।

এতিয়েন চুপচাপ একটা ঝোপের আড়ালে বসে ছিল। হঠাৎ তার কানে এল ঘাস পাতা মাড়িয়ে আসা সতর্ক পায়ের শব্দ। প্রথমে ভেবেছিল কোনো মজুর বা গোপন প্রেমিক। হঠাৎ ফস্‌ করে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে উঠল। জঁলাঁ!

ঐ যে—এ কি, ও যে খাদের দিকে নেমে যাচ্ছে! প্রবল কৌতূহলে এতিয়েন চুপি চুপি এসে গর্তটার মধ্যে উঁকি মারলো। জঁলঁ্যাকে দেখা যাচ্ছে না তবে আবছা একটা আলোর আভাস পাওয়া যায়। দু-এক মুহূর্ত ইতস্তত করে এতিয়েন শক্ত হাতে বুনো লতা ধরে নীচে নামতে লাগল। ঐ তো জঁলঁ্যা। মৃদু আলোয় তার শরীরের ছায়াটাকে বিশাল দৈত্যের মতো লাগছে। অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় নীচে নামতে লাগল এতিয়েন। মইগুলোর অবস্থা খুব খারাপ। যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। আগে আগে এত নীচে নামলে কয়লাখনির ফার্নেসের তাপে গা ঝলসে যেত, এখন ধর্মঘটের জন্য খনির কাজে মন্দা চলছে তাই ততটা কষ্ট হচ্ছে না।

এতিয়েন দাঁতে দাঁত চেপে যেন নিজেকে শুনিয়েই বলল, হারামজাদাটা এখানে কি করছে?

দু-দুবার পা ফসকে গেছে তার। আর একটু হলেই সোজা নীচে পড়ে মাথাটা দু ফাঁক হয়ে যেত। ওঃ, হাতে একটা মোমবাতি থাকলে এতটা কষ্ট হত না! কত নীচে আস্তানা গেড়েছে কে জানে। পথ আর ফুরোয় না। মাথাটা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে। এখন বেশ গরম লাগছে। তিরিশটা মই—তার মানে দুশো দশ মিটার।

এতিয়েন ভাবলো আর কত দুর্ভোগ কপালে আছে কে জানে! ব্যাটা বোধ হয় আস্তাবলে ঘাঁটি গেড়েছে।

কিন্তু না। সে রাস্তা তো পাথরের চাঁই পড়ে বন্ধ। এখন এবড়োখেবড়ো জমিতে হাতড়ে হাতড়ে চলতে রীতিমতো কষ্ট হয়। আলোর নিশানাটা চোখের আড়াল হতে দেওয়া চলবে না। হাত পা কেটে ছড়ে একসা হয়ে যাচ্ছে। ছোকরা দিব্যি কেমন সড়সড় করে নেমে গেল! ইস্, লোহালক্কড়ে রক্তারক্তি কাণ্ড হবে এবার। যথাসম্ভব সাবধানে পেটের ওপর ভর দিয়ে সে এগিয়ে চলল। তার গায়ের ওপর দিয়ে দৌড়ে পালালো কতগুলো মোটে ইঁদুর।

—ওঃ, আরও কত কষ্টই না কপালে আছে আজ!

না, এবার বোধ হয় পথ ফুরিয়েছে। এখানে জায়গাটা অনেকটা চওড়া। বড়-সড় গ্যালারী ছিল। খানিক দূরেই জঁলঁ্যাকে দেখা যাচ্ছে। দুটো পাথরের মাঝখানে জ্বলছে মোমবাতিটা। কি সুখী আর নিশ্চিন্ত হাবভাব! চমৎকার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। এক কোণে নরম খড়ের বিছানা, আর একটা কোণে খাবার সাজানো—রুটি, আপেল, জিনের বোতল। বেশ অনেক দিন ধরেই গুছিয়ে বসেছে বোঝা যায়। স্বার্থপর খুদে শয়তান!

এতিয়েন পেছন থেকে বলল, তাহলে তুমি বেশ আরামেই আছো, কি বলো! আমরা না খেতে পেয়ে মরছি আর তুমি এদিকে দিব্যি খেয়েদেয়ে ফুর্তি করছ।

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে একজন মানুষের উপস্থিতিতে জঁলঁ্যা রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছিল। এতিয়েনকে দেখে খানিক আশ্বস্ত হল।

—এসো না, তুমিও আমার সঙ্গে খাবে। সেঁকা কড মাছ দিব্যি জমবে!

নিপুণ হাতে মাছটাকে কেটেকুটে পরিষ্কার করে ফেলল জ্যঁল্যাঁ। তার হাতে হাড়ের হাতল দেওয়া চমৎকার একটা ছুরি। তাতে আবার খোদাই করে লেখা আছে 'ভালোবাসা'।

এতিয়েন বলল, দারুণ ছুরিটা তো!

জ্যঁল্যাঁ জবাব দিল, হ্যাঁ, লিডি দিয়েছে।

সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। একটা দোকান থেকে চুরি করে আনা।

জ্যঁল্যাঁ আবার বলল, কেমন চমৎকার আস্তানাটা বানিয়েছি বলো। ওপরের থেকে অনেক আরামের আর পরিষ্কারও বটে।

এতিয়েন বসে শুনছিল। সে জ্যঁল্যাঁকে দিয়ে কথা বলাতে চায়। তার প্রথম ঝোঁকের রাগ কেটে গিয়ে এখন একটা অদ্ভুত কৌতূহল হচ্ছে পুরো ব্যাপারটা জানবার জন্য। কিছুটা ভ্যাপসা পুরনো কাঠের গন্ধ, তা ছাড়া দিব্যি জমিয়ে বসা গেছে। ক্ষুদে শয়তানটার মাথায় বুদ্ধি আছে। একটা সাদা মথ উড়ে গেল। নানান রঙের বুনো লতাপাতা আর শ্যাওলা। কয়েকটা মাছি আর মাকড়সাও নজরে পড়ল।

এতিয়েন বলল, তুমি ভয় পাও না?

জ্যঁল্যাঁ অবাক হল।

—ভয় কিসের! কাকে ভয়? আমি তো একলাই থাকি।

মাছটা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। একটু কাঠের আগুন জ্বালিয়ে তাতে মাছটা দিব্যি পোড়ালো জ্যঁল্যাঁ। তারপর একটা বড় রুটিকে দু টুকরো করল। বড় নুনে পোড়া কিন্তু প্রচণ্ড খিদের মুখে যেন অমৃত।

এতিয়েন খেতে লাগল।

—এতদিনে বুঝলাম জ্যঁল্যাঁ, কেন আমরা দিনের দিন শুকিয়ে মরছি অথচ তুমি মোটা হচ্ছ। কিন্তু এভাবে অন্যদের কথা না ভেবে স্বার্থপরের মতো লুকিয়ে একা সুখে থাকাটা কি ঠিক?

—না, কিন্তু অন্যরা এত বোকা কেন?

—অবশ্য তোমার কপাল ভালো যে লুকিয়ে আছো। চুরিচামারি করছ জানতে পারলে মায়ু আর তোমার পিঠের চামড়া আস্ত রাখত না।

—আহা! এমন করে জ্ঞান দিচ্ছ যেন বড়লোকরা গরীবদের রক্ত চোষে না! সেটা বুঝি চুরি নয়, অন্যায় নয়? আমি যখন মেইগ্রার দোকান থেকে রুটি চুরি করি, আমার মনে হয় ওই চশমখোরটার কাছে ওটা আমাদের ন্যায্য পাওনা ছিল। আমি আদায় করে নিচ্ছি মাত্র।

চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছিল এতিয়েন। তার কি রকম একটা অস্বস্তি হচ্ছে। এই বুনো গোঁয়ার ছেলেটার কথাগুলো তো পুরোপুরি অস্বীকার করা যায় না। এই বর্বর স্বভাবের মূলে রয়েছে খনি। জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত উদয়াস্ত পরিশ্রম, খনির আবহাওয়ায় অস্বাভাবিক জীবনযাপন তাকে অশিক্ষিত স্বার্থপর করে তুলেছে। তার পা দুটোর এই অবস্থার জন্যও সেই খনিই দায়ী।

এতিয়েন জিজ্ঞাসা করল, লিডির খবর কি ? ওকে মাঝেসাঝে এখানে নিয়ে আসো না ?

জঁলঁ্যা হাসল।

—পাগল নাকি ! মেয়েদের পেটে কথা থাকে না।

ওর মতে লিডি আর বেবের তো হাঁদা গঙ্গারাম। জঁলঁ্যা যা বলে তাই ড্যাবড্যাবে চোখে শোনে আর বিশ্বাস করে। এই তো, দিব্যি পুরো মাছটা তাকে দিয়ে কেমন সুড়সুড় করে চলে গেল। জঁলঁ্যার তখন এত হাসি পাচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল পেট ফেটে মরে যাবে।

তারপর একটু থেমে বিজ্ঞের মতো বলল, একা থাকাই ভালো, বুঝলে ? তাতে হড়কাবার ভয় থাকে না।

রুটিটা শেষ করে একটু জিন খেয়ে এতিয়েন গলা ভেজালো। একবার তার মনে হল ছোকরাকে কান ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে বাড়িতে নিয়ে যায়। চোরের মার খেলে তবে শিক্ষা হবে। তারপরই মাথায় অন্য চিন্তা এল। বলা যায় না। একদিন হয়তো বিপ্লবের খাতিরে, গণ্ডগোল বেশী পাকিয়ে উঠলে দু-চারজন কমরেডকে এই গোপন আস্তানায় লুকিয়ে থাকতে হবে। কাজেই জঁলঁ্যাকে চটিয়ে লাভ নেই। সে শুধু জঁলঁ্যার কাছ থেকে কথা আদায় করে ছাড়ল যে সারারাত ও বাইরে বাইরে ঘুরবে না, বলা তো যায় না কখন কি দরকার হয়। তারপর একটা জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে নিয়ে ওপরে উঠে এল।

এদিকে মুকেত খুব চিন্তিত ভাবে এতিয়েনের জন্য অপেক্ষা করছিল। অত প্রচণ্ড শীত সহ্য করে একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর বসে ছিল সে। এতিয়েনকে দেখামাত্র তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এতিয়েন রূঢ়ভাবে জানালো যে এভাবে আর দেখা-সাক্ষাৎ করা ঠিক নয়। মুকেতের মনে হচ্ছিল এর চেয়ে এতিয়েন তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিল না কেন ! এতিয়েনের তীব্র ইচ্ছে হচ্ছিল মুকেতকে নিজের ঘরে, নিজের কাছে নিয়ে যায়। কিন্তু নিজেকে সংযত করল সে। হাত ধরে টেনে রাস্তার এক ধারে মুকেতকে নিয়ে গেল। তারপর নরম স্বরে তাকে বোঝালো, এ ভাবে প্রেম করে বেড়ালে তার সহকর্মীদের সামনে সে সৎ আদর্শ বজায় রাখতে পারবে না। রাজনীতির উদ্দেশ্য, বিপ্লবের উদ্দেশ্য সব ব্যর্থ হবে। মুকেতের কাছে সুযোগ-সুবিধা-মতো নিশ্চয় আসবে সে।

মুকেত বারবার অনুরোধ করছিল এতিয়েনকে এ সব রাজনীতির মধ্যে না থাকতে। শেষ পর্যন্ত দু'জন পায়ে পায়ে অনেকটা পথ একসঙ্গে এগিয়ে এল। এতিয়েন বিদায় জানাতে গিয়ে মুকেতের ঠোঁটে নিজের ঠোঁট রাখল। ভরা পূর্ণিমা। চাঁদের আলোয় চারদিক ভেসে যাচ্ছে। হঠাৎ সে দেখল একটা মেয়ে বিমূঢ়ভাবে তাদের দেখে মাথা নীচু করে সরে যাচ্ছে।

এতিয়েন জিজ্ঞেস করল, মেয়েটা কে ?

মুকেত বলল, ক্যাথরিন। জঁা-বার্ থেকে কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরছে।

ক্লান্ত পায়ে মাথা নীচু করে হাঁটছিল ক্যাথরিন এতিয়েনের কাছে হঠাৎই সব কিছু বিস্বাদ হয়ে গেল। যদিও এ কথা ঠিক, ক্যাথরিনকে যেদিন শাভালের সঙ্গে রাস্তায় দেখেছিল সেদিন এতিয়েনের বুকেও শেল বিঁধেছিল কিন্তু সে তো এ ভাবে ক্যাথরিনের ওপর প্রতিশোধ নিতে চায়নি!

চলে যাবার আগে মুকেত মৃদু গলায় এতিয়েনকে বলল, তুমি আসলে অন্য কাউকে চাও। সেই জন্যই আমাকে তোমার ভালো লাগে না।

পরের দিন চমৎকার আবহাওয়া। বেলা একটা আন্দাজ জ্যঁল্যাঁ গোপন আস্তানা থেকে বেরোল। চার্চের পেছনে বেবের অপেক্ষা করে থাকবে।

দু'জনে যখন লিডির জন্য অপেক্ষা করে করে হাল ছেড়ে দিয়েছে, তখন লিডি এল। তার মা তাকে চিলেকোঠায় বন্ধ করে রেখেছিল। এখন ছেড়েছে বটে কিন্তু হাতে ঝুড়ি ধরিয়ে দিয়ে বলেছে শাক তুলে না আনলে তার রাতের খাওয়া বন্ধ। সারারাত বন্ধ ঘরে নোংরার মধ্যে ইঁদুরগুলোর সঙ্গে থাকতে হবে। ভয়ে কাঠ হয়ে আছে লিডি। কি দরকার শুধু শুধু ঝুটঝামেলা করে? তাড়াতাড়ি শাক তুলতে গেলেই তো হয়। কিন্তু জ্যঁল্যাঁ তাকে পাত্তা দেবে কেন? ওসব আলতুফালতু কাজ পরে হবে। অনেক দিন ধরে হ্রাসন্যরের নাদুসনুদুস খরগোশ পোলাণ্ডের ওপর তার নজর। আর কপালও বলিহারি! আর্ভতাজ-এর রাস্তা দিয়ে ওরা যাচ্ছে আর খরগোশটাও রাস্তায় বেরিয়েছে। ঝোলা ঝোলা কান দুটো খপ করে ধরে জ্যঁল্যাঁ তাকে লিডির ঝুড়িতে তুলে চাপা দিয়ে নিল। তারপর তিনজনে দে দৌড়!

রাস্তায় জাশারী আর মুকে-কে দেখা গেল। তারা দু পাত্তর টেনে বাজি ধরে রাস্তায় ডাংগুলি খেলছে। পুরস্কার হল নতুন একটা টুপি আর চৌকোণা রেশমী রুমাল। সে দুটো হ্রাসন্যরের জিম্মায় রাখা আছে। চারজন খেলুড়ে, দু দলে ভাগ হয়ে গেছে। একটা বড় কাঠের ডিম, সেটাকে লোহার বেঁকানো মাথাওয়ালা লম্বা হাতলের একটা দড়িবাঁধা লাঠি দিয়ে মারতে হয়। জাশারী প্রথম খেপেই পর পর তিনবার মেরে সেটাকে চারশো মিটারেরও বেশী দূরে পাঠালো। আগে আগে বেশ কয়েকবার মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর রাস্তায় আর বাড়িঘরদোরের সামনে এ খেলা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। মুকেও কিছু কম যায় না। ফিরতি মারে সে গুলিটাকে প্রায় দেড়শো মিটার ফেরত পাঠালো। খেলা চলছে পুরোদমে। কোনো পক্ষেরই অন্য দিকে হুঁশ নেই।

জ্যঁল্যাঁ, বেবের আর লিডি খেলুড়েদের পেছনে দাঁড়িয়ে প্রথমে খুব উৎসাহ নিয়ে খেলা দেখছিল। হঠাৎ মনে হল ঝুড়িতে খরগোশটা বড় বেশী নড়াচড়া করছে। খেলা ছেড়ে তিনজনে মাঠে নামল। তারপর খরগোশটাকে ছেড়ে দিয়ে তাড়া করল। দেখা যাক কত জোরে ছুটতে পারে। তিনজনে চিৎকার করছে, ছুটোছুটি করে ওকে ধরবার চেষ্টা করছে, প্রাণভয়ে ছুটছে খরগোশটা। খরগোশটার বাচ্চা হবে তাই, নয়তো ওদের চোদ্দ পুরুষের সাধ্য হত না তাকে ধরার।

তিনজন হাঁপিয়ে পড়ল। দম নেবার জন্য একটু থেমেছে, হঠাৎ পেছনে অশ্রাব্য

গালিগালাজ। ওমা! ঘুরেফিরে আবার ওরা খেলার জায়গাতেই এসে পড়েছে। জাশারী আর একটু হলেই জঁলঁ্যার খুলিটা ফাটিয়ে দিচ্ছিল। বাপ্‌ রে, ওর হাতের টিপে যা জোর! আসলে খেলাটা অনেকদূর ছড়িয়ে পড়েছে। দর্শকও জমেছে মন্দ নয়। মাঝে মাঝে গলা ভেজাবার জন্য খেলা বন্ধও থাকছে। মুকে জিতেছে। এদিকে জাশারীও ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। তার ফিরতি মারে গুলিটা গিয়ে পড়ল দূরে, গভীর একটা খানার মধ্যে। মুকের সঙ্গী এর জবাব দিতে পারবে না কারণ গুলিটা তুলে আনবে কে? সবাই উত্তেজিত। হারজিতের ফয়সালা হল না। খেলা আবার নতুন করে শুরু করতে হবে।

জঁলঁ্যার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। খেলুড়েরা গলা ভেজাতে চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে সে খরগোশটার বাঁ পায়ে একটা সুতো বেঁধে দিল। পকেটেই ছিল সুতোটা। কি মজা! খরগোশটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে তিনজনের আগে আগে ছুটছে কিন্তু পালাবার উপায় নেই। পা বাঁধা তো! হাসতে হাসতে তিনজনের দম বেরিয়ে যাবার যোগাড়। এরপর পোলাগের গলায় দড়ি বেঁধে তাকে নাচাতে শুরু করল। প্রায় ধুঁকতে থাকা প্রাণীটাকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে এগোতে লাগল। ওটাকে ওরা যখন ঝুড়িতে ওঠালো তখন তার অবস্থা খুবই সঙ্গীন। আবার জাশারীদের মুখোমুখি। তিনজন খানিকক্ষণ খেলা দেখল।

জোর কদমে খেলা এগিয়ে চলেছে। আবহাওয়াও চমৎকার। রাস্তাঘাট শুকনো, খটখটে। কাদায় পা হড়কাবার ভয় নেই। শুধু হাত পায়ে জোর থাকলেই হল। কয়লাখনির প্রতিটি মজুরই এই খেলাটা খুব পছন্দ করে। হাত পায়ের খিল ছাড়ানোর জন্য এর চেয়ে ভালো দাওয়াই আর নেই। তবে চল্লিশ পেরোলে আর অত দৌড়া-দৌড়ি করবার ক্ষমতা থাকে না।

পাঁচটা বেজে গেল। সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে। শেষ বাজির খেলা চলছে। জঁলঁ্যা ঠিক পায়ে পায়ে জঙ্গলের দিকে, তার গোপন আস্তানার দিকে এগিয়ে চলেছে। লিডি একবার শাক তোলার কথা বলতে গিয়ে ধমক খেয়েছে। বনে জঙ্গলে আজ সভা হবার কথা। বুড়োহাবড়াগুলো কি নিয়ে মাথা গরম করে সেটা শুনতে হবে না? বেবেরকে জঁলঁ্যা তাতাতে লাগল—আর একবার পোলাগুকে ছেড়ে দিয়ে ওর দিকে পাথর ছোঁড়া হোক। আসলে জঁলঁ্যার ইচ্ছে পোলাগুকে মেরে নিয়ে গিয়ে খায়। খরগোশটা ছাড়া পেয়ে কান খাড়া করে দৌড়তে লাগল। একটা পাথর তার পিঠ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। আর একটা পাথরে জখম হল তার লেজ। বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে এখন। পোলাগু মরেই যেত যদি পথে এতিয়েন আর মায়্যুকে দেখতে পেয়ে বাচ্চা তিনটে লুকিয়ে না পড়ত। তারা পোলাগুকে তড়িৎগতিতে ঝুড়িতে ভরে নিয়ে ঝোপের আড়ালে চলে গেল। এমনি সময় খেলতে খেলতে জাশারী, মুকে এবং আরও দু-চারজন সেখানে এসে পড়েছে। সভা শুরু হবার সময় এগিয়ে এল।

চারদিক থেকে দলে দলে মানুষ এসে জমায়েত হচ্ছে। মেয়ে, বউ, বাচ্চা—কেউ বাদ নেই। যেন একটা মেলা বসেছে। সবাই একই আশা বুকে নিয়ে নীরবে

এগিয়ে এসেছে গন্তব্যস্থলের দিকে শুধু সকলের পায়ে চলার একটানা ক্ষীণ শব্দ।

মঁসিয় এনবো ঘোড়ায় চড়ে বাড়ি ফিরছিলেন। তাঁর কানেও এই অদ্ভুত একটানা শব্দটা ভেসে এল। শীতের রাতে জোড়ায় জোড়ায় স্বামী-স্ত্রীকে রাস্তায় দেখলেন তিনি। কি ব্যাপার? সবাই কি হাওয়া খেতে বেরিয়েছে নাকি? প্রেমিক-প্রেমিকারা অবশ্য আড়ালে আবডালে প্রেম করে যাচ্ছে। যত্রতত্র তাদের স্বেচ্ছাচার চলছে অবাধে—এছাড়া জীবনে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যই বা কি আর কিসেরই বা আদর্শ? মঁসিয় এনবোর মনে হল তিনিও যদি এই জীবনটা ফিরে পেতেন, পাশে একজন সঙ্গিনী পেতেন যে তাঁকে ভালোবাসবে, আদর করবে তাহলে তিনিও অবলীলায় না খেয়ে থাকতে পারতেন। অপর্যাপ্ত সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর—তবুও তিনি এদের হিংসে করেন। মাথা নীচু করে একজন পরাজিত মানুষের মতো যাচ্ছিলেন এনবো—প্রায় ঘোর অন্ধকার রাস্তায়—তাঁর কানে শুধুমাত্র চুম্বনের শব্দ ছাড়া আর কিছুই ঢুকছিল না।

* * *

প্লাঁ-দে-দাম। জায়গাটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর খোলামেলা। সামান্য ঢালু, চমৎকার উঁচু ছায়া ছায়া গাছ ঘেরা। কয়েকটা গাছ কাটা হয়েছে, তাদের গুঁড়িগুলো ছড়িয়ে আছে এদিক ওদিক। সন্ধ্যে এখন অনেকটা গাঢ়, ঠাণ্ডাটাও বেড়েছে। পায়ের নীচে জায়গায় জায়গায় স্যাঁতস্যাঁতে শ্যাওলা। গাছের মাথায় চাঁদ উঁকি মারছে। আকাশে অগুনতি তারার ভীড়। একটু পরেই তারারা নিষ্প্রভ হয়ে যাবে পরিপূর্ণ চাঁদের আলোয়।

প্রায় তিন হাজার খেটে খাওয়া মানুষ তাদের পরিবারের লোকজনদের নিয়ে মাঠে জমায়েত হয়েছে। এখনও অনেকে আসছে। অন্ধকারে তাদের মুখের আবছা আদল নজরে পড়ে। অনেকেই নীচু গলায় নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা চালাচ্ছে। গাছের ফাঁক দিয়ে তাদের গুঞ্জন স্তব্ধ নিশ্চল বনের মধ্যে শনশন বাতাস বয়ে যাবার মতো শোনা যায়।

এতিয়েন একটু উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে চারদিক দেখছিল। সঙ্গে রাসনার আর মায়্যু। তিনজনের মধ্যে হঠাৎই মতান্তর দেখা দিল। বাকি সকলে উৎসুক হয়ে শুনছে, বিশেষত পুরুষরা। লেভাক উত্তেজিত, তার হাত মুঠি পাকানো। পিয়েরোঁ পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে—যেন দৃকপাতই করছে না। আসলে তার মাথায় দুশ্চিন্তা—অসুখের দোহাই দিয়ে এইসব ঝুটঝামেলা থেকে এবার আর রেহাই পাওয়া গেল না। বুড়ো বোন্‌মর আর মুক্যও এসেছে। দু'জনে একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে বিরাট দার্শনিকের মতো চারপাশের হালচাল লক্ষ্য করছে। জাশারী আর মুকে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে এসেছে মজা দেখবার জন্য। কিন্তু মেয়ে-বউরা খুব গম্ভীর। তারা সত্যিই ব্যাপারটা বুঝতে চায়। মায়্যু-গিন্নী নীরবে মাথা নাড়ছে, দাঁতে দাঁত চেপে মালিকপক্ষকে গালাগাল দিচ্ছে লেভাকের বউ। ফিলোমিন ভীষণ কাশছে—তার

সর্দিকাশিটা বড়ই চেপে বসেছে। প্রতি শীতেই একই ব্যাপার। মুকেতই একমাত্র খিলখিল করে হাসছে। তার এত হাসির কারণ বদমেজাজী বুড়ি 'মা ব্রুলে'। সে নিজের মেয়ের উদ্দেশ্যে অকথ্য গালিবর্ষণ করছে। মেয়ে নাকি এক আজব চীজ—যাকে খরগোশের মাংসের ভাগ দিতে হবে বলে বাজে ছুতোয় বাড়ি থেকে বের করে দেয়। স্বামীর অকর্মণ্যতার সুযোগে পরপুরুষের সঙ্গে নষ্টামি করে। এক জায়গায় কিছু কাঠ জমা করে রাখা ছিল। জ্যঁলাঁ নিজে সেখানে উঠেছে। বেবের আর লিডিকেও তুলেছে। তাদের মাথাই সকলের চেয়ে উঁচুতে।

হ্রাসন্যর, মায়্যু আর এতিয়েনের মনান্তরের কারণ হ্রাসন্যর। সে পুরোপুরি গণ-নির্বাচনের ভিত্তিতে বিপ্লবের প্রস্তুতি নিতে চায়। বিধবা দিস্যিরের বাড়ির সভায় তার পুরনো হারের বদলা নিতে হবে তো! সে বিশ্বাস করে মজুররা তার পাশে এসে দাঁড়াবেই। এতিয়েন তো একটা উটকো লোক।

এতিয়েনের ধারণা, এই ধরনের কাজে, কয়লাখনি এলাকায় এ সব নিতান্তই সময়ের অপচয় আর বোকামি। তাদের প্রকৃত বিপ্লবীর মতো, হিংস্র মানুষের মতো কাজ করতে হবে। ও সব ভদ্র, সভ্য, আইন মাফিক নির্বাচন বাতুলতা মাত্র।

এতিয়েন দেখল এ ভাবে বড্ড সময় নষ্ট হচ্ছে। সে লাফিয়ে উঠে মাথার ওপর দু হাত তুলে বলল, কমরেডগণ! তোমরা শান্ত হও।

অস্পষ্ট গুঞ্জন থেমে গেল। হ্রাসন্যর একটু প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল। মায়্যু তাকে থামিয়ে দিল।

এতিয়েন গলা ফাটিয়ে চেঁচালো।

—কমরেডগণ! খনি এলাকায়, কলোনীতে আমাদের কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আমাদের ওপর পুলিস নজর রেখেছে। আমরা আজ চোরেরও অধম। আমাদের কথা বলবার, বক্তব্য রাখবায় ন্যায্য অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে, আপনারা জানেন। এর বিচার চাই! এখন আমরা স্বাধীন। নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট সমঝোতা রয়েছে। এখানে কেউ আমাদের বিরক্ত করতে আসবে না। জঙ্গলের মুক্ত জীবের মতো আমরা নিজেদের কথা বলে যাব।

সকলে সানন্দে তাকে সমর্থন করল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই জঙ্গল আমাদের। এখানে আমরা যতক্ষণ ইচ্ছে কথা বলতে পারি। তুমি ভাষণ দিতে শুরু কর।

এতিয়েন এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কাঠের গুঁড়িটার ওপর। সবে চাঁদের আলো ফুটি-ফুটি করছে। জমায়েত হওয়া মানুষগুলোর ভীড—একজনের থেকে অন্যজনকে আলাদা করা যাচ্ছে না। তাকেও হয়তো এই ছায়া-ছায়া অন্ধকারে এমন আবছা মূর্তির মতোই দেখাচ্ছে।

এবার এতিয়েন একটা হাত তুলে বলতে শুরু করল। আর আগের মতো জোর গলায় নয়। শীতল গলায় কেটে কেটে ঠিক একজন সাধারণ রাজনীতিকের মতো নিজের বক্তব্য পেশ করছিল সে। যে কথাগুলো দিস্যিরের নাচঘরের সভায় বলা

হয়নি, সেই সব কথা। খুব সংক্ষেপে সে এই ধর্মঘটের কারণ বিবৃত করল—একটাও বাড়তি কথা নয়: সে নিজে তো এইরকম ধর্মঘট চায়নি। শুধু সে কেন একজন মজুরও চায়নি। তারা বাধ্য হয়েছে মালিকপক্ষের ধূর্ততার কাছে আত্মসমর্পণ করতে। সহকর্মী ভাইদের, বন্ধুদের কি মনে নেই প্রথম যারা যারা ম্যানেজারের কাছে গিয়েছিল তাদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল? পরে দ্বিতীয়বার আবার সেই ওপর-ওয়ালাই ঝুড়িপিছু দু সেন্টিম ফিরিয়ে দিতে চায়। এখন পরিস্থিতি এই রকম। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড প্রায় নিঃশেষ।

এতিয়েন হিসেব দাখিল করল কোথায় কি ভাবে সাহায্য করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সমিতি যে বেশী সাহায্য দিতে পারেনি, এতে তাদের দোষ দেওয়া যায় না। কারণ আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন পৃথিবীর সমস্ত বিপ্লবী সমিতির—সেইমতো টাকার পরিমাণ কম বেশী ভাগ হয়ে যায়। ধীরে ধীরে পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে—কোম্পানি শাসাচ্ছে দরকার হলে সবাইকে ছাঁটাই করে বেলজিয়াম থেকে নতুন লোক আনানো হবে। অনেককে জোর করে কাজে নামানো হয়েছে।

নিজের বক্তব্য সহজ সুস্পষ্ট ভাষায় সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়াই এতিয়েনের উদ্দেশ্য: দুর্ভিক্ষ এসে গেছে, যম এসে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে, অসহনীয় যন্ত্রণার শেষ পর্যায় চলছে এখন

হঠাৎই বক্তব্য শেষ করল এতিয়েন:

সুতরাং বন্ধুগণ, এইরকম অবস্থায় তোমরা আজ পরবর্তী পদক্ষেপ স্থির করবে। আজ, এই রাত্রেই তোমরা যদি চাও ধর্মঘট চলুক, তাহলে প্রস্তাব দিতে পারো কি করে আমরা জিতব

চারদিকে নিস্তব্ধতা। একটা ছুঁচ পড়লেও বুঝি বা তার শব্দ শুনতে পাওয়া যাবে। সকলে একই সঙ্গে আজ একটা চরম সত্যের মুখোমুখি হয়েছে। প্রত্যেকের নীরব দীর্ঘশ্বাস আর আক্ষেপে মুহূর্তেই আবহাওয়াটা ভারী হয়ে উঠল।

কিন্তু আবার এতিয়েন কথা বলছে: সে এখন কোনো সমিতির সম্পাদক নয়, শ্রমিক নেতা হিসেবে জানতে চাইছে এমন কেউ আছে কি যে এই সময় সকলের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে না চলে ভীরুর মতো পিছিয়ে যেতে চায়? বিপ্লব করতে হলে, ন্যায্য অধিকার আদায় করে নিতে হলে এত সহজে দমে গেলে চলবে না। এত দিন ধরে এত কষ্ট সহ্য করে আজ কুকুরের মতো ল্যাজ গুটিয়ে মালিকপক্ষের দাবি মেনে নিয়ে কাজে যোগ দেওয়ার চেয়ে না খেতে পেয়ে মরাও ভালো। তার চেয়ে সবাই একসঙ্গে বিষ খাওয়া ঢের সম্মানের। তাতে বরং পৃথিবীর তাবৎ লোককে এই পুঁজিবাদী ধনতন্ত্রের কুফল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা যাবে। অনাহারের চাবুক আজ পর্যন্ত অনেক খেয়েছে সবাই। এই চাবুক খেতে খেতেই এমন অবস্থা এসে পৌঁছেছে যে চাবুকের বিরুদ্ধে চাবুক, অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার লড়াই চাই। দিনের পর দিন অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করেছে সকলে, জুতোর বাড়ি খেয়ে পিঠ রক্তাক্ত হয়ে গেছে, আবার পরের দিন সেই পিঠই মালিকের সামনে পেতে দিতে হয়েছে নীরব আনুগত্যে

দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু, প্রাণশক্তি শোষণ করছে বুর্জোয়া কোটিপতির দল। এখন আর নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকলে চলবে না। এ লড়াই বেঁচে থাকার লড়াই, প্রতিবাদের লড়াই, মনুষ্যত্বের লড়াই।

একটু থামলো এতিয়েন সমর্থনলাভের আশায় সমবেত জনতার দিকে দু হাত বাড়িয়ে দিল।

সকলে জয়ধ্বনি দিল

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, বিচার চাই।

আস্তে আস্তে উত্তেজিত হচ্ছে এতিয়েন তার রক্ত গরম হয়ে উঠছে রাসেনারের মতো ভাষায় তার অত দক্ষতা নেই। মাঝে মাঝেই হয়তো কথাবার্তা একটু অসংলগ্ন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তাতে আন্তরিকতার অভাব নেই একটুও ভেতর থেকে যেন এক স্বতোৎসারিত প্রাণশক্তি তাকে চালিত করছে। তার খেটে খাওয়া হাতের ভঙ্গি, দৃঢ় চিবুক প্রতিশোধস্পৃহায় আকুল হয়ে উঠছিল—বদলা নিতে হবে। মাটি কামড়ে পড়ে থাকা চাই, রক্তের বদলে রক্ত চাই। হয়তো এতিয়েনের বাগ্মিতা নেই তেমন, কিন্তু এইসব সাধারণ মানুষগুলোর মনের দরজায় বাক্য মাবলে যে গুণগুলো থাকা দরকার, তা নিঃসন্দেহে আছে

এতিয়েন বলে চলল, এই নতুন বেতনক্রম এক ধরনের দাসখত ছাড়া কিছুই নয়। খনি কার? শ্রমিকের। যারা শরীরের প্রতিটি রক্তবিন্দু মাটির নীচে কয়লা তোলার কাজে ব্যয় করে, তারা মরবে অনাহারে আর মুনাফা লুটবে মালিকপক্ষ? সমুদ্র কার? জেলের মাটি কিষাণের এও তো ঠিক তেমনই। এই খনি আমাদের। অনেক দুঃখ আর রক্তের বিনিময়ে এই অধিকার আমরা অর্জন করেছি। মাটির ওপর যেমন পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের সমান অধিকার, মাটির নীচের সম্পদের ওপরও তেমনই। মস্তুতে বহুদিন আগে থেকে যে ধরনের শোষণতান্ত্রিক মতবাদ চলে আসছে তা শুধু অন্যায় নয়, ঘোরতর লজ্জারও বটে। প্রাচীন বর্বর সমাজে এসব হয়তো চলত কিন্তু আজ সাম্যবাদের আলোয় যখন পৃথিবীর দিগন্ত উদ্ভাসিত, তখন এই সব ধ্যান-ধারণা মূঢ়তা মাত্র। নিজেদের ন্যায্য পাওনা আদায় করে নিতে হবে।

চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে চারদিক। এতিয়েনকে সকলের এক নতুন মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। তার প্রার্থনার ভঙ্গিতে দু হাত ছড়িয়ে মেলে ধরা, সে শ্রমজীবী মানুষদের নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে—সকলে মুগ্ধ হয়ে তাকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানালো।

এবার এতিয়েন অন্য প্রসঙ্গে এল: এই বেতন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন দরকার। বেতন জিনিসটাই নির্মূল করতে হবে। সত্যিকারের স্বাধীনতা পেতে গেলে সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করতে হবে। সাধারণ মানুষ সরকার গঠন করবে। সমস্ত মানুষ একই গোষ্ঠী বা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হবে—তাদের একই সমাজ, একই রাজনীতি আর একই অর্থনৈতিক কাঠামো। সবাই বিভিন্ন ধরনের কারিগরী বিদ্যা শিখতে পারবে। ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে সমাজের এই পচা ঘুণধরা মেরুদণ্ডটা। বিংশ

শতাব্দী শুরু হবে এই নতুন সভ্যতাকে ধারণ করে সকলেই স্বপ্ন দেখুক সেই অনাগত ভবিষ্যতের। সেই বর্ণময় বসন্ত উপভোগ করতে গেলে এটুকু নির্যাতন তো সহ্য করতেই হবে। আগুন, রক্ত, মৃত্যু এসব তো তুচ্ছ।'

এতিয়েনের গলা চড়া পর্দায় বাঁধা।

—এবার আমাদের পালা এসেছে। আমরাই এবার ক্ষমতা আর সম্পত্তির মালিক হব।

সবাই চেঁচিয়ে তাকে দ্বিধাহীন সমর্থন জানালো। চাঁদের আলো তির্যকভাবে এসে পড়েছে সমবেত জনতার চোখে মুখে। আশার, উত্তেজনায় তিন হাজার মানুষের মন আর শরীর দাউ দাউ করে জ্বলছে। খেয়ে না খেতে পাওয়া অত্যাচারিত, অবহেলিত মানুষ এক অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হল আজ। এই মুহূর্তে তাদের খিদে নেই শীতবোধ নেই—এই আগুনঝরানো কথাগুলো তাদের শরীরের সমস্ত তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে সৃষ্টি করেছে অপূর্ব মাদকতা। কয়েক মুহূর্তেই তাদের যেন চরম মানসিক উত্তরণ ঘটেছে। মহান যুগের আর বেশী দেরী নেই। সবাই যে সব তত্ত্বকথা বুঝতে পেরেছে তা নয় তবুও স্বপ্ন দেখতে বাধা কোথায়? এক অদৃশ্য মায়াবী হাতছানিতে তারা ভূতে পাওয়া মানুষের মতো শপথ বাক্য গ্রহণ করল। এবার আমাদের পালা। অত্যাচারী শাসকের কালো হাত ভেঙে দাও।

বিশেষত মেয়েরা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। শান্তশিষ্ট মাহ্যগিন্নী উত্তেজনায় অধীর হয়ে চিৎকার করছে। লেভাকের বউও বাদ যায়নি। মা রুলে হাত পা নেড়ে কি সব বলছে। ফিলোমিন অবশ্য কেশে যাচ্ছে একটানা। মুকেত এতিয়েনের প্রশংসায় মুখর। সমবেত পুরুষদের মধ্যে মাহ্য উত্তেজনায় কাঁপছে, তার এক পাশে পিয়েরো দাঁড়িয়ে। অন্য পাশে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে লেভাক। রাশায়ী আর মুকের কেমন যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছে নিজেদের নিস্পৃহতার কথা ভেবে। তাতেও অবশ্য তারা ঠাট্টা ইয়ার্কি ছাড়েনি। তাদের কমরেড যে একটানা এত কথা বলে যাচ্ছে একটুও মাল না টেনে সেটাই নাকি আশ্চর্য। সবচেয়ে বেশী চেঁচাচ্ছে জ্যাঁলা—জোরে জোরে হাতের ঝুড়িটা পোলাণ্ড সমেত দোলাতে দোলাতে। তার সঙ্গে বেবের আর লিডিও আছে।

এতিয়েন এই অচিন্তনীয় জনপ্রিয়তা মনে মনে উপভোগ করছিল। কি অদ্ভুত ক্ষমতা তার। হাজার তিনেক লোককে এক কথায় সে নিজের পক্ষে টেনে আনতে পারে। তিন হাজার মানুষের বুকে একই সঙ্গে জাগাতে পারে কম্পন, তাদের রক্তে দোলা দিতে পারে সে একাই। সুভারিন কত খুশী হত এসব দেখলে। সবাই সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী হবে এটাই তো সুভারিন চেয়েছিল। রাসনর কিন্তু এ সবে একটুও খুশী হয়নি।

সে চেঁচিয়ে ডাকলো এতিয়েনকে।

—তুমি আমাকে কিছু বলবার সুযোগ দাও।

এতিয়েন কাঠের গুঁড়ির ওপর থেকে লাফিয়ে নেমে এল।

—নিশ্চয়ই, তুমি যা খুশি বলতে পারো। দেখাই যাক ওরা শোনে কি না।

হ্রাসন্যর সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতা দেবার জন্য লাফিয়ে উঠল। দু হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে চেঁচাতে লাগল, যাতে সবাই চুপ করে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো উত্তাল জনতা। সামনের সারির অনেকেই হ্রাসন্যরকে চিনতে পারলো। কিন্তু চুপ করে থাকবার গরজ নেই কারও। হ্রাসন্যর নিজের বাগ্মিতা সম্বন্ধে সচেতন। সে কথার ফুলঝুরি ছড়ালো কিন্তু শ্রমিকরা এতিয়েনকে চায়। হ্রাসন্যরের কথা তাদের কাছে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া পেয়ালার চায়ের মতোই বিস্বাদ। হ্রাসন্যর বলছে এভাবে বিপ্লব হয় না। পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদ আস্তে আস্তে নিজে নিজেই বদলে যাবে।

সবাই অধৈর্য হয়ে চাপড়া চাপড়া শ্যাওলা আর ঘাস ছুঁড়তে লাগল। হ্রাসন্যরের উপস্থিতি, কথা, উপদেশ সবই এখন মজুরদের কাছে বিরক্তিকর আর অর্থহীন বলে মনে হচ্ছে। বঁ জোয়্যু যেখানে আগে সভা হয়েছিল। হ্রাসন্যরের হার হয়েছিল কিন্তু বোধ করি সে পরিণতি এত মর্মান্তিক নয়। একটা বুড়ি তো বলেই ফেলল—বিশ্বাসঘাতক, মালিকের দালাল, নিপাত যাক।

হ্রাসন্যর প্রাণপণে বোঝাতে চেষ্টা করছিল যে তাঁত যেমন তাঁতীর সম্পত্তি বলা যায়, সেই অর্থে খনি কখনই মজুরদের সম্পত্তি নয়। তার চেয়ে লভ্যাংশ ভাগ করে নেওয়ার ব্যবস্থাই ভালো।

সবাই চেঁচিয়ে তাকে গালাগাল দিতে লাগল। ঝাঁকে ঝাঁকে পাথরের টুকরো পড়তে লাগল তার দিকে।

অপমানে বিবর্ণ হয়ে গেল হ্রাসন্যর। তার দু চোখে জল। এত দিনের আশা আকাঙ্ক্ষা, অহংকার সব এক নিমেষে ধুলোয় লুটিয়ে গেছে। কুড়ি বছর ধরে তিলে তিলে যে ধারণা সে শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিল, এই অকৃতজ্ঞ জনতা তাতে থুথু ছিটিয়েছে। প্রায় অন্ধের মতো হাতড়াতে হাতড়াতে গুঁড়ি থেকে নেমে এল সে। শরীরে তখন যেন বিন্দুমাত্র শক্তিও অবশিষ্ট নেই।

—এতিয়েন, খুব মজা লাগছে আমার এই হাল দেখে, তাই না? দেখো তোমারও একদিন এই অবস্থাই হবে আমি বলে দিলাম।

ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে গেল হ্রাসন্যর। দু-চারটে লোক টিটকিরিও দিল।

হঠাৎ সবাই অবাক হয়ে দেখল বুড়ো বোনমর কাঠের গুঁড়িটার ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে। এতক্ষণ সে বেশ শান্তশিষ্ট হয়ে মুক্যা-এর সঙ্গে বক্তৃতা শুনছিল। এত দিনের নির্বিকার ঘুম থেকে তবে কি সেও জেগে উঠল?

সবাই চুপ করে গেল। বুড়ো বোনমর কথা বলতে শুরু করল। অসংলগ্ন কথা। যৌবনের কাহিনী, ল্য ভোর্যুতে কি ভাবে তার দুই কাকা মারা যায়, তার স্ত্রীর মৃত্যু হয় নিউমোনিয়ায়। তার বক্তব্য একটাই। আগেও মজুররা মালিকের পায়ের তলায় পড়ে ছিল, এখনও থাকবে। কিছুই পাল্টায় না। আগেও বহুবার তারা ... করেছে বিদ্রোহ করেছে। সে নিজেও তো কতবার প্রতিজ্ঞা করেছে প্রাণ

থাকতে কাজে যাবে না কিন্তু পেরেছে কই? রাজার সেপাই এসে গুলি চালিয়েছে, অত্যাচার করেছে এই, আজ এখানে যেমন সকলে এসেছে, তার সময়েও ঠিক এই জঙ্গলে এসে তারা জমায়েত হয়েছে সভা করবে বলে। শুধু এখানে কেন, আরও কত নির্জন জায়গায়। কিন্তু ধর্মঘট করে, সভা করে কোনো ফল হয়নি। খিদের জ্বালা বড় জ্বালা। সবাই আবার সুড়সুড় করে খনির কাজে ফিরে গেছে

সমবেত জনতা অবাক হয়ে শুনছিল পুরনো দিনের গল্প। এতিয়েনও বুড়ো বোনমরের কথা শুনছিল, জনতার প্রতিক্রিয়া দেখছিল। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বুড়োর পাশে এসে দাঁড়ালো। ওই তো, প্রথম সারিতে শাভাল আর তার বন্ধুরা। তবে নিশ্চয়ই ক্যাথরিনও ধারে কাছেই আছে। উত্তেজনায় সে অধীর হয়ে উঠল। মেয়েটা দেখুক সে কতটা জনপ্রিয়।

—কমরেডগণ। তোমরা সকলে শুনলে, কি করে বংশপরম্পরায় প্রতিটি শ্রমিক পরিবার শোষণের শিকার হয়েছে। আমরা আজ রুখে না দাঁড়ালে আমাদের সন্তানরাও এই অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাবে না এত সব চোর আর খুনেদের মুখোশ খুলে দাও।

এতিয়েনের চোখ দুটো উত্তেজনায় জ্বলছিল। এত আবেগ দিয়ে সে আগে কখনও কথা বলেনি এক হাত দিয়ে বোনমরকে আঁকড়ে ধরে আছে পরম মমতায় আর মুখে চিৎকার করছে প্রতিশোধের জন্য। মাহ্যু-পরিবারের উদাহরণ দিল সে। চার পুরুষ ধরে এরা খনিতে খেটে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। একশো বছরেও তাদের পেটের জ্বালা মেটেনি পুরো, পেটভরা খাবারও জোটে না আর অন্যদিকে মালিক-পক্ষ অপর্যাপ্ত বিলাসিতায় মত্ত, খাবার ফেলে ছড়িয়ে নষ্ট করছে। এই যে মজুরদের এত অসুখবিসুখ—রক্তশূন্যতা বাতের গ্রন্থিতে যক্ষ্মা, ব্রংকাইটিস, হাঁপানি, বাত, কিছুই তো বাদ নেই এক ভেড়ারাও এর চেয়ে সুখে থাকে অন্তত খড় ভুসিটুকু পেট ভরে খেতে পায় আজন্ম দাসত্ব থেকে শ্রমিকরা মুক্তি পাবে কবে? হাজার হাজার মজুর মারা যাচ্ছে মাটির নীচে কাজ করতে করতে কিন্তু ভবিষ্যতে সেই মাটি ফুঁড়ে উঠে আসবে লক্ষ কোটি সেনানী যারা এই সব অত্যাচারী শাসকদের ধুলোয় মিশিয়ে দেবে, নতুন উর্বরা পৃথিবীতে আনবে নতুন সুখের স্বপ্ন। সেইদিন হয়তো মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে মালিকপক্ষ স্বীকার করবে একটা মানুষের সারাজীবনের পরিশ্রমের বিনিময়ে দেড়শো ফ্রাঁ অবসরভাতা মূল্যহীন। শ্রমবাদ ধ্বংস করবে পুঁজিবাদকে। নিষ্ঠুর রক্তলোভী দেবতাকে সম্মানের সিংহাসন থেকে টেনে নামাবে অবহেলিতের দল, আগুনের আলোয় তাকে প্রত্যক্ষ করাবে স্বরূপ।

এতিয়েন থামলো। সমুদ্রগর্জনের মতো জনতার উচ্ছ্বাস আছড়ে পড়তে লাগল তার ওপর। যেন ধস নেমেছে। রাত-পাখিরা ভয় পেয়ে উড়ে পালালো।

এতিয়েন পরবর্তী পদক্ষেপ আজই স্থির করে ফেলতে চায়।

—বন্ধুরা, তোমরা কি ঠিক করলে? ধর্মঘট কি চলবে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

—তাহলে কি ভাবে এগোনো হবে? কাল যদি তোমরা কেউ কাজে যাও, তবে পরোক্ষভাবে আমরা হেরে যাব।

—চুলোয় যাক কাজ।

ঠিক আছে। তোমরা তাহলে মালিকপক্ষকে শিক্ষা দিতে রাজী আছো। এক কাজ করা যাক। কাল আমরা সবাই খনিতে যাব। যারা, যে সব বেইমান নমকহারাম খনিতে ঢুকছে শুনব, তাদের আটকাবো। কর্তৃপক্ষকে দেখিয়ে দেব আমরা সবাই এককাট্টা। আত্মসমর্পণ করার চাইতে মরে যাওয়াও ভালো।

– হ্যাঁ হ্যাঁ, খনিতে যাব।

যতক্ষণ এতিয়েন কথা বলছিল, ভীড়ের মধ্যে কাথরিনকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল তার চোখ দুটো। শাভালকে চোখে পড়ছে কিন্তু কাথরিন কই? শাভাল এদিকে হিংসেয় জ্বলছে। এই জনপ্রিয়তার সামান্যতম অংশ অর্জন করতে সে নিজেকে বিকিয়ে দিতেও রাজী আছে।

এতিয়েন কথা থামায়নি।

- যদি এখানে মালিকপক্ষের দালাল কেউ থেকে থাকে, সে জেনে রাখুক আমরা তার মুখোশ খুলে দেব। এই তো এখানে ভঁদাম-এর কিছু কিছু মজুর আছে যারা নিয়মিত কাজে যাচ্ছে।

শাভাল কাঁধ ঝাঁকালো।

– কথাটা বোধ করি আমার উদ্দেশ্যে বলা হল।

—যে কেউই হতে পারে। তবে কথাটা তুললে বলে বলছি, তুমি তো বেশ খেতে পাও বলে এদের কষ্টটা বুঝবে না। তুমি 'জঁ-বার'-এ কাজ করছ।

একটা ঠাট্টার স্বর ভেসে এল পেছন থেকে।

– ওঃ, ও কাজ করে! ওর বউ তো কাজ করে ওকে খাওয়ায়।

রাগে লাল হয়ে অশ্লীল একটা গালাগাল দিল শাভাল।

– গুরুদেব! আমাদের কি তবে কাজ করবারও অধিকার নেই?

গর্জে উঠল এতিয়েন।

—না নেই। যেখানে তোমার জাতভাইরা সাবিক মঙ্গলের জন্য না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে, সেখানে তোমার কাজ করবার, বিশ্বাসঘাতকতা করবার কোনো অধিকার নেই। দুটো পয়সার লোভে মালিকপক্ষের চামচা হতে তোমার লজ্জা করে না? যদি তোমরা সবাই পাশে থাকতে, মালিকপক্ষকে চারবে শায়েস্তা করতাম। মঁসুতে কাজ বন্ধ, তোমরা ভঁদামের লোকেরা কাজে যাও কেন? যদি সর্বত্র কাজ বন্ধ করে দিতে পারতাম, দেখতে ওপরওয়ালা সুড়সুড় করে আমাদের দাবী মেনে নিত। তোমরা, জঁ-বার-এর সবাই বিশ্বাসঘাতক।

শাভালের চারদিকে জনতা উন্মত্ত। তার পারলে শাভালকে ছিঁড়ে খায়। ভয়ে সাদা হয়ে গেল শাভাল। হঠাৎ তার মাথায় একটা দুর্বুদ্ধি এল।

—শোনো এতিয়েন, কাল তুমি জঁ-বার-এ এসে দ্যাখোই না আমি সত্যি সত্যি

কাজে যাই কিন্তু আমরা সবাই তোমাদের সমর্থন করি। তাই তো আমি আমাদের সমস্ত মজুরদের পক্ষ থেকে এখানে এসেছি। ওখানকার সব ফার্নেস বন্ধ করে দেব, ইঞ্জিনীয়ারদের বাইরে বের করে দেব। আর পাম্প খারাপ হলে তো কথাই নেই। জলের তোড়ে সব খাদ ফেটে ভেসে নষ্ট হয়ে, ধ্বংস হয়ে যাবে।

লাভালকে সবাই অভিনন্দন জানালো। বাস। দলে দলে মজুরর কাঠের গুঁড়ির ওপর উঠে প্রস্তাব, অবাস্তব প্রস্তাব দিতে লাগল। সবাই এখন বিশ্বাস করে যে কোনো ভাবেই হোক, যে কোনো মূল্যেই হোক স্বাধীনতা ফিরে আসবে। লাল রং দেখলেই তাকে ভুল করে রক্ত আর আগুন লাগে। শান্ত চাঁদের আলো, রক্তাক্ত সংগ্রামের কঠিন প্রতিশ্রুতি। পায়ের তলায় ঘাস আর জঙ্গল মথিত হবার শব্দ গাছের পাতা শনশন করে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যায়।

মায়া-গিন্নী ঠেলেঠুলে সামনে এগিয়ে এসে স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে। দুজনেই উত্তেজিত। তার লেভাককে সমর্থন করে ইঞ্জিনীয়ারদের মাথা চাই। সব কটাকে খতম করা। পেরোকে আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। বেগজিব দেখে নাকি কেটে পড়েছে। বানমর আর মুক দুজনেই অসংলগ্ন কথা বলছে। তাদের কথা কেউ কর্ণপাত করছে না। শাভালো মজা করছে এর ওকে রাগাচ্ছে। তার সঙ্গ দিচ্ছে মুকে। মহিলার সংখ্যা খুব উত্তেজিত। লেভাকের বউ ঝিলোমিনের দিকে তাকিয়ে বলে দরকার হয় মেয়েটা বুঝবে। কিছু উল্টো হাসাহাসি করছে। মুকো বলছে পুলিশদের কি বা গাছি শাস্তি দিয়ে ঠাণ্ডা করা যায়। মা বলে এক হাতে লিডির মাথা ধরে আছে, লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটা আলাদে সাপাড় তো করেইনি। উলটে কুড়িয়ে কোথায় ফেলছে কে জানে, অনর্গল তুলে কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে অজস্র কটাক্ষ বর্ষণ করছে। জাঁ নামে কাঠ বেবেল নাকি শুনেছে একটা লোক বলছে যে মাদাম হামন শুনে শোনা গেল, ওকে ধরতে দেখেছে সর্বনাশ। মাগাতির আত্মজের দরজায় খবরের কাগজটা বেঁধে দিয়ে আসতে হবে সে তার খোলা ছুরিটা নিয়ে নাকাতে লাগল হঠাৎ। ছুরির ধারালো ফলাটা চাঁদের আলোয় চকচক করছিল।

এতিয়েন বলল বন্ধুগণ! বন্ধুগণ!

সকলের চিৎকারে তার গলার আওয়াজ চাপা পড়ে গেল।

অবশেষে কিছুক্ষণ বাদে সবাই শান্ত হলে সে বলে কমরেড! কাল সকালে আমরা জাঁ-বার-এ যাচ্ছি। তাই তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ। বিশ্বাসঘাতকদের মৃত্যু চাই।

তিন হাজার গলার স্বর আকাশ বাতাস মথিত করছে। নির্জন পরিবেশে, চাঁদের আলোয় তাকেই তিনকোটি মানুষের সম্মিলিত শপথ বলে মনে হচ্ছিল।

পঞ্চম পর্ব

ভোর চারটে বাজে। চাঁদ ডুবে গেছে। কিন্তু এখনও সূর্যের আলো ফোটেনি। জ্যঙ্গলঁ্যার বাড়িতে সবাই ঘুমে অচেতন। পুরনো ইঁটের বাড়িটার দরজা জানলা সব বন্ধ। বাগান পেরোলেই জঁা-বার কয়লাখনির খাদ। বাড়ির সামনের রাস্তাটা উঁদামের দিকে চলে গেছে। মাইল দেড়েক বন ভাঙলে একটা বড় গ্রামও আছে।

জ্যঙ্গলঁ্যা আগের দিন বহুক্ষণ খনিতে কাজ করে ক্লান্ত ছিলেন খুব। দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে সশব্দে নাক ডাকছিলেন। ঘুমের ঘোরে তাঁর মনে হল কেউ যেন ডাকছে। প্রথমে ভাবলেন স্বপ্ন দেখছেন, তারপর ধড়মড় করে জেগে উঠে জানলা খুললেন। একজন কর্মচারী বাগানে দাঁড়িয়ে আছে।

—কি ব্যাপার, এমন অসময়ে?

—সবাই বিদ্রোহ করেছে স্যার। অর্ধেক মজুর কাজে যোগ দিতে চাইছে না আর যারা যোগ দেবে তাদেরও বাধা দিচ্ছে।

জ্যঙ্গলঁ্যা প্রথমে ঠিক বুঝতে পারলেন না কি বলতে চাইছে কর্মচারীটি কারণ ক্লান্তিতে, ঘুমের ঘোরে মাথাটা এখনও কেমন ভার হয়ে আছে। তাছাড়া বাইরে এত ঠাণ্ডা, বুদ্ধিশুদ্ধি যেন জমে যাচ্ছে।

তোতলাতে শুরু করলেন তিনি।

—সব কটাকে ঘাড় ধরে খাদে নামাও।

—স্যার, ঘণ্টাখানেক ধরে এই কাণ্ড চলছে। জানি আপনি বিশ্রাম করছেন তবুও বাধ্য হয়ে বিরক্ত করলাম। আপনিই এখন ওদের শান্ত করতে পারেন।

—ঠিক আছে, আমি আসছি।

খুব তাড়াতাড়ি জামাকাপড় বদলে নিলেন তিনি। মাথাটা এখন পরিষ্কার হয়েছে। কি কাণ্ড! চাকর রাঁধুনী সবাই ঘুমোচ্ছে। কেউ জাগলো না পর্যন্ত। বাড়িতে চুরিও তো হয়ে যেতে পারে। কিন্তু না, মিথ্যেই ভয় পেয়েছিলেন তিনি। বাড়ির লোকজনেরা উঠে পড়েছে। বাইরে বেরোতেই মেয়েদের মুখোমুখি হলেন। তারাও তাড়াতাড়ি ড্রেসিং গাউন পরে বেরিয়ে এসেছে।

—কি ব্যাপার, বাবা?

লুসি তাঁর বড় মেয়ে। বাইশ পূর্ণ হয়েছে। লম্বা, বাদামী চামড়ার, গম্ভীর প্রকৃতির। ছোট মেয়ে জান্—মাত্র উনিশ বছর, ছোটখাটো, একমাথা সোনালী চুল, হাসিখুশী, প্রাণোজ্জ্বল।

মঁসিয় জ্যঙ্গলঁ্যা আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বললেন, তেমন কিছু না। কয়েকটা বেয়াদব মজুর খনিতে বাজে ঝামেলা করবার তালে আছে। তাই গিয়ে দেখছি।

কিন্তু মেয়েরা নাছোড়বান্দা। এ ভাবে গরম কিছু না খেয়ে এক কথায় বাড়ি থেকে বেরোলে শরীর খারাপ হতে পারে। তখন ঝামেলা পোহাবে কে? অনেক প্রতিবাদ করলেন তিনি কিন্তু পার পেলেন না।

জান্ তার গলা ধরে ঝুলে পড়ল।

—বাবা, লক্ষ্মীটি। অন্তত একটু রাম আর দু'খানা বিস্কুট খেয়ে যাও। যদি কথা না শোনো তবে তোমায় ছাড়বো না। এমনি করে আমায় নিয়ে তোমাকে খনিতে যেতে হবে।

মঁসিয় গ্রেগোয়ার আর কি করেন। অগত্যা বলতে হল। বিস্কুট খাওয়া যায়? গলায় আটকে যাবে না? মেয়েরাও তাঁর সঙ্গে নীচে গেল। দু'জনেরই হাতে মোমবাতি। খাবার ঘরে শশব্যস্তে বাবাকে দেখাশুনো করতে লাগল দু'জনে। একজন রাম ঢালতে লাগল গেলাসে, অন্যজন রান্নাঘরে ছুটলো বিস্কুটের খোঁজে।

ওদের মা মারা গেছেন বহুদিন। এই ভাবেই বাবার তত্ত্বাবধানে আর প্রশ্রয়ে মেয়েরা বড় হয়েছে। বড় মেয়ে স্বপ্ন দেখে মঞ্চে গায়িকা হিসেবে সফল হবে। ছোট মেয়ে তার ছবি আঁকা নিয়ে পাগল। কিন্তু বাড়িতে যখন কোনো গোলমেলে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় দুই মেয়েই মাথা ঠাণ্ডা রেখে চমৎকার কাজকর্ম করে। কোনো কারণে আর্থিক অসুবিধে ঘটলেও তারা মোটেও মুখভার করে থাকে না। হিসেবপত্র করে খরচ করে, দিব্যি গুছিয়ে সংসার চালায়।

ল্যুসি বলল, বাবা, খেয়ে নাও।

মঁসিয় গ্রেগোয়ার গম্ভীর অন্যমনস্ক মুখ দেখে সে রীতিমতো ভয় পেল।

—নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু হয়েছে। বাবা, আমাদের কাছে লুকোচ্ছো কেন? তোমাকে এসব গোলমালের মধ্যে যেতে হবে না। আমরা তিনজনেই বাড়ি থাকব আজ। দুপুরের পিকনিকে আমরা না গেলেও চলবে।

মাদাম এনবোর দুপুরে গাড়ি নিয়ে আসবার কথা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আগে গ্রেগোয়ারদের বাড়ি থেকে সেসিলকে তুলে তিনি এখানে আসবেন। সবাই মিলে মার্শিয়েনে যাবে—সেখানে মাদাম এনবো ওদের খাওয়াবেন। কয়লাখনি দেখার পরিকল্পনাও আছে।

জান্ দিদির কথায় সায় দিল।

—হ্যাঁ বাবা, আমরা বাড়িতেই থাকব আজ।

কিন্তু মসিয় গ্রেগোয়ার মাথায় কিছুই ঢুকছিল না। তিনি মেয়েদের অভয় দিলেন।

—না না, তেমন কিছু নয়। আরে আমি বলছি তো। যাও দু'জনে গিয়ে শুয়ে পড়। সকাল ন'টার মধ্যে তৈরী হয়ে নিও। তাই তো ঠিক আছে?

মেয়েদের চুমু খেয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। বাগানের মধ্যে দিয়ে তাঁর পায়ের আওয়াজ ঝাপসা হতে হতে একসময় মিলিয়ে গেল।

জান্ সাবধানে রামের বোতলটায় ছিপি আটকালো, ল্যুসি বিস্কুটগুলো সরিয়ে রাখল। ঘরটায় বেশী আসবাবপত্র নেই। বেশ পরিষ্কার ছিমছামভাবে সাজানো।

দুই বোনে সমস্ত নীচতলাটা ঘুরে ঘুরে তদারক করল। ভাখো কাণ্ড! চাকরটা একটা ন্যাপকিন ফেলে রেখে গেছে। বকুনি আছে ওর কপালে আজ। তারপর দু'জনে আবার ওপরে উঠে গেল।

সরু রাস্তা ধরে গ্রেগ্‌ওয়া ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। নাঃ, এরকম চলতে থাকলে টাকাপয়সার টানাটানি হবে। এত স্বপ্ন, এত আশা, সব কি ধুলোয় লুটিয়ে যাবে? একের পর এক দুর্ভাগ্য তো আসছেই। খনিতে বড় বড় ফাটল, কাজ চালাবার ক্রমবর্ধমান খরচ, তার ওপর এই শিল্পবিপর্যয়। সবেমাত্র কিছুটা আশার আলো দেখেছিলেন তিনি কিন্তু আবার সব অন্ধকার।

ছোট্ট একটা দরজা ঠেলে খনির চত্বরে প্রবেশ করলেন মঁসিয় গ্রেগ্‌ওয়া। চারপাশে অন্ধকার, শুধু ইতিউতি দু-চারটে বাতি জ্বলছে।

জাঁ-বার যদিও ল্য ভোরয়র মতো অত নামীদামী নয় কিন্তু আধুনিক যন্ত্রপাতি একে বেশ সমৃদ্ধ করে তুলেছে। অন্তত ইঞ্জিনীয়ারদের তো সেইরকমই মত। খনির মুখটা দেড় মিটার বাড়ানো হয়েছে। কাজও চলছে সাতশো আট মিটার গভীর পর্যন্ত। তার ওপর উন্নত মানের ইঞ্জিন বসেছে, নতুন ধরনের খাঁচার ব্যবস্থা হয়েছে। মোট কথা উন্নত প্রযুক্তির সব রকম যন্ত্রপাতি আনা হয়েছে। শুধুমাত্র খনিই নয়, আশেপাশের বাড়ি, টাওয়ার সবেরই সংস্কার করা হয়েছে। পাম্পটা সারানো হয়েছে। গাস্ত-মারি খাদটা এখন শুধু ড্রেনেজের কাজে ব্যবহার করা হয়। জাঁ বার-এর আসল ওয়াইণ্ডিং শ্যাফ্‌টটা ছাড়া আরও দুটো শ্যাফ্‌ট আছে তার ডাইনে বাঁয়ে। তাদের একটার দিয়ে ভেতরের বাষ্প বেরোয়, অন্যটাতে মইগুলো রাখা হয়।

এইদিন ভোর তিনটেয় শাভাল এসে সঙ্গীসাথীদের তাতাতে শুরু করেছে। তাদের সকলেরই মঁস্যর শ্রমিকদের সমর্থন করা উচিত। কয়লার ঝুড়িপিছু মজুরী বাড়াতে হবে পাঁচ সেন্টিম করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শ'চারেক মজুর হল্লা করতে শুরু করল। যারা কাজ করতে চায়, তারা চুপচাপ হাতে বাতি, বগলে শাবল গাঁইতি নিয়ে দাঁড়িয়ে—এত ঠাণ্ডা যে গায়ের কোটটা এখনও খোলেনি। হি হি করে কাঁপছে শীতে। তাদের খনিতে নামতে দেওয়া হচ্ছে না। ডেপুটিরা গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে: এ কি! ভীষণ অন্যায়! যারা কাজ করতে চায় তাদের কেন খাদে যেতে দেওয়া হবে না?

ক্যাথরিনকে ধড়াচূড়ো পরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শাভালের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। সে পইপই করে বলে এসেছিল ক্যাথরিন যেন ঘরে থাকে, কাজে যাবার দরকার নেই। কিন্তু হারামজাদী ঠিক পিছুপিছু এসেছে। আসলে ক্যাথরিন ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। শাভাল তো টাকাকড়ি কিছুই দেয় না। দু'জনের খাইখরচা ক্যাথরিনকেই রোজগার করতে হয়। যদি পয়সা না জোটে, খাবে কি? আর মার্শিয়েন খুব জঘন্য জায়গা। এখানে খনির মেয়েরা খাওয়া না জুটলে পেটের জ্বালায় [redacted]রে নাম লেখায়।

শাভাল ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে উঠল।

—অ্যাই হারামজাদী, তুই এখানে কি করছিস?

ক্যাথরিন আমতা আমতা করল। আচ্ছা, শাভাল এত অবুঝ কেন? যেখানে অন্য কোনো আয় নেই সেখানে কাজে না এলে চলে?

—কুত্তী কোথাকার! তুই আমার কথামতো না চলে কাজ করতে চাস? শীগগির বাড়ি যা—নইলে পাছায় দুই লাথি মেরে বাড়িতে পাঠাবো।

ক্যাথরিন ভয়ে পিছিয়ে গেল। কিন্তু চলে গেল না। কি হয় শেষ পর্যন্ত না দেখে সে যাবে না।

মঁসিয় জঙ্গলঁ্যা এসে গেছেন। লণ্ঠনের মৃদু আলোতে সব কিছু দেখে গেলেন তিনি। প্রতিটি মজুর তার চেনা, এমন কি মেয়েরাও। কাজ থেমে আছে। ইঞ্জিনটা চালু অবস্থায় গোঁ গোঁ করছে। শূন্য খাঁচাগুলো ঝুলছে নিশ্চল হয়ে। লোহার মেঝেতে সারসার কয়লার টবগুলো রাখা। গোটা আষ্টেক বাতি নেওয়া হয়েছে, আরগুলো জ্বলছে, নেবার কোনো লোক নেই। তিনি আদেশ দিলেই সবাই আবার কাজ শুরু করবে।

—কি ব্যাপার তোমাদের? কিছু গোলমাল হয়েছে? আমায় খুলে বলো।

মঁসিয় জঙ্গলঁ্যা এমনিতে মজুরদের সঙ্গে খুবই সহৃদয় ব্যবহার করেন। অনেকটা অভিভাবকের মতো। কিন্তু তিনি কাজ চান অবহেলা সহ্য করতে পারেন না। কথায় মারপ্যাচে নিজের মতটা ঠিক বজায় রাখেন তিনি। সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করে সৎসাহসী মানুষ হিসেবে। যে কোনো বিপদ-আপদে নিজের জীবন তুচ্ছ করে খাদে নামেন। দু'দুবার তো এমন হয়েছে যে বিস্ফোরণ ঘটার পর সকলে পালিয়ে গেছে কিন্তু তিনি ঠিক দড়ি বেঁধে নীচে নেমেছেন।

মঁসিয় জঙ্গলঁ্যা বলে চললেন, দ্যাখো, তোমাদের আমি ভালোবাসি, বিশ্বাস করি। তোমরা নিশ্চয়ই তার অমর্যাদা করবে না। ওপর থেকে বলেছিল পুলিস বসাতে, আমিই রাজী হইনি কারণ জানি যে তোমরা এমন কিছু করবে না যাতে আমার অসম্মান বা ক্ষতি হয়। তোমাদের যা বক্তব্য গুছিয়ে বলো, আমি নিশ্চয়ই শুনব।

কেউই কোনো কথা বলল না। আসলে সবাই সঙ্কোচ পাচ্ছিল।

শেষ পর্যন্ত শাভাল এগিয়ে এল।

—মঁসিয় জঙ্গলঁ্যা, এই মজুরীতে আমরা কাজ চালাতে পারব না। ঝুড়ি প্রতি পাঁচ সেন্টিম বাড়াতে হবে।

মঁসিয় জঙ্গলঁ্যা আকাশ থেকে পড়লেন।

—বলো কি! পাঁচ সেন্টিম? হঠাৎ এ চাহিদা কেন? আমি তো তোমাদের টিম্বারিং নিয়ে কোনো অভিযোগ করিনি? মঁসুর কর্তৃপক্ষের মতো মাইনেপত্তরের কোনো নতুন হিসেবও করিনি।

—হতে পারে। কিন্তু মঁসুতে আমাদের বন্ধুরা ঠিকই দাবী করেছে। তারা নতুন নিয়মমতো মজুরী নিতে রাজী নয়। তাছাড়াও ঝুড়িপ্রতি পাঁচ সেন্টিম [redacted]

চায়। কারণ এভাবে এত কম পয়সায় কাজ চালানো আর সম্ভব নয়। কি হে, তোমরা কি বলো?

চারদিক থেকে সকলে তাকে সমর্থন করল। সবাই উত্তেজিত। আস্তে আস্তে তারা গোল হয়ে মঁসিয় হ্যুন্নর্ঁ্যাকে ঘিরে ধরল।

মঁসিয় হ্যুন্নর্ঁ্যার চোখ দুটো রাগে ঝলসে উঠল। তিনি নিজের দু হাত সজোরে চেপে ধরলেন। ইচ্ছে করছে এখুনি বেয়াদব ছোকরার কলারটা চেপে ধরতে। কিন্তু তাতে লাভ নেই। তার চেয়ে ঠাণ্ডা মাথায় কথাবার্তা বলা ভালো।

—তোমরা পাঁচ সেন্টিম দাবী করছ তো? আমি স্বীকার করছি এই মাগ্‌গি-গণ্ডার বাজারে এটা ন্যায্য দাবী কিন্তু আমি তা দিতে পারব না। যদি দিই, তবে আমাকে দু'দিনেই লালবাতি জ্বেলে পথে বসতে হবে। তোমাদেরও যেমন টাকা-পয়সার দরকার, আমারও তো তেমনি ব্যবসা দেখতে হবে। এখন যা কয়লার বাজার তাতে আমি একান্ত নিরুপায়। দু'বছর আগে যখন ধর্মঘট হয়েছিল, তোমাদের দাবী মেনে নিয়েছিলাম। এই দু'বছর যথেষ্ট কষ্ট করে আমাকে কাজ চালাতে হয়েছে। এর চেয়ে ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়াই ভালো। অবস্থা এখন এমন যে মনে হয় এ সব কয়লাখনি বেচে ঝাড়া হাত পা হয়ে যাই।

শাভাল মনে মনে গজরাচ্ছিল। অন্যরা মাটির দিকে চোখ নামিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে। কেউ মেনে নিতে পারছে না হ্যুন্নর্ঁ্যার কথা। কে না জানে, কর্তৃপক্ষ চিরটা কাল মজুরদের মেহনত ভাঙিয়ে লাখ লাখ টাকা রোজগার করে।

কিন্তু মঁসিয় হ্যুন্নর্ঁ্যা নিজের বক্তব্যে অবিচল। তিনি মঁসুর সঙ্গে তাঁর বিরোধের কথা খোলাখুলি জানালেন। যে কোনো মুহূর্তে ওখানকার কর্তৃপক্ষ তাঁকে পথে বসাতে পারে। এই খনি কিনে নিতে পারে। অহরহ সেই চেষ্টা চালিয়েও যাচ্ছে। এত সাংঘাতিক প্রতিযোগিতা যে তিনি এঁটে উঠতে পারছেন না। নিজের খরচ কমিয়ে দিয়েছেন। জঁা-বার খনির নীচের স্তরে কাজ চালানো চূড়ান্ত ব্যয়সাপেক্ষ। কয়লার স্তর যতই পুরু হোক না কেন খরচ পোষায় না। গতবার ধর্মঘটের সময় তিনি ভয়ে মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, নইলে মঁসু থেকে বেশী মজুরীর লোভ দেখিয়ে তাঁর শ্রমিকদের হাত করা হবে। এখন যদি তিনি খনি বেচে দেন তবে সেই সঙ্গে তো তাঁর সমস্ত মজুররাও বিপদে পড়বে। এভাবে বোকার মতো নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারার কোনো মানে হয়? তিনি যথেষ্ট কাছের মানুষ শ্রমিকদের কাছে। মাইনে দিয়ে তিনি গুণ্ডা পোষেন না শ্রমিকদের চাবকাবার জন্য। যে কেউ যে কোনো দরকারে সোজা তাঁর কাছে আসতে পারে। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করবেন সাহায্য করতে। তিনি মালিক ঠিকই কিন্তু খনির পেছনে তাঁর অগাধ অর্থব্যয় হয়। শুধু অর্থ নয়, বুদ্ধি, স্বাস্থ্য, পরিশ্রম সবকিছু। এখন কাজ বন্ধ করে দেওয়া মানে তাঁর মৃত্যুরই সামিল। কারণ তাঁর হাতে কয়লা মজুত নেই অথচ মাল তাঁকে সর্ত এবং প্রতিশ্রুতিমতো পাঠাতেই হবে। এভাবে তো মূলধন দিনের পর দিন আটকে রাখা যায় না? যে সব বন্ধুরা বিশ্বাস করে তাঁকে টাকা ধার দিয়েছে, তাদের [illegible] বা মুখ দেখাবেন কি করে?

মঁসিয় হ্যন্তলঁ্যা বললেন, সুতরাং তোমরা বুঝতেই পারছ আমার অবস্থা। তোমরা ধর্মঘট করলে অথবা আমি তা থেকে রেহাই পেতে টবপ্রতি মজুরী পাঁচ-সেন্টিম বাড়ালাম, দুটোতেই তো আমার সমান ক্ষতি।

চুপ করলেন হ্যন্তলঁ্যা। ভীড়ের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন। অনেকে দ্বিধা করছে। কয়েকজন তো পায়ে পায়ে খাদের দিকে এগিয়ে গেল। তাদের সকলের আগে ক্যাথরিন। এক হ্যাঁচকা টানে তাকে সরিয়ে আনলো শাভাল।

—না না, আমরা সবাই ঠিক করেছি কাজ করব না। শুধু যারা বেজন্মা, শুয়োরের বাচ্চা, তারাই এখন নেমকহারামি করবে।

ব্যস্! সমঝোতার আর কোনো প্রশ্নই নেই। যারা এগিয়েছিল, তাদেরও টেনে সরিয়ে দেওয়া হল। মিনিটখানেক মঁসিয় হ্যন্তলঁ্যা ব্যর্থ চেষ্টা চালালেন অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য—তারপর বেগতিক দেখে চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলেন। চুপ করে ঝিম মেরে অফিসঘরে বসে রইলেন। নিজেকে ক্লীব বলে মনে হচ্ছে। খানিক বাদে শাভালের তলব পড়ল। শাভাল এলে অন্য সবাইকে ঘর থেকে চলে যেতে বললেন। শাভালকে তিনি একা পেতে চান।

মঁসিয় হ্যন্তলঁ্যার মাথায় আসলে একটা অন্য কথা ঘুরছিল। এতদিন তো শাভাল বেশ ভালোভাবেই কাজ করেছে। আজ হঠাৎ হলটা কি যে এমন বিগড়ে গেল? কেন যেন মনে হচ্ছে শাভাল হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরছে। তিনি মিষ্টি কথায় শাভালকে বশ করতে চাইলেন: তার মতো একজন বুদ্ধিমান শ্রমিক কি করে আর কেনই বা নিজের সর্বনাশ করছে তা তো তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছেন না! এমন ভাবে মঁসিয় হ্যন্তলঁ্যা কথা বলতে লাগলেন যেন শাভালের দ্রুত পদোন্নতির কথা তিনি বহুদিন আগেই ভেবে রেখেছিলেন। ক'দিন পরেই তিনি ওকে ডেপুটি অফিসার করে দিতে পারতেন।

শাভাল প্রথমে জেদী একরোখা ভঙ্গীতে শুনছিল। আস্তে আস্তে তার পেশীগুলো শিথিল হল, সহজ হল। তার মাথায় এখন কিছু কথা ঘুরছে: সে যদি ধর্মঘট চালায়ও, এতিয়েনের সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী হতে সে কোনোদিনই পারবে না, এত জনপ্রিয়তা অর্জন করা তো দূরের কথা। কিন্তু তার সামনে নতুন ভবিষ্যতের ইশারা, সে ডেপুটি অফিসার হতে পারে।

শাভালের মুখ চাপা উত্তেজনায় আর অহংকারে ঈষৎ লাল হল। মনে মনে ভাবলো যে মঁসু থেকেও তো তাকে কেউ দেখতে এল না? ওখানে আবার কি হল কে জানে। তবুও লোক-দেখানো প্রত্যাখ্যানে সে ঘন ঘন মাথা নাড়তে লাগল—না, এভাবে কোনো সমঝোতায় আসা যায় না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মঁসিয় হ্যন্তলঁ্যাই বাজিমাত করলেন। শাভাল হাত কচলাতে কচলাতে রাজী হল। সে নিশ্চয়ই তার সহকর্মীদের কাজে যোগ দিতে বলবে।

হ্যন্তলঁ্যা আর অন্যান্য ঊর্ধ্বতন অফিসাররা শ্রমিকদের সামনে গেলেন না। শা[illegible] ভালো কথায়, মন্দ কথায় মজুরদের বোঝাতে চেষ্টা করছিল, তর্ক করছিল।

তাকে ধিক্কার দিল। শ'খানেক লোক তো বিরক্ত হয়ে চলেই গেল। শাভালই প্রথমে তাদের উত্তেজিত করেছিল, ধর্মঘট করতে বলেছিল, এখন কিনা সেই-ই মালিক-পক্ষের হয়ে ওকালতি করছে! সকাল সাতটা বাজে প্রায়। চমৎকার পরিষ্কার আবহাওয়া। হঠাৎ খনিতে কাজকর্ম শুরু হয়ে গেল। ইঞ্জিনের ঘরঘর শব্দ, মজুরদের খাদে ওঠানামার শব্দ। খনির রাক্ষুসে হাঁ আবার লোকজনকে পেটে পুরতে শুরু করেছে। তার দৈনিক বরাদ্দ সে ছাড়বে কেন?

শাভাল খানিক দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ক্যাথরিনকে দেখে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠল।

—অ্যাই ছুঁড়ি, তুই আবার দাঁড়িয়ে রইলি কেন? নীচে যা।

মাদাম এনবো যখন গাড়ি নিয়ে এলেন তখন ন'টা বাজে। সঙ্গে সেসিল। ল্যুসি আর জান্ চমৎকার সেজেগুজে তৈরী হয়ে আছে। তাদের পরনের জামাকাপড় অবশ্য খুব একটা দামী বা নতুন নয়। মঁসিয় গ্রেগোয়া অবাক হয়ে দেখলেন গাড়ির পেছনেই ঘোড়ার পিঠে নেগ্রেল। কি কাণ্ড! পুরুষমানুষরাও যাচ্ছে নাকি? মাদাম এনবো মিষ্টি হেসে বললেন, রাস্তায় নাকি অনেক আজেবাজে লোকের উৎপাত, তাই সঙ্গে একজন পুরুষ থাকা ভালো। নেগ্রেল একগাল হেসে ভরসা দিল।—না না, সেরকম ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। যে যাই বলুক, যতই শাসাক তা শুধু মুখেই। কেউ সাহসই করবে না ঢিল ছুঁড়তে বা কোনো অসভ্যতা করতে।

মঁসিয় গ্রেগোয়া তাদের সকলকে খনির ঘটনা বললেন।

মেয়েরা সবাই গাড়িতে উঠল। তারা বেড়াতে যেতে পেরে খুব খুশী। কেউ তখনও ভাবতেই পারেনি যে শ'য়ে শ'য়ে মানুষ পায়ে হেঁটে এগিয়ে আসছে।

মাদাম এনবো বললেন, আপনি তাহলে সন্ধ্যেবেলা আমাদের ওখানে খেয়েদেয়ে একেবারে মেয়েদের নিয়ে আসবেন। মাদাম গ্রেগোয়ারও আসবেন সেসিলকে নিতে।

মঁসিয় গ্রেগোয়া বললেন, নিশ্চয়ই।

গাড়ি উদামের দিকে এগিয়ে চলল। জান্ আর ল্যুসি বাবাকে হাত নাড়লো। গাড়ির পাশে পাশে দুলকি চালে চলল নেগ্রেলের ঘোড়া।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে রাস্তা। মার্শিয়েনের দিকে যেতে হবে। সে তার্তার-এর কাছাকাছি গিয়ে জান্ মাদাম এনবোকে জিজ্ঞেস করল তিনি গ্রীন হিল চেনেন কিনা। না, উনি ওদিকটায় যাননি। সে তার্তার একটা গাছগাছালি ঘেরা উঁচু জায়গা, বনের ধারে। তার নীচে নাকি আগুন জ্বলছে ধিকিধিকি। হয়তো ওখানে কয়লাখনি ছিল কোনোকালে। এ নিয়ে গল্পও প্রচলিত আছে—সকলে বলে আগুনটা স্বর্গ থেকে এসে পড়েছিল কয়লাখনিতে। তখন কয়লাখনির মেয়েরা চরম অন্যায় ব্যভিচার করত, তাদেরই শাস্তি দেবার জন্য। একজনও নাকি ওই আগুন থেকে রেহাই পায়নি। আজও সেই আগুন জ্বলছে। জায়গাটা গন্ধকে ভর্তি। দু-চারজন সাহসী লোক নাকি উঁকি মেরে দেখেছে—গভীর গর্তে আগুনের আভাস, অশরীরী [illegible], তারা আগুনে ঝলসে যাচ্ছে। আলেয়া দেখা যায় রাতে। বিচ্ছিরী মজা মজা [illegible]। এ সবেরই মাঝে গ্রীন হিল—তার পাতা সব সময় সবুজ, ঘাস সতেজ।

মাটির উত্তাপ একটু বেশী বলে বরফ গলে যায়, সবুজ গুল্ম জন্মায়। বরফ তার কিছুটি করতে পারে না।

গাড়ি আবার চলতে শুরু করল। নেগ্রেল গল্প শুনে হাসল খানিক তারপর এইসব আজগুবী গল্পের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিল: কয়লার গ্যাস থেকে এরকম আগুন হয়। বেলজিয়ামে নাকি একবার নদীর গতি পরিবর্তন করে বন্যা ঘটাতে হয়েছিল সেই আগুন নেভাবার জন্য।

হঠাৎ থেমে গেল নেগ্রেল। খানিকক্ষণ যাবৎ দলে দলে মজুর পাশ দিয়ে হেটে যাচ্ছে। তারা কোনো কথা বলছে না। আড়চোখে তাকাচ্ছে এই বিলাস-বহুল গাড়ির দিকে, তারপর ধাক্কা লাগবার ভয়ে নিজেরাই সরে যাচ্ছে। ছোট্ট সেতুটার ওপর তো এত লোক একসঙ্গে হাঁটছে যে ঘোড়াটার লাগাম টেনে ধরতে হল। হলটা কি? একসঙ্গে এত লোক রাস্তায় কেন। মেয়েরা একটু ভয় পেয়েছে। নেগ্রেলের মনে হচ্ছে গ্রামের দিকে বোধহয় গণ্ডগোল বাধতে পারে।

মার্শিয়েনে পৌছে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো সকলে। খোলা আকাশের নীচে জলজলে সূর্য, কয়লাখনির চিমনির কালো ধোঁয়া চারধারটা কেমন আচ্ছন্ন করে দিয়েছে।

* * * *

জাঁ-বার খনি। ক্যাথরিন তার কয়লাভর্তি টবটা ঠেলছিল এক ঘণ্টা টানা কাজ করতে করতে সে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। দরদর করে ঘাম ঝরছে এক মিনিট দাঁড়িয়ে মুখের ঘাম মুছল।

শাভাল অন্য মজুরদের সঙ্গে কয়লা কাটছিল আর ক্যাথরিনের কয়লার ঝুড়ি তোলার ঘরঘর শব্দ শুনছিল। হঠাৎই শব্দটা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে সচকিত হল। সে চেঁচিয়ে উঠল, কি হল?

ক্যাথরিন চিৎকার করে জানান দিল যে গরমে তার প্রাণ আইঢাই করছে মনে হচ্ছে সমস্ত শরীর যেন খসে যাবে। বুকের ধুকপুকুনি কমে আসছে।

শাভাল ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে উঠল।

—সামান্য ব্যাপার নিয়ে আদিখ্যেতা কোরো না দরকার হলে আমাদের মতো জামাটা খুলে ফেল।

তারা সকলে মাটি থেকে সাতশো আট মিটার নীচে, উত্তর দিকের কোণটায়—দিস্থিন্ত্রে খাদের প্রথম গ্যালারীতে, খনির একেবারে নীচ থেকে তিন কিলোমিটার ওপরে। যখন এই খাদে নামবার কথা হয়, ভয়ে মজুরদের মুখ শুকিয়ে যায়। নরকের সামিল এ জায়গা। তারা এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতেও ভয় পায়। গ্যালারীগুলো উত্তর দিকের ঢাল বেয়ে নেমে গেছে। তাপমাত্রা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। বাইরে থেকে লোকে টের পায় যে গরম গ্যাস আর গলানো গন্ধক বেরোচ্ছে খনির মুখ থেকে।

ক্যাথরিন তার জ্যাকেট ইতিমধ্যেই খুলে ফেলেছিল। এখন একটু ইতস্তত করে প্যান্টটাও খুলে ফেলল। তার হাতে পায়ে কোথাও একগাছি সুতোও [illegible]

কোমরের কাছটায় শক্ত করে শার্টটা বাঁধা, কোনো রকমে মেয়েলী আব্রুটুকু বজায় রেখে। সে আবার কয়লার টব ঠেলতে ঠেলতে শাভালকে চেঁচিয়ে বলল, আগের চেয়ে একটু ভালো লাগছে এখন।

ভ্যাপসা গরম। ক্যাথরিনের দমবন্ধ হয়ে আসছিল। গত পাঁচদিন যাবৎ এখানে কাজ করছে। ছোট্ট থেকে সে শুনে এসেছে লে তার্তারে মেয়েরা এখনও আগুনে পুড়ছে; স্বর্গ থেকে নেমে আসা সেই আগুন নাকি এখনও জ্বলে। এখনও অবশ্য এ সব গল্প তার ঠিক বিশ্বাস হয় না কিন্তু হঠাৎ যদি দেওয়াল ফুঁড়ে একটা মেয়ে বেরিয়ে আসে, আগুনে পুড়ে যার সমস্ত শরীর লাল দগদগে হয়ে গেছে? আবার সমস্ত শরীরটা ঘামে ভিজে গেল ক্যাথরিনের।

যেখানে কয়লার টবগুলো লেনদেন হচ্ছিল, সেখানে বছর তিরিশের একজন শুকনো চেহারার বিধবা কাজ করছিল। সে ক্যাথরিনকে দেখে বলল, বাঃ বেশ, দিব্যি জামা খুলে আরাম করছ তো! আমি পারি না কারণ ওপরের বজ্জাত ছোঁড়াগুলো বিশ্রী অঙ্গভঙ্গি করে, ইয়ার্কি মারে।

ক্যাথরিন বলল, আমাকেও হয়তো যা-তা বলবে কিন্তু আমি আর সত্যিই পারছি না।

খালি টবটা ক্লান্ত পায়ে সে ঠেলে ঠেলে নিয়ে গেল। শুধু যে তাপমাত্রা খুব বেশি তাই নয়, একবার বিষাক্ত বিস্ফোরক গ্যাসে প্রচুর ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল। সেই গ্যাস আজ দশ বছরেও পুরোটা বেরিয়ে যায়নি। ইটের ভাটির মতো গরম হয়ে রয়েছে সমস্ত দেওয়াল আর মেঝে। রীতিমতো শ্বাসকষ্ট হয়। এখানে তাপমাত্রা প্রায় ষাট ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

দু'বার যাতায়াত করবার পর ক্যাথরিনের আবার খুব শরীর খারাপ লাগছিল। কি কপাল যে এই দিস্থিত্রে খাদের এই স্তরে যাতায়াতের পথটা একটু চওড়া আর সুগম, মাথা ওপরের ছাদে ঠেকে না বলে দাঁড়িয়ে কাজ করতে মজুরদের সুবিধে হয়। মজুররা কিন্তু পিঠ বেঁকিয়ে কাজ করতে রাজী যদি একটু বুকভরা ঠাণ্ডা বাতাস মেলে।

শাভাল গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে উঠল।

—কি ব্যাপার? ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? কি করে যে আমার কপালে এই রকম একটা নচ্ছার কুত্তী জুটলো কে জানে! আমার মাথা খেয়ে দয়া করে টবে কয়লা বোঝাই কর!

কয়লার স্তরের একেবারে নীচে ক্যাথরিন, তার বেলচাটায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখুনি টলে পড়ে যাবে বলে মনে হয়। ভূতগ্রস্তের মতো সে ওদের দিকে চেয়ে রইল। শাভালদের পরিষ্কার দেখাও যায় না। শুধু বাতিগুলোর চোখরাঙানি। ওরা সবাই উলঙ্গ। জন্তুর মতো দেখাচ্ছে ওদের। কয়লার গুঁড়ো আর ধুলো মেখে প্রায় ভূতের মতো চেহারা। কাজ করতে করতে ওদের পিঠ দুমড়ে যাচ্ছে যন্ত্রণায়। ওরা কিন্তু অপেক্ষাকৃত পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছে ক্যাথরিনকে। তার নগ্নতা নিয়ে ঠাট্টা ইয়ার্কি করছে সমানে।

—সাবধান, দেখো যেন ঠাণ্ডা না লেগে যায়, সব তো খুলেই রেখেছ।

—বাঃ, ঠ্যাং জোড়া তো খাসা।

—শার্টটাই বা অঙ্গে রাখার দরকার কি। ওটুকুও খুলে ফেললেই হয়, আমরা চক্ষু সার্থক করি।

ক্যাথরিন অতি কষ্টে টবটা ভর্তি করে ঠেলতে শুরু করল। গ্যালারী বেশ চওড়া। দু দিকে দেওয়াল অনেকটা দূরে। দরকার হলেও সে চট্ করে ঠেস দিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। তার খালি পা বার বার লোহার লাইনে ঠোক্কর খাচ্ছিল। হাত দুটোয় যেন কোনো জোর নেই। শরীর বেঁকে যাচ্ছে যন্ত্রণায়। খানিকটা এগোলেই সেই বিষাক্ত আগুনের হল্‌কার মতো গ্যাস। বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটার মতোই তার কপাল, চিবুক, বুক বেয়ে ঘাম ঝরছিল। হঠাৎ দু চোখে অন্ধকার দেখল সে। কালো নোংরা কাদায় সমস্ত শরীর ভরে গেল। এত চিটচিটে যে চলা যাচ্ছে না।

আজ হঠাৎ এ কি হল ক্যাথরিনের? এতদিন ধরে কাজ করছে, এত কষ্ট তো পায়নি কখনও। নিশ্চয়ই বাতাসে বিষ আছে, ঘুলঘুলিগুলো ঠিকমতো কাজ করছে না। সমানেই তো কয়লার স্তর থেকে বুদ্বুদের মতো গ্যাস বেরোয়, অনেক সময় তাতে বাতি নিভে যায়। ক্যাযার ড্যাম্পের কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল। সবাই বলে এ বাতাস শরীরের ভেতর গেলে নিশ্চিত মৃত্যু। একবার চাপা বদ্ধ অবস্থায় বিস্ফোরণ ঘটলে শ'য়ে শ'য়ে মানুষ মরবে। ছোট্ট থেকেই ক্যাথরিন তো এই পরিবেশে কাজ করে অভ্যস্ত—এত সব বিপদের আশঙ্কা, ক্ষতির সম্ভাবনা দৈনন্দিন জীবনে গ্রাহ্যের মধ্যে আনলে তাদের চলে না। কিন্তু আজকের কষ্ট অমানুষিক। পাগলের মতো শার্টটাও খুলে ফেলল ক্যাথরিন। শরীরে একগাছি সুতোও সহ্য হচ্ছে না। গায়ের চামড়া যেন জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। একটু বসতে পারলে ভালো হত। কিন্তু না, বেশী লোভ ভালো না। ক্যাথরিন আবার কয়লার ঝুড়ি ঠেলতে লাগল। নাঃ, আর তো পারা যায় না। পারলে নিজের শরীর ক্ষতবিক্ষত করে ফেলত ক্যাথরিন। ঠিক একটা পশুর মতো নগ্ন অবস্থায় খাদের মধ্যে শুয়ে সে নড়াচড়া করতে লাগল।

কিন্তু তাতেই বা জ্বালা কমে কই? এখন আর কি খুলবে সে? কানের ভেতরটা কেমন ঝিমঝিম করছে। বুকটার ভেতরে যেন হাতুড়ি পিটছে কেউ। হাঁটু মুমড়ে পড়ে গেল ক্যাথরিন। কয়লার টবের ওপর বাতিটা বসানো ছিল। সেটাও প্রায় নিভু নিভু। ওটাও কি তার মতো দপ্ করে নিভে যাবে এবার? হঠাৎ বাতিটা নিভে গেল। সমস্ত জায়গাটা নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। মাথার ভেতরটায় অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। হাত পা অসাড়। আর বোধহয় সে বাঁচবে না।

শাভাল ওপর থেকে চেঁচিয়ে উঠল।

—কি কাণ্ড ছাখো, আবার কাজ থামিয়ে দিয়েছে।

ওপরে দাঁড়িয়ে শাভাল আসলে টবের চাকার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল না।

—কি হল ক্যাথরিন? আলসের ডিম একটা!

কিন্তু তবুও কোনো সাড়াশব্দ নেই।

—আমি গিয়ে ঘাড়ধাক্কা দিলে তবে কাজ করবি ?

তাও কোনো জবাব নেই। সেই একই হিমেল নিস্তব্ধতা।

রাগে গরগর করতে করতে নীচে নামলো শাভাল। এত দ্রুত যে প্রায় ক্যাথরিনের শরীরটার ওপর হুড়মুড়িয়ে পড়ল। ভয়ার্ত চোখে ভালো করে ক্যাথরিনের দিকে তাকিয়ে দেখল শাভাল। হলটা কি ? নিশ্চয়ই ভান করে পড়ে নেই ? আলোটা নামিয়ে ক্যাথরিনের মুখের কাছটায় ধরল সে। বাতিটা প্রায় নিভে এল। ভালো ভাবে নজর করে ব্যাপারটা বুঝতে পারল শাভাল। নিশ্চয়ই খুব বিষাক্ত গ্যাস নাকে গেছে। সমস্ত রাগ সে ভুলে গেল। ক্যাথরিন এই মুহূর্তে তার একজন হতভাগ্য সহকর্মিণী, যে বিপদে পড়েছে, মুমূর্ষু। কর্তব্যবোধে সজাগ হয়ে উঠল শাভাল। চিৎকার করে ডাকলো অন্যদের। একজন ক্যাথরিনের শার্টটা ছুঁড়ে দিল। এক হাতে কোনোরকমে পাঁজাকোলা করে ক্যাথরিনকে তুলে সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল জায়গাটা ছেড়ে। তার অন্য হাতে দুটো বাতি। হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটছিল শাভাল। শীগগির ঠাণ্ডা বাতাস চাই। ওই তো ঝরঝর করে জল পড়ার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। এখানে খুব ঠাণ্ডা বাতাস। ভালো করে ক্যাথরিনকে শুইয়ে দিল শাভাল। শাভাল নিজে ঠাণ্ডা বাতাসে কেঁপে উঠল।

—ক্যাথরিন, চোখ খোলো লক্ষ্মীটি। এ রকম কোরো না। তাকাও আমার দিকে। এই স্থাখো, জলের ছিটে দিচ্ছি।

ক্যাথরিন ঝিম মেরে রইল। শার্টটা জলে ভিজিয়ে তার হাত মুখ ধুইয়ে দিল শাভাল। ক্যাথরিনকে একটা মরা মাছের মতো ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। ছোট্ট বালকের মতো দেহটা থেকে থেকে কেঁপে উঠছে।

হঠাৎ চোখ মেলল সে।

—আমার শীত করছে।

শাভাল হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

—যাক্ বাবা। এই তো তুমি ঠিক হয়ে গেছ।

ক্যাথরিনকে জামাকাপড় পরিয়ে দিচ্ছিল শাভাল। শার্টটা পরাতে অসুবিধে হয়নি কিন্তু প্যান্টটা নিয়ে কিছুতেই সুবিধে করতে পারছিল না। আসলে ক্যাথরিনের একটুও নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। সে নিজে পরতে পারছে না। সমস্ত শরীর মন কেমন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কিছুতেই মাথা কাজ করছে না। বুঝতেই পারছে না সে নগ্ন হয়ে গেল কি ভাবে।

হঠাৎ সবকিছু মনে পড়ে গেল। লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠল। ছি ছি, কি করে সে সব জামা কাপড় খুলে ফেলল ? যত কষ্টই হোক, সেটুকু সহ্য করা উচিত ছিল। সবাই নিশ্চয়ই ওই অবস্থায় তাকে দেখেছে। পরনে তো একগাছি সুতোও ছিল না। শাভাল ঠাট্টা ইয়ার্কি করে ক্যাথরিনকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছিল।

শাভাল বলল, আমার ভীষণ ঠাণ্ডা লাগছে।

ক্যাথরিন শাভালের কাছ থেকে অনেকদিন এত ভালো ব্যবহার পায়নি। সে মিষ্টি কথা বললেও শাভাল তার উত্তরে সাধারণত দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ওঠে। মনটা ভরে উঠল তার। ফিসফিস করে আদুরে গলায় বলে উঠল, আমায় একটা চুমু দাও।

ক্যাথরিনকে চুমু খেল শাভাল। তারপর তার পাশে শুয়ে রইল যতক্ষণ না ক্যাথরিন হাঁটবার শক্তি ফিরে পেল।

ক্যাথরিন বলল, জানো, তুমি আমায় তখন অমন করে না বকলেই পারতে। আমি আর সত্যিই পারছিলাম না। তোমরা যেখানে কাজ কর সেখানে অতটা গরম নয় কিন্তু আমাকে যে জায়গাটা দিয়ে কয়লা নিয়ে যেতে হয়, হাত পা যেন ঝলসে যায়।

—জানি। তোমার খুব কষ্ট হয়, না?

ক্যাথরিন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। শাভাল তার সঙ্গে এত ভালো ব্যবহার করছে, এত সহানুভূতি জানাচ্ছে?

—না। আজই হঠাৎ শরীরটা কেমন খারাপ লাগল। বাতাসটা বিষাক্ত ছিল। আমি কিন্তু সত্যিই কাজে ফাঁকি দিতে চাই না। এটুকু কষ্ট সহ্য করতে না পারলে তো বেঁচে থাকাই উচিত নয়।

শাভাল একটা হাত দিয়ে ক্যাথরিনকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছে। এত ঠাণ্ডা। যদিও ক্যাথরিন ইচ্ছে করলেই হয়তো এখন উঠতে পারে কিন্তু এই অনাস্বাদিত সুখের মুহূর্তও তো চট করে পাওয়া যায় না।

খুব নরম গলায় ক্যাথরিন বলল, আমি আর কিছু চাই না। তুমি শুধু আমার সঙ্গে একটু ভালো ব্যবহার কোরো। দু'জনে দু'জনকে খুব ভালোবাসবো, এ ছাড়া তো আমার কোনো চাহিদা নেই।

ক্যাথরিন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

শাভাল প্রতিবাদের সুরে বলল, কিন্তু আমি তো তোমাকে ভালোবাসি, না হলে কি আর জোর করে তোমাকে আমার কাছে নিয়ে আসতাম?

ক্যাথরিন মাথা নাড়লো। সব পুরুষই মেয়েদের চায় দখল করবার বাসনা নিয়ে। কিন্তু সত্যি সত্যি তাদের সুখদুঃখের অনুভূতি নিয়ে মাথা ঘামায় ক'জন? তার দু চোখ দিয়ে হু হু করে জল ঝরতে লাগল। হায়, এমন মানুষ যদি সে পেত যার সহানুভূতি, সমবেদনা আর ভালোবাসা তাকে ঘিরে থাকত সর্বক্ষণ, তাহলে আজ সে কত সুখী হতে পারত! অন্য কোন্ মানুষ? চকিতে তার মনের কোণে ভেসে উঠল এতিয়েনের মুখ।...কি লাভ পুরনো কথা ভেবে? যা হবার তো হয়েই গেছে। ক্যাথরিন এখন শাভালকে নিয়েই থাকতে রাজী, শুধু যদি একটু সহৃদয় ব্যবহার পায়।

মুখে শুধু বলল, ঠিক আছে। তুমি শুধু এই রকম ভালো ব্যবহার কোরো আমার সঙ্গে।

আবার ফুঁপিয়ে উঠল ক্যাথরিন। শাভাল তাকে চুমু খেল।

—বোকা মেয়ে কোথাকার! বেশ তো, কথা দিচ্ছি ভালো হয়ে যাব। তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করব। আচ্ছা, আমি মানুষটা কি এতই মন্দ

ভেজা চোখে শাভালের দিকে তাকিয়ে এক ঝলক হাসল ক্যাথরিন। হয়তো কথাটা ঠিক। পৃথিবীতে আর ক'জন মেয়ে তার প্রেমিককে নিয়ে পুরোপুরি সুখী হতে পেরেছে! শাভালের এই আশাতীত পরিবর্তনে খুশী হল ক্যাথরিন। হে ভগবান, জীবনটা যদি এই রকমই হত!

তারা দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরল।

হঠাৎ পায়ের শব্দে চমক ভাঙলো তাদের। দেখি দেখে তিনজন সঙ্গী খোঁজ নিতে এসেছে।

সকলে একসঙ্গে রওনা হল। প্রায় দশটা বাজে। কাজ শুরু করবার আগে স্থির হয়ে বসে একটু খেয়ে নেওয়া দরকার।

সবে স্যাণ্ডুইচ শেষ করে কফির গেলাসে চুমুক দিয়েছে, দূর থেকে একটা হট্টগোলের আওয়াজ ভেসে এল। কি হল? আবার দুর্ঘটনা? সকলে ছুটলো আওয়াজ লক্ষ্য করে। মেয়ে পুরুষ সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছে। নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু। সবাই ভয়ে কাঁটা। কেউ কিছু বলছে না কেন?

হঠাৎ একজন ডেপুটি দৌড়ে এলেন।

—ওরা তার কেটে দিচ্ছে! তার কেটে দিচ্ছে!

এইবার সকলে ভয়ে সাদা হয়ে গেল। অন্ধকার গ্যালারীতে শ'য়ে শ'য়ে ত্রস্ত মানুষ। কি হবে! তার কেটে ফেলছে কেন? এত লোক যে খাদে আটকা পড়ে যাবে। কি সর্বনাশ হল!

আরেকজন ডেপুটির গলা।

—মঁস্যুর মজুররা তার কেটে ফেলেছে। তোমরা যত তাড়াতাড়ি পারো বেরিয়ে যাও!

পুরো ব্যাপারটা যখন শাভালের মাথায় ঢুকল, সে ক্যাথরিনকে দু হাত দিয়ে আটকালো। কি সর্বনাশ! সে এখন বাইরে বেরোলেই তো মঁস্যুর লোকেরা তাকে দেখে ফেলবে। তার বিশ্বাসভঙ্গের কথাটা জানাজানি হয়ে যাবে। শাভালের হাত পা অসাড় হয়ে গেল। কি কপাল! ঠিক এসে পড়েছে ওরা! পুলিস ওদের আটকাতে পারল না? এক মুহূর্তের জন্য তার মনে হল অন্য রাস্তা দিয়ে—গাস্তঁ মারির রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে গেলে কেমন হয়? কিন্তু ওখানে শ্যাফ্‌টটা কাজ করছে না। রাগে, ভয়ে দিশেহারা হয়ে গেল শাভাল। আর সেই দুর্বলতা ঢাকতে চেঁচিয়ে উঠল। সবাইকে বলল, এভাবে ভয় পেয়ে পালাবার কোনো মানেই হয় না। মঁস্যুর লোকেরা তাদের নিশ্চয়ই চাপা দিয়ে মেরে ফেলবে না।

আবার ডেপুটির গলা শোনা গেল।

—হাঁ করে দাঁড়িয়ে সব দেখছ কি? মই দিয়ে ওপরে উঠে সবাই বেরিয়ে যাও!

ঢেউয়ের মুখে কুটোর মতোই শাভাল অন্যদের ধাক্কায় ছিটকে এগিয়ে চলল। [illegible] ক্যাথরিনকে বকাবকা করতে লাগল তাড়াতাড়ি চলতে না পারার জন্য।

ক্যাথরিন কি এখানেই মাটি চাপা পড়ে মরতে চায়? সম্ভব নচ্ছার মজুরগুলো শয়তানি করে মইগুলোকেও অকেজো করে রাখতে পারে।

ব্যস। মজুরদের মধ্যে আরও হুড়োহুড়ি লেগে গেল সবাই আগে বেরিয়ে যেতে চায়। বাঁচবার জন্য পাগলের মতো করতে লাগল সকলে। অনেকে চেঁচিয়ে বলতে লাগল মই নাকি নষ্ট হয়ে গেছে, কেউ বেরোতে পারবে না। একটা শ্যাফ্‌ট ছিল, হঠাৎ বিপদ হলে ব্যবহার করার জন্য। মাটির নীচে অতগুলো মানুষ আদিম জন্তুর মতো একে অন্যকে আঘাত করতে লাগল, পিষে ফেলতে লাগল সেই শ্যাফ্‌টের কাছে যাবার জন্য। শুধু একটা বুড়ো মজুর, ঘোড়াগুলোর কোচোয়ান, নির্বিকার। আগেও বহুবার সে খনির মধ্যে রাত কাটিয়েছে। জানে একটা না একটা উপায় হবেই।

শাভাল বলল, ক্যাথরিন, দয়া করে তুমি আমার সামনে সামনে ওঠো যাতে পা ফসকে গেলেও তোমাকে ধরে ফেলতে পারি

তিন কিলোমিটার পথ দৌড়ে ক্যাথরিন হাঁপিয়ে উঠেছে। তার শরীরটা কেমন অস্থির লাগছে। আবার ঘাম ঝরছে দরদর করে। এতক্ষণ কেমন পাগলের মতো সেও কিছু না বুঝে সকলের সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করছিল শাভাল ক্যাথরিনের হাতটা জোরে মুচড়ে দিল। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে কেঁদে ফেলল মেয়েটা। শাভাল এর মধ্যেই তার প্রতিজ্ঞা ভুলে গেছে। রূঢ় গলায় বলল, এগিয়ে যাও।

ক্যাথরিন ভয়ে সিঁটিয়ে গেল। যদি সে শাভালের আগে আগে যায়, শাভাল এমনি করেই তাকে মর্জিমাফিক আঘাত করবে, তার ভুল ধরবে। তাই সে মৃদু প্রতিবাদ জানালো। অন্য মজুররা প্রাণ বাঁচবার তাগিদে তাকে প্রায় ঠেলে এক কোণে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল। শ্যাফ্‌ট থেকে বড় বড় ফোঁটায় জল পড়ছে। মাটিটা নরম, ভিজে থেকে থেকে অতগুলো মানুষের পায়ের চাপে বুঝি বা কেঁপেও উঠছে। গত দু'বছর আগেই এখানে খাঁচার তার ছিঁড়ে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। সেবার অবশ্য মাত্র দু'জন মারা গিয়েছিল। তবুও সেই ভয়ংকর স্মৃতিতে সকলের মন তোলপাড়।

শাভাল চেঁচিয়ে উঠল, তুই মর হারামজাদী, তাহলে আমার হাড় জুড়োয়।

সে নিজেই এবার ওপরে উঠতে লাগল। তার পিছু পিছু ক্যাথরিন।

নীচ থেকে ওপর পর্যন্ত মোট একশো দুটো মই আছে। পরপর খাড়াভাবে দেওয়ালের সঙ্গে লাগিয়ে প্রত্যেকটাকে একটা করে সংকীর্ণ তক্তার ওপর দাঁড় করানো। একজন মানুষ ভালোভাবে গলে ওপরের মইতে উঠতে পারে, প্রতিটি তক্তার মাঝখানে ঠিক সেই মাপের একটা করে ফোকর কাটা আছে। এইভাবে অন্ধকার, স্যাঁত-স্যাঁতে সাতশো মিটার পথ মই বেয়ে উঠে আসতে সাধারণ ভাবে মিনিট পঁচিশ সময় লাগে একজন শক্তসমর্থ মজুরের। অবশ্য এই দুর্গম পথ শুধুমাত্র জরুরী অবস্থায় ব্যবহার করা হয়।

প্রথমে ক্যাথরিন বেশ তাড়াতাড়িই উঠছিল। তার পা দুটো অবশ্য কয়লার ঘুরে ঘষা লেগে ছড়ে গেছে। কিন্তু কাজ করে করে হাতের চেটো বেশ শক্ত। সে জোরে

করে চেপে ধরেছিল মই। এই উত্তেজনা তার সমস্ত ক্লান্তি আর অশান্তি এক নিমেষে ভুলিয়ে দিয়েছে। প্রতিটা মইতে একসঙ্গে তিনজন করে মানুষ সরীসৃপের মতো সাবলীলভাবে উঠে যাচ্ছে। খুব সামান্য পথই ওঠা হয়েছে এখন পর্যন্ত। সবাই চুপ। শুধু পায়ের শব্দ মইয়ের ওপর। মানুষগুলোকে আবছা অন্ধকারে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না, শুধু সার সার বাতি।

ক্যাথরিনের ঠিক পেছনে একটা ছেলে মইয়ের সংখ্যা গুনছিল। সবাই এর মধ্যে পনেরোটা মই বেয়ে উঠে এসেছে। সেই সময়ই শাভালের পায়ের সঙ্গে ক্যাথরিনের পা ঠেকে গেল। শাভাল চেঁচিয়ে উঠল। ক্যাথরিন কি একটু দেখেশুনে উঠতে পারে না? সামনের মানুষগুলোর গতি মন্থর হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে থেমেও পড়ছে। আবার নতুন করে কি বিপদ হল? মুখে মুখে একটা কথা ফিরতে লাগল---একজন মজুর নাকি পা ফস্কে পড়ে গেছে। তা বলে কি এখানে এইভাবে সারারাত থাকতে হবে? হঠাৎ আবার সকলে চলতে শুরু করল, আগের মতোই কষ্ট করে। হয়তো অনেকটা পথ উঠে দেখা যাবে ওপরের মইগুলোর সিঁড়ি সব ভেঙে রেখে দিয়েছে মঁস্যুর মজুররা। কিছুই আশ্চর্য নয়।

বত্রিশটা মই বেয়ে ওঠা হয়েছে। ক্যাথরিনের হঠাৎ মনে হল যে হাতে পায়ে আর জোর পাচ্ছে না। প্রথমে কেমন যেন ছুঁচ ফোটবার মতো অনুভূতি---কিন্তু আস্তে আস্তে কষ্টটা বাড়ছে। কিছুতেই মইটা জোরে ধরতে পারছে না। সমস্ত শরীর গরম হয়ে উঠেছে। হঠাৎ বুড়ো ঠাকুর্দার কথা মনে হল তার: আগে নাকি এমনি করেই মই বেয়ে দশ বছরের ছোট ছোট মেয়েরা কাঁধে কয়লার ঝুড়ি নিয়ে যাতায়াত করত। একবার পা বা হাত ফস্কালেই সেই কয়লা চাপা পড়ে দু-চারজন ঐরকম বাচ্চা বাচ্চা মেয়ে মারা পড়ত। ক্যাথরিনের হাতে পায়ে এত খিল ধরেছে, কেমন অবশ লাগছে। নাঃ, সে কিছুতেই শেষ ধাপে পৌঁছতে পারবে না বলে মনে হচ্ছে।

মাঝে মাঝে একটু থামতে পেরে ভালো লাগছে। কিন্তু সামনে পেছনে ভয়ার্ত মানুষ। সকলেই হাঁপিয়ে উঠেছে। মাথাটা ঘুরছে। চোখে অন্ধকার। ভিজে স্যাঁতসেঁতে দেওয়াল। শীত করছে। ওপর থেকে ফোঁটা ফোঁটা ঠাণ্ডা জল গায়ে পড়ে যেন চামড়া কেটে বসে যায়। জলের তোড় বাড়ছে, আলোগুলো এক্ষুণি নিভে যাবার যোগাড়।

দু-দু'বার ক্যাথরিনকে ডাকলো শাভাল। পেছন থেকে কোনো সাড়া পেল না। আবার কি হল? বোবায় ধরল নাকি! একবার মুখ ফুটে বলতেও তো পারে ঠিকঠাক আছে কি না। প্রায় আধ ঘণ্টা হতে চলল, কিন্তু মাত্র উনষাটটা মই পার হতে পারা গেছে। এখনও তেতাল্লিশটা বাকি। ক্যাথরিন কোনরকমে বলল, সে ঠিক আছে। লোহার ধাপগুলো যেন পায়ের পাতার চামড়া ভেদ করে মাংসে আঘাত করছে। প্রতিটা ধাপে পা রাখার সময় মনে হচ্ছে এই বুঝি তার হাত দুটো আর শরীরের ভার সামলাতে পারল না। ঘাড়টা, কাঁধ দুটো কেটে যাচ্ছে যন্ত্রণায়। [illegible] আর পারছে না ক্যাথরিন। মইটা এত খাড়াভাবে লাগানো যে পেটটা

প্রায় দেওয়ালের সঙ্গে চেপে ধরে উঠতে হচ্ছে। গা গুলিয়ে উঠছে। সামনে পেছনে মানুষের পায়ের শব্দ ছাপিয়ে এখন শুধু জোরে জোরে শ্বাস ফেলার শব্দ। সকলের বুক ওঠানামা করছে হাপরের মতো। একটা ছেলের নাকি তক্তার কোণায় আঘাত লেগে মাথাটা চৌচির হয়ে গেছে।

খুব কষ্ট হচ্ছিল ক্যাথরিনের উঠতে। এখানে জল পড়াটা বন্ধ হয়েছে। কিন্তু বাতাস ভারী, তাতে জলে ভেজা কাঠ আর পুরনো লোহার গন্ধ। ক্যাথরিন অভ্যাসবশত গুনে যাচ্ছিল। একাশি, বিরাশি, তিরাশি· আঃ, এখনও উনিশটা মই। কি ক্লান্তিকর এই একঘেয়ে ওঠা! এখন আর নিজের শরীর নিয়ে মাথা ঘামাতে পারছে না, সেটুকু শক্তিও তার অবশিষ্ট নেই। মাথার ওপর বাতিগুলো ঘুরে ঘুরে উঠে যাচ্ছে—ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাওয়া মানুষগুলোকে তো আর দেখা যাচ্ছে না। সমস্ত শরীরে যেন রক্তচলাচল থেমে গেছে ক্যাথরিনের। একবার শ্বাস নিলেই সে মরে যাবে—বুকটায় টান ধরেছে। পেছনের লোকজনেরা তাকে ক্রমাগত ঠেলছে। পুরো লাইনটা ধাক্কাধাক্কিতে ভেঙেচুরে একসা হয়ে যাচ্ছে। একেবারে সামনের কয়েকজন এর মধ্যে বাইরে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। তার মানে একেবারে ওপর পর্যন্ত মইগুলো ঠিকই আছে। কিন্তু তবুও সকলের মনে ভয়, যদি শেষ মুহূর্তে মঁসুর মজুররা মইগুলো ভেঙে দেয়, যাতে কিছু লোক অন্তত বেরোতে না পারে সেইজন্য কেউ একজন একটু থেমে শ্বাস নিতে চাইলেও পেছনের ক্ষুব্ধ লোকজন তাকে থামতে দিচ্ছে না, একেবারে ঠেলে এগিয়ে দিচ্ছে।

তারপর ক্যাথরিন সত্যিই পড়ে গেল। কয়েকবার মুমূর্ষু গলায় শাভালের নাম ধরে ডেকেছিল, কিন্তু শাভালের কানে সে ডাক পৌঁছায়নি সে যে তখন তার সামনের লোককে ঠেলতে ব্যস্ত! ক্যাথরিন গড়িয়ে পড়ল, জ্ঞান হারাবার মুহূর্তে তার মনে হল সে বুঝি সেই ছোট্ট মেয়ে—যে হয়তো বা কতদিন আগে এমনি করে এখানে কয়লা চাপা পড়ে মরেছিল, পাথরের টুকরো বুকে লেগে ঠিক যেমন চড়ুই পাখির ছানা মরে। আর মাত্র পাঁচটা মই··

এক ঘণ্টার ব্যাপার। ক্যাথরিন জানে না কি করে তাকে বাইরে আনা হল, কে বা কারা তাকে কাঁধে করে তুলে এনেছিল। আসলে সে মাটিতে পড়েনি। মইয়ের নীচে অপেক্ষমান মজুরদের ঘাড়ে এসে পড়েছিল। হঠাৎ সে চোখ চেয়ে দেখল সূর্যের আলোয় চারদিক ভেসে যাচ্ছে। তার চারদিকে কত মানুষের ভিড়।

* * * *

সূর্যোদয়ের আগে থেকেই মজুরদের সমস্ত বসতি অশান্ত হয়ে উঠেছে। জোর গুজব যে মালিকরা পুলিস এনে সকলকে শায়েস্তা করবে। রাতেই সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেছে। হ্রাসন্তরই নাকি সহকর্মীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে মঁসির এনবোকে সতর্ক করে দিয়েছিল। একজন মেয়ে মজুর তো হলফ করে বলল ওই বড়কর্তার চাকরকে সে নাকি চিঠি নিয়ে অফিসে যেতে দেখেছে। চোয়াল শক্ত হল অন্যান্য শ্রমিকদের। তারা দিনের আলো ফোটবার আগেই খড়খড়িতে চোখ রেখে বসে আছে।

সাড়ে সাতটা বাজলো প্রায়। সূর্যের আলো চারদিকে। আবার আর একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ল। উত্তেজনাও বাড়লো সেই সঙ্গে। সৈন্যরা নাকি কুচকাওয়াজ শুরু করেছে। অবশ্য এটা হয়তো নিছকই ভয় দেখাবার জন্য কর্তাদের একটা চাল। কারণ আজকাল প্রায়ই এই সৈন্যদের পথে টহল দিতে দেখা যায়। মঁসুর বাসিন্দারা লিল-এর পুলিস-বিভাগের বড়কর্তাকে খুব কুনজরে দেখে। ভীষণ ছোটলোক, চোখের চামড়া নেই, কথার দাম নেই। খালি চোখরাঙানি। সকাল ন'টা পর্যন্ত কোনো অঘটন ঘটল না দেখে সবাই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সেপাইদের ঘোড়ায় চড়ে ধুলোর ঝড় উড়িয়ে চলে যাওয়া দেখল। মঁসুর অভিজাত সম্প্রদায়ের এখনও ঘুম থেকে ওঠবার সময় হয়নি। নরম বালিশে, তুলোর গদীতে সব গা ডুবিয়ে শুয়ে আছে। মাদাম এনবো অবশ্য খানিক আগে জুড়িগাড়িতে করে বেরিয়ে গেলেন। ওঁর কর্তাটি নিশ্চয়ই ব্যস্ত। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিস-পাহারাও বসেনি। যত্তো সব বাজে গুজব। ন'টার সময় মজুররা দলে দলে উদামের পথে বেরিয়ে পড়ল। জঙ্গলে তাদের আজ সভা আছে।

এতিয়েন আগেই বুঝতে পেরেছিল যে সাফল্য পেতে হলে জাঁ-বার খনির তিন হাজার মজুরকে পাশে পেতে হবে। অনেকে নিশ্চয়ই ভেবেছে যে কোনো কারণে শ্রমিকদের পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে। আর সবচেয়ে ভয়ের কারণটা হল দু তিনটে দল ইতিমধ্যেই হয়তো মালিকপক্ষের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে রাজী হয়ে গেছে। তাদের তাড়াতাড়ি দলে টানা দরকার। শ'খানেক লোক ভোর হবার আগেই রওনা হয়ে গেছে। তারা নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট জায়গায় অপেক্ষা করছে। এতিয়েন সুভারিনের কাছে গিয়েছিল পরামর্শ চাইতে। সুভারিন ঘাড় নেড়েছে। তার নাকি কিছুই করণীয় নেই। দশজন লোক যদি একরোখা হয়ে কাজে যোগ দেয়, তাদের বিরুদ্ধে হাজার জন মিলেও কিছু করতে পারে না। যেমন একমনে বই পড়ছিল, তেমনই পড়তে লাগল সুভারিন। উল্টে এতিয়েনকে আবার উপদেশ দিল: এরকম সংবেদনশীল মন নিয়ে বিপ্লব করা যায় না। তার চেয়ে মঁসুতে আগুন জ্বালিয়ে দাও। সে কাজটা তো বেশ সোজা।

বেরোতে গিয়ে এতিয়েনের চোখে পড়ল উনুনের সামনে বিবর্ণ, বিমর্ষ মুখে হ্রাসগ্লর বসে। তার স্ত্রী হাত পা নেড়ে তাকে কি সব বোঝাবার চেষ্টা করছে।

মায়্যুর মতে তাদের কথা রাখতে হবে। আগেই ঠিক ছিল সভা হবে, জমায়েত হবে সকলে। এখন সেটাকে ভেস্তে দেওয়া যায় না। কিন্তু আজ সকালে সেখ কিছুটা চিন্তিত যদি সত্যিই কোনো ঝামেলা হয়?

মায়্যু বারবার বলতে লাগল, তার চেয়ে চলো আমরা যাই, ওদের উপর নজর রাখি। মায়্যু-গিন্নীও তাতে সায় দিল।

এতিয়েন বলল, হ্যাঁ, প্রকৃত বিপ্লবীর মতোই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। তবে অযথা রক্তপাতের দরকার নেই।

বেরোবার মুখে মায়্যুর বউ তাকে খানিকটা রুটি আর খিদে দিল। রুটিটা নিয়েছে

দিল এতিয়েন। জিনের গেলাসে লম্বা চুমুক দিল। শরীর গরম রাখা দরকার। সঙ্গেও খানিকটা নিতে হবে।

আলজিরির বাচ্চাদের দেখাশুনো করবে ঠিক হল। কাল রাতে অনেকটা হেঁটে বুড়ো বোন্মরের পায়ে ব্যথা হয়েছে। সেও বাড়ি থাকবে। একসঙ্গে সকলের না বেরোনোই ভালো। শাঁলাঁ্যা অনেকক্ষণ আগেই বেরিয়ে গেছে।

মাহ্যু আর তার বউ এক দিকের রাস্তা ধরল, এতিয়েন এগোল অন্য রাস্তা ধরে। পথে তার এক দঙ্গল মেয়ের সঙ্গে দেখা। মা ব্রুলে আর লেভাকের বউও আছে। তাদের কোঁচড ভর্তি বাদাম, মুফেতই এনে দিয়েছে সকলকে। খোসাসুদ্ধ বাদাম খাচ্ছে সবাই, পেটটা বেশ খানিকক্ষণ ভর্তি থাকবে তাহলে।

জঙ্গলে কারুর দেখা পেল না এতিয়েন। খনির ধারে পৌঁছে তার প্রথমেই চোখ পড়ল লেভাক আর শ'খানেক মজুরের দিকে। সবাই খাদের দিকে এগোচ্ছে। এর মধ্যে চারদিক থেকে অন্যান্য মজুররাও আসছে। মাহ্যুরাও এসে পড়ল। মেয়েরাও বাদ নেই। কারও সঙ্গে কোনো রকম অস্ত্র নেই। একটা ঠাণ্ডা লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুধু। শাঁলাঁ্যা এরই মধ্যে একটা উঁচু জায়গায় উঠে দাঁড়িয়েছে। সেখান থেকে চারদিকের সব কিছুই বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। এতিয়েন সকলের সামনে এসে পড়ল। প্রায় শ' তিনেক লোক হবে।

প্রথমেই বাধা দিলেন মঁসিয় দ্যন্সলাঁ্যা। সিঁড়ির ওপর থেকে চেঁচিয়ে বললেন, কি চাই তোমাদের?

একটু আগেই বাড়ি থেকে ফিরেছেন তিনি মেয়েরা বেরিয়ে গেছে মাদাম এনবোর সঙ্গে। খনিতে কাজকর্ম চলছে। সাময়িক যা অশান্তিটা গেল। ঠাণ্ডা মাথায় একজন কর্মচারীর সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি। হঠাৎ খবর পেলেন দলে দলে মজুর এদিকে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে জানলায় এসে দাঁড়ালেন। অগুনতি মানুষ এদিকেই আসছে। এই প্রথম বুঝতে পারলেন তিনি কত অসহায়। কি করে এই খনি, অফিসঘর রক্ষা করবেন? চারদিক খোলামেলা, অরক্ষিত। লোকবলও কম।

রাগে সাদা হয়ে গেলেন মুখে সাহস দেখিয়ে বললেন, কি চাই তোমাদের?

সবাই নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি করতে লাগল। অতিকষ্টে ভীড় সরিয়ে সামনে এল এতিয়েন। নরম স্বরে বলল, আমাদের কোনো বদ মতলব বা খনির ক্ষতি করবার ইচ্ছে নেই স্যর। কিন্তু এখানে কাজ বন্ধ করতে হবে

মঁসিয় দ্যন্সলাঁ্যা এতিয়েনকে পাত্তাই দিলেন না।

--তুমি কি বলতে চাও হে ছোকরা? তাতে আমার কোন্ উপকারটা হবে শুনি? তার চেয়ে আমার পিঠে গুলি কর না কেন? হাঁ হাঁ, আমার লোকেরা খনিতে কাজ করছে। সে কাজ বন্ধ করতে হলে আমাকে মেরে আমার বুকের ওপর দিয়ে আগে হেঁটে যাও।

মঁসিয় দ্যন্সলাঁ্যার স্পষ্ট ঝাঁঝালো কথায় সকলে হাঁ হয়ে গেল। লেভাক তো,

তক্ষুণি ভেঙে যায় আর কি। অতি কষ্টে তাকে ঠাণ্ডা করল মায়্যু। মঁসিয় ভঁন্দর্ল্যাকে মিষ্টি কথায় বোঝাবার চেষ্টা করল এতিয়েন: তাদের এই বিপ্লব যথেষ্ট বৈধ। মঁসিয় ভঁন্দর্ল্যারও এক কথা: যে কাজ করতে চায়, তাকে কাজ করতে দিতে হবে। এ নিয়ে উটকো লোকের সঙ্গে কথা বলে তর্ক করে সময় নষ্ট করতে চান না তিনি। এটা তাঁর জায়গা। তিনি যা বলবেন তাই হবে। আগে জানলে পুলিস নিয়ে আসতেন। লাঠির ঘায়ে এই সব বদলোককে দূর করে দিতেন।

উত্তেজিত হয়ে উঠলেন তিনি।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, এ সব আমারই নির্বুদ্ধিতার ফল। তোমাদের মতো লোকদের শায়েস্তা করতে গেলে চাবুক আর জুতো ছাড়া কাজ হবে না। তোমরা হলে জাত নিমকহারাম! দেশের সরকার যখন তোমাদের হাতে রাখবার জন্য নানারকম সুযোগ সুবিধে দেয়, তোমরা সেগুলো নির্বিবাদে গ্রহণ কর। পরে আবার সেই সরকারেরই বিরুদ্ধে বিষোদ্গার কর নিজেদের ইচ্ছেমতো। যার খাবে, পরবে তারই বুকের ওপর বসে তার দাড়ি ওপড়াবে!

এতিয়েন রাগে কাঁপছিল, কিন্তু তবুও ধৈর্য হারায়নি। আরও নরম গলায় সে বলল, আমি আপনার কাছে এইটুকু সহানুভূতি ভিক্ষে চাইছি, স্যর। আপনি আপনার লোকদের খনির বাইরে ডেকে নিন। আমরা তো কেউই চাই না অপ্রিয় কিছু ঘটুক।

—না, এক্ষুণি বেরিয়ে যাও তোমরা। আর তুমি এসব গরম গরম কথা বলবার কে? আমার এখানে তুমি চাকরি কর না। তোমার সঙ্গে আমি কথা বলতে যাবই বা কেন? তোমরা সব চোর ডাকাতেরও অধম।

চারদিক থেকে বিভিন্ন কথার আওয়াজে মঁসিয় ভঁন্দর্ল্যার গলার স্বর ডুবে গেল। অনেকেই, বিশেষত মেয়েরা তাঁকে কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করতে লাগল। অপমানজনক নানা কথাবার্তা বলছিল তারা। কিন্তু মঁসিয় ভঁন্দর্ল্যা নড়লেন না। নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে সব শুনতে লাগলেন। এমনিতেও যা সর্বনাশ হবার তা হবে। মাঝে মাঝে অবশ্য ধৈর্যচ্যুতি ঘটছিল। এখন আস্তে আস্তে লোক বাড়ছে। প্রায় পাঁচশো লোক জড়ো হয়ে গেছে। তাঁকে টেনে সরিয়ে আনলো তাঁর একজন কর্মচারী।

—কি করছেন স্যর! সর্বনাশ হয়ে যাবে যে। খনির লোকগুলোকে এরা পিটিয়ে মেরে ফেলবে।

মঁসিয় ভঁন্দর্ল্যা চিৎকার করতে লাগলেন।

—শয়তান! যা খুশি তাই করবে ভেবেছো? দাঁড়াও, তোমাদের উচিত শিক্ষা দিচ্ছি। আমারও দিন আসবে।

শেষ পর্যন্ত তিনিও পিছু হটে আসতে বাধ্য হলেন। দলের মেয়েরা পুরুষদের উস্কানি দিচ্ছে। দরজাটায় পলকা খিল দেওয়া ছিল। স্রোতের মতো জনতা এসে পড়ল তার ওপর। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল সেটা। সিঁড়িটা বড্ড সরু। কিন্তু

উত্তেজিত মজুররা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত কারখানায়, খাদের মুখে, অফিসঘরে বয়লার-ঘর, লকার-রুম, সর্বত্র তারা হৈ হৈ করে ঢুকে পড়ল। পাঁচ মিনিটের চেয়েও কম সময়ে সমস্ত খাদ, পুরো তিনটে তলা তাদের দখলে চলে এল। জয়ের উল্লাসে মুখর হল সবাই।

মাহ্যু ভয় পেয়েছে। সে একান্তে এতিয়েনকে ডেকে বলল, ওঁকে যেন মেরে ফেলা না হয়।

এতিয়েনও এখন ছুটছে। ছাঁসুলঁ্যা ডেপুটিদের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে আছেন।

এতিয়েন চেঁচিয়ে বলল, মেরে ফেলা হলে হবে। এই রকম গোঁয়ার লোকদের সর্বনাশ হওয়া উচিত।

কিন্তু মনে মনে সে-ও একটু ভয় পেয়েছিল এমনিতে সে বেশ ঠাণ্ডা মাথার মানুষ, চট করে এরকম কিছু করার পক্ষপাতীও নয় কিন্তু তার নিজের অহংকারেও আঘাত লেগেছে কারণ, দলের লোক এখন আর তার আয়ত্তে নেই। সবাই নিজেদের মর্জিমাফিক এদিক ওদিক হুড়োহুড়ি করছে ঠিক এই ভাবে সব কিছু হবে, তা এতিয়েন মোটেই চায়নি। সে প্রাণপণ চেষ্টা করছিল অবস্থা আয়ত্তে আনতে। বারবার বোঝাতে চেষ্টা করছিল এ ভাবে ঝোঁকের মাথায় কিছু করে বসলে শত্রুপক্ষেরই সুবিধে হবে।

মা রুলে খনখনে গলায় বলল, বয়লার! বয়লার! চুল্লীগুলো নষ্ট করে দাও। আগুন নিভিয়ে দাও।

লেভাক হাতে একটা লম্বা উকো তুলে নিয়ে তলোয়ারের মতো ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, তার কেটে দাও, তার কেটে দাও সব।

ব্যস। সকলে যেন খেপে উঠল। একমাত্র এতিয়েন আর মাহ্যু প্রতিবাদ করছিল। চেষ্টা করছিল সবাইকে থামাতে শেষ পর্যন্ত চিৎকার চেঁচামেচির মধ্যে অনেক কষ্টে এতিয়েন নিজের গলা চড়ালো।

—তোমরা কিন্তু ভুলে যাচ্ছ খাদে মানুষ আছে।

সকলে আরও খেপে উঠল। চারদিক থেকে বলতে লাগল, তাহলে তো আরও ভালো হবে। নেমকহারাম, চামার সব! পয়সার লোভে খাদে নেমেছে। সবসুদ্ধ মেরে ফেলব। কাউকে ওপরে উঠতে হচ্ছে না। ও হো, ভেতরে তো আবার মইয়ের বন্দোবস্ত আছে।

মজুররা সবাই এক বিধ্বংসী নেশায় মেতে উঠল। এতিয়েন বুঝতে পারল এই উত্তেজনার দাবানল আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। শেষবারের মতো চেষ্টা করল খাঁচাগুলোকে তার কাটবার আগেই ওপরে তুলতে যাতে ওগুলো ছিঁড়ে না পড়ে। তাহলে ভেতরের মানুষগুলো সব ভারী খাঁচার নীচে চাপা পড়ে মরবে। অবশ্য বেগতিক বুঝে খাঁচার চালক আগেই চম্পট দিয়েছে। এতিয়েন একাই লিভার ঠেলতে লাগল। লেভাকের সঙ্গে আরও দু'জন তাকে সাহায্য করতে লাগল। সঙ্গে খাঁচাগুলো নিরাপদ অবস্থায় আনা হয়েছে কি হয়নি, তার কাটার চড়চড় শব্দ শোনা

গেল। সবাই চুপ। সমস্ত খনিতে মৃত্যুর নিস্তব্ধতা। মায়্যু এক ধরনের পৈশাচিক উল্লাস অনুভব করছিল—ব্যস্, আর কাউকে খনিতে নেমে কাজ করতে হবে না।

মা ক্রলে লকার-রুমের দিকে এগিয়ে গেল চিৎকার করতে করতে, বয়লারগুলো আগে শেষ কর।

তার পিছু পিছু মেয়েরা। মায়্যুর বউ স্বামীর দেখাদেখি মেয়েদের বোঝাতে চেষ্টা করছিল, এভাবে সব কিছু নষ্ট করে ফেলাটা ঠিক নয়। সকলের মধ্যে তারই মাথা সবচেয়ে বেশী ঠাণ্ডা। জনতার সম্পত্তি নষ্ট না করে ভদ্রভাবেও তো দাবীদাওয়া আদায় করা যায়। সে ওদের নিরস্ত করতে চেষ্টা করল প্রাণপণে। খনির সম্পত্তি আসলে মজুরেরই সম্পত্তি। নষ্ট করলে তাদের নিজেদেরই ক্ষতি। কিন্তু কে শোনে কার কথা। মেয়েদের পিছু পিছু সেও এসে পৌঁছল বয়লারের ঘরে। সে ঢোকবার আগেই মেযেরা, চুল্লীতে যারা কয়লা চালে—তাদের দু'জনকে হটিয়ে দিয়েছে। আর মা ক্রলে বড় বেলচা নিযে একটা চুল্লীর মস্ত পেটটার ভেতর থেকে রাশি রাশি জলন্ত কয়লার টুকরোগুলো বের করে চারদিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে। ইটের গাঁথনির ওপর ওগুলো পড়ে ধোঁযা বেরোতে লাগল গলগল করে। পাঁচটা বয়লারের জন্ত দশটা চুল্লী। সব মেযেরাই প্রায় হাত লাগালো। লেভাকের বউয়ের তো সে কি উৎসাহ! দু হাতে বেলচা ভর্তি করছে। আগুন লেগে যাবার ভয়ে মুকেত তার পরনের জামাটা উরু পর্যন্ত গুটিয়ে নিয়েছে। আগুনের গনগনে আঁচে প্রত্যেকের চোখ মুখ রাঙা, দরদর করে ঘাম ঝরছে। অসহ্, অসহ্ গরম। গা ঝলসে যাচ্ছে। জলন্ত কয়লার স্তূপ প্রায় আকাশ ছুঁই ছুঁই—শেষে ছাদ ফাটতে শুরু করল ওই প্রচণ্ড তাপে।

মায়্যু-গিন্নী আর থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠল, ঢের হয়েছে, এবার ক্ষান্ত দাও তোমরা! স্টোর রুমে তো আগুন ধরে গেছে!

মা ক্রলে উৎফুল্ল গলায় বলল, হ্যাঁ এইবার বেশ হয়েছে! উচিত শিক্ষা হয়েছে। আমি তো বলেইছিলাম, আমার স্বামীর মৃত্যুর বদলা নেব।

এমনি সময়ে জঁলাঁ্যা তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠল, ত্যাখো ত্যাখো, আমি কেমন আগুন নিভিয়ে দিই!

অত ভীড়ের মধ্যে সে লাফাতে লাগল, নাচতে শুরু করল। তারপর হঠাৎ গরম বাষ্প (স্টীম) বেরোবার নলের মুখটা খুলে দিল। বন্দুকের গোলার মতো প্রচণ্ড বেগে বাষ্প বেরিয়ে চারদিক ভরে গেল। এত জোরে হিসহিসে শব্দ হতে লাগল যেন কান ফেটে রক্ত ঝরবে। চারপাশের সবকিছু ঝাপসা হয়ে গেল। গনগনে লাল কয়লার টুকরোগুলো এখন ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে। কোনো মানুষকে আর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। শুধু সকলের মাথার ওপরে জঁলাঁ্যা, দুরন্ত খুশীতে উচ্ছল।

প্রায় পনেরো মিনিট এইরকম চলল। কয়েক বালতি জল ঢেলে অবস্থা আয়ত্তে আনা হল। আর আগুন ছড়িয়ে পড়বার [illegible] নেই। উত্তেজনা কিন্তু একটুও কমেনি। [illegible]েই প্রচণ্ড বেগে উঠেছে। ছেলেদের হাতে হাতুড়ি, মেয়েরা বড় বড় লো হার

ভাঙা নিয়েছে—সব কিছু নষ্ট করে দাও। প্রতিশোধ নিতে হবে! ধ্বংসের নেশায় প্রত্যেকে উন্মাদ।

একজনের মুখে খবর পেয়ে দৌড়ে এল এতিয়েন। তার সঙ্গে মাহ্যু। কিন্তু কে শোনে কার কথা? সবাই খেপে গেছে। এতিয়েন সবাইকে শান্ত করবার চেষ্টা করছিল। তার কাটা হয়ে গেছে, আগুন নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে, শূন্য বয়লার—কাজ তো এমনিতেও বন্ধ হয়ে যাবে। অর্থাৎ উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল।

হঠাৎ এস্কেপ শ্যাফ্‌ট (খনির বাইরে বেরোবার প্রধান পথ বন্ধ হযে গেলে এই পথে ভেতরের মজুররা বেরিয়ে আসছিল) থেকে লোকজনের সাড়া পাওযা গেল।

জনতা আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল।

—ওই, ওই যে, নেমকহারাম, কুৎসিত বিশ্বাসঘাতকগুলো। ওদের শেষ করে দাও।

জঁা-বার খনির মজুররা একে একে বেরিয়ে আসছে। সূর্যের আলোয ধাঁধিয়ে যাচ্ছে তাদের চোখ। বাইরে এসেই তারা দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করছে।

—ধরো ওদের! মেরে তক্তা বানিয়ে দাও!

ব্যস্‌। পাঁচশো মজুর সমস্ত জাযগাটা ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়ল। মাছি গলে যাবারও ফাঁক নেই। একজন করে মজুর বেরোচ্ছে, আর ঠাট্টা, বিদ্রূপ, ইয়ার্কি ছড়িয়ে পড়ছে। আস্তে আস্তে অশ্লীলতা, নোংরামি বাড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত কদর্য ইঙ্গিত ছাপিয়ে নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত শুরু হল। জঁা-বার খনির মজুররা ভয়ে, অপমানে কাঁপতে কাঁপতে তাড়া খাওয়া জন্তুর মতো এগোতে লাগল। প্রাণ নিয়ে বেরোতে পেরেছে, এই তাদের কাছে যথেষ্ট।

এতিয়েন বলল, ওঃ! ক'টা আছে আর ভেতরে?

সত্যি, একের পর এক মানুষ বেরিয়েই আসছে। তার মানে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মজুর ওপরওয়ালার চোখরাঙানিতে ভয় পেয়ে খাদে নেমেছিল, এ কথা ঠিক নয়? তারা জঙ্গলে সকলের সামনে বিদ্রোহের প্রতিজ্ঞা, লড়াই চালিয়ে যাবার শপথ নিয়েছিল। সবই তবে মিথ্যে? প্রায় সব ক'জন মজুরই কাজে যোগ দিয়েছে দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ শাভালকে দেখে দৌড়ে গেল এতিয়েন।

—বিশ্বাসঘাতক কোথাকার! তুমিই যত নষ্টের গোড়া!

চারদিক থেকে বিদ্রূপ আর ধিক্কার ধ্বনি ভেসে এল। সবাই শাভালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। কেন সে শুধু শুধু সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিযেছিল? মাত্র চব্বিশ ঘণ্টাতেই তার এত পরিবর্তন?

—মেরে ফেল ওকে! আবার খাদে ফেলে দাও!

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে শাভাল মিনমিনে গলায় সাফাই গাইতে চেষ্টা করল। তাকে এক দাবড়ানি দিল এতিয়েন।

—ঢের হয়েছে! তুমি তো আমাদের সাহায্য করবে বলেছিলে? নেমকহারাম কুত্তা, এখন আমাদের পথ দেখাও!

ইতিমধ্যে আহত ক্যাথরিনকে ধরাধরি করে সবাই বের করে এনেছে। সে সূর্যের আলোয় ভালো করে তাকাতে পারছে না। হাত কেটে রক্ত পড়ছে, পায়ে জোর নেই। ছোট্ট বুকটা শ্বাস নেবার জন্য আকুলিবিকুলি করছে।

মাহ্যুর বউ মেয়ের দিকে তেড়ে গেল।

—রাস্তার কুত্তী কোথাকার! তোর মা না খেয়ে মরছে, আর তুই কি না বিশ্বাসঘাতকতা করছিস তোর ওই শাভালের জন্য! সে তো ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মারবার গোঁসাই।

মাহ্যু বউয়ের হাত ধরে টেনে আনলো। কিন্তু সে নিজেও রেগে আগুন হয়ে আছে। ক্যাথরিনকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করল। দু'জনেই মেয়েকে দেখে রাগে অন্ধ হয়ে গেছে। পাগলের মতো শাপশাপান্ত করছে মেয়েকে। অন্য লোকের চিৎকার চেঁচামেচি ছাপিয়ে তাদের গলা শোনা যাচ্ছিল।

ক্যাথরিনকে দেখে ভেতরে ভেতরে ফুঁসে উঠছিল এতিয়েন। সে শাভালকে বলল, কি রে শুয়োরের বাচ্চা, আমাদের সঙ্গে অন্য খনিতে যাবি, মদত দিবি কিনা বল।

কোনোরকমে জামাকাপড় গায়ে গলিয়ে নিল শাভাল। তাকে প্রায় টানতে টানতে অন্যরা নিয়ে যাচ্ছিল। ক্যাথরিনও পাগলের মতো নিজের জখম হওয়া পা দুটো হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে শাভালের পিছু পিছু রওনা দিল। ওরা যদি ওকে মেরে ফেলে?

জাঁ-বার কয়লাখনি দু মিনিটের মধ্যে খালি হয়ে গেল। জাঁল্যাঁ এর মধ্যে মাটি থেকে পাহারাদারের একটা বাঁশি কুড়িয়ে পেয়েছে। তাতে জোরে জোরে ফুঁ দিতে লাগল, যেন দিনের শেষে গরু ছাগল চরিয়ে বাড়ি ফিরছে। মেয়েরাও পুরুষদের পিছু নিল। আস্তে আস্তে চারদিক থেকে অন্যান্য মজুররাও আসছে। প্রায় হাজারের ওপর মানুষ জড়ো হয়েছে। বন্যার মতো দুর্বার, উদ্দাম গতিতে তারা এগিয়ে চলল।

—যন্ত্রপাতি ভেঙে দাও! সব খনি বন্ধ করে দাও! বিশ্বাসঘাতকদের পুড়িয়ে মারো!

জাঁ-বারে মৃত্যুর নিস্তব্ধতা। একজন মানুষেরও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। দ্যন্যল্যাঁ ঘর থেকে বেরোলেন। খনিটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। চূড়ান্ত ক্ষতি হয়ে গেছে। দুঃখে, ক্ষোভে, অপমানে তাঁর শরীর মন যেন জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছিল। তারগুলো কেটে দিয়ে গেছে ওরা। সব কিছু ভেঙেচুরে নষ্ট করে দিয়ে গেছে। ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া ধাতব যন্ত্রগুলো ছুঁলেন তিনি। কেঁপে উঠল তাঁর আঙুলগুলো যেন কোনো মৃত লোককে ছুঁয়ে ফেলেছেন। বয়লার, নিভন্ত কার্নেস সব ভিজে একশা হয়ে গেছে। বয়লারের পেটে লাথি মারলেন তিনি। শূন্য—ফাঁপা আওয়াজ হল। যদি বা চেষ্টাচরিত্র করে যন্ত্রপাতি মেরামতও করেন, খনিতে কাজ করবার লোক পাবেন কোথায়? আর পনেরোদিন ধর্মঘট চললে তাঁকে পথে বসতে হবে। আর সেই চিন্তাটা মাথায় আসতেই অদ্ভুত শান্ত হয়ে গেলেন তিনি। মজুর

এই সব দুর্বৃত্তদের প্রতি কোনো রাগ, অনুযোগ নেই আর—তিনি যেন ওদের মানসিক বিপর্যয়টা নিজে আজ বিপদের মুখোমুখি হয়ে উপলব্ধি করতে পারছেন।

* * * *

মজুরদের পুরো দলটা সারবদ্ধভাবে এগোচ্ছিল। মাথার ওপর সূর্যের আলোর তেজ আবার খানিকটা কমে এসেছে। রাস্তা ছেড়ে মাঝে মাঝে বীটের ক্ষেতে নেমে পড়ছিল ছেলেবুড়ো সকলে।

অবস্থা এখন অনেকটা আয়ত্তে এনে ফেলেছে এতিয়েন। একবারও পথে কাউকে থামাতে দিচ্ছে না। চেঁচিয়ে হুকুম করছে, সবাই নির্বিবাদে তা মেনে নিচ্ছে। জঁলঁ্যা আগে আগে ছুটছিল—তার ঠোঁটের ফাঁকে বাঁশি। ইচ্ছেমতো হরেকরকম সুর তুলছিল সে। তার পেছনে একটু বয়স্কা মেয়েরা। কারুর কারুর হাতে লাঠিও আছে। উদভ্রান্তের মতো চোখমুখ মাহ্যুর বউয়ের—যেন শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সেই অনাগত সফল স্বপ্নের জগতের দিকে। মা ব্রুলে; লেভাকের বউ, মুকেত—সকলে তালে তালে পা ফেলছিল, ঠিক যেন যুদ্ধযাত্রা। মেয়েদের পর লোহার ডাণ্ডা হাতে নিয়ে পুরুষদের দীর্ঘ সারি—শুধু লেভাকের হাতে একটা কুঠার, তার ইস্পাতের ফলাটা সূর্যের আলো পড়ে ঝিকিয়ে উঠছে। মাঝখানে এতিয়েন, নিজের ঠিক চোখের সামনে শাভালকে রেখে সে এগোচ্ছে। মাহ্যু পেছনে। মাঝে মাঝে বিরক্তি আর তিরস্কার মাখানো চোখে তাকাচ্ছে মেয়ে ক্যাথরিনের দিকে। এতগুলো পুরুষ-মানুষের দলে সেই ই একমাত্র সবচেয়ে কমবয়েসী মেয়ে। আর আক্কেলও বলিহারি! পাছে কেউ প্রেমিকের ক্ষতি করে, তাই পেছন পেছন একেবারে ফেউয়ের মতো লেগে আছে। লজ্জাসরমের বালাইও নেই। কারও মাথায় টুপি নেই, উস্কোখুস্কো চুল—জঁলঁ্যার বাঁশির সুর দূর থেকে শুনলে মনে হয় একপাল গরু ছাগলকে খামারের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

হঠাৎ কেউ কেউ চেঁচিয়ে উঠল—রুটি চাই, রুটি!

সূর্য প্রায় মাঝ আকাশে। গত ছ' সপ্তাহ যাবৎ ধর্মঘট চলছে। ধীরে ধীরে অসন্তোষের তীব্রতা বেড়েছে, সেই সঙ্গে খিদের জ্বালাও। খালি পেটে কি আর বিপ্লব হয়? সেই কখন মুকেতের দেওয়া বাদাম খাওয়া হয়েছে—পেটে যেন ছুঁচোয় ডন মারছে এখন। খিদের জ্বালায় অস্থির সকলে। তাদের ক্ষোভ, হতাশা তীব্রতর হয়ে উঠল এক নিমেষে।

—চলো খনিতে যাই। সব জায়গায় কাজ বন্ধ করে দেব। রুটি চাই আমাদের।

এতিয়েন এখানে আসবার আগে বাড়ি থেকে কিছু খেয়েও আসেনি। শরীরে তার এক অদ্ভুত অস্বস্তি হচ্ছিল। সমস্ত বুক পিঠ বেয়ে কেমন শিরশিরে যন্ত্রণার অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ছিল ধীরে ধীরে। মুখে কিছু বলছিল না, কোনো অভিযোগ, অনুযোগ নয়। মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে জিনের বোতলে চুমুক দিচ্ছিল; যাতে কোনোরকমে টালটামাল পায়ে পথটুকু পাড়ি দিতে পারে। তার গাল মুখ লাল হয়ে উঠছে ক্রমশ। শরীরে যেন আগুন জ্বলছে। চোখ দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে। কিন্তু

তবুও ধৈর্যচ্যুতি হয়নি—সে বুঝতে পারছে যা কিছু করবার তা ঠাণ্ডা মাথায় করতে হবে।

জোয়াজেল-এর রাস্তার ভঁদামের একজন মজুর এদের সঙ্গে যোগ দিল। সেও চায় তার মনিব শায়েস্তা হোক। সবাইকে সে ভাড়িয়ে দিল ডানদিকের পথটা ধরবার জন্য।

—গাস্ত-মারিতে চলো। পাম্প বন্ধ করে দেব। জলের তোড়ে জঁা-বার খনি ভেসে যাবে একেবারে!

ব্যস্! জনতা খেপে উঠল আরও। এতিয়েন এসবের বিপক্ষে। মালিকপক্ষের ওপর ক্ষোভ, কিন্তু তার জন্য যন্ত্রপাতি নষ্ট করে লাভ কি? সে নিজেও যথেষ্ট ক্ষুব্ধ, তবু একজন ন্যায়নিষ্ঠ শ্রমিক হিসেবে দামী দামী যন্ত্রপাতি এ ভাবে নষ্ট করে দিতে তার বিবেকে বাধছিল। মাহ্যুরও তাই মত। কিন্তু ভঁদামের ওই মজুরটার চিৎকার থামায় কার সাধ্য।

এতিয়েন জোরে চেঁচিয়ে উঠল।

—চলো আমরা মিহ্রুতে যাই। ওখানে অনেকে কাজ করছে। কাজ বন্ধ করতে হবে। মিহ্রুতে চলো, মিহ্রু!

অতিকষ্টে সে জনতার গতিপথ পরিবর্তন করল। তারা সকলে বাঁ দিকের রাস্তা ধরল। সকলের আগে এবারও লাফাতে লাফাতে চলল জঁলাঁ। খানিকক্ষণের জন্য হয়তো এতিয়েন পারল গাস্ত-মারিকে বাঁচাতে।

চার কিলোমিটার পথ চলতে সময় লাগল আধ ঘণ্টা। খালের ধার দিয়ে উঁচু নীচু রাস্তা।

খাদের কাছে পৌঁছে তারা দেখল ছোট্ট নীচু পায়ে চলার সাঁকোটার ওপর একজন ডেপুটি দাঁড়িয়ে। বোধহয় তাদেরই অপেক্ষায়।

সবাই চেনে মঁসুর এই প্রবীণ ডেপুটি—কোয়াঁত্যুকে। অল্পবয়েসীরা সবাই তাঁকে সম্মান দেয়। এঁর বয়স সত্তরের কোঠায়। ধবধবে সাদা চামড়া আর চুল, চমৎকার স্বাস্থ্য।

—এই যে, নচ্ছার বোম্বেটেরা! এখানে কি মতলবে নাক গলানো হয়েছে?

চমকে গিয়ে সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। কোয়াঁত্যু তো ঠিক মালিকের পর্যায়ে পড়েন না—তিনিও একসময় সাধারণ মজুরই ছিলেন। আজ অবশ্য পদোন্নতি হয়েছে।

এতিয়েন বলল, খাদে যে সব লোক কাজ করছে, তাদের সবাইকে বাইরে আসতে বলুন।

কোয়াঁত্যু বললেন, হ্যাঁ, কাজ করছে বটে তবে মাত্র ডজন ছয়েক লোক। বাকিরা তোমাদের ভয়ে হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে বসে আছে। কিন্তু আমিও স্পষ্ট করে তোমাদের বলে দিচ্ছি যে যারা কাজ করছে তাদের মধ্যে একজনও কাজ ছেড়ে ওপরে উঠে আসবে না। তাদের জোর করতে গেলে আমাকে পথ থেকে সরিয়ে তবেই ভেতরে যেতে পারবে।

ভীড়ের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল। অনেক মেয়ে পুরুষ তো তখনই ছিটকে বেরিয়ে এসে কোয়াঁত্যুর মুখোমুখি হতে চায়। ইতিমধ্যে সাঁকো থেকে নেমে এসে কোয়াঁত্যু দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

মাথ্যু তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করল।

—আপনি একটু ঠাণ্ডা মাথায় আমাদের বক্তব্যটা শুনুন। ধর্মঘটটা সমস্ত মজুরদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে গেলে তো সব জায়গাতেই কাজ বন্ধ করতে হবে। সেক্ষেত্রে সকলে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা না করলে চলবে কেন?

এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন বুড়ো অফিসার। এত সব কূটকচালি তাঁর মাথায় ঢোকে না।

বললেন, হয়তো এটা তোমাদের অধিকারের আওতায় পড়ে, আমি ঠিক বলতে পারি না। কিন্তু আমার ওপর এই রকমই নির্দেশ দেওয়া আছে। নিজেই তাই হাজির আছি এখানে। রাত তিনটের সময় খনিতে সবাই কাজে নেমেছে এবং জেনে রাখো, বেলা তিনটের আগে তারা ওপরে উঠছে না।

কোয়াঁত্যুর শেষের কথাগুলো টিটকিরি আর ঠাট্টার তোড়ে ডুবে গেল। এবার সবাই রেগে গেছে। মেয়েরা চিৎকার করছে, অভিসম্পাত দিচ্ছে। তাদের গরম নিঃশ্বাসের ঝাপ্‌টা এসে লাগছে কোয়াঁত্যুর চোখেমুখে। কিন্তু এক মুখ সাদা দাড়ি আর এক মাথা সাদা শনের নুড়ির মতো চুল নিয়ে বুড়ো কোয়াঁত্যু দাঁড়িয়ে রইলেন এক অদ্ভুত ঋজুভঙ্গিতে। তাঁর মাথা উঁচু। গমগমে সাহসী গলায় স্পষ্ট ভাষায় বলে চললেন, ভগবানের নামে শপথ করছি, প্রাণ থাকতে তোমাদের আমি খনিতে ঢুকতে দেব না। সূর্যের আলো যেমন সত্যি, আমার মনের জোর তেমনই। খাঁচার তার কাটতে গেলে আমার মরা শরীরের ওপর দিয়ে পা ফেলে হেঁটে যাও তোমরা··· আমাকে ধাক্কা মারবার চেষ্টা কোরো না, তাহলে সবার আগে আমিই খাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরব!

সমস্ত মজুর নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে।

—কি হল? এমন কোনো শুয়োরের বাচ্চা এখানে আছে কি যার কাছে আমার কথাগুলো স্পষ্ট হচ্ছে না? তোমাদের মতো আমিও একজন সাধারণ মজুর। আমার কাছে ওপরওয়ালার যে নির্দেশ আছে, বুকের রক্ত দিয়ে তা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব!

কোয়াঁত্যু চুপ করলেন। এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা চারদিকে দানা বেঁধে উঠছিল। তাঁর জীবনের পঞ্চাশটা বছর কেটেছে মাটির নীচে। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ। সমস্ত মজুররা তাঁর কথায় বিচলিত হয়েছে। তাদের পা আর এগোচ্ছে না। তাঁর কথাগুলো মুহুর্মুহু অনুরণিত হচ্ছে সকলের কানে: সত্যিই তো, কম দিন ধরে আমরা মালিকের নুন খাইনি? একে অন্যের জন্য বিপদের দিনে ঝাঁপিয়ে পড়বার কথা ভেবেছি···

কোয়াঁত্যু আবার বললেন, দরকার হলে আমি নিজে জান দিয়ে দেব!

সমস্ত মজুররা ধীর পায়ে পিছু হটল। [illegible]

—ব্যাদলেন-এ চলো! ক্রেভক্যর-এ চলো! সব জায়গায় কাজ বন্ধ করে দিতে হবে।

এই গণ্ডগোল আর দ্বিধাদ্বন্দ্বের ফাঁকে তাল বুঝে পালাবার চেষ্টা করছিল শাভাল। এতিয়েন সময়মতো মতলব বুঝে ফেলে ঠিক তার হাত চেপে ধরেছে।

—খবরদার শাভাল, একটু এদিক ওদিক করবার চেষ্টা করলে পুঁতে ফেলব একেবারে!

শাভাল প্রাণপণে নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করছিল।

—কি আশ্চর্য! এ কি মগের মুলুক পেয়েছ নাকি? আমাদের দেশের প্রত্যেক মানুষ স্বাধীন। কি করে নিজের মতামত তুমি অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দাও? এক ঘণ্টা ধরে টানা হাঁটছি, হাতে পায়ে ব্যথা হয়ে গেল। আমি মুখে চোখে জল দেব। আমায় যেতে দাও!

সত্যিই, ঘামে কয়লার গুঁড়োয় শাভালের সমস্ত গা চটচট করছে।

এতিয়েন জবাব দিল, ভালো চাও তো জোর কদমে এগিয়ে চলো! সবাই কষ্ট করছে, তুমি একলা নও।

সকলে জোর পায়ে হাঁটতে লাগল। হঠাৎ পেছনে ঘুরতেই এতিয়েনের চোখ পড়ল ক্যাথরিনের দিকে।—আহা রে, মেয়েটা এখনও সঙ্গ ছাড়েনি। কি দুঃখী, জামাকাপড়গুলো কাদামাখা, ঠকঠক করে কাঁপছে ভিজে কোট গায়ে দিয়ে। হয়তো হাঁপিয়ে পড়েছে, না জানি কত কষ্ট হচ্ছে।

এতিয়েনের মনটা নরম হয়ে পড়ল।

—ক্যাথরিন, তুমি বরং বাড়ি ফিরে যাও।

ক্যাথরিন কথাটা শুনতে পেল কি? সে ব্যথাতুর চোখে তাকালো এতিয়েনের দিকে। কিন্তু থামল না।

এতিয়েন কি বোকা! ভেবেছিল ক্যাথরিন শাভালকে ছেড়ে চলে আসবে। শাভাল ভালোমানুষ নয় ক্যাথরিন জানে। হয়তো বা মেজাজ খারাপ থাকলে তাকে দু-চার ঘা দেয়ও তবু সে তো ক্যাথরিনের প্রেমিক। ক্যাথরিন তাকে ভালোবাসে। তার শরীর মন সব কিছুর দখল নিয়েছে শাভাল—আজ তার ভালোবাসার মানুষটার বিরুদ্ধে সবাই উঠে পড়ে লেগেছে। কেন সকলের এত গাত্রদাহ? ক্ষমতা থাকলে ক্যাথরিন একাই সমস্ত বিরুদ্ধতার মোকাবিলা করত। তার ভালোবাসায় আঘাত লেগেছে, আঘাত লেগেছে অহংকারে।

মায়্যু বলল, তুই চলে যা না!

ক্যাথরিনের চলার গতি একটু শ্লথ হল। সে কাঁপছে। দু চোখ জলে ভরা, তবুও আবার পা চালালো। এবার আর তাকে কেউ কোনো কথা বলল না।

জোয়াজেল রোড পেরিয়ে গেল সকলে। তারপর ক্রঁ রোড ছাড়িয়ে কুন্তির দিকে [illegible]গোল। দূরে আকাশের গায়ে লম্বা লম্বা চিমনির মাথা, কাঠের চালাঘর রাস্তার [illegible] আকার। এরপর দু'ধারে কয়লাখনির মজুরদের

কলোনি—একশো আশি আর একশো ছিয়াত্তর নম্বর। সমস্ত বাড়ি থেকে দলে দলে মেয়ে, পুরুষ, বাচ্চারা বেরিয়ে এসে এদের সঙ্গী হল। ম্যাদলেন-এ যখন সকলে পৌঁছল তখন মজুররা সংখ্যায় প্রায় পনেরোশো ছাপিয়ে গেছে। ঢালু রাস্তা, জোর কদমে এগোল সবাই। তাদের সম্মিলিত গলার আওয়াজে সরব হল এতক্ষণের শান্ত আবহাওয়া।

বেলা প্রায় দুটো বাজে। আগে থেকেই ডেপুটিরা খবর পেয়ে গিয়েছিল—তারা তাড়াতাড়ি খাঁচায় করে মজুরদের ওপরে তুলতে ব্যস্ত। এরা যখন এসে পৌঁছল, মজুররা প্রায় সবাই ততক্ষণে ওপরে উঠে এসেছে। জনা কুড়ি মাত্র প্রাণী, একেবারে শেষে যারা উঠে আসছিল তারা বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ওপর পাথরের টুকরো এসে পড়তে লাগল বৃষ্টির মতো। সেই সঙ্গে অকথ্য গালিগালাজ। তবে এই পর্যন্তই। খনির বয়লার বা অন্য কোনো যন্ত্রপাতির কোনো ক্ষতি করা হল না।

এরপর ক্রেভকার। মাত্র পাঁচশো মিটার দূরে। এখানে মজুররা ঠিক যখন খাদ থেকে উঠছে, সেই সময় এতিয়েন দলবল নিয়ে হাজির হল। একটা মেয়ে মজুরকে ধরে এতিয়েনের দলের মেয়েরা তার স্কার্ট খুলে নিল। এই অশ্লীল দৃশ্য দেখে হৈ হৈ করে উঠল পুরুষেরা। ছোট ছোট ছেলেগুলোকে ধরে আচ্ছা করে ঝাঁকুনি দিল সকলে। ক্রেভক্যর-এর মজুরদের শরীরে মার খেয়ে কালশিটে পড়ে গেল। রক্ত পড়তে লাগল নাক দিয়ে। সবাই যেন উন্মাদ হয়ে গেছে, হিংস্র জন্তুর মতো আচরণ করছে। প্রতিশোধ চাই! প্রতিশোধ! কানফাটানো চিৎকার করছিল সকলে: 'সমস্ত বিশ্বাসঘাতকদের রক্ত চাই! মজুরী বাড়াতে হবে! খাবার চাই! অত্যাচারী শাসকদের কালো হাত ভেঙে দাও!'

এখানকার খাদের তারগুলো (কেব্‌ল) বিক্ষুব্ধ মজুরদের হাত থেকে রেহাই পেল না। একটা বয়লার নষ্ট হল। সমস্ত ফার্নেসে জল ঢেলে দেওয়া হল।

সবাই এবার সেন্ট-টমাসে যেতে চায়। এখন পর্যন্ত ওই একটা জায়গায় ধর্মঘটের কোনো আঁচ লাগেনি। অন্তত সাতশো লোক নির্ঘাত কাজে নেমেছে, এটা তো সহ্য করা যায় না! সব ক'টাকে টেনে বাইরে আনতে হবে। কিন্তু ওখানে নাকি সান্ত্রী পাহারা দিচ্ছে। গুলিগোলা চলতে পারে।

ব্যস্! এই গুজবটা সমস্ত জনতার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। সবাই এবার ভয় পেল। সত্যিই তো! সকালের সেই সেনাবাহিনীকে এতক্ষণ পথেঘাটে কোথাও তো চোখে পড়ল না। নিশ্চয়ই তবে ওখানেই ওত পেতে বসে আছে।

কেউ কিছু বোঝবার আগেই কে যেন বলে উঠল, তার চেয়ে লা ভিক্তোয়ার-এ চলো।

ওঃ, তাহলে ওখানে কোনো সেপাই সান্ত্রী নেই! সঠিক যদিও বলা যাচ্ছে না তবু মনে মনে সকলেই নিশ্চিন্ত হল। আবার পিছু ফিরে ডানদিকে বেঁকে গেল মজুররা। 'ব্যুম'-এর দিকে হাঁটা দিল। মাঠ পেরিয়ে জোয়াজেল রোড। এখানে

লাইন টপকাতে হল। সবাই মঁসুর দিকে চলেছে। সামনে বিস্তীর্ণ বীটের ক্ষেত আর অনেক দূরে দূরে লোকবসতির আভাস।

এবার পাড়ি দিতে হবে পাঁচ কিলোমিটার পথ কিন্তু প্রত্যেকের মনে এত উৎসাহ উদ্দীপনা যে ক্লান্তি অনুভব করছে না কেউ। সেই কখন থেকে হাঁটছে, পা ক্ষতবিক্ষত কিন্তু তাতে কি! আস্তে আস্তে মানুষের সংখ্যা বাড়তেই লাগল। প্রতি গ্রাম থেকে কিছু কিছু লোকএসে যোগ দিচ্ছে এদের সঙ্গে। খালের ওপর 'ম্যাগাশ্' সেতু পেরিয়ে যখন লা ভিক্তোয়ার-এ এসে পৌছল, লোকসংখ্যা তখন দু হাজার ছাড়িয়েছে। কিন্তু বেলা তিনটে বেজে গেছে, লা ভিক্তোয়ার খনির মজুররা সকলেই ওপরে উঠে এসেছে। এতিয়েনের দল হাতেনাতে ধরতে পারল না কাউকে। শুধু যারা বিকেলের শিফটে কাজে এসেছিল তাদের ওপর কটূক্তি বর্ষণ করেই ক্ষান্ত হতে হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত খনি তল্লাটা খালি হয়ে গেল। এতিয়েন আর তার সঙ্গী সাথীরা সফল হয়েছে কাজ বন্ধ করে দিতে। বছরের পর বছর ধরে অবচেতন মনে এই ক্ষমতাটুকুই তো তারা কামনা করেছিল!

হঠাৎ এতিয়েনের চোখে পড়ল কয়েকজন মজুর একটা কয়লার গাড়ি ভর্তি করছে।

—অ্যাই, কি হচ্ছেটা কি?

এতিয়েনের চোখের ইঙ্গিতে একশো মজুর ছুটে গেল তাদের দিকে। সেই হতভাগা মজুরগুলো তো পালাতে পথ পায় না। এতিয়েনের লোকেরা ঘোড়াগুলোর লাগাম খুলে নিয়ে গাড়ি অচল করে দিল।

লেভাক পাগলের মতো কুড়ুলের আঘাতে পায়ে চলার সাঁকোটা ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছিল। হতোদ্যম হয়ে শেষে যে রেলরাস্তাটা খনি এলাকার এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত গেছে সেটা নষ্ট করে দেবার কাজে হাত লাগালো। লেভাকের দেখাদেখি অন্যরাও পাগল হয়ে উঠেছে। মায়্যু লোহার চেয়ারগুলো ভাঙছে। এর মধ্যে মা ব্রুলে মেয়েদের পুরো দলটা নিয়ে হানা দিয়েছে বাতি রাখবার ঘরে। লাঠির ঘায়ে খান খান হয়ে ভেঙে যাচ্ছে শয়ে শয়ে বাতি। মায়্যুর বউকেও ধ্বংসের নেশায় পেয়ে বসেছে। সবার গা ভিজে গেছে তেলে। খিলখিল করে হাসছে মুকেত।

—ইস্, হাত পা কি নোংরা হয়েছে ভাখো!

তার পিঠের ওপর একটা তেলভরা বাতি উপুড় করে দিল জঁল্যা।

কিন্তু শুধু প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে তো পেট ভরে না। খানিক বাদেই সবাই খেপে উঠল।

—রুটি চাই! রুটি!

একজন অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি লা ভিক্তোয়ারে একটা খাবারের দোকান চালাতেন। অবস্থা সুবিধের নয় দেখে তিনি আগেভাগেই চম্পট দিয়েছিলেন। দরজায় পলকা একটা ছিল লাগানো ছিল। ক্ষুধার্ত, বিক্ষুব্ধ জনতার চাপ সহ্য করতে না পেরে তা ভেঙে [illegible] কিন্তু কোথাও রুটি নেই। ছোটো বড় কাঁচা মাংসের টুকরো

আর এক বস্তা আলু। নোংরা বোতলে জিন ছিল খানিকটা। চোঁ চোঁ করে তাই খানিকটা গলায় ঢাললো মজুররা। এতিয়েন আবার তার ফ্লাস্কটা ভরে নিয়েছে। এবার সে-ও খিদের জ্বালা অনুভব করতে পারছে। হিংস্র নেকড়ের মতো খিদের অনুভূতিটা কামড় বসাচ্ছে তার সর্বাঙ্গে। এমন সময় খেয়াল হল শাভাল ওখানে নেই। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ পেয়ে চারদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজতে শুরু করল সকলে। একটা কাঠের স্তূপের পেছনে শাভাল আর ক্যাথরিনকে পাওয়া গেল।

রাগে গরগর করে উঠল এতিয়েন।

—নোংরা শুয়োর কোথাকার! তুমি একটা নরকের কীটেরও অধম! ভয়ে গর্তে সেঁধিয়েছ? তুমিই তো সেদিন জঙ্গলে আমাদের বলেছিলে পাম্প বন্ধ করে দেবে, এই করবে, তাই করবে! এখন আবার নিজের আখের গোছানোর ধান্দা, না? ঠিক আছে! ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি তো! গাস্তঁ-মারিতে চলো। তোমাকে দিয়েই আমি ওখানকার পাম্প নষ্ট করাবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভগবানের দিব্যি!

সকাল থেকে জিন ছাড়া পেটে আর কিছুই পড়েনি। এতিয়েনের এখন প্রায় মাতাল অবস্থা। কে বলবে খানিক আগে সে-ই গাস্তঁ-মারির পাম্প নষ্ট করতে দেয়নি।

—গাস্তঁ-মারি চলো! গাস্তঁ-মারি!

সবাই লাফিয়ে এগিয়ে গেল। শাভাল একবার মিনমিন করে হাত মুখ ধোওয়ার কথা বলতে গিয়ে ভীষণ দাবড়ানি খেল। সবাই তাকে ঠেলে দিয়ে এগোতে লাগল। শাভালের পিছু পিছু হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটছিল ক্যাথরিন।

মায়ু এবার বিরক্ত হল।

—তুই এবার বাড়ি যা তো!

ক্যাথরিন বাবার দিকে একবার তাকালো মাত্র। তারপর আবার দৌড়তে শুরু করল।

আবার শুরু হল পথ চলা। বেলা চারটে বাজে। সূর্য প্রায় ঢলে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তে। বিশৃঙ্খল জনতার এলোমেলো ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছে।

লা পিয়োলেইনের পাশ দিয়ে এগোল তারা—মঁসুর রাস্তা ধরল এবার। গ্রেগোয়াররা খানিকক্ষণ আগে বেরিয়ে গেছেন, তাঁদের উকিলের সঙ্গে কথা বলতে। কাজ সেরে মঁসিয় এনবোর বাড়ি যাবেন সেসিলকে আনতে। সমস্ত বাড়িটা নিঝুম হয়ে আছে। জানলা দরজাগুলো পুবো বন্ধ। এই বাড়িটার চার দেওয়ালের মধ্যে কত-রকম দামী গরম খাবার, নরম বিছানা আর পার্থিব সুখগুলো বন্দী হয়ে আছে!

ক্ষুধার্ত, প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষগুলো কিন্তু চলার গতি কমালো না। তারা রাগী অসহায় ভঙ্গিতে বারবার দেখতে লাগল গ্রেগোয়ারদের বিশাল বাড়িটা।

—আমরা রুটি চাই! রুটি!

দুটো দৈত্যাকার গ্রেট ডেন কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল। বন্ধ জানলার খড়খড়িতে চোখ রেখে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল বাড়ির রাঁধুনি আর পরিচারিকা। এতগুলো লোক কি একই সঙ্গে পাগল হল নাকি? হঠাৎ একটা জানলার শার্সি

ভাঙলো ঝনঝন করে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মেলানি আর ওনোরিন—সর্বনাশ, শেষের দিন বোধ হয় ঘনিয়ে এসেছে। জানলার কাঁচ ভাঙাটা জ‍ঁল্যাঁর কীর্তি। সবাই আবার এগোতে লাগল! আস্তে আস্তে পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতে লাগল দূরে—সেই সঙ্গে ক্ষীণ হতে লাগল সোচ্চার চাহিদাটাও—রুটি চাই! রুটি!

গাস্তঁ-মারিতে সবাই যখন এসে পৌছল, লোকসংখ্যা তখন আড়াই হাজারের ওপর। বন্যার জলের মতো হুড়হুড় করে লোক আসছে। খানিক আগেই সশস্ত্র পুলিসবাহিনী এসেছিল এখানে। কয়েকজন কৃষক তাদের অন্য পথে পাঠিয়ে দিয়েছে ফলে খনি অঞ্চলটা একেবারে ফাঁকা। পনেরো মিনিটও লাগল না। গাস্তঁ-মারি ছারখার হয়ে গেল। বয়লার ভাঙলো, অফিস বাড়িগুলো মাটিতে মিশে গেল। চূড়ান্ত ভাঙচুর চলল কিন্তু আসলে সকলের লক্ষ্য পাম্পের দিকে। শুধুমাত্র সেটা অকেজো করে দেওয়াই নয়—মজুরদের কাছে যেন এটাই মালিকপক্ষের জীবন্ত প্রতি-নিধি—যার রক্তপান না করে শান্তি পাওয়া যাবে না।

এতিয়েন শাভালের হাতে একটা বিরাট হাতুড়ি ধরিয়ে দিল।

—নাও, প্রথম আঘাতটা তুমিই হানো। তুমিও তো আমাদের সঙ্গে শপথ নিয়েছিলে!

শাভাল ভয়ে গুটিয়ে গেল। তার হাত থেকে পড়ে গেল হাতুড়িটা। কিন্তু বাকি মজুররা তখন হাতের কাছে যা পেয়েছিল—হাতুড়ি, লাঠি, শাবল সব নিযে পাম্পটাকে মুহুর্মুহু আঘাত করছে। অনেকের লাঠি তো ভেঙেই গেল। একটা গাঁইতি সোজা লাগল পাম্পে—দুমড়ে মুচড়ে গেল লোহার চোঙটা। গব্ গব্ করে জল বেরিযে গেল। শেষ হয়ে গেল পাম্পটা এতগুলো মজুরের চোখের সামনে।

এতিয়েন কিন্তু শাভালকে ছাড়েনি। সবাই চেঁচিয়ে উঠল: ওই বিশ্বাস-ঘাতকটাকে শেষ করে দাও! শ্যাফ্‌টের মধ্যে ফেলে দাও!

ভয়ে শাভলের গলা দিয়ে কোনো আওযাজ বেরোচ্ছিল না। তা সত্ত্বেও সে গোঁয়াতুর্মি করে চলেছে—তার নাকি হাত মুখ ধোওয়া দরকার।

দীর্ঘদিন ধরে পাম্প থেকে অল্প অল্প জল বেরিয়ে একটা অগভীর ডোবার মতো তৈরী হয়েছিল। কি কনকনে ঠাণ্ডা জল! অনেক দিন ধরেই জল জমছে এখানটায়। ওপরে খানিকটা বরফ। মজুররা বরফ ভেঙে শাভালের মাথাটা জলের মধ্যে চেপে ধরল।

মা ক্রুদ্ধ বলল, যা যা, সাতার কাট্ এখন। কত হাত মুখ ধুবি, ধো। যদি না ধুতে চাস তোকে আমরা জলের মধ্যে চেপে ধরে রাখব। জল খা পেট পুরে, কুকুর বেড়ালের মতো চেটে চেটে!

সবাই শাভালকে চেপে ধরল। রাশি রাশি জল খেতে বাধ্য করল তাকে। একজন মেয়ে মজুর তার কান মুলে দিল। আরেকজন খানিকটা ঘোড়ার নাদি মাখিয়ে দিল সারা মুখে। সব জামা কাপড় ছিঁড়ে ফেলল ক্ষুব্ধ জনতা। প্রাণপণে পালাতে চেষ্টা করছিল শাভাল।

মায়ু তাকে ঠেলতে ঠেলতে ফেলে দিচ্ছে। মায়ুর বউ শাভালের এই নিগ্রহে খুশী হয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দিচ্ছে মজুরদের। আসলে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই তো গায়ের ঝাল মেটাতে চায়। মুকেত এমনিতে ঝুটঝামেলা পছন্দ করে না কিন্তু আজ সেও খেপে উঠেছে। শাভালকে অপদার্থ, নপুংসক বলে গালাগালি দিতে দিতে সে শাভালের প্যাণ্টটা খুলে দিল।

এতিয়েন নিরস্ত করল মুকেতকে।

—ঢের হয়েছে! সবাই মিলে এমন করার কোনো দরকার নেই। শাভাল, তুমি যদি তৈরী থাকো, এস অমরা দু'জন সামনাসামনি ব্যাপারটার ফয়সালা করে নিই।

এতিয়েনের হাত দুটো মুঠি করা। চোখ ধক ধক করে জ্বলছে—সমস্ত ইন্দ্রিয় জুড়ে মত্ত জিঘাংসা। রক্তপিপাসু মন উত্তাল হয়ে উঠেছে।

—কি শাভাল, তুমি কি তৈরী? আমাদের দু'জনের মধ্যে কাল থেকে একজনই বেঁচে থাকবে···হয় তুমি নয় তো আমি। ওকে একটা ছুরি দাও কেউ। আমি আমারটা নিয়েছি।

ক্যাথরিন প্রায় মূর্ছা যাচ্ছিল। ভয়ে আধমরা হয়ে তাকিয়ে থাকল এতিয়েনের দিকে। তার মনে পড়ল এতিয়েন একদিন কথায় কথায় বলেছিল, তার পথে অবাঞ্ছিত কেউ এসে পড়লে দরকার হলে তাকে খুন পর্যন্ত করতে পিছপা হবে না এতিয়েন। এখন এতিয়েনের চোখে মুখে সেই খুনের উল্লাস। গাদা গাদা মদ গিলে তার রক্তে আগুন লেগেছে। ক্যাথরিন হঠাৎ লাফিয়ে এতিয়েনের সামনে এসে দাঁড়ালো। দু-হাতে তার কান দুটো ধরে ঝাঁকিয়ে দিল। তারপর ভূতে পাওয়া মানুষের মতো বলতে লাগল: ভীতু, ভীতু তোমরা! সকলে ভীতু! এত করেও আশ মেটেনি? এখন ওকে খুন করতে চাও? অসহায় বলে? যখন দেখছ ও সোজা হয়ে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছে না?

সদর্পে বাবা, মা, এতিয়েন আর অন্য সকলের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, তোমরা সবাই কাপুরুষ! ওর সঙ্গে আমাকেও মেরে ফেল। শাভালের গায়ে একবার হাত দিয়ে ঢাখো, আমি কি কাণ্ডটা করি!

নিজের ছোট্ট পলকা শরীরটা দিয়ে শাভালকে আড়াল করে দাঁড়ালো—এত দিনের দুঃখ কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণা সব ভুলে গিয়ে। শাভাল তার প্রেমিক, শরীর মন সব কিছুর দাবীদার। তাকে বাঁচাতেই হবে। শাভালের অপমান মানে তারও অপমান।

ক্যাথরিন এতিয়েনকে আঘাত করেছিল। বিস্ময়ে, ক্ষোভে সাদা হয়ে গিয়েছিল এতিয়েন। এত সাহস এই একরত্তি মেয়েটার! ক্যাথরিনকে মারতে গিয়ে হাত তুলেও শেষ মুহূর্তে নামিয়ে নিল এতিয়েন। নিজের মাথায়, মুখে হাত বোলালো। টান টান হয়ে উঠল তার সমস্ত স্নায়ু।

নিস্তব্ধতা ভেঙে সে শাভালকে বলল, ক্যাথরিন ঠিকই বলেছে, যথেষ্ট হয়েছে··· তুমি চলে যাও'

শাভাল সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল। তার পিছু পিছু ক্যাথরিন। বজ্রাহতভাবে দাঁড়িয়ে রইল আড়াই হাজার মানুষ। তাদের চোখের সামনে দিয়ে ক্যাথরিন আর শাভালের শরীর দুটো আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল দূরে, আরও দূরে।

মায়্যু-গিন্নী বিড়বিড় করে বলল, কাজটা ঠিক করলে না। শাভালকে আটকে রাখা উচিত ছিল। ঠিক কোনো-না-কোনো বদ মতলব আঁটবে ও।

সবাই আবার হাঁটতে শুরু করল। পাঁচটা বাজলো প্রায়। লাল একটা বলের মতো সূর্যটা ডুবে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। রাস্তায় একটা লোক বলল ক্রেভক্যুর থেকে পুলিসরা এদিকেই রওনা দিয়েছে। শুনে আবার ওরা দিক পরিবর্তন করল।

দলপতির নির্দেশ এল: মঁস্যু চলো! ম্যানেজারের কাছে। আমাদের রুটি চাই। খাবার চাই!

*   *   *   *

মঁসিয় এনবো তাঁর অফিসঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন। একটু আগে মাদাম এনবো গাড়ি করে বেরিয়ে গেছেন—মার্শিয়েনের দিকে। নেগ্রেলও ঘোড়ায় চড়ে তাকে অনুসরণ করল। দু-এক মুহূর্তের জন্য মঁসিয় এনবোর কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়ল। তারপর তিনি ধীর পায়ে এসে নিজের চেয়ারে বসলেন। স্ত্রী বা ভাগনে কেউই বাড়িতে না থাকায় আশ্চর্য রকম শান্ত লাগছে চার পাশটা।

আজ নতুন পরিচারিকা 'রোজ'-এর বেলা পাঁচটা পর্যন্ত ছুটি। ছোকরা কোচোয়ানটা বেরিয়েছে জুড়িগাড়ি করে মাদামকে নিয়ে। বাড়িতে আছে একমাত্র ইপোলিত—এঘর ওঘর খুটখুট করে বেড়াচ্ছে ঝাড়ন কাঁধে আর রাঁধুনি, রান্নাঘরে ব্যস্ত। রান্নাঘর থেকে হরেকরকম বাসনপত্রের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। সন্ধ্যেবেলা একগাদা লোক খাবে—তাদের রান্নাবান্না করা তো আর চাট্টিখানি কথা নয়! মঁসিয় এনবোও মনে মনে ঠিক করেছেন আজ শান্তিমতো, নির্ঝঞ্ঝাটে কাজকর্ম করবেন। ইপোলিতকে কড়া নির্দেশ দিলেন যে কেউ কাজের সময় দেখা করতে এলে যেন ভাগিয়ে দেওয়া হয়।

সকাল ন'টা আন্দাজ দঁসের এসে হাজির হল। তাকে দেখা করতে না দিয়ে উপায় নেই। গরম খবর আছে। এই প্রথম ম্যানেজার জানতে পারলেন জঙ্গলে মজুরদের গোপন সভার কথা। প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ভালোভাবে জেনে নিলেন তিনি। বোঝাই যাচ্ছে পিয়েরোঁর বউ দঁসেরকে এত সব খবর দিয়েছে। বহুদিন ধরেই দু'জনের ফষ্টিনষ্টির খবর তাঁর কানে আসছে। হঠাৎ কথার মাঝখানে দঁসেরকে থামিয়ে দিয়ে সেই কথাই আকার ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন তাকে। দঁসের লজ্জায় লাল হল। এত অপ্রস্তুত হতে হবে কে ভেবেছিল! মঁসিয় এনবো অবশ্য নিজেই কথার মোড় ঘুরিয়ে নিলেন—ওসব বাজে কথায় তাঁর দরকারটাই বা কি! যাই হোক, সব খবর জানিয়ে দঁসের চলে গেল।

প্রচণ্ড মানসিক অস্থিরতায় ভুগতে লাগলেন মঁসিয় এনবো। কি করা উচিত এরপর? পুলিসের সাহায্য নেবেন না ওপরওয়ালাকে সব খবর বিস্তারিতভাবে

জামানোটাই বেশী জরুরী? কিন্তু তাতে তো আবার নিজের পায়েই কুড়ুল মারা হবে। তিনি তো মালিকপক্ষকে বড় মুখ করে জানিয়েছেন যে আর দিন পনেরোর মধ্যেই ধর্মঘট মিটে যাবে কিন্তু এদিকে তো দু'মাস হতে চলল··দিনের পর দিন এতে তাঁর নিজের মাথাই হেঁট হচ্ছে। মাঝে মাঝে মনে হয় এই পরোক্ষ অপমানের চেয়ে সমঝোতাই অনেক—অনেক বেশী কাম্য ছিল। মালিকরা তো চুপচাপ আছেন, কোনো চিঠিপত্রও দিচ্ছেন না। আজ বিকেলের ডাকে অন্তত জবাব পাওয়া উচিত। অবশ্য দরকার হলে তার করে পুলিস আনানো যাবে। কিন্তু তাতে আবার খুনোখুনি বেধে যাবার সম্ভাবনা। এত বড় দায়িত্ব ঘাড়ে না নেওয়াই ভালো।

বেলা এগারোটা পর্যন্ত নিজের কাজ করলেন মঁসিয় এনবো। সারা বাড়িতে শুধু হিপোলিতের চলাফেরার শব্দ। সে ঘরের মেঝে পরিষ্কার করতে ব্যস্ত।' তারপর দুটো খবর পেলেন তিনি। প্রথম খবর, মঁসুর ক্ষিপ্ত মজুররা জাঁ-বার-এ হানা দিয়েছিল আর দ্বিতীয়টায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ। ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হল না তাঁর। এটা' কেমন হল? নিজেদের কোম্পানির খনি আক্রমণ না করে মঁসিয় দ্যুভ্যাঁর খনির ওপর গায়ের ঝাল মেটানো কেন? দরকার হলে ভঁরাম দখল করতে পারত··মস্ত বড় খাবার ঘরটায় আজ তিনি একা একাই দুপুরের খাওয়া সারলেন। বড় একলা লাগছে। একজন ডেপুটি এসে মিহুর খবর দিল। রীতিমতো অসুস্থ বোধ করতে লাগলেন মঁসিয় এনবো। একটু পরেই শোনা গেল ম্যদলেন আর ক্রেভক্যর আক্রান্ত হয়েছে। এবার নির্ঘাত পাগল হয়ে যাবেন তিনি। দুটো পর্যন্ত কি ডাকহরকরার জন্ম অপেক্ষা করা উচিত না এখনই পুলিসের সাহায্য চাওয়া উচিত? না কি কর্তৃপক্ষের আদেশ না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন? আগের দিন নেগ্রেলকে একটা চিঠি লিখে রাখতে বলেছিলেন। কই, সেটা তো ও যাবার সময় দিয়ে গেল না? তার মানে ঘরেই ফেলে রেখে গেছে। দৌড়ে ওপরে গেলেন, ভাগনের ঘরে।

ইস্ কি কাণ্ড! ঘরটা সকালবেলা গোছানোও হয়নি। এলোমেলো নোংরা বিছানা। সারারাত ঘরের দরজা জানলা বন্ধ ছিল নিশ্চয়। আজ এত বেলা হয়ে গেছে কিছু খোলা হয়নি। ঘরে ঢুকতেই নাকে একটা ভ্যাপসা গন্ধ এসে লাগল। জামাকাপড় ডাঁই করা, ভিজে তোয়ালে মেলা আছে চেয়ারে, কার্পেটের ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছে বিছানার চাদর। অন্যমনস্ক ভাবে সোজা টেবিলের ধারে চলে গেলেন মঁসিয় এনবো। একরাশ কাগজপত্র। একটা সাধারণ কাজও সময়মতো করে রাখতে পারে না? কি অকর্মণ্য, অপদার্থ ছেলে পল!

ঘরের দু ধারে চোখ বোলাতে লাগলেন যদি অন্য কোথাও পড়ে গিয়ে থাকে চিঠিটা। হঠাৎ চোখ পড়ল বিছানায়। ঠিক মাঝখানে ছোট্ট কি একটা জিনিস যেন ঝিলিক দিচ্ছে। কৌতূহলী হয়ে দু পা এগিয়ে যেতেই বুকের ভেতরটা ধক্ করে' উঠল। খুব পরিচিত জিনিস—মাদাম এনবোর সুগন্ধির শিশি। এটা তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী। কিন্তু এটা এখানে কেন? সব কিছু হঠাৎ জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। চোখের ওপর থেকে একটা হালকা পর্দা সরে গেল যেন। এতকাল কি

তিনি অন্ধ হয়ে ছিলেন? চোখ মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল তাঁর—কাল তাঁর স্ত্রী তাহলে পলের সঙ্গে তার ঘরে, তার বিছানায় রাত কাটিয়েছিলেন···

দরজার বাইরে ইপোলিতের গলার স্বর পাওয়া গেল—স্যর, দেখলাম আপনি ওপরে এসেছেন·· কি কাণ্ড দেখুন! 'রোজ' ছুটি নেওয়াতে আজ আমার ঘাড়েই সব কাজ পড়েছে। এই ঘরটা গোছাবার ফুরসুৎ পাইনি মোটে··

মঁসিয় এনবো দু হাতের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরেছিলেন ছোট্ট শিশিটা এত জোরে যে হাতের মুঠোয় সেটা ভেঙে যাবার দাখিল।

—কি চাও, ইপোলিত?

—স্যর; ক্রেভক্যর থেকে একজন লোক এসেছে চিঠি নিয়ে।

—ঠিক আছে। আমায় একটু একা থাকতে দাও। তুমি যাও, আমি যাচ্ছি।

তাঁর স্ত্রী এখানে রাত কাটিয়েছেন। ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করলেন। তারপর আস্তে আস্তে হাতের মুঠোটা খুললেন। তালুতে রক্ত জমে গেছে। ওঃ তাহলে এই নোংরামি তাঁরই বাড়িতে তাঁরই চোখের ওপর দিনের পর দিন চলেছে। তিনি যা অস্পষ্টভাবে সন্দেহ করতেন, তা তাহলে মিথ্যে নয়? রাত্রিবেলা ঘরের দরজার সামনে কাপড়ের খসখসানি, পা টিপে টিপে চলার শব্দ সবই তাহলে তাঁর স্ত্রীর! রাতে ও নেগ্রেলের ঘরে যেত। ওঃ, এতদূর!

চেয়ারে বসে পড়লেন এনবো। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন পলের বিছানার দিকে।

আবার কে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে।

—স্যার·· ও, দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছেন?

—কি হল আবার?

—ওই লোকটা, স্যর। বোধহয় খুব জরুরী দরকার। সব জায়গায় মজুররা ভাঙচুর করছে · আরও দু'জন লোক খবর নিয়ে এসেছে

—দূর হও তুমি! এক্ষুণি যাচ্ছি বললাম যে! কথা কানে ঢুকল না, না?

ছি ছি, সকালবেলা ইপোলিত ঘর পরিষ্কার করতে এলে কেলেঙ্কারীর আর বাকি থাকত না। অবশ্য কত দিন ধরে এমন বেলেল্লাপনা চলছে কে জানে। ইপোলিত কি আর খবর রাখে না? বালিশে জড়িয়ে থাকা মেয়েদের মাথার চুল, কোঁচকানো চাদর···ইপোলিত হয়তো ইচ্ছে করেই বারবার তাঁকে বিরক্ত করে মজা দেখছে। কে জানে হয়তো বা দরজায় কান পেতে আছে।

তবুও কিন্তু মঁসিয় এনবো চেয়ার থেকে উঠলেন না। তাকিয়েই রইলেন বিছানাটার দিকে এই ভদ্রমহিলাটিকে স্ত্রীর সম্মান দিয়েছিলেন, এই অসতী, ব্যভিচারিণী মহিলাকে ·

কোনোদিনই দেহের বা মনের যথার্থ মিল হয়নি দু'জনের। তবু গত দশ বছর ধরে এই স্ত্রীরই সুখ দুঃখ, ভালোমন্দ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন তিনি। ভেবেছেন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, বয়স বাড়লে সব ঠিক হয়ে যাবে। তারপর পল এল। না জানি,

কি ভাবে তার মন ভোলানো হয়েছিল! স্ত্রীকে ভালোবাসতে চেষ্টা করেছিলেন তিনি আর এই তার প্রতিদান! স্ত্রীর মুখে একটু হাসি দেখবার জন্য নতজানু হতেও কুণ্ঠা বোধ করেননি…বিনিময়ে কি পেলেন?

দরজায় ঘণ্টা বাজলো। ডাকহরকরা এল। উঠে দাঁড়ালেন তিনি। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, চুলোয় যাক্ সব!

ওঃ, তাঁর স্ত্রী একটা রাস্তার কুকুরীরও অধম! পারলে গলা টিপে মারতেন। আবার ভড়ং দেখিয়ে সেসিল আর পলের বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে! শুধুমাত্র শরীরী তাগিদ ছাড়া কি এই মহিলার মধ্যে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই? খাবার পর লোকে যেমন মিষ্টিমুখ করে, তাঁর স্ত্রীর কাছে পুরুষমানুষও তেমনি। ঘন ঘন মুখ বদলাতে হয়। এ এক অদ্ভুত মানসিক বিকৃতি। এবার কার পালা? কে এই মহিলার পরবর্তী শিকার? কোন্ ভাইপো, ভাগ্নে আসবে এবার তাঁর বাড়ি, ব্যবসা আর বউয়ের দাবীদার হয়ে?

ইপোলিত দরজার চাবি লাগাবার গর্তে মুখ রেখে বলল, স্যর, মঁসিয় দঁসের আবার এসেছেন। বলছেন সর্বনাশ হয়ে গেছে।

—যাচ্ছি যাচ্ছি! এক মুহূর্ত আমায় তিষ্ঠোতে দেবে না কেউ।

কি করবেন এখন মঁসিয় এনবো? দু'জনকেই তাড়িয়ে দেবেন? বলবেন এসব নোংরামি অন্য জায়গায় গিয়ে করতে? এই ঘরে দু'জন অবৈধ প্রেমের অংশীদার—এখানকার সব কিছু থেকেই স্ত্রীর গায়ের গন্ধ পাচ্ছেন। এই ঘরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পাপ। সারারাত স্বেচ্ছাচারিতার চূড়ান্ত হয়েছে।

হঠাৎ মনে হল সিঁড়িতে আবার ইপোলিতের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। লজ্জায় সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। এক মুহূর্ত থেমে কপালের ঘাম মুছলেন, আয়নার সামনে দাঁড়ালেন। নিজেকে নিজেই চিনতে পারছেন না। এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে পরিবর্তন হয়েছে তাঁর? আস্তে আস্তে মনকে শাসন করলেন, নিজেকে সংযত করলেন, তারপর নীচে নেমে এলেন।

দঁসের ছাড়াও পাঁচজন লোক খবর নিয়ে অপেক্ষা করছিল। প্রত্যেকের খবর অন্যজনের খবরের চেয়ে খারাপ। খনিতে খনিতে হামলা হয়েছে। মিত্রু খনিতে কোয়াঁত্যু অদ্ভুত সাহস আর মনের জোর দেখিয়ে মজুরদের পিছু হটতে বাধ্য করেছে। মঁসিয় এনবো যদিও শুনছিলেন কিন্তু তাঁর মন ছিল অন্যদিকে। পারিবারিক কেলেঙ্কারীর কথা ভাবছিলেন তিনি। সকলকে বিদায় দিলেন শান্তভাবে। আশ্বাস দিলেন: 'তাঁর যা কিছু করণীয়, নিশ্চয়ই করবেন।' তারপর একলা চেয়ারে বসে দু হাতে মুখ ঢাকলেন। ক্ষোভে, লজ্জায়, অপমানে তাঁর মরে যেতে ইচ্ছে করছিল। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে চিঠি এসেছে কিন্তু চোখের সামনে সব অক্ষরগুলো ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত যেটুকু পাঠোদ্ধার করা গেল তা হল, কর্তৃপক্ষ মনে করেন দরকার হলে সামনাসামনি লড়াইয়ে নামতে হবে। কিন্তু এখনই কিছু করবার দরকার নেই। প্রয়োজনমতো বন্দুকের মুখে শায়েস্তা করা যাবে। সেই মতোই চারদিকে নির্দেশ

পাঠালেন মঁসিয় এনবো—পুলিসে, সেনাবাহিনীর কাছে। এমন কথাও লিখলেন যে তিনি অসুস্থ। এর মধ্যে আরও খবর এল বিকেলের দিকে—সান্ত্রীরা কোথাও মজুরদের হাতেনাতে ধরতে পারেনি। তারা ভাঙচুর করে চলে যাবার পর এরা খবর পেয়েছে। যাক গে, যা খুশি করুক সকলে। তাঁর মাথাব্যথার কি আছে? নিঝুম হয়ে বসে রইলেন তিনি—সারা বাড়ি চুপচাপ, শুধু রান্নাঘর থেকে হাতা খুন্তির আওয়াজ আসছে। রাতের খাবারের যোগাড় হচ্ছে।

সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে। পাঁচটা বাজে। মঁসিয় এনবো এখনও একভাবে বসে আছেন। হঠাৎ কানে একটা শব্দ এল। প্রথমে ভেবেছিলেন পল আর তার মামীমা ফিরে এল—লীলাখেলা শেষ করে। কিন্তু শব্দটা বাড়ছে ক্রমশ। উঠে জানলার দিকে এগোলেন।

সমুদ্রগর্জনের মতো শোনা গেল একটাই কথা: আমাদের রুটি চাই। খাবার চাই!

ধর্মঘটী মজুররা মঁস্যুতে এসে পৌঁছেছে। এদিকে পুলিস ভেবেছে ল্য ভোরয়াতে এবার আক্রমণ হবে। তারা ঘোড়া ছুটিয়েছে সেই দিকে।

খানিক আগেই মজুরদের গোটা দলটাকে দেখতে পেয়েছেন মাদাম এনবোরা। মার্শিয়েনে আজ সারাদিনটা তাঁদের চমৎকার কেটেছে। খাওয়াদাওয়াও জমেছিল খুব। তারপর কাঁচের কারখানা দেখতে দেখতে দুপুর গড়িয়ে গেছে কোন ফাঁকে। ফেরবার পথে সেসিলের মাথায় হঠাৎ ভূত চাপলো। সামনের চাষীর বাড়ি থেকে এক কাপ দুধ খেতে ইচ্ছে করছে। সবাই নামলো গাড়ি থেকে। নেগ্রেলও ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে এল। চাষীবউ তো এতগুলো 'ভদ্দরলোক' দেখে কি করবে বুঝতে পারছে না। আহ্লাদে আটখানা হয়ে সে তাদের বসাবার বন্দোবস্ত করতে লাগল। কিন্তু মেয়েরা দুধ-দোয়ানো দেখতে চায়। তারা জামা কাপড় বাঁচিয়ে পেয়ালা হাতে করে গোয়ালঘরের দিকে এগোল।

মাদাম এনবো সবে দুধের কাপে চুমুক দিয়েছেন, এমন সময় বাইরে থেকে একটা গণ্ডগোলের আওয়াজ পাওয়া গেল।

—কি হল আবার?

আসলে গোয়ালঘরটা রাস্তার ঠিক পাশেই। তার দরজাটা বেশ বড়। খড় বিচালির আঁটি ঘরটার এদিক ওদিক ছড়ানো। গলা বাড়িয়ে সবাই দেখল একগাদা লোক চেঁচাতে চেঁচাতে রাস্তা দিয়ে চলেছে—ক'জন তা গুনে শেষ করা যায় না। যতদূর চোখ যায় শুধু কালো কালো মানুষের মাথা।

নেগ্রেলও বেরিয়ে এসেছিল। সে বলল, ওই যে শয়তানগুলো! ব্যাপার কি? কাজে যোগ দেবার সুবুদ্ধি হয়েছে নাকি?

চাষীবউ জবাব দিল, মনে হয় মজুররা। এই নিয়ে দু বার ওরা এই রাস্তা দিয়ে গেল। হাবভাব দেখে মনে হয় ওরা বোধহয় কর্তৃত্ব পেয়ে গেছে আশেপাশের খনিগুলোতে।

পলকেই ফ্যাকাশে হয়ে গেল তার অতিথিদের মুখ।

দেখেশুনে তাড়াতাড়ি সে কথার মোড় ঘোরালো!

—যত সব বজ্জাতের দল!

বেলা শেষ হয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা দরকার। নেগ্রেল গাড়িতে ওঠার হুকুম দিল। এদিকে মাদাম এনবো আর মেয়েরা এত ভয় পেয়েছে যে পারলে তারা চাষীর এই খামার বাড়িতেই থেকে যায়। দরকার হলে খড়ের গাদায় লুকিয়ে থাকা যাবে। কিন্তু এদিকে যে আবার গোয়ালঘরের দরজাটা ভালো করে বন্ধ হয় না!

নেগ্রেল হেসে ফেলল।

—আরে, ঘাবড়াচ্ছো কেন? দরকার হলে আমাদের জানগুলো আজ নীলামে বেচব।

এ কথায় অন্যরা আরও ভয় পেয়ে গেল। এদিকে মানুষগুলো ক্রমশই এগিয়ে আসছে। ধুলোর ঝড় উঠছে যেন।

সেসিল কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, না না, আমি এসব দেখতে চাই না।

মাদাম এনবো ভয়ে সাদা হয়ে গেলেন। কি অবিবেচক এই সব গোঁয়ার মজুরগুলো! তাঁর সারাদিনের আনন্দটা মাটি করে দিল! ল্যুসি আর জান্ এদিকে কাঁপছে কিন্তু তক্তার ফাঁকে চোখ রেখে সব কিছু দেখছেও দিব্যি।

মানুষগুলো এবার বড় কাছে এসে পড়েছে। তাদের সকলের পায়ের চাপে মাটিটা কি কাঁপছে একটু একটু? একেবারে সামনে জঁল্যাঁ ছুটছে আর বাঁশিতে ফুঁ দিচ্ছে।

নেগ্রেল ঠাট্টার সুরে বলল, শীগগির নাকে রুমাল চাপা দাও। এই সব জানোয়ারগুলোর গায়ের গন্ধে তো ভূত পালায়!

তার গলার আওয়াজ চাপা পড়ে গেল। এবার দেখা যাচ্ছে দলে মেয়েরাও আছে। অনেকের কোলে কাঁখে বাচ্চা। তারা বাচ্চাগুলোকে ওপরে দু হাতে তুলে ধরেছে—যেন বিদ্রোহের রঙিন ফেস্টুন! কেউ কেউ মাথার ওপর লাঠি ঘোরাচ্ছে। প্রত্যেকের চোখে মুখে জিঘাংসা—এক্ষুণি সব কিছু ধ্বংস করে দিতে হবে। সবার পেছনে পুরুষরা—সংখ্যায় অন্তত হাজার দুই। একের থেকে অন্যকে আলাদা করে চেনবার উপায় নেই। সকলের চোখ ধক ধক করে জ্বলছে। মুখে গানের কলি—সাম্যবাদের গান। অনেকের হাতে বড় বড় লোহার ডাণ্ডা। সকলের মাথা ছাপিয়ে উঁচিয়ে আছে লেভাকের হাতের চকচকে কুড়ুলটা। কুড়ুলের ফলাটা পড়ন্ত রোদ্দুরের লালচে আভায় ঝকঝক করছে—গিলেটিনের ধারালো ক্ষুরের মতো।

মাদাম এনবো শুধু এটুকুই বলতে পারলেন—কি ভয়ংকর চেহারা সব!

নেগ্রেল বিড়বিড় করে বলল, একটাকেও চিনতে পারলাম না। এগুলো এল কোত্থেকে?

সত্যিই তাই। দীর্ঘদিনের অনাহার, ক্ষোভ, প্রতিহিংসা আর বিতৃষ্ণায় মানুষগুলোর চেহারা বুনো জন্তুর মতো হয়ে গেছে। সূর্যের লালচে সোনালী

যেন রক্ত ঢেলে দিয়েছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে, কসাইখানায় যেন পশুবলির মহোৎসব—এ কি ভবিষ্যতের ইঙ্গিত?

ল্যুসি আর জান্ বলে উঠল, কি চমৎকার, না?

এই ভয়ংকর সুন্দর দৃশ্য তাদের শিল্পীমনকে নাড়া দিয়েছে। মনে মনে কিন্তু সবাই ভয় পেয়েছে—মাদাম এনবো একটা বিচালি রাখবার পাত্রের আড়ালে লুকোবার চেষ্টা করছেন। এই বুঝি ধাক্কা দিয়ে দরজা ফেঙে ফেলল ওরা, তারপর মাথায় বাড়ি কিংবা গলায় কোপ। নেগ্রেল সাধারণত ভয় পায় না কিন্তু আজ সেও বিচলিত হয়েছে। সেসিল সেই যে খড়ের গাদার আড়ালে লুকিয়েছে, আর নড়নচড়ন নেই। সকলেই চাইছে বাইরের এই দৃশ্য থেকে চোখ সরিয়ে নিতে কিন্তু পারছে কই?

সত্যি, হয়তো কোনো এক রাতে এই রকমই দুর্যোগ আসবে, মানুষ সমস্ত মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে হয়ে উঠবে ভয়াল, ভয়ংকর! প্রাণের মায়া ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে বন্দুকের সামনে পাশব প্রতিহিংসায় উত্তাল হয়ে—পুরনো পৃথিবীর বস্তাপচা নিয়মগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে খান খান হয়ে—সেই রক্তাক্ত ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধজয়ী ক'জন মানুষ শপথ নেবে, নতুন পৃথিবী গড়ে তোলবার স্বপ্ন বুকে নিয়ে। পুঁজিপতিরা সর্বস্ব খুইয়ে পথে এসে দাঁড়াবে। সাম্যবাদের উজ্জ্বল সোনালী আলোয় ভেসে যাবে চারদিক!

—আমরা রুটি চাই! রুটি!

ল্যুসি আর জান্, মাদাম এনবোকে আঁকড়ে ধরেছে—তাঁর নিজেরই অবশ্য মূর্ছা যাবার উপক্রম। নেগ্রেল দাঁড়িয়ে আছে বুক চিতিয়ে—মেয়েদের তো আগে রক্ষা করতে হবে। তবে কি শেষের সে দিন এগিয়ে এল? আস্তে আস্তে দলটা চলে যাচ্ছে। সকলের পেছনে মুকেত। বোধহয় তার চোখ পড়ে থাকবে নেগ্রেলের দিকে। চট্ করে সে স্কার্টটা তুলে পেছন ফিরে দাঁড়ালো উদ্ধত ভঙ্গিতে। সেই নগ্নতায় অশ্লীলতা ছিল না, রসিকতাও ছিল না—ছিল এক ভয়ঙ্কর রূঢ়তা আর ঔদ্ধত্য।

পুরো দলটা মঁসুর দিকে চলে গেল। অবস্থা নিরাপদ বুঝে গাড়ি বের করা হল মেয়েদের জন্য। কিন্তু কোচোয়ান নারাজ। এই অবস্থায় মেয়েদের নিয়ে বেরোনো ঠিক নয়। কারণ অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরে যাওয়াও যাবে না—রাস্তা একটাই।

মাদাম এনবো বললেন, কিন্তু যেতে তো হবেই। বাড়িতে কয়েকজন খেতে আসবেন। ঠিক যেদিন আমার একটা না একটা কাজ থাকে, সেদিনই যত বাজে ঝামেলা হয়। এই জন্যই ছোটলোকদের লাই দিয়ে মাথায় তুলতে নেই।

ল্যুসি আর জান্ খড়ের গাদা থেকে সেসিলকে টেনে বের করতে চেষ্টা করছিল। সেসিলের এখনও ভয় কাটেনি, যদি ওরা আবার ফিরে আসে!

সবাই গাড়িতে উঠলে নেগ্রেল কোচোয়ানকে বলল, সাবধানে চলো, রাস্তা ভালো নয়। আমরা বাগানের পেছন দিকে গিয়ে নামব। খিড়কির দরজা তো খোলাই থাকবে। [redacted] রাস্তলে গাড়ি আর ঘোড়াগুলোকে কোনো নিরাপদ কসাইখানায় রেখে দিও

গাড়ি চলতে লাগল। এদিকে লোকগুলো সব মঁসুর পথে। তথাকথিত ভদ্রলোকদের মধ্যে নানারকম গুজব ছড়িয়ে পড়ছে: বিদ্রোহীরা লুঠতরাজ, ভাঙচুর করছে; দরকার হলে ছুরি চালাচ্ছে পেটে। একজন নাকি উড়ো চিঠি পেয়েছে যে তার চিলেকোঠায় বিস্ফোরক জিনিস লুকিয়ে রাখা আছে। ধর্মঘটী সাধারণ মানুষের সঙ্গে হাত না মেলালে সমস্ত কিছু উড়িয়ে দেওয়া হবে।

গ্রেগোয়াররা অবশ্য ব্যাপারটা উড়িয়ে দিল।

—দূর দূর, যত সব গুজব। মজুররা এরকম হিংস্র হতেই পারে না। পাঁচটা বাজে। মঁসিয় এনবোর বাড়িতে যেতেই হবে। সেসিলরাও হয়তো এতক্ষণে এসে পড়েছে।

মঁসুর অন্য বাসিন্দারা কিন্তু তাঁদের কথা মেনে নিতে পারেনি। এসব ফালতু আশ্বাসের কোনো মানেই হয় না। খেপে উঠলে সবাই সমান। মানুষ তখন স্থান-কালপাত্র বিচার করে না। মরীয়া হয়ে ওঠে। সব বাড়ির দরজা জানলা ঝটপট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মেইগ্রা তার দোকান সুরক্ষিত করবার চেষ্টায় ব্যস্ত। লোহার হুড়কো লাগাচ্ছে জানলায়। হাত এত কাঁপছে যে তার রুগ্ন বউটাকে এসে দুর্বল হাতে ছিটকিনি লাগাতে হচ্ছে।

সমস্ত মজুররা মঁসিয় এনবোর বাড়ির সামনে এসে থামল। আবার একটা চিৎকার উঠল—রুটি চাই! রুটি!

মঁসিয় এনবো জানলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। ইপোলিত এল জানলা বন্ধ করতে—কাঠের খড়খড়ি বন্ধ করতে হবে নয়তো ঢিল লেগে কাঁচ ভেঙে যাবে। পুরো একতলাটা সে বন্ধ করে দিয়ে এসেছে। রান্নাঘরের জানলাটা শুধু বন্ধ করা যায়নি।

কিন্তু মঁসিয় এনবো দেখতে চান অবস্থাটা। উঠে আবার তিনতলায় পলের ঘরে গেলেন। এখান থেকে পুরো রাস্তাটাই নজরে আসে। লোকগুলোকে দেখছিলেন, হঠাৎ আবার ঘরের ভেতরের জিনিসপত্রে চোখ পড়ল। খাটবিছানা, মুখ হাত ধোওয়ার জায়গা, ঘরের সবকিছুই পরিষ্কার করে পরিপাটিভাবে গুছিয়ে রাখা হয়েছে। বিছানায় কাচা চাদর পাতা। সারাদিন ধরে নিজের মনের সঙ্গে আজ যুদ্ধ করেছেন মঁসিয় এনবো। এই প্রথম তিনি অদ্ভুত ক্লান্তি অনুভব করলেন। ধীরে ধীরে সংযত করলেন নিজেকে…এখন এই ঘরটার মতোই আশ্চর্য স্থির লাগছে নিজেকে। কি দরকার শুধু শুধু কেলেঙ্কারী বাড়িয়ে? কিই বা তেমন এসে যায়। তাঁর স্ত্রীর উপপতির সংখ্যা একজন বাড়লো—এই বই তো আর কিছু নয়? এক হিসেবে মন্দের ভালো. যে পল নেগ্রেল তাঁর আত্মীয় এবং তিনিই ওকে এ বাড়িতে জায়গা দিয়েছেন। এতে বাইরের লোক জানাজানি ততটা হবে না। আগেও তো এমন হয়েছে। তখনও স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারেননি, আজও পারবেন না। সমস্ত মুখ বিস্বাদ হয়ে গেল তাঁর। এইভাবে বেঁচে থাকার যৌক্তিকতা কোথায়? নিজেকে ঘৃণা করতে সাধ জাগছে—ছি ছি, এই মহিলাকে দেবীজ্ঞানে এককালে পুজো করেছিলেন! এখনও স্ত্রীর কথা ভাবলে তাঁর মনের কোণে নাম-না-জানা জোয়ার উথলে ওঠে। একেই কি অন্ধ ভালোবাসা বলে?

জানলার নীচ থেকে চিৎকার উঠল, রুটি চাই! রুটি!

দাঁতে দাঁত চেপে মঁসিয় এনবো বললেন, যত সব বুদ্ধুর দল।

কানে এল সকলে তাঁকে গালাগাল দিচ্ছে, অপমান করছে—তিনি যে মোটা মাইনে পান। বলছে, অতিরিক্ত বিলাসব্যসনে দিন কাটিয়ে তিনি মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়েছেন। এই যে মজুররা দিনের পর দিন অনাহারে মরছে, এতেও তাঁর গায়ে লাগে না। এদিকে দলের মেয়েদের নাকে এসেছে ভাজা মাংস আর রকমারি মশলার গন্ধ। তারা খিদের জ্বালায় চিৎকার করছে। মঁসিয় এনবোর মনে হল, সব ক'টার গলায় শ্যাম্পেনের বোতল উপুড় করে দেন—যদি মদ খেয়ে চিৎকার কমে।

মঁসিয় এনবোর রাগ উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। এরা তাঁকে বুঝতে চাইছে না। এক্ষুণি তিনি এই বিলাসব্যসন, টাকাপয়সা, সুখ সব কিছু ছেড়ে দিতে পারেন—যদি একবার—একবার এই মানুষগুলোর সঙ্গে মাটিতে নেমে আসা যায়, এই মজুরদের মতো মদ খেয়ে বেয়াদব বউকে শায়েস্তা করা যায়—রাতবিরেতে আবার রাগ ভুলে তাকেই সোহাগ করা যায়·· প্রতিবেশীর ঘরণীর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করা যায়! যদি না খেতে পেয়ে মরতেনও তাতেও হয়তো কোনো ক্ষোভ থাকত না। আঃ, এইসব ছন্নছাড়া অশিক্ষিত মজুরদের মতো যদি মাঠেঘাটে ঘুরতে পারতেন অবসর সময়ে, কুৎসিত অথচ সর্বাঙ্গে উপচে পড়ছে যৌবন—এমন মজুরনীকে নিয়ে মাততে পারতেন রঙ্গবিলাসে, মাটির গন্ধ, ঘামের গন্ধ, শুকনো বাসি রুটির গন্ধ আর তাঁরই আত্মজ অপুষ্ট শিশুর ওম মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত···

—আমরা রুটি চাই! রুটি!

আর থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠলেন মঁসিয় এনবো।

—রুটি! সেটা যে এখানে মিলবে এ ধারণা হল কোত্থেকে তোমাদের?

হ্যাঁ, খাবার তাঁর ভাঁড়ারে আছে। অপর্যাপ্ত। কিন্তু তবুও শান্তি তো পান না তিনি? সুখের ঘর ভেঙে গেছে। লজ্জা, ক্ষোভে, অপমানে গলার কাছটায় যেন পাক দিয়ে ওঠে—মুমূর্ষু রুগীর টুঁটি টিপে ধরবার মতোই। শুধু পেট ভরে খেতে পাওয়াটাই কি সব? মুঠো মুঠো টাকা থাকলেই কি 'শান্তি' নামের দুর্লভ জিনিসটা কিনতে পাওয়া যায়? আজ যদি এরা নতুন পৃথিবী গড়ে তুলতে পারে, কালই আবার অন্য কিছুর জন্য হা হুতাশ শুরু করবে। আসলে সবচেয়ে সুখের হত যদি জড় পদার্থ হওয়া যেত—পাথর, কাঠ অথবা গাছ কিংবা এক দানা গম—কি এক কণা বালি, তাহলে মানুষের পায়ের চাপে রক্তাক্ত, দলিত, পিষ্ট হতে হত না প্রতি মুহূর্তে নতুন করে।

মঁসিয় এনবোর চোখ উপচে, দু গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। বাড়ির সামনে ইট পাথরের বৃষ্টি হচ্ছে। এখন আর কোনো ক্ষোভ নেই তাঁর এইসব সর্বহারাদের ওপর। রাগ, অভিমান কিছু হচ্ছে না। শুধু নিজেকে কেমন পাগল পাগল লাগছে। চোখের জলে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে সব। তিনি বারবার বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, কেউ কিছু বোঝে না। সব মূর্খের দল!

পেটের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে শয়ে শয়ে মজুর আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে চেঁচাতে লাগলো।

—আমাদের রুটি চাই, রুটি!

* * * *

ক্যাথরিন এতিয়েনকে আঘাত করবার পর এতিয়েন এখন অনেকটা শান্ত হয়ে গেছে। তবে দলের নেতৃত্ব দিচ্ছে সে-ই। এমন কি যখন রূঢ় গলায় সকলকে মঁসুতে গিয়ে সব কিছু তছনচ করে দেবার কথা বলছে, তখনও তার মনের মধ্যে একটা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যেন কাজ করছে: কি দরকার অনর্থক এত ক্ষয়ক্ষতির? সে তো চায়নি এমন কিছু হোক। জাঁ-বারে তো সে-ই পাম্প নষ্ট করার সময় সমস্ত শক্তি দিয়ে মজুরদের বাধা দিয়েছিল। কিন্তু এখন এই ধরনের চারিত্রিক বৈপরীত্য তার মধ্যে কাজ করছে কেন? ম্যানেজারের বাড়ি ঘর দোর সব কিছু শেষ করে না দিতে পারলে কেন তার ভেতরের অবাধ্য হিংস্র পশুটা শান্ত হতে চাইছে না?

তবু যখন সকলে ম্যানেজারের বাড়িতে অজস্র ইঁট ছুঁড়ছে, তখন এতিয়েনই সকলকে থামতে বলল। খনির কাজকর্ম নিয়ে গণ্ডগোল, তার জন্য ভদ্রলোকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিয়ে টানা-হেঁচড়া করা ঠিক নয়। কিন্তু কে শোনে কার কথা! রাস্তায় অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে ছিল এতিয়েন। পেছন থেকে কে যেন তাকে ডাকলো। তির্সোঁর মদের দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক। দোকানের মালিকানী একটু আগে ভয়ের চোটে ঝাঁপ বন্ধ করে চম্পট দিয়েছে।

—হ্যাঁ, আমিই তোমাকে ডাকছি. একটু শোনো।

স্থাসন্তর। দু'শো চল্লিশ নম্বর কলোনী থেকে আরও জনাতিরিশ মেয়ে পুরুষ, যারা সকালে যায়নি, এসে হাজির হয়েছে ওখানে। দোকানের মধ্যে তারা বসে আছে। জাশারী আর তার বউ ফিলোমিন, পেছন ফিরে মুখ আড়াল করে পিয়েরোঁ আর তার স্ত্রী—কেউ মদ খাচ্ছে না। এমনিই হালচাল দেখে ঘাবড়ে গেছে। স্থাসন্তরকে দেখে চিনতে পেরে এতিয়েন আবার পিছু ফিরল। তার কথা বলার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই।

স্থাসন্তর বলল, তুমি আমার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতে চাও না, না? আগেই বলেছিলাম তোমাকে যে হাঙ্গামা বাধবে। যাও, এবার রুটির জন্য দরবার কর, বদলে বন্দুকের গুলি জুটবে কপালে।

এতিয়েন ঘুরে দাঁড়ালো।

—আমার হাড় জ্বলে যায় তোমাকে দেখলে। ভীতু কোথাকার! দূরে দাঁড়িয়ে কত বড় বুকনি ঝাড়ছো, মজা দেখছ আর আমরা শেষ রক্তবিন্দুটুকু দিয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি।

—তোমার বুঝি ধারণা এই চালেই কিস্তিমাত করবে?

—আমি শেষ পর্যন্ত আমার বন্ধুদের পাশে পাশে থাকব। দরকার হলে ওদের সঙ্গেই মরব।

এতিয়েন আবার নিজের জায়গায় ফিরে গেল। দরকার হলে মরতে হবে বৈকি!

তিনটে বাচ্চা পাথর ছুঁড়ছিল। তাদের ধাক্কা মেরে হটিয়ে দিল এতিয়েন। চেঁচিয়ে বলল, এভাবে জানলা দরজা ভাঙলে আখেরে লাভ হবে না কিছু।

বেবের আর লিডি, জ্যঁল্যার সঙ্গে দাঁড়িয়ে পাথর ছোঁড়া অভ্যেস করছিল। প্রত্যেকে একবার করে ছুঁড়ছে, দেখছে কে কত বেশী কাঁচ ভাঙতে পারে। লিডির হাত ফসকে একটা পাথর গিয়ে লাগল ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা একজন মাঝবয়সী মজুর-গিন্নীর মাথায়। কেটে গিয়ে রক্ত বেরোতে লাগল। জ্যঁল্যা আর বেবেরের আনন্দ আর হাসাহাসি দেখে কে। বোন্‌মর আর মুক্য পেছনে একটা বেঞ্চিতে বসে মজা দেখছিল। তাদের বুড়ো, বেতো শরীর, এত হৈ হুজ্জুতি কি পোষায়? কত কষ্টে যে বোন্‌মর ফুলে ঢোল হওয়া তার পা দুটোকে টেনে টেনে এই পর্যন্ত নিয়ে এসেছে! তবে দু'জনের কেউই কোনো কথা বলছিল না।

মোদ্দা ব্যাপার হল যে কেউ এতিয়েনের কোনো কথা কানেই তুলছে না। বেপরোয়া ভাবে পাথর আর ইট ছোঁড়া হচ্ছে। এতিয়েনের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে সেসব দেখে—ছি ছি, সে-ই তো এদের খেপিয়ে তুলেছিল এক সময়। যে আগুনটা ছাইচাপা ছিল এতকাল, আজ ইন্ধন পেয়ে দাউ দাউ করে কেমন জ্বলে উঠেছে। এরা সব হিংস্রতায় এখন পশুরও অধম, কোনো কথাই কানে তুলতে চাইছে না। এতিয়েন এসেছে দক্ষিণ অঞ্চল থেকে—সেখানে মানুষ চট্ করে রেগে যায় বটে কিন্তু ধ্বংসাত্মক মনোবৃত্তি অনেক—অনেক কম। লেভাকের হাত থেকে অতিকষ্টে কুড়ুলটা কেড়ে নিল এতিয়েন কিন্তু মায়্যুদের আটকাবে কে? তারা দু হাতে পাথর ছুঁড়ছে। সবচেয়ে বেশী ভাবিয়ে তুলেছে দলের মেয়েরা, লেভাকের বউ, মুকেত, আরও অন্য সবাই—রক্তের লোভে সব খেপে উঠেছে। দাঁতে দাঁত দিয়ে একতরফা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, বাস্তার ঘেয়ো কুকুরের মতো আচরণ তাদের। মা ক্রুলে সবাইকে তাতাচ্ছে।

কোন্ এক অদৃশ্য মন্ত্রবলে হঠাৎ সব কিছু থেমে গেল। মঁসিয় গ্রেগোয়ার আর তাঁর স্ত্রী রাস্তা পেরিয়ে মঁসিয় এনবোর বাড়ির দিকেই আসছেন—স্থির, নিষ্কম্প মুখে, অবিচল দৃঢ়তায়। তাঁরা যেন জানেন মজুররা—যারা এত দিন বিশ্বস্তভাবে কাজ করেছে, তারা কিছুতেই তেমন কিছু ক্ষতি করতে পারবে না। সবাই সত্যিই সসম্ভ্রমে এঁদের দু'জনকে পথ ছেড়ে দিল। নির্বিঘ্নে এঁরা বাগান পেরিয়ে বাড়ির সামনে চলে গেলেন। দরজায় ঘণ্টা বাজালেন। কিন্তু দরজা খুলল না কেউ। ইতিমধ্যে রোজ ফিরে এসেছে—সে-ও মজুরদের অনেককেই চেনে। দলে পড়ে তাদের কারও কারও সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ার্কি করছিল। গ্রেগোয়ারদের দেখে দৌড়ে এগিয়ে এসে জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা মারতে লাগল। ইঞ্চি কয়েক ফাঁক হল দরজাটা। ভেতরে ইপোলিতের ভয়ার্ত মুখ। অতিথিরা ভেতরে ঢোকামাত্র আবার ইট পড়তে শুরু করল। সাময়িক আচ্ছন্নতা কেটে গেছে মজুরদের। তারা চিৎকার করতে লাগল—পুঁজিপতি দালাল নিপাত যাও। সাম্যবাদের জয় হোক!

বড় হলঘরটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রোজ তখন ভয়ার্ত চাকরটাকে হেসে হেসে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করছিল।

—আরে, ওরা তোমাকে কিছু করবে না! আমি ওদের জানি তো!

মঁসিয় গ্রেগোয়ার ধীরে সুস্থে কোটটা খুলে হুকে ঝুলিয়ে রাখলেন। তারপর স্ত্রীকে সাহায্য করলেন তাঁর পশমী জামাটা খুলতে। তিনিও রোজের কথায় সায় দিলেন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ও ঠিকই বলছে। মজুররা একটু মাথা গরম করছে বটে কিন্তু সেরকম কোনো ক্ষতি ওরা নিশ্চয়ই করবে না। খানিকক্ষণ চেঁচামেচি করেই খিদে পেয়ে যাবে। অমনি সব ঘরে ফিরে যাবে সুড়সুড় করে!

মঁসিয় এনবো তিনতলা থেকে নীচে নেমে এসেছেন সম্মানিত অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাতে। কান্নার আবেগে এখনও তাঁর চোখ দুটো জ্বালা করছে। নিজেকে এতক্ষণে অবশ্য অনেকটা সামলিয়ে নিয়েছেন। বললেন, জানেন, মেয়েরা কিন্তু এখনও ফেরেনি।

এবার গ্রেগোয়াররা চিন্তিত হলেন। সেসিল এখনও আসেনি? বাইরে যা তাণ্ডব শুরু হয়েছে, এসে পৌঁছলেই বা ভেতরে ঢুকবে কেমন করে?

মঁসিয় এনবো বললেন, একবার ভেবেছিলাম বাইরের লোকগুলোকে সব হটিয়ে দেব, কিন্তু একা মানুষ, কি করি বলুন! আর কাকেই বা বাইরে পাঠাই পুলিস আনবার জন্য!

রোজ মৃদু গলায় বলল, না না স্যর, ওরা কিছু করবে না।

ম্যানেজার মাথা নাড়লেন। বাইরে গণ্ডগোল ক্রমশ বাড়ছে। ক্রমাগত ইঁট পাথর বর্ষণের শব্দ।

এবার মঁসিয় এনবো বললেন, দেখুন, ওদের ওপর আমার ব্যক্তিগত কোনো আক্রোশ নেই। কিন্তু এমন অরাজকতা চলতে দেওয়া যায় না। এই এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখবার দায়িত্ব আমারই। এই তো শুনলাম পুলিস এসেছে, তা কই? সকাল থেকে তো একটি মক্কেলের টিকিও নজরে এল না।

কথা থামিয়ে মাদাম গ্রেগোয়ারের দিকে নজর দিলেন।

—কি কাণ্ড দেখুন! মাদাম, আপনি বরং ভেতরে বৈঠকখানায় চলুন।

কিন্তু তাঁরা যাবার আগেই রাঁধুনি এসে হাজির হল। হাত পা নেড়ে বলল, না না, এভাবে রান্না করা পোষাবে না আমার। কিছু রান্নার সরঞ্জাম আর খাবার-দাবার আসার কথা মার্শিয়েন থেকে। ওখানকার লোকই নিয়ে আসবে। কিন্তু সে সব এখনও এল না। নির্ঘাত রাস্তায় ওই হাজার তিনেক হাভাতে তাকে ধরে সব লুটেপুটে নিয়েছে। ওই নচ্ছারগুলোর পেটে যাওয়ার চেয়ে সব রান্না উনুনে ঠেসে দেওয়াও ভালো।

মঁসিয় এনবো অপ্রস্তুত গলায় বললেন, আঃ, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা কর! মার্শিয়েন থেকে এখুনি হয়তো লোক এসে পড়বে

সবে বৈঠকখানার দরজাটা খুলতে যাবেন, হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল হলঘরের আবছা অন্ধকারে বসে থাকা একটা লোকের দিকে।

—কি ব্যাপার মেইগ্রা, তুমি এখানে?

মেইগ্রা উঠে দাঁড়ালো। তার সমস্ত শরীর ভযে কাঁপছে। এত দিনের ঔদ্ধত্য, দুঃসাহস কোথায় গেল? সে জানালো ফাঁক পেয়ে সে ম্যানেজারের কাছে চলে এসেছে সাহায্য পাবার আশায। ওরা সবাই তার দোকান লুট করে নেবে।

—দেখতেই তো পাচ্ছো, ওরা আমাকেও আক্রমণ করেছে। তার চেযে বরং দোকানে বসে তুমি মালপত্র সামলাতে পারতে।

—ওঃ, আমি লোহার হুড়কো এঁটে দিযে বউকে বসিযে রেখে এসেছি।

ম্যানেজার নিজের রাগ গোপন করতে পারলেন না। কি বুদ্ধি! রোগা শুঁটকো বউটাকে বাইরে ফেলে রেখে নিজে গর্তের মধ্যে সেঁধিয়েছে!

—যাই হোক মেইগ্রা, আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। নিজের ব্যবস্থা নিজেই কর। মনে হয় তোমার দোকানে চলে যাওযাই ভালো। দেখছ না, ওরা কি রকম খাবারের জন্য চেঁচাচ্ছে।

আবার নতুন করে গণ্ডগোল শুরু হল বাইরে। মেইগ্রার মনে হল যেন তার নাম ধরেই চেঁচানো হচ্ছে। এখন বাইরে বেরোলে সবাই তার টুঁটি টিপে মেরে ফেলবে। অথচ এদিকে দোকানের না জানি কত ক্ষতি হয়ে যাবে! দরজার কাঁচে নাক ঠেকিয়ে বাইরের দিকে তাকালো মেইগ্রা। অবস্থাটা একবার খতিয়ে দেখতে চাইল। এখুনি হয়তো পুরো দলটা দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকবে। গ্রেগোযাররা সকলে বৈঠকখানায চলে গেলেন।

মঁসিয় এনবো মোটামুটি শান্তভাবে সকলকে আপ্যায়ন করতে লাগলেন। বারবার অনুরোধ করলেন শান্ত হযে বসবার জন্য।

ঘরের সমস্ত দরজা জানলা বন্ধ। দুটো বাতি জ্বলছে। কিন্তু বাইরে এখনও রাত নামেনি। চেঁচামেচির আওযাজ পাওয়া যাচ্ছে। মোটা শার্সি আর পর্দা ভেদ করে যেটুকু অস্পষ্ট গোলমালের আভাস পাওয়া যায়, তাতেই অন্তরাত্মা যেন কেঁপে ওঠে। মঁসিয় এনবো যথেষ্ট উত্তেজিত—তিনি নিশ্চিত, হ্রাসন্তরই এই গণ্ডগোলের জন্য দায়ী। পুলিস আসার তো কথাই আছে কিন্তু সে মহাপ্রভুদের কখন দয়া হবে কে জানে! এরা সবাই তাঁকে পথে বসিয়ে দিয়ে গেল। গ্রেগোয়ারদের মাথায একটাই চিন্তা—সেসিলের নিরাপত্তা। আহা, বাছা আমাদের এত অল্পেতে ভয় পেয়ে যায়! বড় নরম মন তো! আরও পনেরো মিনিট কেটে গেল। বাইরে অস্থিরতা বাড়ছে। অবস্থা ক্রমশ সহ্য আর আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। মঁসিয় এনবো একলাই বেরিয়ে সকলকে শায়েস্তা করবেন কিনা ভাবছেন এমন সময় ইপোলিত চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে এল।

—সর্বনাশ হয়েছে! শুই যে! ওরা বোধহয় গিন্নীমাকে মেরে ফেলল!

বাগানের সরু পায়েচলা পথে ফিরছিল। তার বিশ্বাস, নিশ্চয়ই কেউ না কেউ ঠিক দরজা খুলে রাখবে। সমস্ত পথটা নিরাপদেই পেরিয়ে এসেছিল প্রায়। কিন্তু যখন মাদাম এনবো আর মেয়েরা দরজায় কড়া নাড়তে ব্যস্ত, তখন মজুরদের দলের কয়েকজন মেয়ে ওদের দেখে ফেলেছে। এদিকে নেগ্রেল তখন পাগলের মতো দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। কেউ দরজা খুলছে না। এদের সকলকে ধাওয়া করে মজুরদের দলটা আস্তে আস্তে কাছে সরে আসছে কিন্তু শেষ মুহূর্তে কেমন সব গোলমাল হয়ে গেল। নিজেদের মধ্যে নিতান্তই ভুল বোঝাবুঝি। খানিক পরে একটা ঝি দরজা একটু ফাঁক করাতে লুসি আর জান সুড়ুৎ করে ভেতরে ঢুকে গেল মাদাম এনবোও ভেতরে এলেন নেগ্রেল কোনোক্রমে ওঁর পিছু পিছু এসে দরজা বন্ধ করে দিল। কিন্তু সেসিল? সে এত ভয় পেয়ে গেছে যে সোজা রাস্তার দিকেই আবার ছুটতে লাগল অর্থাৎ ঐ বিপদের মধ্যেই এসে পড়ল বেচারী।

সঙ্গে সঙ্গে একটা সম্মিলিত চিৎকার শোনা গেল

—সব ক'টাকে পিটিয়ে মেরে ফেল। আমরা বদলা চাই।

সেসিলের মুখ একটা ওড়নায় ঢাকা। অনেকেই তাকে আসলে মাদাম এনবো বলে ভুল করেছে। কেউ ভাবলো সে ম্যানেজারের স্ত্রীর জনৈকা নাকউঁচু বান্ধবী, যাকে এখানকার লোকজন দু' চক্ষে দেখতে পারে না আসলে যেই হোক না কেন তাতে বড় একটা কিছু যায় আসে না তারা খেপে গেছে এত দামী রেশমী জামাকাপড় দেখে নরম তুলতুলে পশমের কোট, দস্তানা আর টুপিতে গোঁজা সাদা পালক—গা দিয়ে ভুর ভুর করে সুগন্ধ বেরোচ্ছে গায়ের চামড়া মাখনের মতো সাদা আর নরম—খেটে খাওয়া শরীর নয়

মা ক্রলে চেঁচিয়ে উঠল

—সবুর কর মজা দেখাচ্ছি! এত সাজগোজ, বড়মানুষী সব জন্মের মতো ঘুচিয়ে দেব!

লেভাকের বউ বলল, এই সব কুত্তীগুলো তো আমাদেরই রক্ত জল করা খাটনির টাকায় চালচালিয়াতি করে নিজেরা তুলতুলে দামী কোট পরে, আমরা এদিকে শীতে জমে যাই ওর জামাকাপড় খুলে দাও সব—বুঝুক বেঁচে থাকার যন্ত্রণা কত!

মুকেত এগিয়ে এল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ দাঁড়াও, ওকে একেবারে দিগম্বরী করে দিচ্ছি!

সেসিলের ওপর কে কত ঝাল ঝাড়বে, মুখে মুখে তারই হিসেবনিকেশ আর প্রতিযোগিতা চলল। কদর্য, অশ্লীল উক্তিও বাদ গেল না: 'অনেক দিন এসব অন্যায্য বিচার চলেছে। এখন থেকে রাস্তার মজুর আর কারখানার মালিক একই রকম খাবে, পরবে। এই সব বড়লোকের মেয়েগুলো, ভদ্র চেহারার বেশ্যাগুলো কিনা একটা জামা কিনতে পঞ্চাশ স্যু খরচ করে!'

চারদিকের হালচাল দেখে ভয়ে কাঁপছে সেসিল। তার মনে হচ্ছিল বুঝি স্না

এখুনি অজ্ঞান হয়ে যাবে। বারবার সে একটা কথাই বলছিল, 'শোনো শোনো, এই যে তোমরা, ভদ্রমহিলারা, দোহাই তোমাদের! আমাকে মেরে ফেল না।'

তার গলায় স্বর আর্তনাদের মতো শোনালো। একজোড়া ঠাণ্ডা হাত বুঝি তার গলা টিপে ধরেছে। পুরো জনতা তাকে ঠেলে দিল বুড়ো বোন্‌মরের সামনে। খিদের জ্বালায় বুড়োর বোধবুদ্ধি লোপ পেয়েছে। এই প্রথম সে বদলা নেবার জন্য যেন খেপে উঠল—এত বার যে হাত দুটো তার কত সঙ্গীর প্রাণ বাঁচিয়েছে, সেই হাতই এখন বিশ্বাসঘাতকতা করল. চেপে বসল সেসিলের নরম গলায়- ঠিক যেন নখদন্তহীন বৃদ্ধ সিংহ শেষ বারের মতো তার শিকারকে বাগে পেয়েছে।

দলের মেয়েরা চেঁচিয়ে উঠল।

—না না, ওকে ওপরে তুলে ধর!

এদিকে নেগ্রেল আর মঁসিয় এনবো ছুটে বেরিয়ে এসেছেন সেসিলকে রক্ষা করতে কিন্তু বাঁধভাঙা জনতার মধ্যে দিয়ে এগোবে কে? হাতহাতি শুরু হল। সিঁড়ির ওপর একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে গ্রেগোয়াররা দাঁড়িয়ে। সেসিলের মুখের ওড়নাটা ছিঁড়ে গেছে। মায়্যুর বউয়ের টনক নড়ল। সে বুড়ো বোন্‌মরকে বলল, ওকে ছেড়ে দাও। ও লা পিয়োলেইনে থাকে।

একটা কিশোরীর ওপর এই অত্যাচার আর দেখতে পারছিল না এতিয়েন। কি করে সকলের মন অন্য দিকে ঘোরানো যায় তাই ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল তার। লেভাকের কুড়ুলটা মাথার ওপর তুলে ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, ওহে ভাইসব, চল আমরা মেইগ্রার দোকানে যাই। ওখানে রুটি আছে, খাবার আছে. সব লুট করে আনি।

প্রথমবার সজোরে কুড়ুল দিয়ে দোকানের দরজায় আঘাত করল এতিয়েন। তার সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন, তাদের মধ্যে লেভাক আর মায়্যুও আছে।

মেয়েরা কিন্তু সেসিলকে ছাড়েনি। বুড়ো বোন্‌মরের হাত থেকে রেহাই পেয়ে সে এখন মা ব্রুলের খপ্পরে পড়েছে। জ্‌লঁ্যার নেতৃত্বে লিডি আর বেবের উবু হয়ে বসে সেসিলের স্কার্টটা তুলে দেখবার চেষ্টা করছে বড়মানুষের মেয়ের শরীরের গড়নটা কেমন! এর মধ্যেই সেসিলকে যথেষ্ট শারীরিক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে, তার জামাকাপড় ছিঁড়ে গেছে। হঠাৎ ঘোড়ায় চড়ে চাবুক হাতে কি একজন দেবদূতের আবির্ভাব হল? মঁসিয় স্ত্যন্‌লঁ্যা।

—শুয়ারকা বাচ্চা! আমাদের মেয়েদেয় গায়ে তোরা হাত তুলেছিস!

মঁসিয় স্ত্যন্‌লঁ্যা খেতে এসেছিলেন। দরজায় ধাক্কা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই এই দৃশ্য! তিনি সেসিলকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে ঘোড়ায় তুলে চাবুক হাঁকড়ালেন। মজুররা সবাই ছিটকে পড়ল এদিক ওদিক। নেগ্রেল আর মঁসিয় এনবো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। নেগ্রেল সেসিলকে ভেতরে নিয়ে এল। মঁসিয় এনবোর সঙ্গে ভেতরে আসবার সময় স্ত্যন্‌লঁ্যার কাঁধে একটা বড় পাথরের টুকরো এসে লাগল। আর একটু হলে হাড়টা ভেঙে চৌচির হয়ে যেত।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার হাড়গোড় সব গুঁড়িয়ে দাও। যন্ত্রপাতিগুলোর বারোটা তো বাজিয়েই দিয়েছ, এখন আমিই বা বাদ যাই কেন!

দরজাটা সজোরে বন্ধ করলেন মঁসিয় গ্রুগ্লঁ্যা।

—কি সব বদ্ধ পাগলের কাণ্ড। আর একটু এদিক ওদিক হলেই আমার মাথাটা ফাঁক হয়ে যেত। ওদের ভালো কথায় কিছু বোঝানোও যাবে না। শুভবুদ্ধি হারিয়েছে সব, এখন চাবুকের ঘায়ে শায়েস্তা করা দরকার!

বসবার ঘরে গ্রেগোয়াররা অসহায় করুণ চোখে সেসিলকে দেখছিলেন। তার শরীরে অবশ্য তেমন আঘাত লাগেনি তবে মুখের ওড়নাটা ছিঁড়ে গেছে। ইতিমধ্যে লা পিয়োলেইন থেকে মেলানি এসে গেছে। সে বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছে এই সব মজুররা কি রকম খেপে গেছে। আর সে সব কিছুই এত অতিরঞ্জিত করতে লাগল যে জঁল্যা যে ঘরের জানলার একটা কাঁচ ভেঙেছিল, সেটা মনে হতে লাগল একশোটা কাঁচের সমান। লা পিয়োলেইনের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। দেওয়াল, ছাদ সব ধসে গেছে। তার মানে মঁসিয় গ্রেগোয়ারের এত দিনের ধ্যানধারণা সব মিথ্যে: এই ছোটলোক মজুরগুলো যা খুশি তাই করতে পাবে!

রোজ ঘরে এল ওডিকোলন আর তোয়ালে নিয়ে। সে মন্তব্য করল, যাই হোক না কেন, লোকগুলো কিন্তু আসলে খুব খারাপ নয়।

মাদাম এনবো চেয়ারে বসেছিলেন। এখনও তাঁর চোখমুখ থেকে আতঙ্কের চিহ্ন মুছে যায়নি। নেগ্রেলের সাহস আর বুদ্ধিমত্তাকে তারিফ করলেন গ্রেগোয়াররা। মাদাম এনবো মুচকি হাসি হাসলেন। বিয়ের কথাবার্তা প্রায় পাকা হয়ে গেল। মঁসিয় এনবো তির্যক দৃষ্টিতে একবার স্ত্রীর দিকে তাকালেন, আর একবার নেগ্রেলের দিকে। ভাবলেন, এই ফুলের মতো নিষ্পাপ মেয়েটার জীবনটা এরা নষ্ট করে দেবে। ইচ্ছে করে, দুটোকেই গলা টিপে মেরে ফেলতে। ছি ছি, তাঁর স্ত্রীর এ কি রুচি! এর পর তো চাকরবাকরদের সঙ্গে

মঁসিয় গ্রুগ্লঁ্যা সস্নেহ দৃষ্টিতে মেয়েদের দিকে তাকালেন।

—কি রে, তোদের আবার হাড়গোড় ভাঙেনি তো?

ল্যুসি আর জান্ খুব ভয় পেয়েছিল সত্যি কথা, কিন্তু এ ধরনের নাটকীয় উত্তেজনা তাদের মন্দ লাগেনি। তারা খিল খিল করে হেসে উঠল।

মঁসিয় গ্রুগ্লঁ্যা বললেন, কি কাণ্ড দেখুন! দিনকাল কি পড়েছে! শোনো গো মেয়েরা, ল্যুসি আর জান্, তোমাদের বিয়েতে যদি পণ-টণ লাগে, এই বুড়ো বাপটার ওপর আবার জুলুম কোরো না যেন। নিজেরাই চেষ্টা চরিত্র করে টাকার যোগাড় করে নিও। হ্যাঁ, আর একটা কথাও বলে রাখি— আমার দেখাশুনো না করলে কিন্তু চলবে না।

মঁসিয় গ্রুগ্লঁ্যার গলা কাঁপছিল আবেগে। ল্যুসি আর জান্ বাবাকে জড়িয়ে ধরল। মঁসিয় গ্রুগ্লঁ্যার দু চোখে জল। মজুররা আজ ধ্বংসের তাণ্ডবে তাঁকে সর্বস্বান্ত করেছে।

মঁসিয় এনবোর চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ওদাযের মালিকানা তবে মঁসুর কর্তাদের হাতে এসে যাচ্ছে! কম দিন ধরে তো তদ্বির-তদারকি চলছে না এর জন্য। যাক, কর্তারা এবার তাহলে খুশী হবেন।

ঘরে স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলা শুরু হল এরপর: 'বাইরে কি হচ্ছে বলো তো?' 'চেঁচামেচির শব্দটা প্রায় মরে এসেছে।' 'পাথর ছোঁড়ার আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে না।' 'শুধু যেন দূরে কোথাও কুড়ুল দিয়ে আঘাত করার শব্দ।'

সকলের কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠল। পুরুষরা হলঘরে ফিরে গিয়ে কাঁচের দরজায় চোখ রাখলেন। মেয়েরা উঠল দোতলায়।

মঁসিয় এনবো মঁসিয় ডেন্সলঁ্যাকে বললেন, ঐ দেখুন, হতচ্ছাড়া হ্রাসন্তর দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি, এর পেছনে ওর হাত আছে।

কিন্তু তিনি ভুল করেছিলেন। আসলে ওখানে দাঁড়িয়েছিল এতিয়েন। মেইগ্রার দোকানের দরজায় কুড়ুল দিয়ে আঘাত করছিল বারবার। আর কর্কশ গলায় তার সঙ্গীসাথীদের ডাকছিল। বলছিল, এই দোকানের সব মাল আসলে মজুরদের। মেইগ্রা তিলে তিলে এতদিন ধরে যা কিছু শোষণ করেছে আজ কড়ায় গণ্ডায় তা উশুল করবার দিন।

ধীরে ধীরে পুরো দলটা জমায়েত হল মেইগ্রার দোকানের সামনে। 'আমরা রুটি চাই, খাবার চাই!' ঐ তো দরজার পেছনে কত খাবারভরা বস্তা। পেটের ভেতর আবার যেন মোচড় দিয়ে উঠল। হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকতে ব্যস্ত হল সকলে।

ইতিমধ্যে মেইগ্রা গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে এনবোদের রান্নাঘরে। সেখান থেকে দোকানটাকে আবার দেখা যায় না। তাই সে বেরিয়ে এসে পাম্পের পেছনে লুকিয়ে দাঁড়ালো। ঐ তো··· তার দোকানে ভাঙচুর চলছে। সবার মুখে তার নাম এটা কি দুঃস্বপ্ন? নিজেকে চিমটি কাটলো সে। কই না তো! কারণ শুধু চোখে দেখা তো নয়, কানেও তো সব কিছু শুনতে পাচ্ছে সে। প্রতিটা কুড়ুলের কোপ যেন তারই বুকে এসে পড়ছে। এই একটা খিল ভেঙে পড়ল: আর পাঁচ মিনিট, ব্যস তারপরই পুরো দোকানটা ওদের হাতের মুঠোয় এসে যাবে। চোখের সামনে সবকিছু পরিষ্কার ছবির মতো ভেসে উঠছিল: ওই তো বস্তাভরা সব খাবার লুট হয়ে যাচ্ছে, সব মদের বোতল খালি হয়ে গেল—কিছু পড়ে নেই আর। এবার গ্রামের পথে পথে ভিক্ষে করতে হবে মেইগ্রাকে। না! কিছুতেই এ জিনিস সে বরদাস্ত করবে না। তার চেয়ে সামনাসামনি লড়াই করে মরাও ভালো। ওই তো, জানলায় ঝুঁকে আছে তার বউয়ের ভয়ার্ত মুখ—যেন বোবা জন্তু একটা, চারপাশের অবস্থা দেখছে করুণ চোখে। তার দোকানের দোতলার জানলার নীচে একটা শেড আছে। মঁসিয় এনবোর বাড়ি থেকে দেওয়াল ধরে ধরে ওইখানে চলে যাওয়া যায়। ইস, রক্ত হিম হয়ে গেছে। দোকানের দরজাটা ভেতর থেকে ভারী ভারী জিনিসপত্র দিয়ে আরও বেশী জোরে ঠেকা দেওয়া উচিত ছিল। ওপর থেকে গরম মোম বা জলও তো ফেলা

যেত! ইস্, আবার কুড়ুলের আওয়াজ! মেইগ্রা মন ঠিক করে ফেলল। তারা স্বামী-স্ত্রী দরকার হলে জান দিয়েও জিনিসপত্র বাঁচাবে তবু মজুরদের হাতে এক টুকরো রুটিও তুলে দেবে না। ওই পথেই বাড়ি ফেরার চেষ্টা করতে হবে, কার্নিশ বেয়ে, দেওয়াল ধরে ধরে···

ঠিক সেই সময় নীচ থেকে মজুররা চিৎকার করে উঠল।

—ওই তো! বজ্জাত হুলো বেড়ালটা! ওই তো মেইগ্রা··

সকলে মেইগ্রাকে শেডের ছাদে দেখতে পেয়েছে। জোরে লাফ মারলো সে। জানলার দিকে এগোল সন্তর্পণে টালির ওপর দিয়ে। কিন্তু ছাদের ধারটা যে বড় সরু। মড়মড় করছে কেন পায়ের তলায় ছাদটা? প্রাণের ভয়ে এগোতে লাগল মেইগ্রা। একটু এদিক ওদিক হলেই নিশ্চিত মৃত্যু। তার মাথা ঘুরছে, চোখে সব কিছু ঝাপসা লাগছে। কই, নীচের লোকগুলোকে আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না তো

—ওই যে মেইগ্রা! হারামজাদাটাকে মেরে ফেল!

মেইগ্রার হাত দুটো আর শরীরের ভার সামলাতে পারল না। একটা বলের মতোই তার শরীরটা ওপর থেকে নীচে গড়িয়ে পড়ল। একটা পাথরের চাঁইতে ধাক্কা লেগে মাথাটা দু ফাঁক হয়ে গেল—রক্ত, হাড়, মাংস ছিটকে গেল চারদিকে। মেইগ্রা মারা গেল। এখনও দেখা যাচ্ছে মেইগ্রার বউয়ের আবছা মূর্তিটা জানলায় দাঁড়িয়ে।

কয়েক মুহূর্ত সবাই আতঙ্কে, উত্তেজনায় কথা বলতে পারল না। এতিয়েনের হাত থেকে কুড়ুলটা পড়ে গেল শব্দ করে। মায়্যু, লেভাক, অন্য সকলেই দোকান লুট করার কথা ভুলে গেল সাময়িকভাবে। ওই যে, দেওয়ালের গা বেয়ে এখনও ক্ষীণ একটা রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। এখন আর কোনো চিৎকার চেঁচামেচি নেই।

একটু বাদেই আবার গণ্ডগোল শুরু হল।, এবার মেয়েরা। তারা হঠাৎই যেন খেপে উঠেছে এত রক্ত দেখে। পাষণ্ডটার শরীরে এত রক্তও ছিল!

—মরেছে, শকুনিটা মরেছে! ভগবান সত্যিই আছেন তাহলে!

সকলে মৃতদেহটা ঘিরে দাঁড়ালো। এখনও মেইগ্রার শরীরটা গরম। সবাই যা-তা গালাগাল দিচ্ছে। তার থেঁতলে যাওয়া খুলিটাকে তুলনা করছে তোবড়ানো মগের সঙ্গে। এতদিনের উপোসী ঝাঁঝরা শরীরগুলো সোচ্চার হয়ে উঠেছে প্রতিবাদে।

খণায় মায়্যুর বউ পাগলের মতো চেঁচাতে লাগল।

—কি রে মেইগ্রা, আমার কাছে ষাট ফ্রাঁ পাওনা ছিল তোর। আজ কড়ায় গণ্ডায় আদায় হয়েছে তো? আর আমাকে অপমান করতে পারবি না। দাঁড়া দাঁড়া, তোর টাকার খিদেটা আগে ঘুচিয়ে দিই!

দু হাতের দশটা শীর্ণ আঙুলে মাটি খুঁড়তে লাগল সে। তারপর চাপ চাপ মাটি গুঁজে দিল মেইগ্রার হাঁ করা মুখের ভেতরে।

—খা খা, শয়তান কুত্তা। যেমন করে অ্যাদ্দিন আমাদের খেয়ে এসেছিস, তেমনি করে খা!

চারদিক থেকে অশ্রাব্য. কুৎসিত গালিগালাজ ভেসে আসছিল মৃত মেইগ্রার উদ্দেশ্যে। রাত হয়ে আসছে। ওই তো, ওর মুখের নোংরা মাটিগুলো সব রুটির টুকরো—যা মজুরদের দিতে অরাজী ছিল মেইগ্রা। এখন থেকে এই মাটিই খাবে সে। গরীব মানুষদের রক্ত চোষার উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে আজ!

কিন্তু মেয়েদের রাগ ছিল অনেক অন্য কারণেও। ক্ষুধার্ত মাদী নেকড়ের মতো জ্বলজ্বলে চোখে তারা মেইগ্রাকে দেখছিল। এমন কিছু করতে হবে যাতে এত দিনের গায়ের ঝাল মেটে।

মা ব্রুলে চেঁচিয়ে উঠল।

—আমরা ওকে শাস্তি দেব। হুলো বেড়ালের মতো ও মেয়েদের ওপর অত্যাচার করত। সেই ভাবে ওকে শাস্তি দাও!

—হ্যাঁ হ্যাঁ, মেয়েছেলের শরীরে নজর ছিল ওর বড্ড বেশী। সে খাঁই আজ মিটিয়ে দাও!

মুকেত মেইগ্রার প্যাণ্ট খুলতে শুরু করে দিয়েছে। লেভাকের বউ তার ঠ্যাং দুটো উঁচু করে ধরল। মুকেত হ্যাঁচকা টানে প্যাণ্টটা খুলে ফেলল।

কাঁপা কাঁপা শীর্ণ রুক্ষ দুই হাতে মেইগ্রার সম্পূর্ণ পুরুষাঙ্গ চেপে ধরল মা ব্রুলে। এত জোরে টান মারল যে তার শরীরটা টাল সামলাতে না পেরে পেছনে হেলে গেল। প্রথম বারে কিছু হল না। কিন্তু আবার এক হ্যাঁচকা টান মারল বুড়ি। বিকল, রক্তাক্ত পুরুষাঙ্গ একতাল নরম মাংসের ডেলার মতো এখন মা ব্রুলের হাতে। সে সেটাকে ওপরে তুলে ধরল।

—ভাখ্, ভাখ্, আমি পেরেছি।

এত পরিশ্রমের পর বীভৎস পুরস্কার! সবাই উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল

—শালা শুয়োরের বাচ্চা, আর আমাদের ইজ্জত লুটতে পারবি না!

—হ্যাঁ হ্যাঁ, খাবারের দাম হিসেবে আর আমাদের দেহ বেচতে হবে না! এক টুকরো রুটির জন্য শয়তানটার শরীরের চাহিদা মেটাতে হবে না!

—এই মেইগ্রা, আমার কাছে তুই দশ ফ্রাঁ পাবি। শুধতে তো পারব না তবে তোর সঙ্গে শুতে পারি। কিন্তু তোর সাহস আর মুরোদে কুলোবে তো?

পৈশাচিক উল্লাসে কেঁপে কেঁপে উঠছিল সবাই। পরস্পরকে এমন ভাবে বিকৃত পুরুষাঙ্গটা দেখাচ্ছিল যেন সেটা কোনো ঘৃণ্য পশু। এখন তাকে মেরে ফেলা হয়েছে, আর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। সকলে ওই বিকৃত রক্তাক্ত জননেন্দ্রিয়ের ওপর থুথু ফেলল। তারপর বীভৎস গলায় বলতে লাগল: 'আর ও কিছু করতে পারবে না। কিচ্ছু না। ও এবার কবরে যাবে! হাঃ হাঃ, তাও একজন পুরো মানুষ হিসেবে নয়। যা যা হতচ্ছাড়া, যা নিয়ে তোর বড় বেশী গর্ব ছিল তাই খুইয়ে এখন মাটির তলায় শুয়ে থাক্!

তারপর মা ক্রলে পুরো মাংসের ডেলাটা তার লাঠির আগায় গেঁথে নিল। সেটাকে উঁচু করে তুলে ধরে রাস্তায় চলতে শুরু করল উন্মত্ত উল্লাসে। তার পেছনে উজ্জ্বল হাসিখুশী মুখে একগাদা মেয়ে বউ। টপ টপ করে রক্ত পড়ছে লাঠিটা বেয়ে, যেন এক টুকরো পাঁঠার মাংস। ওপরের জানলায় মেইগ্রার বউ, এখনও নিশ্চল, নিস্পন্দ! সূর্যের শেষ রশ্মি অল্প আলো ফেলেছে তার মুখে। আধভাঙা কাঁচের মধ্যে দিয়ে হঠাৎ দেখলে মনে হয় সে বুঝি বা হাসছে একটু একটু। দিনের পর দিন মার খেয়ে, অপমানিত হয়ে রুগ্ন শরীরে সে বেঁচে আছে। হয়তো বা সত্যিই হাসছে --স্বামী নয়, স্বামীর ভেতরকার জানোয়ারটা আজ মরেছে দেখে!

এতিয়েন, মায়্যু কেউ কোনো কথা বলছিল না। হিমশীতল নীরবতা। তারা মেয়েদের বাধাও দিতে পারছিল না। তিসোঁর মদের দোকানের দরজায় বিরক্তমুখে স্নাসন্যর, জাশারী আর ফিলোমিনের আতঙ্কিত চোখ, বোনমর আর মুক্যু বারবার এদিক ওদিক মাথা নাড়াচ্ছে... শুধু খিক খিক করে হাসছে জ'ল'া, মাঝে মাঝে বেবেরকে খোঁচা দিচ্ছে আর লিডিকে চোখ তুলে দেখতে বলছে। মেয়েরা পিছু ফিরেছে। সার বেঁধে চলেছে ম্যানেজারের জানলার পাশ দিয়ে। মঁসিয় এনবোর বাড়িতে উপস্থিত মহিলারা সারসের মতো লম্বা গলা বাড়িয়ে দেখতে চেষ্টা করছেন। তাঁরা তো আর মেইগ্রার পড়ে যাওয়াটা দেখতে পাননি। দেওয়ালের আড়াল পড়াতে তাঁরা কিছুই বুঝতে পারেননি ব্যাপারটা। এখন তো আরোই কিছু দেখা যাচ্ছে না প্রায়, বাইরে বেশ অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।

সেসিলের ভয় খানিকটা কেটেছে এতক্ষণে। সেও উঁকি মারল।

—আচ্ছা, লাঠির আগায় ওটা কি?

ল্যুসি আর জান্ মন্তব্য করল।

—খরগোশের চামড়া বোধহয়!

মাদাম এনবো অন্যমনস্কভাবে বললেন, না না, বোধহয় সত্য কোনো মাংসের দোকান লুট করে এসেছে। মনে হচ্ছে এক টুকরো শুয়োরের মাংস।

তারপরই তিনি বুঝতে পারলেন যেন। কেঁপে উঠে চুপ করে গেলেন। মাদাম গ্রেগোযার তাঁকে হাঁটুতে গুঁতো মেরে ইঙ্গিত করলেন। দু'জন মাঝবয়েসী মহিলা আতঙ্কে, উত্তেজনায়, ঘৃণায় নির্বাক হয়ে রইলেন। মেয়েরাও ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। ওরাও কি কিছু অনুমান করতে পেরেছে? কই, ওরা তো আর কোনো প্রশ্ন করছে না!

সমস্ত দলটা আস্তে আস্তে দূরে চলে গেল। এতিয়েন কুড়ুলটা আবার হাতে তুলে নিল। কিন্তু মন থেকে কিছুতেই বীভৎস দৃশ্যটা মুছে ফেলা যাচ্ছে না। দোকানের সামনে আড়াআড়িভাবে মেইগ্রার মৃতদেহটা পড়ে আছে। অনেকেই ফিরে যাবার মুখে। খিদেবোধ চলে গেছে এই বিশ্রী গা-ঘিনঘিনে দৃশ্য দেখে। মায়্যু চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ কানের কাছে ফিসফিসে আওয়াজ শুনে ঘুরে দাঁড়ালো। ক্যাথরিন। পরনে এখনও পুরুষের পোশাক। হাতে মুখে কয়লার গুঁড়ো। রুক্ষ

নিঃশ্বাস ফেলছে, উত্তেজনায় ঘামছে। মেয়েকে দেখে মাথায় রক্ত উঠে গেল মাহ্যুর। না, ক্যাথরিনের কোনো কথাই সে শুনতে চায় না। ধাক্কা মেরে দূরে সরিয়ে দিতে গেল মেয়েকে। ক্যাথরিন একটু দ্বিধা করে ছুটে গেল এতিয়েনের কাছে।

—পালাও তোমরা·· পুলিস আসছে, পুলিস!

এতিয়েনও ধাক্কা মারতে গেল ক্যাথরিনকে, অভিশাপ দিতে লাগল। শরীরের যেখানে ক্যাথরিন তাকে আঘাত করেছিল সেখানটা যেন হঠাৎই আবার জ্বালা করে উঠল। কান দুটো গরম হয়ে গেল। কিন্তু ক্যাথরিন ছাড়বার পাত্রী নয়। সে এতিয়েনের হাত থেকে কুড়ুলটা কেড়ে নিয়ে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর তাকে দু হাতে আঁকড়ে ধরে বলল, বলছি যে তোমায়, পুলিস আসছে! শাভাল খবর দিয়েছে পুলিসকে। আমি ওর ব্যবহারে দুঃখিত। তাই তো ছুটে এলাম! শীগগির পালাও! আমি চাই না তুমি, তোমরা কেউ ধরা পড়।

ক্যাথরিন সবেমাত্র এতিয়েনকে টেনে এনেছে কি আনেনি, দূর থেকে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ ভেসে এল। সবাই চেঁচিয়ে উঠল, পুলিস! পুলিস! পাগলের মতো দৌড়তে লাগল সকলে। দু মিনিটের মধ্যেই সমস্ত জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেল। জনমানব নেই। যেন বিরাট এক ঝড় এসে সবাইকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। শুধু বড় রাস্তার এক পাশে পড়ে আছে মেইগ্রার দেহটা। তির্সোঁর দোকানের সামনে হাসন্তর ছাড়া আর কেউ নেই। তার ঠোঁটের কোণে এক টুকরো হাসি খেলে গেল। এদিকে তথাকথিত পুঁজিপতিরা অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে কাঁচের দরজা জানলায় চোখ রেখে দরদর করে ঘামছিলেন।

রাতের আকাশ শান্ত, নিস্তব্ধ। অনেক দূরে দূরে শুধু গোটাকয়েক ফার্নেস আর চিমনির আভাস, লালচে আগুনের আভা, কালো ধোঁয়া। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হল। বিরাট এক পুলিসবাহিনী এখন রাস্তায়। তাদের পেছনে পেছনে মার্শিয়েন থেকে লোক এসেছে গাড়িতে. এনবোদের বাড়ির জন্য ফরমায়েশী রান্নার জিনিসপত্র নিয়ে। হাল্কা দু চাকার কাঠের গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামল অল্পবয়েসী ছেলেটা। তার হাতের বাক্সে রয়েছে সুস্বাদু মাংসের পিঠে।

ষষ্ঠ পর্ব

ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম পনেরো দিন কেটে গেল। আকাশের কুয়াশা তো কাটলোই না, সকলের মনে অসন্তোষের কালো কুয়াশাও গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে। হাড়কাঁপানো শীত। গরীব লোকগুলোর ওপর নিগ্রহের আর বাকি রইল না কিছু। মালিকপক্ষ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবার জন্য তিনজনকে পাঠালো—লিল-এর শাসনকর্তা, এক আইনবিদ আর সেনাবাহিনীর বড়কর্তা। পুলিস তো ব্যর্থ হল। এবার দরকার হলে সেনাবাহিনীর বেয়নেটের ডগায় সব ক'টাকে শায়েস্তা করতে হবে! পুরো মঁস্যু অঞ্চল ছেয়ে গেছে সেনাতে। প্রতি খনিতে সশস্ত্র পাহারা, ইঞ্জিনগুলোর সামনেও। ম্যানেজারের বাড়ি, খনির সামনের বিস্তীর্ণ খোলা জায়গাটা এমন কি ওপরওয়ালা কর্মচারীদের বাড়িও বাদ যায়নি। সমস্ত রাস্তায় পাহারাদার টহল দেয়, ভোরোর আবর্জনা ফেলার জায়গাতেও সর্বদা লোক মজুত। প্রতি দু ঘণ্টায় তারা সমস্বরে গলায় হাঁক পাড়ে:

—কে যায়? সঙ্কেতবাক্য বলো!

কোথাও কোনো কাজ আরম্ভ হয়নি বরং ধর্মঘট আরও ছড়িয়েছে বলা যেতে পারে। ক্রেভক্যর, মিরু, আর মাদলেন-এও লা ভোরোর মতোই কয়লার উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে। ফ্যত্রি কঁতে আর লা ভিক্তোয়ারেও দিনের দিন মজুরের সংখ্যা কমছে। এমন কি এতদিন ধরে একমাত্র নিরুপদ্রুত এলাকা সেণ্ট-টমাসেও এখন কাজ করবার মতো লোক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। শ্রমিকেরা চুপচাপ থেকে সমস্ত রকম অসহযোগিতা শুরু করেছে। তাদের আত্মসম্মানে ঘা লেগেছে যে! কোনো শ্রমিক বসতিগুলোয় প্রাণের সাড়া নেই। একটা মজুরকেও বাইরে বিশেষ ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় না। যদি বা ক্বচিৎ কখনও পথেঘাটে দু-একজনকে দেখতেও পাও, তবে বুঝবে তারা কেমন মাথা নীচু করে একলা একলা দ্রুত পথটুকু পার হয়ে যাচ্ছে, আশেপাশে সেনাবাহিনীর লোক দেখলেই চট্ করে মুখ নিচু করছে। কিন্তু এই হিমেল নিস্তব্ধতার আড়ালে বিস্ফোরণের আভাস। মজুরদের অবস্থা খাঁচার বন্দী হিংস্র পশুর মতো—যারা নিষ্ফল আক্রোশে চাবুক হাতে মালিকের তড়পানি দেখে মনে মনে গজরায় আর নিঃশব্দে অপেক্ষা করে কখন একবার মানুষটা পেছন ফিরবে! শুধু পলক ফেলার অপেক্ষা। ঝাঁপিয়ে পড়ে টুটিটা টিপে ধরা তো তেমন কিছু শক্ত কাজ নয়! এদিকে কোম্পানির লাভের খাতায় তো শূন্য! কথা হচ্ছে, বরিনেজ (বেলজিয়াম সীমান্ত) থেকে মজুর ভাড়া করে আনতে হবে, কিন্তু সাহসে কুলোয় না। ফলে পরিস্থিতি দাঁড়ালো এই যে মজুররা দরজা বন্ধ করে বাড়িতে, আর জনশূন্য খনি পাহারা দিচ্ছে সশস্ত্র সান্ত্রী!

তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে মেইগ্রার মৃত্যু নিতান্তই দুর্ঘটনা এবং পতনজনিত। তার তালগোল পাকানো শরীরটা যেন এখনও চোখের সামনে ভাসে। কোম্পানি ক্ষতির পরিমাণ খোলাখুলি স্বীকার করে নিতে সঙ্কোচ পাচ্ছে। গ্রেগোয়াররাও তেমনি মেয়ের কেলেঙ্কারীর কথা গোপন রাখতে চান। সেদিনের উত্তেজিত জনতা আজ একেবারে শান্ত। কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিস। ভুল করে পিয়োরোঁকে ধরেছে তারা, তাই দেখে অন্য সকলের কি হাসি! হ্রাসঙ্গর তো জেলে যেতে যেতে বেঁচে গেছে। কোম্পানি মজুরদের নামের একটা তালিকা করেছে কাকে কাকে ছাঁটাই করতে হবে। মায়্যু, লেভাক ছাড়া দুশো চল্লিশ নম্বর কলোনীর আরও চৌত্রিশ জন। কর্তৃপক্ষের যত আক্রোশ এতিয়েনের ওপর। কিন্তু গণ্ডগোলের দিন থেকেই সে নিখোঁজ। শাভালই চুকলি কেটেছে গায়ের ঝাল মেটাতে। অন্যদের নামও করত, বাবা-মাকে বাঁচাবার জন্য ক্যাথরিন হাতে পায়ে ধরতে বাকি রেখেছিল শুধু। এই ভাবে একটার পর একটা দিন কেটে যাচ্ছে। সঠিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কেউই ওয়াকিবহাল নয়।

মস্যুঁর উচ্চমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের রাতের ঘুম নষ্ট হয়ে গেছে। সব সময়ই আতঙ্কে ভুগছে তারা। নতুন ধর্মযাজক রাঁভিয়ে সবাইকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি আগের ধর্মযাজকের মতো ভালোমানুষ নন। ধর্মঘটীদের সপক্ষে এবং মালিকপক্ষের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে কথা বলতে লাগলেন ভদ্রলোক। ওপরতলার লোকরা নাকি ধর্মবিরুদ্ধ কাজকর্ম করছে। প্রীতি, সৌজন্য, ভ্রাতৃত্ববোধ সব নাকি লাটে উঠেছে। এমন কি বড়লোকদের চোখ রাঙাতেও ছাড়লেন না তিনি। এইভাবে গরীবের দুঃখে মন-টাকে পাষাণ করে রাখলে নাকি ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। আর ভগবান চিরকালই অসহায়দের পক্ষে। এই সব বড়মানুষদের সৌভাগ্য কেড়ে নিয়ে তিনি তা সুষম ভাবে ভাগ করে দেবেন গরীবদের ঘরে ঘরে। ধর্মভীরু মহিলারা এক অজানা দুর্ভাবনায় কেঁপে উঠলেন।

মঁসিয় এনবো এসব কথা শুনে কাঁধ ঝাঁকালেন।

—বাদ দাও তো। যদি বেশী বাড়াবাড়ি করে, বিশপকে জানালেই তিনি ওকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেবেন।

যখন এই রকম অবস্থা, এতিয়েন কিন্তু জঁল্যার গোপন আস্তানায় লুকিয়ে আছে। কেউ ভাবতেই পারেনি ও এত কাছেই আছে। সুড়ঙ্গের মুখটা এত আগাছা আর ফেলে দেওয়া জিনিসে ভর্তি যে কেউ কষ্ট করে সেগুলো একবার সরিয়েও দেখেনি। তার ওপর তো ভেতরে যা অস্বাভাবিক গরম আর সরু রাস্তা! সাহস করে ঢুকবে কে? তবে একবার ভেতরে গেলেই যেন দস্যুদের দলপতির আখড়ার ছবিটা পরিষ্কার হয়ে যায়। খানিকটা জিন, শুকনো কড মাছ, আরও টুকিটাকি নানান জিনিস। খড়ের বড় বিছানাটা দিব্যি নরম! এত নীচে হাওয়াটা অসহ্য গরমও নয়! জঁল্যা তো উৎসাহে একেবারে টগবগ করে ফুটছে। সান্ত্রীদের চোখে ধুলো দিয়ে সে কত কি এনে দিয়েছে, এমন কি মাথার তেল পর্যন্ত! কিন্তু একটা জিনিস আনতে বড় ভুল

করে, যদি লোক জানাজানি হয়ে যায়! মোমবাতি!

পাঁচ দিনের দিন প্রথম এতিয়েন সাহস করে খাবার সময় একটা মোমবাতি জ্বাললো। আলো ছাড়া খেতে এত অসুবিধে হয়। এই চাপ চাপ অন্ধকারে টিঁকে থাকার সংগ্রাম দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে সে! একটা কথা ঠিক যে এখানে নিশ্চিন্ত, নিরাপদ আশ্রয়, খাবারের অভাব নেই, অপর্যাপ্ত বিশ্রাম। কিন্তু ভগবান! আলো যে মানুষের জীবনে কতটা দরকারী তা বোধহয় এই রকম বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে না পড়লে যথার্থ অনুভব করা যায় না। এমনই অবস্থা এখন যে চুরি করা খাবারদাবারের ওপর ভরসা করে দিন কাটাতে হচ্ছে। এতদিনের নীতি, ধারণা সব ভেঙে চুরমার হয়ে গেল! কিন্তু সে কিই বা করতে পারে! এখনও অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে। না খেয়ে শুকিয়ে মরলেই তো আর সমস্যার সমাধান হবে না! আসলে অন্য এক দুশ্চিন্তা দিনরাত এতিয়েনকে কুরে কুরে খাচ্ছে। সর্বত্র গুজব রটেছে যে গণ্ডগোলের দিন নাকি খালি পেটে মাল টেনে সে খোলা ছুরি নিয়ে শাভালকে মারতে গিয়েছিল। সর্বনাশ! সেও কি তার বাবার মতো মদ্যপ হিংস্র হবে না কি? ছি ছি, শেষ পর্যন্ত কি সে মাতাল হয়ে মানুষ খুন করবে? এখন এই পাগল-করা ভাবনায় সে অস্থির! শরীর বেশ অসুস্থ লাগে। বমি বমি ভাব, মাথায় যন্ত্রণা, মুখটা বিস্বাদ লাগে সর্বক্ষণ।

এক সপ্তাহ কেটে গেল। একমাত্র মায়্যুরাই জানে তার এই গোপন আস্তানার কথা কিন্তু ভরসা করে একটা মোমবাতিও পাঠাতে পারছে না। আস্তে আস্তে এবার খাওয়াদাওয়াও ছেড়ে দিতে হবে।

একলা শুয়ে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আবোলতাবোল চিন্তা করে এতিয়েন। নিজেকে মস্ত বড় একজন নেতা মনে করে নাকি সে যে সেইজন্য সহকর্মীদের ছেড়ে ঘেয়ো কুকুরের মতো নির্জনে আত্মগোপন করে আছে? সেদিনের গণ্ডগোলের ব্যাপারটা চিন্তা করেও অবাক লাগে তার। ওইভাবে খনিগুলোর ক্ষতি করা কি ঠিক কাজ হয়েছে? কিন্তু নিজের মুখোমুখি দাঁড়াতেও যে সাহস হয় না আর! সর্বত্র হা হুতাশ আর অনাহারের ছাপ! কখনও হয়তো দুশো চল্লিশ নম্বর কলোনীতে আর পাও রাখা যাবে না। এই সব মাথামোটা লোকগুলোকে রাজনীতিতে টেনে আনাই হয়তো বা ভুল হয়েছিল! বারবার সে চেষ্টা করেছে মজুরদের মনের পরিসরটাকে বড় করতে, শোষণতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করতে, ঐক্যবদ্ধ করতে, কিন্তু কতটা সফলতা এসেছে! এই অনাহার আর দারিদ্র্যের লৌহকপাট ভাঙবে কবে? আস্তে আস্তে সেও পাল্টে যাচ্ছে। এখন মনে হয় এত কষ্ট করাটাই নিছক মূঢ়তা—খাও দাও, ফুর্তি কর! কি দরকার বিপ্লব করার? সুখে থাকতে কি তোমায় ভূতে কিলিয়েছে?

একদিন সন্ধ্যেবেলা জ্যঁল্যা এক টুকরো মোমবাতি নিয়ে এল। চুরি করা জিনিস। যখন অন্ধকারে পাগল পাগল লাগে তখন দু-এক মিনিটের জন্য মোমবাতি জ্বালানো যায়। খাবার আর আলো—দুইয়েরই বাজার মন্দা! পাথুরে রুক্ষ মেঝেতে ইঁদুরের ছুটোছুটি, বড় বড় মাকড়সা জাল বুনছে…। হা ঈশ্বর, তার এ কি দুরবস্থা! এতিয়েন

অন্য মজুররা কি করছে কে জানে! এ তো আত্মপ্রবঞ্চনা, গা বাঁচাতে লুকিয়ে থাকা! ছি ছি, সে একটা কীটেরও অধম হয়ে গেল! না না—তা কেন? সে নিজেকেই আবার সান্ত্বনা দেয়—তার এখন নিরাপদে থাকা দরকার; জনস্বার্থে। এর পর থেকে আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে নয়, সে পুরোপুরি রাজনীতিই করবে। কিন্তু এভাবে ঘা খাওয়া কুকুরের মতো লুকিয়ে-চুরিয়ে নয়—ভদ্র পরিবেশে, খোলাখুলি।

দ্বিতীয় সপ্তাহের গোড়ার দিকে জঁল্যাঁ খবর আনলো যে পুলিস সন্দেহ করছে এতিয়েন বেলজিয়ামের দিকে পালিয়েছে। সেদিন রাত গাঢ় হলে সন্তর্পণে বাইরে এল এতিয়েন। এখন তার মনে দ্বিধা দ্বন্দ্ব—এত বিপ্লব বিপ্লব করেও আখেরে লাভটা কি হল? কোম্পানি তো নরম হল না! উল্টে তার ঘাড়েই সকলে দোষ আর দায়-দায়িত্ব চাপাবে। অথচ ধর্মঘট বন্ধ হওয়া মানে তার রাজনৈতিক জীবন শেষ! বারবার নিজের মনকে প্রবোধ দিচ্ছে সে—না না, এত কষ্ট করে, এত অত্যাচার সহ্য করে ধর্মঘটের প্রস্তুতি—এ কখনও বিফলে যেতে পারে না। পুঁজিবাদ নিপাত যাক! শ্রমতন্ত্রের জয় হোক!

সমস্ত অঞ্চল জুড়ে ধ্বংসের ইশারা। রাতের ঠাণ্ডা বাতাস যেন ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো চারদিক কাঁপিয়ে দিচ্ছে। চারদিকে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির টালমাটাল অবস্থা। পর পর শুধু বন্ধ কারখানা। ওতোঁ আর ফোভেল চিনির কারখানা তো দারুণভাবে মার খেয়েছে। এ মাসের দ্বিতীয় শনিবার থেকে ময়দাকলগুলোও বন্ধ। মার্শিয়েনের আশেপাশে দিনের দিন পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। গ্যগবোয়া কাচের কারখানায় সমস্ত ফার্নেস বন্ধ জ্বালানীর অভাবে। পর পর সর্বত্রই শ্রমিক ছাটাই হচ্ছে। ফর্জের তিনটে ফার্নেসের মধ্যে জ্বলছে মাত্র একটা। খনির জন্য তার (কেব্‌ল) তৈরী হয় যেখানে সেই ব্লজ্‌-কারখানাও স্তব্ধ। কোক-ওভেনের চিমনি-গুলোর মুখ দিয়ে আজ কতদিন একতিল ধোঁয়া বেরোচ্ছে না! গত দু বছর ধরে যে শিল্প বিপর্যয়ের সম্ভাবনা ছিল, মস্যুঁর শ্রমিক ধর্মঘট তাকে আরও ত্বরান্বিত করেছে বলা চলে। এই ভাবে কয়লার উৎপাদন বন্ধ হওয়া মানে সমস্ত কলকারখানার উৎপাদন বন্ধ হওয়া। একের পর এক সব কিছু বিপর্যস্ত, ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ব্যাঙ্কগুলো লালবাতি জ্বালবে এরপর—সমস্ত মধ্যবিত্ত পরিবার কপর্দকহীন হবে।

এই সব হিমেল সন্ধ্যায় আগে আগে এতিয়েন বুকভরা শ্বাস নিত। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে মাথা উঁচু করে আকাশ দেখত আর ভাবতো আগামী কাল সকালে নতুন সূর্য রাঙিয়ে দেবে দশ দিগন্ত। সোনালী দিন এল বলে! এখন তার যাবতীয় মাথাব্যথা কোম্পানির খনিগুলোকে নিয়ে—কতটা ক্ষয়ক্ষতি হল! এই ঘোর অন্ধকারে ছায়া ছায়া ধ্বংসস্তূপ থেকে একই সঙ্গে আতঙ্ক আর উত্তেজনায় শিউরে ওঠে এতিয়েন। মিন্থুর উত্তরদিকের গ্যালারী এমনভাবে ধসে পড়েছে যে জোয়াজেল-এর প্রায় একশো কিলোমিটার রাস্তা ভেঙে চৌচির হয়ে গেছে। ক্রেভক্যর, ম্যদলেনেও পাথরের চাঙড় আলগা হয়ে গেছে। জনশ্রুতি যে লা ভিক্তোয়ারে দু'জন ডেপুটি ধসে চাপা [illegible]

সম্ভব মেরামত করা দরকার—ওখানে টিম্বারিং-এর অবস্থা ভয়াবহ। জলের মতো টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে।

এই সব দেখে শুনে এতিয়েনের মনে আবার নতুন করে আশার আলো দেখা দিল। ধর্মঘট চলছে প্রায় তিন মাস ধরে। মজুররা মাথা নীচু করেনি। মস্যুঁর এই গণ্ডগোলের কথা প্যারিসে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমিতি সম্বন্ধে লোমহর্ষক কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছে। শাসক সম্প্রদায় আর কানে তুলো গুঁজে থাকতে পারছে না। শোনা যাচ্ছে কোম্পানির দু'জন পরিচালক তদন্ত করতে এসেছিলেন কিন্তু তিনদিন বাদেই নাকি 'সবকিছু ঠিক আছে' এই বলে ফিরে গেছেন। অর্থাৎ তাঁরা কাজের ভান করে কয়েকদিন পর পিছু হটেছেন। এতিয়েন এখন স্থির নিশ্চিত যে যুদ্ধে মজুররাই জিতবে।

কিন্তু পরের দিন রাতেই আবার চূড়ান্ত হতাশা। নাঃ, কোম্পানির মেরুদণ্ড বড় শক্ত, তাকে কি আর অত সহজে বেঁকানো যাবে? এখন লাখ লাখ টাকা ক্ষতি হলেও পরে মজুরদের রক্তের বিনিময়ে সে ঘাটতি তারা ঠিকই পুষিয়ে নেবে। সেই রাতে জাঁ-বার পর্যন্ত গেল এতিয়েন। সেখানে শুনল ভঁদাম খনির মালিকানা মস্যুঁর কর্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। মঁসিয় দ্যন্যলঁ্যার অবস্থা শোচনীয়। আর্থিক দুশ্চিন্তায় তাঁর মন তো বটেই, শরীরও ভেঙে পড়েছে। মেয়েরা এত দিনের ধার শোধ করতে ব্যস্ত। অন্তত জামাকাপড় বিক্রী করে যাতে ধার শোধ করতে না হয়, সেই চেষ্টাটুকুও তো করতে হবে। ভদ্রলোকের অবস্থা অনেক বেশী করুণ। মজুররা তো না খেয়ে খেয়ে অভ্যস্তই হয়ে গেছে, তাদের কষ্ট ববং অনেক কম হচ্ছে। বড়লোকরা দরজা জানলা বন্ধ করে আছে পাছে কেউ তাদের শুধু জল খেয়ে থাকতে দেখে ফেলে। জাঁ-বারে কোনো কাজ হচ্ছে না। গাস্ত-মারির পাম্প সারাতে হবে। হু হু করে জল বেরোচ্ছে। দ্যন্যলঁ্যা শেষ পর্যন্ত অনেক সাহস সঞ্চয় করে গ্রেগোয়ারদের বাড়িতে এক লক্ষ ফ্রাঁ ধার চাইতে গিয়েছিলেন। যথারীতি প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। এই শেষ আঘাতটুকুই হয়তো পাওনা ছিল। গ্রেগোয়াররাই পরামর্শ দিলেন খনিটা বেচে দিতে। তখনও মঁসিয় দ্যন্যলঁ্যা রাজী হননি। হা ঈশ্বর! এই লাঞ্ছনা, অপমানের জবাবে তিনি যদি মাথায় রক্ত উঠে মারা যেতেন! কিন্তু তাতেই বা লাভটা কি হত। শেষ পর্যন্ত অবস্থার চাপে তিনি মাথা নীচু করতে বাধ্য হলেন। মওকা পেয়ে বড্ড কম দর হাঁকছে সকলে, অথচ কি আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে, কত টাকা খরচ করে এই খনিকে ঢেলে সাজিয়েছিলেন। এখন তো মনে হচ্ছে, পাওনাদারদের ঠেকাবার মতো টাকা পেলেও সাত পুরুষের ভাগ্য। পুরো দুটো দিন নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন তিনি। মস্যুঁর মালিকরা অন্যায়ভাবে তাঁকে কোণঠাসা করে ফেলছে। ব্যস্, মালিকরা তাক বুঝে প্যারিস চলে গেল। মরুক বুড়োটা ভেবে ভেবে!

এতিয়েন অসহায় আক্রোশে দেখতে লাগল, বুঝতে চাইল অবস্থাটা। এই ধনী মালিকপক্ষের এত টাকা—এত টাকা যে চূড়ান্ত ক্ষয়ক্ষতিতেও নির্বিকার থাকতে পারে!

পরের দিন জঁল্যা একটা ভালো খবর নিয়ে এল। ল্যা ভোয়ার শ্যাফটে গণ্ডগোল হয়েছে। প্রতিটা জোড় থেকে জল বেরোচ্ছে। ছুতোর মিস্ত্রীদের খবরও দেওয়া হয়েছে।

এতদিন পর্যন্ত এতিয়েন ল্যা ভোয়ার দিকে যায়নি। ওখানে সান্ত্রীটা এখন দিন রাত্তির পাহারা দেয়। তার শ্যেনদৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া খুব মুশকিল। সেদিন ভোর তিনটের সময় এতিয়েন ল্যা ভোয়ার দিকে রওনা হল। তখনও আলো ফোটেনি। ঐ তো ছুতোরদের যন্ত্রপাতির খটখটানি শোনা যাচ্ছে। বেশ হয়েছে শ্যাফটটা নষ্ট হয়ে!

ভোরের আলো ফুটলো। সান্ত্রীটা তখনও স্তুপের ওপর একইভাবে দাঁড়িয়ে। এবার তো আর ওর চোখকে ফাঁকি দেবার উপায় নেই। সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে এই সব সৈন্যদের বেছে নিয়ে সেই সাধারণ মানুষের বিপক্ষেই এদের লড়াইয়ে নামানো হয়। বিধাতার কি নির্মম পরিহাস! ইস্, একবার যদি এদেরও দলে টানা যেত; শাসক গোষ্ঠীর ফায়দা লোটা বেরিয়ে যেত। এই সব সেপাইরা কি করে ভুলে যায় যে তারাও সমাজের খেটে খাওয়া মানুষের স্তর থেকেই এসেছে। দু ঘণ্টায় সব কিছু হাতের মুঠোয় পুরে ফেলা যেত শুধু এদের সহায়তা পেলে। ধ্বংস করে দেওয়া যেত বুর্জোয়া ধনতন্ত্রের শেষ দুর্গটাকে। এদিকে তো শোনা যাচ্ছে সমস্ত সেনাবাহিনীতে সাম্যবাদের বীজ ঢুকেছে। তাহলে এরা কেন একজোট হয়ে মালিকদের বুক ঐ বেয়নেটের খোঁচায় আর মেশিনগানের গুলিতে এখনও ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে না? এতিয়েনের দু চোখে এখন রঙিন স্বপ্ন··

এতিয়েনের মনে হল সান্ত্রীটার সঙ্গে কথা বলে দেখা যাক একবার। ও কি ভাবছে এখন, তাও তো জানা দরকার।

যেন কোনো মতলবই নেই এমনভাবে এতিয়েন গুটিগুটি লোকটার দিকে এগোল। সেপাইটা কিন্তু এক পাও নড়ল না।

—কি বন্ধু, কি খবর বলো। কি বিশ্রী আবহাওয়া, দেখেছো? মনে হয় বরফ পড়বে।

সেপাইটা ছোটখাটো হালকা চেহারার। শান্ত মুখ, মুখে মেছেতার দাগ।

সে বিড়বিড় করে বলল, হতেও পারে।

মুখ তুলে নীল আকাশের দিকে তাকালো।

এতিয়েন বলল, কি নিষ্ঠুর লোক সব দেখ, তোমাকে এই ঠাণ্ডায় ঠায় দাঁড় করিয়ে রেখেছে। যেন কি না কি ভয়ংকর কাণ্ড হয়ে গেল।

লোকটা একটু কেঁপে উঠল। কোনো কথা বলল না। একটু দূরেই একটা পাথরের ছাউনী আছে। ঠাণ্ডা পড়লে দরকারমতো বুড়ো বোনমর সেখানে ঢুকত। কিন্তু ওপরওয়ালার কড়া হুকুম, এক মুহূর্তও এখান থেকে নড়া চলবে না। সেপাই বেচারীর আঙুলগুলো ঠাণ্ডায় জমে গেছে। ভালো করে বন্দুকটাও ধরতে

পারছে না। অন্তত ষাট জন সেপাই একইভাবে ল্য ভোরয়ের নানা জায়গায় পাহারা দিচ্ছে। ঝিমধরা বাচ্চার মতো থেমে থেমে এতিয়েনের কথার জবাব দিচ্ছিল লোকটা।

প্রায় পনেরো মিনিট ধরে সেপাইটার মুখ থেকে রাজনীতির কথা বার করতে চেষ্টা করল এতিয়েন। কিন্তু পারল না। কিছু না বুঝেই 'হ্যাঁ', 'না' এই রকম টুকটাক উত্তর দিচ্ছিল লোকটা। হ্যাঁ, বিপ্লব হচ্ছে বটে কিন্তু কি যে আসলে হচ্ছে তা সে সঠিক জানেই না। তাকে বলা হয়েছে, দরকার বুঝে গুলি চালাতে। ব্যস্, একটু এদিক ওদিক হলে তার চাকরি খতম!

ঘৃণায় শিউরে উঠছিল এতিয়েন। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেগুলো এত সহজে বদলে যায়, নিষ্ঠুর নির্বিকার হয়ে যায় শুধু সেনাবাহিনীর পোশাকটুকু পরে?

—তোমার নাম কি?

—জুল।

—কোত্থেকে আসছো?

—প্লগো।

দূরে আঙুল তুলে দেখালো সে। ব্রিটানির আশেপাশেই হবে হয়তো কোথাও। হঠাৎ চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার। ঠোঁটের কোণে ঝিকমিকিয়ে উঠল হাসি।

—জানো, আমার মা আছে। একটা বোনও আছে। ওরা অপেক্ষা করে আছে আমার জন্য। কিন্তু কবে যেতে পারব কে জানে। যখন এসেছিলাম, ওরা আমার সঙ্গে পঁ ল্যাবে পর্যন্ত এসেছিল। একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করেছিলাম। তা ঘোড়াটার আবার পাহাড়ী রাস্তায় ঠ্যাং মচকে যায় আর কি! আমার খুড়তুতো ভাই চার্চিল আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে কি ভালো সসেজ দিয়েছিল, কিন্তু মা আর বোন এমন কান্নাকাটি জুড়লো যে তরিবত করে খাওয়াই গেল না।

জুলের দু চোখে স্বপ্নের আবেশ ঘনিয়ে এল। সে যেন দূরে দেখতে পাচ্ছে তার ছোট্ট গ্রাম, মাকে, বোনকে··

এতিয়েনকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় ঠিক ভাবে কাজ করলে ওরা দু বছর পর আমাকে মাসখানেকের জন্য ছুটি দেবে?

এতিয়েন তখন তাকে নিজের বাড়ির কথা বলল। কত ছোটবেলায় সে সব কিছু ছেড়ে চলে এসেছে··এই রে, জঁলঁ্যা আবার তাকে ইশারা করছে দূর থেকে। দূর, কি দরকার শুধু শুধু এই সাদাসিধে সেপাইটার সঙ্গে বাজে গল্প করবার? একে সঠিক অবস্থাটা বোঝাতেই তো এতিয়েনের কয়েক জন্ম কেটে যাবে। হঠাৎ সে বুঝতে পারল জঁলঁ্যা তাকে ইশারা করছে কেন। এবার পাহারা বদল হবে। এই সেপাই-টার জায়গায় অন্য একজন আসবে। দৌড়ে নেমে এল সে। জঁলঁ্যা বলল একটা পুলিসের লোক নাকি সেপাইকে বলেছে গুলি ছুঁড়তে।

স্তূপের ওপরে জুল এখনো নড়েনি। ওখানে দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে যে আকাশের দিকে তাকিয়ে। তার বদলী লোক এল। নিয়মমাফিক পাহারা বদল হল।

এখন বেশ সকাল হয়ে গেছে। কিন্তু মজুরদের বসতি নিস্তব্ধ। কোথাও কোনো জনপ্রাণীর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

* * * *

দু'দিন ধরে সমানে বরফ পড়ার পর আজ সকালে তার প্রকোপটা একটু কমেছে। চারদিক বরফের পাতে ঢাকা। কয়লার দেশ যেন কোনো যাদুমন্ত্রবলে সাদা ধবধবে হয়ে গেছে। দুশো চল্লিশ নম্বর বসতিটা বরফে পুরো ঢাকা পড়ে আছে। একটা বাড়ির চিমনি থেকেও ধোঁয়া বেরোচ্ছে না। আগুন জ্বালার সামর্থ্যই নেই কারও। নিস্প্রাণ পাথরের মতো সারি সারি ঘর। ছাদের ওপরের বরফের স্তর এক চিলতেও গলতে পারেনি। ঠিক যেন সাদা পাথরের রাস্তায় সাদা পাথরের ঘরবাড়ি। মাঝে মাঝে শুধু সেনাবাহিনীর ভারী বুটের দাগ বরফ কেটে বসে গেছে।

মায়্যুদের বাড়িতে এক টুকরো কয়লাও নেই। গতকালই সব জ্বালানী শেষ হয়ে গেছে। আর এই আবহাওয়ায় পাহারাদারদের চোখে ধুলো দিয়ে কয়লা তুলতেই বা বেরোত কে? এত বরফ, যে চড়ুই পাখিরাও একটা ঘাসের শীষ খুঁজে পাচ্ছে না। দু হাত বরফ খুঁড়ে কয়লা বের করেছিল আলজির এব যথারীতি সে এখন কঠিন অসুখে পড়েছে। একটা জীর্ণ চাদর দিয়ে মায়্যুর বউ তাকে জড়িয়ে রেখেছে। ডাক্তার ভ্যাণ্ডারহেঘেন-এর বাড়িতে দু-দুবার তাঁকে ডাকতে গিয়েছিল সে। ডাক্তার বাড়ি ছিলেন না। পরিচারক অবশ্য বলেছে সন্ধ্যের আগেই তিনি বাড়িতে ফিরবেন। জানলা দিয়ে তাই নজর রাখছিল আলজিরের মা। ডাক্তার এ পথ দিয়ে গেলেই ধরতে হবে। আলজির কিছুতেই ওপরে যাবে না। সে কাঠের চেয়ারটায় বসে ঠকঠক করে কাঁপছে। তার ঠিক উল্টো দিকে ঠাকুর্দা। আবার তার পায়ের অবস্থা খারাপ হয়েছে। তবে বুড়ো বোধহয় এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। লেনোর আর অঁরি এখনও ফেরেনি। তারা জঁল্যার সঙ্গে রাস্তায় ভিক্ষে করতে বেরিয়েছে। খালি ঘরে অস্থির পায়ে পায়চারী করছে মায়্যু—যেন খাঁচায় বদ্ধ পশু, যে কেবল তার খাঁচাটা দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু বন্দীদশাটা চরমভাবে অনুভব করছে। এক ফোঁটা তেল পর্যন্ত নেই কিন্তু সন্ধ্যে ঘনিয়ে এলেও বাইরের চকচকে বরফ ঘরের ভেতরটা নরম পড়ন্ত আলোয় ভরিয়ে রেখেছে।

বাইরে একটা আওয়াজ হল। লেভাকের বউ রাগে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ঢুকল।

—বলি ও মায়্যু-গিন্নী! ভেবেছটা কি? বিশ্বসুদ্ধ লোককে বলে বেড়িয়েছ যে আমার ভাড়াটের সঙ্গে শুয়ে আমি কুড়ি সু করে আদায় করি।

মায়্যু-গিন্নী কাঁধ ঝাঁকালো।

—বোকার মতো কথা বোলো না। এরকম কিছু আমি মোটেই বলিনি। আর এ কথা তোমায় বলেছেই বা কে যে আমি রটিয়েছি?

—বাদ দাও। যেই বলুক না কেন তাতে কিছু যায় আসে না। তুমি তো এ কথাও বলেছ যে দেওয়াল ভেদ করে আমাদের সব কেচ্ছাই তোমাদের কানে আসে

—আমি সব সময় বুতলুর সঙ্গে বেলেল্লাপনা করি, তাই আমার সংসারের এই হাল ·· এবার বলো যে এ কথাও তুমি বলোনি।

এ রকম ঘটনা এখানে আগেও ঘটেছে। যে কোনো দু'জন মেয়েমানুষ এক জায়গায় হলেই পাড়ার বাসিন্দাদের রগরগে কেচ্ছা, কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি কিছুই বাদ যায়নি। কিন্তু সেগুলো নিজেদের মধ্যেই আবার মিটে গেছে। তাই নিয়ে বাড়ি বয়ে নোংরা ঝগড়া করতে কেউ আসেনি। আজকাল এই ধর্মঘটের পর পুরুষ মানুষ-গুলোও বাড়িতে বসে থাকে, মেয়েদের কূটকচালি শোনে আর নিজেদের মধ্যে মাথা গরম করে মারামারি বাধায়। আজ ঠিক তাই হল। একা লেভাকের বউ নয়। সঙ্গে বুতলুকেও হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এসেছে লেভাক নিজে।

—এই যে, আমাদের ভাড়াটেকেও নিয়ে এসেছি। কথাটা খোলাখুলি হয়ে যাক। কি হে, তুমি নাকি আমার বউয়ের সঙ্গে বিছানায় শোয়া বাবদ কুড়ি সু করে দাও?

বুতলু থতমত খেয়ে গেছে। সে প্রতিবাদ করে উঠল।—না না, কক্ষনো না।

লেভাক মায়্যুর নাকের সামনে ঘুঁষি পাকিয়ে বলল, ছাখো, আমিও মরদের বাচ্চা। এসব কেচ্ছা মুখ বুজে সহ্য করব না। তোমার উচিত বউকে চাবকে টিট করে দেওয়া। অন্য বাড়ির মেয়েদের সম্বন্ধে এ সব কথা বলে যে, তার মুখে পোকা পড়া উচিত।· তুমিই বা কি মাগের ভেড়া হে যে বউ যা বলে তাই বিশ্বাস কর।

মায়্যু গা ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

--কি যা-তা বলছো? এত সব কথা আসে কোত্থেকে? বাড়ি বয়ে ঝগড়া করতে এসেছ, না? মানে মানে সরে পড়। নয়তো ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দেব। আর আমিও জানতে চাই এসব বাজে গুজব কে ছড়াচ্ছে?

-পিয়েরোঁর বউ।

মায়্যুর বউ হেসে উঠল।

—ও বলল আর তুমিও বুড়ো মাগী সে কথা শুনে নেচে উঠলে? এবার আমি বলি, ও আমায় কি বলেছে তোমার নামে? তুমি নাকি তোমার ভাগার আর বুতলু দু'জনকেই একসঙ্গে নিয়ে শুয়ে থাকো! দু'জনের মাঝখানে।

ব্যস্! এ কথায় একেবারে আগুন জ্বলে গেল। সবাই চেঁচাচ্ছে।

লেভাকরা বলল, তোমাদের হাঁড়ির খবর জানতে আমাদেরও বাকি নেই। পিয়েরোঁর বউ সব বলেছে। ক্যাথরিনকে তোমরা টাকার লোভে বেচে দিয়েছ। ভলকাঁতে গিয়ে এতিয়েন বিশ্রী রোগ নিয়ে এসেছে আর তোমাদের সবার এখন সেই রোগ হয়েছে।

মায়্যু গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে উঠল।

—আমি এখুনি যাব ওর বাড়ি! একবার যদি শুনি হারামজাদী মাগী সত্যিই এত বড় মিথ্যে কথাটা বলেছে তো জুতিয়ে আমি ওর মুখ ভেঙে দেব।

দৌড়ে ঘর থেকে বেরোল সে। পেছনে পেছনে লেভাকরা। বুতলু এসব ঝগড়া-ঝাঁটি ভালোবাসে না। সে গুটি-গুটি বাড়ির দিকে চলল। মায়্যুর বউও বেরো[illegible]

হঠাৎ আলজির ককিয়ে উঠল। ভালো করে রুগ্ন মেয়েটাকে চাদর চাপা দিয়ে সে আবার জানলায় গিয়ে দাঁড়ালো, যদি ডাক্তারের দর্শন মেলে!

মাস্যুরা দেখল পিয়েরোঁর বাড়ির সামনে বরফের ওপর হাঁটছে লিডি। ঘরের দরজা জানলা বন্ধ, শুধু খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে এক চিলতে আলো আসছে। প্রথমে লিডি অপ্রস্তুত মুখে জানালো তার বাবা বাড়ি নেই। দিদিমা ধোপার বাড়ি থেকে জামা কাপড় আনতে গেছে। বাবাও সেখানে। মা কি করছে সে জানে না। তবে চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত ধূর্তভাবে হেসে বাচ্চা মেয়েটা বলল, মা তাকে বাইরে বার করে দিয়েছে কারণ ভেতরে মঁসিয় দঁসের এসেছেন। ওরা এখন কথাবার্তা বলতে ব্যস্ত।

এদিকে দঁসের ঐদিন সকাল থেকে ঢেঁড়া পেটাচ্ছিল পাড়ায় পাড়ায় যে সোমবার পর্যন্ত মালিকপক্ষ দেখবেন এরা সব কাজে যোগ দেয় কিনা। তারপর বেলজিয়াম থেকে মজুর আনা হবে। সন্ধ্যে নামতে সে সঙ্গের লোকজনদের বিদায় করে পিয়েরোঁর ঘরে এসে ঢুকেছে তার বউয়ের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করতে।

লেভাক ফিসফিস করে বলল, দাঁড়াও দেখি, কি করছে ওরা। অন্য কাজ পরে হবে। এই খুকী, তুই হাঁ করে কি দেখছিস? যা। অন্যদিকে খেলগে যা।

লিডি কয়েক পা সরে যেতেই লেভাক খড়খড়ির ফাঁকে চোখ রাখল। হাঁ হয়ে গেছে লেভাক। লেভাকের বউ উঁকি মারলো তারপর। ছিটকে সরে এল সে। মাস্যু চোখ রাখল তারপর। বিনে পয়সায় যা দেখা যায়, তাই লাভ। আবার তিনজন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পালা করে খড়খড়ির ফাঁকে চোখ রাখতে লাগল। ঘরের ভেতরটা পরিষ্কার ঝকঝক করছে, গনগনে আগুন জ্বলছে। টেবিলে কেকের টুকরো, বোতল, গ্লাস—দিব্যি ভোজ চলছিল। মজলিসী পরিবেশ। যে দৃশ্য তারা দেখল তা অন্য কোনো সময়ে হলে এ নিয়ে ছ মাস ঠাট্টা ইয়ার্কি করা যেত। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি অন্য রকম। এই যে পিয়েরোঁর বউ স্কার্টটা প্রায় মাথার ওপর তুলে পর-পুরুষের সঙ্গে জঘন্যতম আচরণ করছে তাতে কৌতুকের বদলে বিবমিষা আসে। যেখানে তোমার প্রতিবেশীর ঘরে এক টুকরো কয়লা নেই, এক দানা গম নেই, সেখানে তুমি কি না ফুর্তি মারছো?

লিডি চেঁচিয়ে উঠল, ঐ যে বাবা আসছে।

পিয়েরোঁ জামা কাপড়ের বাণ্ডিল নিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে

মাস্যু তাকে দেখে তেড়ে গেল।

—ভাখো, তোমার বউ যা-তা বলে বেড়াচ্ছে আমাদের নামে আমরা নাকি ক্যাথরিনকে বেচে দিয়েছি, আমাদের নোংরা অসুখ হয়েছে, এই সব। আর নিজের ঘরের ভেতরে কি হচ্ছে সে খবর রাখো কি? বউকে পরের কোলে শুইয়ে ক' টাকা রোজগার করো? ছি ছি, তুমি কি পুরুষমানুষ!

পিয়েরোঁ তো হাঁ! সে এত কথা বুঝতেই পারছে না। এদিকে বাইরে লোক-জনের গলার আওয়াজ পেয়ে দরজাটা একটু ফাঁক করল তার বউ। এখনও তার চোখমুখ লাল হয়ে রয়েছে। জামার বোতামগুলো খোলা। স্কার্টটা তুলে কোমরে

গোঁজা। ভেতরে দঁসের জামাকাপড় পরতে ব্যস্ত—সেটাও নজরে পড়ল সকলের। কোনো দিকে না তাকিয়ে দঁসের তড়িঘড়ি বাইরে বেরিয়ে চলে গেল। কি সর্বনাশ! ম্যানেজারের কানে গেলেই হয়েছে আর কি! এই ভূতগুলো, দেখা যাচ্ছে, তার চাকরি না খেয়ে ছাড়বে না।

লেভাকরা হো হো করে হাসতে লাগল, টিটকিরি দিতে লাগল।

লেভাকের বউ পিয়েরোঁর বউকে বলল, কি, সব সময় তো শুনি আমাদেরই চরিত্তির খারাপ! তুমি মাগী ধোয়া তুলসীপাতাটি, না? এতক্ষণ ধর্মকথা শুনছিলে ভেতরে? হবেই তো! বড় গাছে নৌকো বেঁধেছ, ছপ্পর ফুঁড়ে টাকা তো আসবেই। ছি ছি, অমন সতীপনার মুখে আমি ঝাঁটা মারি!

লেভাক বলল, আরে ছোঃ! রাস্তার কুত্তীগুলোকে দেখ না? একটা মদ্দা হলেই হল। এ আবার বলে বেড়ায় আমার বউ দু'জনকে নিয়ে থাকে! হ্যাঁ হ্যাঁ, ছেনাল মাগী! তুই এ কথা বলেছিস আমি শুনেছি।

কিন্তু এতক্ষণে পিয়েরোঁর বউয়ের ভয়ডর কেটে গেছে। সে নাক উঁচু করে সব অপমানের জবাব দেবে। কে না জানে এ পাড়ার সব মেয়ে বউদের মধ্যে সে ই সবচেয়ে বড়লোক আর সুন্দরী।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, যা বলেছি ঠিক বলেছি, বাস! এবার বিদেয় হও! যত সব হাভাতের দল! আমি কি করি না করি তাতে তোমাদের কি? আমরা ব্যাঙ্কে টাকা সরিয়ে রাখি, বেশ করি! নিজেদের মুরোদ নেই এক ফোঁটা, খালি লম্বা লম্বা কথা আর হিংসে! সব জলে পুড়ে মরছে! যা খুশি আমার বরকে বলতে পারো। ও তোমাদের মতো পরের কথায় নাচে না মঁসিয় দঁসের কখন আমাদের বাড়িতে আসেন, কেন আসেন সব ওর জানা।

পিয়েরোঁও দিব্যি বউয়ের দিক টেনে কথা বলতে শুরু করেছে। আস্তে আস্তে সবারই মেজাজ চড়তে লাগল। কথায় কথা বাড়ে। পিয়েরোঁকে বলা হল 'মালিক পক্ষের দালাল'। মজুরদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার হিসেবেই তো তার এই রমরমা অবস্থা! পিয়েরোঁ চিৎকার করে উঠল। হ্যাঁ হ্যাঁ, কে জানে যে মায়্যু তাকে ভয় দেখিয়ে উড়ো চিঠি দিয়েছে! ব্যস, মারামারি বেধে গেল—কি পুরুষ কি মেয়েরা—এই দুঃসহ দারিদ্র্য ভুলতেই কি এরা অহরহ নিজেদের রক্তদর্শন করছে? মায়্যু আর লেভাক ঘুঁষি পাকিয়ে তেড়ে গেল পিয়েরোঁর দিকে। শেষে অতিকষ্টে তাদের আলাদা করা হল।

এর মধ্যে মা ক্রুলে ফিরে এসেছে। জামাইয়ের নাক দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে। মারপিটের কারণ শুনে ঘেন্নায় নাক কুঁচকালো সে।

—এই শুয়োরের বাচ্চাটার জন্য আমার মানসম্মান আর রইল না দেখছি।

আস্তে আস্তে সবাই শান্ত হয়ে গেল। আবার সেই গাঢ় নিস্তব্ধ সন্ধ্যা।

মায়্যু বাড়ি ফিরে সাবধানে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বউকে জিজ্ঞেস করল, ডাক্তার এসেছিল?

মাহ্যু-গিন্নী জানলা থেকে নড়ল না।

—না।

—বাচ্চারা ফিরেছে ?

—না।

মাহ্যু আবার পায়চারী করতে শুরু করল। বুড়ো বোন্‌মর চেয়ারে ঝুঁকে বসে আছে এখনও। মাথাও তোলেনি। আলজির চুপচাপ। চেষ্টা করছে আর না কাঁপতে—বাবা মা যে তাকে দেখে বড় কষ্ট পাচ্ছেন! তার মতো বয়সে এত সহিষ্ণুতা খুব কমই দেখা যায়। তবু এর মধ্যেও দমকে দমকে তার ছোট্ট শরীরটা এক এক সময় এত কেঁপে কেঁপে উঠছে যে চাদর ভেদ করেও তা চোখে পড়ে। সে বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে আছে ছাদের দিকে—ঘরের সবটুকু আলো তো এখনও মরে যায়নি।

মাহ্যু-পরিবার দুর্গতির শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। মাদুর, চাদর, পশমের জিনিসপত্র, জামাকাপড় প্রায় সবই এক এক করে বিক্রী করতে হয়েছে। একদিন সন্ধ্যেবেলা ঠাকুর্দার একটা রুমাল বেচে দু সু ঘরে এসেছে। প্রতিটি জিনিস পয়সার জন্য ঘর থেকে বের করে দিতে হয়। আর সকলের বুকের ভেতরে প্রতিবারই নতুন করে ভাঙচুর হতে থাকে। সেই গোলাপী বাক্সটা, যেটা মাহ্যু প্রথম যৌবনে তার স্ত্রীকে উপহার দিয়েছিল—আলজিরের মা কাঁদতে কাঁদতে সেটাও বেচে দিয়ে এসেছে। এ যেন অভাবে পড়ে সন্তানকে পরের দরজায় চুপি চুপি রেখে আসা। ঘরে এখন আর প্রায় কিছুই নেই। আজকাল আর বাড়িতে কেউ কোনো জিনিস খোঁজে না। সে দরকারও পড়ে না কারণ সবাই জানে ঘরে কিছুই নেই। একটা মোমবাতি, এক টুকরো কয়লা, একটা আলু—কিস্সু না। শুধু মৃত্যুর হিমশীতল অদৃশ্য উপস্থিতি প্রতি মুহূর্তে অনুভব করা যায়। এদের একমাত্র ক্ষোভের কারণ এখন একটাই, কোম্পানির বিষ নজরে পড়ে আলজির পর্যন্ত তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

মাহ্যুর বউ বলল, এই যে, এসে গেছেন।

একজন মানুষ ঘরে ঢুকলেন। না, ডাক্তার নয়। নতুন ধর্মযাজক র‍াঁভিয়ে। তিনি যেন এই রকম পরিস্থিতির জন্যই প্রস্তুত ছিলেন। এই যে আসবাববিহীন ঘর, আলো নেই, রুটি কয়লা, কিছু নেই—এতে তিনি একটুও অবাক হননি। একটু আগেই কাছাকাছি তিনটে বাড়ি থেকে ঘুরে এসেছেন। ইদের আর তার সঙ্গীদের মতোই তিনি বাড়ি বাড়ি ঘুরেছেন, তবে ভিন্ন উদ্দেশ্যে।

র‍াঁভিয়ে বললেন, তোমরা রবিবারের প্রার্থনাসভায় গেলে না কেন? মস্ত বড় ভুল করছ তোমরা। একমাত্র ঈশ্বরই তোমাদের মুক্তিদাতা। আমায় কথা দাও পরের রবিবার নিশ্চয়ই আসবে।

মাহ্যু একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। তার পায়চারী করা বন্ধ হল না। কোনো কথাও সে বলল না। তার বউ বলল, প্রার্থনা করে কি লাভ? আপনার ভগবান তো আমাদের অসহায় অবস্থা দেখে ঠাট্টার হাসি হাসছেন। বলুন তো,

আমাদের এই ছোট্ট রুগ্ন মেয়েটা কি দোষ করেছে যে তাকে এইভাবে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে? আমাদের কষ্টের দিন কি এখনও শেষ হয়নি? নাকি আমাদের এখনও যথেষ্ট শিক্ষা হয়নি বলে আপনার ঈশ্বর এই ছোট্ট মেয়েটার ওপর তাঁর নিজের আক্রোশ মেটাচ্ছেন? আর আমি যা হয়ে ওর ঠোঁটে এক কাপ গরম পানীয়ও তুলে দিতে পারছি না!

ধর্মযাজক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তত্ত্বকথা শোনাতে লাগলেন: তিনি জানেন মালিকপক্ষের অত্যাচার আর মজুরদের অসহায়তার কথা। গীর্জা আর ভগবান—মজুরদের পক্ষে। এই সব শোষকসমাজ অন্যায়ভাবে ধর্মের অবমাননা করছে। যদি মজুররা সত্যিই মঙ্গল চায় তবে ভগবানের শরণ নিক। তিনি তাদের আলো দেখাবেন। এক সপ্তাহের মধ্যেই দুর্নীতি নির্মূল হয়ে যাবে। শ্রমতন্ত্র পৃথিবীতে স্থাপন করবে এক মহতী শান্তির আশ্বাস!

ধর্মযাজকের কথা শুনতে শুনতে মায়্যুর বউয়ের মনে হচ্ছিল সে যেন এতিয়েনের কথাই শুনতে পাচ্ছে। শুধু এতিয়েনের কথায় ভরসা হয়, এঁর কথায় তা হয় না—এইটুকুই যা তফাত।

—আপনি যা বলতে চাইছেন তা বুঝতে পারছি কিন্তু আসলে বুর্জোয়া মালিকপক্ষ আপনাকে নিশ্চয়ই ত্যাগ করছে, তাই এত কথা। আমাদের সব যাজকরাই মালিকপক্ষের সঙ্গে এক টেবিলে খানাপিনা করতেন—আর এক টুকরো রুটির জন্য দরবার করতে গেলে আমাদের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে দিতেন।

ব্যস্! আবার লম্বা লম্বা কথা শুরু হয়ে গেল। গীর্জার সঙ্গে সাধারণ মানুষের এত বিরোধ কেন—এই সব বিষয়ে নানা কথা। কথায় কথা বাড়ে। রঁাভিয়ে শহুরে যাজকদের কথা টেনে আনলেন। তাঁরা নাকি অহরহ বিলাসব্যসনে গা ভাসাচ্ছেন। চারদিকের সকরুণ আর্তনাদেও টনক নড়ে না। কিন্তু এই সব গ্রামের যাজকরাই প্রকৃত ধর্মান্বেষী। তাঁরাই বিপ্লব আনবেন সাধারণ খেটেখাওয়া মানুষকে পাশে নিয়ে। দু চোখ আনন্দে উত্তেজনায় চকচক করে উঠল তাঁর। আরও অনেক কথা মায়াবী তীক্ষ্ণতায় বলে গেলেন—মায়্যুরা তার অনেকটাই বুঝল না।

শেষ পর্যন্ত ধৈর্য হারালো মায়্যু।

-যান যান মশাই। লম্বা লম্বা বুকনি না ঝেড়ে একটা রুটি আনলে তো পারতেন! বাচ্চারা খেয়ে বাঁচত। আগে বাঁচবে তবে তো ধর্মের জয়গান!

রঁাভিয়ে বললেন, তোমরা রবিবার গীর্জায় এস। ভগবান আছেন।

এবার লেভাকের বাড়ি। আসলে ধর্মের মোহ রঁাভিয়েকে এতই আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে তিনি নির্বিবাদে এইসব ভুখা মানুষগুলোকে উপদেশ দিতে পারেন।

মায়্যু অক্লান্তভাবে পায়চারী করছিল। শূন্য ফায়ারপ্লেসে থুথু ফেলল বোনমর। আলজির প্রলাপ বকছে। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে তার গা। ছোট্ট মেয়েটির মতো খিলখিল করে হাসছে কখনও বা—বিকারের ঘোরে স্বপ্ন দেখছে সে যেন নরম সূর্যের আলোয় গা ভাসিয়ে খেলা করছে আর পাঁচজন সমবয়সী ছেলেমেয়ের সঙ্গে।

মেয়ের শরীর স্পর্শ করে আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল মায়্যুর বউ।

—কি কাণ্ড! এত জ্বর! আর ওই শুয়োরের বাচ্চা ডাক্তারটা কি মরেছে? আমি বাজি ফেলে বলতে পারি নচ্ছার বড়লোকগুলো ওকে আসতে দেয়নি।

হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। এত গালিগালাজ করা সত্ত্বেও আশায় দুলে উঠল মায়ের বুক। কিন্তু হা ভগবান। ডাক্তার নয়, এতিয়েন।

—কি হল, কেমন আছো সবাই?

সন্তর্পণে দরজাটা বন্ধ করে জিজ্ঞেস করল সে।

মাঝে মাঝেই সন্ধ্যের দিকে এমনি করে লুকিয়ে দেখা করতে আসে এতিয়েন। অজ্ঞাতবাসের দ্বিতীয় দিন থেকেই মায়্যুরা জানে তার গোপন আস্তানার কথা। বাকি লোকজনেরা অবশ্য ভাবে কোথায় উবে গেল জলজ্যান্ত ছোকরাটা! এখনও সকলে এতিয়েনকে বিশ্বাস করে যদিও সত্যি মিথ্যে অনেক গুজবই ছড়িয়েছে: এতিয়েন নাকি মুক্তিফৌজে নাম লিখিয়েছে—একদিন অনেক সোনাদানা, রসদ নিয়ে ফিরবে তারপরই নতুন সূর্যের আলো ধাঁধিয়ে দেবে চতুর্দিক, সুবিচার আসবে দেশে। কেউ বলে তাকে নাকি তিনজন ভদ্রলোকের সঙ্গে মার্শিয়েনের পথে দেখা গেছে। কেউ বা বলে দু'দিনের মধ্যেই সে ইংল্যাণ্ড পৌছবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেজাজ হারিয়ে সবাই তাকে ধিক্কার দেয়, এইভাবে গা বাঁচিয়ে চলার জন্য। ছি ছি, এতিয়েন নির্ঘাত কোনো গোপন কুঠুরীতে মুকেতের সঙ্গে বসে গা গরম করছে। দিনের পর দিন অভাব অনটনের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে মজুরদের বিশ্বাসে আস্তে আস্তে ফাটল ধরছে

এতিয়েন বলল, কি বিশ্রী আবহাওয়া দেখেছ? তোমাদের কি অবস্থা? নিশ্চয়ই পরিস্থিতির বিন্দুমাত্র উন্নতি হয়নি। শুনলাম নেগ্রেল নাকি বেলজিয়াম গেছে বরিনেজ থেকে মজুর ভাড়া করে আনতে। হে ভগবান! এ কথা সত্যি হলে তো মারা পড়ে যাব।

আবছা অন্ধকার ঘরের দিকে ভালো করে নজর করতে চেষ্টা করল এতিয়েন। হে ঈশ্বর, এই সব মানুষগুলোর জন্মজন্মান্তরের দুঃস্বপ্নের দিন শেষ হবে কবে? গলার ভেতরে কান্নাটা যেন দলা পাকিয়ে উঠল। কি বলে এদের সে সান্ত্বনা দেবে!

মায়্যু রাগে চেঁচিয়ে উঠল।

—যদি হারামজাদারা চায় যে খনি শেষ হয়ে যাক, তবেই যেন বেলজিয়ানদের কাজে নেয়। আমরা তার আগেই সব শেষ করে দেব।

এতিয়েন মাথা নাড়লো। এ ভাবে তো হবে না। চারদিকে সেপাইরা পাহারা দিচ্ছে। কয়লাখনির চৌহদ্দির মধ্যে একটা ছুঁচও গলতে পারবে না। কিন্তু মায়্যুকে বোঝাবে কে? সে জানে তার পিঠের ওপর বন্দুকের নলের ঠাণ্ডা স্পর্শ কিন্তু এই তুচ্ছ জিনিস দিয়ে কি তাকে দমিয়ে রাখতে পারবে কেউ? একটা মানুষকে আর কতবার মারবে ওরা? মায়্যু এখন ঠাণ্ডা কঠিন একটা শব। বন্দুকের একটা কেন, গোটা গুলিও তাকে আর নতুন করে আঘাত করতে পারবে না। মজুররা কি ক্রীতদাসেরও অধম? বন্দুকের বাঁট দিয়ে আঘাত করে তাদের খাদে নামানো হবে? খনিকে সে ভালোবাসে। আশৈশব জীবনের এতগুলো সোনালী দিন তো মাটির

নীচে অন্ধকারেই কেটে গেল—আজ দু মাস সে মাটির স্পর্শ পায়নি, কানে আসেনি শাবল গাঁইতির শব্দ—তার কি কষ্ট হচ্ছে না? মন টানছে না মাটির নীচে যাবার জন্য? তাদের জন্মগত অধিকারে ভাগ বসাবে বিদেশীরা?

মায়্যু বলল, আমি মাঝে মাঝে ধৈর্য হারিয়ে ফেলি। এত যন্ত্রণা সহ্য করার চেয়ে যদি মরে যেতে পারতাম।

এতিয়েন বকুনি দিল।

—বোকার মতো কথা বোলো না। এত দুর্বল হয়ে পড়লে ওরা অল্পেই পেয়ে বসবে। এতদিন বিশ্বস্ততার সঙ্গে খনিতে কাজ করেছ। মালিকের সাধ্য কি তোমাকে ছাঁটাই করবে!

কথা বলতে বলতে থেমে গেল এতিয়েন। বিকারের ঘোরে খিলখিল করে হাসছে আলজির। এতক্ষণ পর্যন্ত বুড়ো বোনমরের কাশির আওয়াজই শোনা যাচ্ছিল শুধু। বুকের ভেতরটা এক অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল এতিয়েনের। হায় ঈশ্বর! এইভাবে যদি বাচ্চাগুলো একে একে মরতে শুরু করে

উদ্গত আবেগ চেপে বলল, ছাখো, এভাবে চলতে পারে না আমরা শেষ হয়ে গেছি। এর চেয়ে আত্মসমর্পণ করা ভালো।

এতক্ষণ শান্ত হয়ে বসে ছিল মায়্যুর বউ। এবার বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল।

—কি বললে? তুমি—তুমি শেষ পর্যন্ত এই কথা বলছো?

এতিয়েন তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করল। কিন্তু কে শোনে কার কথা!

—তুমি আর কক্ষণো এ কথা বলবে না। এই আপোসের কথা শোনবার আগে ঈশ্বর যেন আমার মাথায় বাজ ফেলেন! তোমার চোয়াল ভেঙে দেব। আজ ৬ মাস যাবৎ অকথ্য যন্ত্রণা সহ্য করেছি। জিনিসপত্র সব বেচতে হয়েছে। বাচ্চাদের তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছি। এত আত্মত্যাগ শুধু ভবিষ্যতের কথা ভেবে। তোমার এত বড় সাহস যে তাকে অপমান কর! তার আগে আমি সব কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে, সকলকে মেরে শেষ করে রেখে যাব

স্বামীর দিকে ফিরল সে।

—শুনে রাখো। যদি কোনোদিন দেখি তুমি মালিকপক্ষের সঙ্গে আপোস করে খনিতে গেছ, সেদিন খনি থেকে ফেরবার পথে রাস্তায় আমি নিজে তোমার মুখে থুথু ফেলব।

অন্ধকারে মায়্যুর বউকে দেখতে পাচ্ছিল না এতিয়েন। কানে আসছিল শুধু রক্ত জল করা বাঘিনীর গর্জন—ভেতর ভেতর গুটিয়ে গেল সে। এত পাল্টে গেছে মায়্যুর বউ! এতদিন পর্যন্ত মাথা ঠাণ্ডা ছিল তার। এতিয়েনকে, স্বামীকে বিদ্রোহ করতে নিষেধ করেছে কতবার, ছেলেমেয়েদের মুখ চেয়ে। আজ সে-ই কি না কাউকে পিছু হটতে দিচ্ছে না। সব কিছুর শেষ দেখে তবে ছাড়বে। যেন মানুষ খুন করতেও হাত কাঁপবে না তার। এতিয়েনের বদলে রাজনীতির কথা বলছে এখন ক্যাথরিনের মা—রক্তের বদলে রক্ত চাই! চাবুকের বদলে চাবুক! মজুরদের দাবি

আর রক্ত দিয়ে গড়া ধনতন্ত্রের বুনিয়াদ বিপ্লবের বুলডোজার দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে!

—হাঁ্যা হাঁ্যা, আমি নিজের হাতে ওদের গলা টিপে ধরব। যথেষ্ট সহ্য করেছি, আর নয়। এবার আমাদের পালা। তুমি তো নিজেই এতদিন একথা আমাদের বুঝিয়েছ। যখন ভাবি আমাদের পূর্বপুরুষরাও এত যন্ত্রণা সহ্য করেছে মুখ বুজে, আমার মাথায় যেন রক্ত চড়ে যায়। মনে হয় খোলা ছুরি হাতে ছুটে যাই। অনেক আগেই আমাদের উচিত ছিল মসুঁর জমি ফালাফালা করে দেওয়া। এর সব কিছুর ভিত নড়িয়ে দিয়ে প্রতিশোধ নিতে পারলে যেন সাধ মিটত। মেহনতী জনতার শেষ রক্তবিন্দু নিংড়ে যে ইমারত এরা গড়েছে, একটা একটা করে তার ইঁট খসিয়ে সব ভূমিসাৎ করলে তবে শান্তি পাব। জানো, একটা ব্যাপারে আমার খেদ থেকে গেছে। বুড়ো যখন সেদিন লা পিয়োলেইন-এর সেসিল নামে মেয়েটার টুঁটি টিপে ধরতে গিয়েছিল তখন যে আমার কি ভিমরতি হল, আমি তাকে বাঁচালাম। আর আজ? বড়লোকেরা সবাই আমাদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। 'খিদে' নামের দানবটা আমার বাচ্চাগুলোর কচি, নরম গলায় তার হাতের লোহার মতো আঙুলগুলো চেপে বসিয়ে দিয়েছে!

মায়্যু গিন্নীর প্রতিটি কথা নিশ্ছিদ্র অন্ধকারকে কুঠারের মতো আঘাত করছিল সোনালী ভবিষ্যতের বিরাট বন্ধ দরজাটা এখনও খুলছে না তো! তার কঠিন কপাটে বারে বারে করাঘাত করাই সার হল শুধু!

এতিয়েন বলল, তুমি আমায় ভুল বুঝছো। আমাদের এখন কোম্পানির সঙ্গে সমঝোতা করা দরকার। খনিগুলোর অবস্থার যথেষ্ট অবনতি ঘটছে। এই মওকায় নিজেদের দাবীদাওযাগুলো খানিকটা আদায় করে নেওয়া যাবে।

—না না, তা কিছুতেই নয়!

লেনোর আর অঁরি ফিরে এল। খালি হাতে। তারা দুটো স্যু পেয়েছিল এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে কিন্তু পথে দিদি খালি ছোট ভাইকে মেরেছে। হাত ফসকে পয়সা পড়ে গেছে বরফের মধ্যে। জঁলাঁ্যাও তাদের সঙ্গে খুঁজতে লেগেছিল। সুতরাং যথারীতি পয়সা উদ্ধার হয়নি।

—জঁলাঁ্যা কোথায়?

—ও পালিয়ে গেছে মা। বলেছে কাজ আছে।

এতিয়েনের বুকটা ভেঙে যাচ্ছিল। একসময় মায়্যুর বউ বলত বাচ্চারা মান খুইয়ে রাস্তায় ভিক্ষে করলে সে নিজের হাতে ওদের গলা টিপে মেরে ফেলবে। আর এখন সেই মা-ই বাচ্চাদের পথে পথে ভিক্ষে করতে পাঠায়। শুধু মায়্যুরা তো নয়, দশ হাজার বেকার মজুর সমস্ত অঞ্চল জুড়ে আজ ভিক্ষে করছে।

লেনোর আর অঁরি কিছু খাবার জন্ত চেঁচামেচি শুরু করে দিল। কেন ঘরে খাবার নেই অবোধ শিশুরা বোঝে না। শেষ পর্যন্ত আলজিরের পায়ের ওপর দাপাদাপি শুরু করল তারা। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল আলজির। পাগলের মতো এলোপাথাড়ি

তাদের মারতে শুরু করল মায়্যুর বউ। অন্ধকারে কাকে কোথায় মারছে বুঝতে পারছে না সে। বাচ্চারা তারস্বরে কাঁদতে লাগল। আরও—আরও জোরে রুটি খাবার বায়না ধরল। হঠাৎ দু হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ওদের মা। বাচ্চাদের বুকে জড়িয়ে ধরে কি মর্মান্তিক সে কান্না! শেষ পর্যন্ত জোরে কাঁদবার শক্তিও ফুরিয়ে গেল। হেঁচকি উঠতে লাগল আর মাঝে মাঝে দু-চারটে মৃদু শব্দ 'হে ভগবান! তুমি কেন আমাদের সবাইকে তোমার কাছে ডেকে নিচ্ছ না?' …'তোমার করুণার দোহাই, এবার আমাদের রেহাই দাও।'

বুড়ো বোন্‌মর পুরনো বটগাছের মতোই বসে আছে। অস্থির ভাবে পায়চারী করছে মায়্যু—পারস্পরিক সম্পর্কের জটিল বিকীর্ণ শিকড়গুলো মাটির অনেক—অনেক গভীরে প্রোথিত! কেউ কোনো কথা বলছিল না।

দরজাটা খুলে গেল। এবার ডাক্তার এলেন।

—কি কাণ্ড! মোমবাতিও জ্বালাতে পারোনি কয়েকটা? দেখি, কার অসুখ? আমার আবার তাড়া আছে।

যথারীতি নিজের মনে গজগজ করতে লাগলেন। সত্যিই বড্ড কাজের চাপ। একটাও মোমবাতি নেই। পর পর ক'টা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললো মায়্যু। ডাক্তার আলজিরকে দেখছেন। গায়ের চাদরটা সরিয়ে দিলেন তিনি। থিরথির করে কাঁপছে আলজিরের রক্তশূন্য দুর্বল দেহটা। একটা ছোট্ট পাখির নরম বুক বরফে ডুবে যাচ্ছে কিন্তু তবুও তার মুখ থেকে হাসি মুছে যায়নি। শেষ বারের মতো বড় বড় চোখ দুটোকে মেলে সে তার ছোট্ট পৃথিবীটাকে দেখে নিতে চায়। বুকের ওপর শীর্ণ শিরা বের হওয়া হাত দুটো রেখেছে আলজির

পাগলের মতো মায়্যুর বউ বলছে ডাক্তারকে: আলজির তার কত লক্ষ্মী মেয়ে শান্ত মেয়ে। মাকে বাড়ির কাজে সাহায্য করে।, সে কি আর সারবে না?

অস্থির গলায় ডাক্তার বললেন, ও চলে গেছে মায়্যু! শুধু না খেতে পেয়ে মরে গেল বাচ্চাটা। আর ও তো একলা নয়। একটু আগে রাস্তায় আর একটি শিশুর মৃতদেহ আমি দেখে এসেছি। আমায় ডাকো তোমরা চিকিৎসার জন্য। কিন্তু আমি কি করব? ভালো খাবারদাবারই তোমাদের আসল চিকিৎসা।

মায়্যু জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠিটা হাত থেকে ফেলে দিল। তাত লেগে তার আঙুলটা লাল হয়ে গেছে। আলজিরের শরীরটা এখনও গরম। অন্ধকার তার শরীরে বিছিয়ে দিয়েছে হাল্কা আবরণ। ডাক্তার চলে গেছেন। তাঁর তো আর কিছু করবারও ছিল না। এতিয়েনের কানে আসছে আলজিরের মায়ের আর্ত কণ্ঠস্বর: 'হে ভগবান, এবার আমার পালা। তুমি আমায় নাও। তারপর আমার স্বামীকে, সব ছেলেমেয়েদের। আর তো পারি না… সব জ্বালা শেষ করে দাও এইবার, দোহাই তোমার…'

* * * *

রবিবার রাত আটটা খাগাদ সুভারিন আভঁতাজের একটা টেবিলে একা বসে

ছিল, দেওয়ালে পিঠ রেখে। একজনও মজুর নেই কাছাকাছি—যে দুটো সু দিয়ে এক পাত্র বীয়ার খাবার বিলাসিতা করতে পারে। দোকানের খদ্দের দিনে দিনে কমছে। মাদাম হ্রাসন্তর স্থিরভাবে কাউণ্টারে বসে আছেন। হ্রাসন্তর মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে আছে লোহার উনুনটার দিকে। কয়লা জ্বলছে। লাল গনগনে আঁচ। একঘেয়ে চুপচাপ সব কিছু।

দমবন্ধ হওয়া নিস্তব্ধতা হঠাৎই ভেঙে গেল। সাঙ্কেতিক তিনটে টোকা পড়ল জানলায়। লাফিয়ে উঠল সুভারিন। চারদিকে তাকালো। এতিয়েন ডাকছে। আগে কয়েকবার এরকম হয়েছে। দোকানে অন্য লোকজন না থাকলে এতিয়েন এইভাবে ডেকে তাকে বাইরে আসতে বলে। কিন্তু সুভারিন দরজা খোলার আগেই হ্রাসন্তর উঠল। সে-ই খুলে দিল দরজাটা। অল্প আলোতেও জানলার ফাঁক দিয়ে হ্রাসন্তর ঠিকই চিনতে পেরেছিল এতিয়েনকে।

—কি ব্যাপার? পাছে তোমায় ধরিয়ে দিই, তাই ভেতরে আসতে ভয় পাচ্ছ? কিন্তু ঘরের ভেতরে বসে কথা বলা অনেক বেশী নিরাপদ।

এতিয়েন ভেতরে এল। মাদাম হ্রাসন্তর তাকে বীয়ার খাওয়াতে চাইলেন। এতিয়েন রাজী হল না।

হ্রাসন্তর বলল, আমি অনেক দিন আগেই বুঝতে পেরেছিলাম তোমার গোপন আস্তানাটা কোথায়। কিন্তু যদি আমি সত্যিই মালিকের পা-চাটা দালাল হতাম, সপ্তাহখানেক আগেই তোমাকে পুলিসের হাতে তুলে দিতে পারতাম।

এতিয়েন উত্তর দিল: জানি আমি। তুমি তো নেমকহারাম নও। আমাদেরই একজন। এটা তো হতেই পারে যে দু'জনের মত, আদর্শ আলাদা। তবুও পরস্পরকে শ্রদ্ধা করা যায়।

আবার সব চুপচাপ। সুভারিন নিজের জায়গায় গিয়ে বসেছে। তার হাতের সিগারেটটা পুড়ছে। নীলচে ধূসর ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সুভারিন। উরুর ওপর তার অস্থির আঙুলগুলো নড়াচড়া করছে। অন্যদিন এ সময় পোলাণ্ড থাকে কোলে আর খরগোশটার তুলতুলে নরম লোমে বিলি কাটে সুভারিন। আজ বোধহয় পোল্যাণ্ড বাইরে বেরিয়েছে।

এতিয়েন বসেছিল সুভারিনের মুখোমুখি। খানিক বাদে সে-ই নীরবতা ভাঙলো।

—কাল থেকে না ভোরাতে কাজ শুরু হচ্ছে। নেগ্রেলের সঙ্গে বেলজিয়াম থেকে মজুররা এসে গেছে।

হ্রাসন্তর আপনমনে বলল, হ্যাঁ, সন্ধেবেলা সব দলগুলোকে দেখলাম। মালিক পক্ষ তোমাদের আর ঘাঁটাতে চায় না।

গলা চড়ল তার।

—ছাখো, আমি বাজে তর্ক করতে চাই না। কিন্তু এভাবে তোমরাও যদি গোঁ ধরে বসে থাকো তাহলে বিপদ বাড়বে। কোম্পানি লাটে তুলেছো ঠিকই, নিজেরাও কি না খেতে পেয়ে মরছ না? তোমাদের আন্তর্জাতিক সমিতির কি হাল হয়েছে

তাও বোধকরি জানো? পরশু দিন লিল-এ গিয়েছিলাম ব্যবসার কাজে। প্লুশারের সঙ্গে দেখা হল। বেচারী বোধহয় এখন পস্তাচ্ছে।

হ্রাসঙ্গর বিস্তারিত বিবরণ দিতে শুরু করল। আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রথমে মজুরদের টাকায় গড়ে তোলা তহবিল নিয়ে কাজ শুরু করে। কিন্তু টাকার দরকার তো সকাল সন্ধ্যে—এ দিকে ধর্মঘট চারদিকে। এখন দলের চাঁইরা সব চোখে অন্ধকার দেখছে এমন কি নিজেদের মধ্যে এখন খেয়োখেয়ি, কামড়াকামড়ি, দলবাজি চলছে। দলের মাথারা সব ভাগ হয়ে গেছে। কেউই অন্যের মতে চলতে রাজী নয়।

প্লুশার মানসিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। অবশ্য ওর কথায় কেউ আর এখন ওঠে বসে না। কিন্তু তবুও ওর বড় বড় কথা থামেনি। প্যারিসে গিয়ে নতুন করে সবকিছু শুরু করতে চায়। অন্তত তিন-তিনবার আমায় শুনতে হল যে আমাদের ধর্মঘটটা ব্যর্থ হয়েছে।

এতিয়েন মাথা নীচু করে সব শুনছিল। কয়েকজনের সঙ্গে গতকালই তার এ নিয়ে কথা হয়েছে। সকলের মনেই সন্দেহ আর তিক্ততার বীজ—এই ভাবেই এতিয়েন ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে।

চুপ করে বসেছিল এতিয়েন। নিজের হতাশা, ব্যর্থতার কথা হ্রাসঙ্গরের কাছে স্বীকার করাটা নিঃসন্দেহে চরম মূঢ়তা হবে। এককালে হ্রাসঙ্গরকে তো সে দেখেছে সকলের কাছে হাস্যাস্পদ হতে।

এতিয়েন বলল, হ্যাঁ, আমি বুঝি যে এভাবে ধর্মঘট করে আখেরে লাভ হবে না কোনো। কিন্তু সে তো বুঝতে পারা যায়নি আগে। আমরা ঠিক স্বেচ্ছায় ধর্মঘট করিনি তাতো জানো। কোম্পানিই প্রকারান্তরে বাধ্য করেছে। আমরা অপরিণামদর্শী, সে আমাদেরই ব্যর্থতা। এখন এটাই ভেবে নিতে মন চায় যে দৈব বিপর্যয় ঘটেছে।

—কিন্তু তুমি যদি বোঝোই যে এভাবে এগোনো যাবে না তবে সবাইকে তা বোঝাতে চেষ্টা করছ না কেন?

এতিয়েন সোজাসুজি হ্রাসঙ্গরের চোখের দিকে তাকালো।

—দ্যাখো, খোলাখুলি কথা বলাই ভালো। তোমার মতের সঙ্গে আমার মত কোনো দিনই মিলবে না। আমি তোমার বাড়িতে এলাম—তার কারণ এই যে সহকর্মী হিসেবে তোমাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস যে আমাদের এই অনশন, আন্দোলন, চাপের মুখেও নতি স্বীকার না করা—এইগুলো তোমার জোলো আপোসবহুল রাজনীতির চেয়ে সাধারণ মানুষের মনকে ঢের বেশী নাড়া দেবে। আজ যদি সেনাবাহিনীর বুলেটে আমার হৃদপিণ্ডটা ঝাঁঝরা হয়ে যায়, তাহলে দেখবে আগুন কেমন জ্বলে ওঠে।

চোখ দুটো জলে ভরে উঠল এতিয়েনের। মনের সমস্ত আবেগ মথিত করে কথা কটা বলেছে সে।

মাদাম হ্রাসঙ্গর সপ্রশংস গলায় বললে, ঠিক বলেছ।

ভদ্রমহিলা স্বামীর মিনমিনে মনোভাব মোটেই বরদাস্ত করতে পারেন না।

স্যুভারিন স্বপ্নমদির চোখে তাকিয়ে ছিল এতিয়েনের দিকে। তার আঙুলগুলো তখনও নড়ছে কোলের ওপর। ফর্সা মেয়েলী মুখ, তীক্ষ্ণ দাঁত, পাতলা নাক—তাকে বর্বর, নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। এরা এত কাপুরুষ। রক্তপাতে ভয় পায়!

চেঁচিয়ে উঠল স্যুভারিন।

—ভীতুর ডিম কোথাকার! সবকিছু ছারখার করে দিতে পারছ না? একটাও মরদ নেই তোমাদের মধ্যে? কারুর ইচ্ছেই নেই গর্জে ওঠার। সত্যি সত্যি মরবার আগেই সব মরে বসে আছে!

তথাকথিত বিদ্রোহের রীতিপ্রকৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার বিষোদ্গার শুরু করল সে। এতিয়েন আর স্থাসনুরের রীতিমতো অস্বস্তি হচ্ছিল। এ যেন অন্য কোনো মানুষের স্বপ্নের জগতে চুপিসাড়ে অনুপ্রবেশ। রাশিয়ার গোপন বিপ্লবের খুঁটিনাটি কথা ঘোরলাগা মানুষের মতো বলে যাচ্ছিল স্যুভারিন: সেখানকার অবস্থাও খুব খাবাপ —তার সহকর্মীরা এখন রাজনীতির বিলাসে গা ডুবিয়েছে। সশস্ত্র বিপ্লবের রক্তাক্ত অঙ্গীকার কি তারা ভুলে গেল? নিম্ন আর মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে উঠে আসা তবতাজা তরুণদের রাজনৈতিক মতাদর্শে ফাটল দেখা দিয়েছে। তথাকথিত বিপ্লবের পথ ছেড়ে তারা আর সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সামিল হতে চায় না।

স্যুভারিনের চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন রক্তে পিছল যুদ্ধক্ষেত্রে এক তেজী ঘোড়ার মতো—যুদ্ধ থেমে গেছে, শান্তিপত্রে স্বাক্ষর হয়ে গেছে। সেনানায়করা যে যার প্রমোদকাননে—শুধু আরোহীবিহীন এই ঘোড়াটা অসহায় নিষ্ফল আক্রোশে পা ঠুকছে—নিজের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে ভেবে। তার হৃদপিণ্ডে এখনও বেজে চলেছে যুদ্ধের দারুণ দামামা।

—না না না। এইভাবে কখনও পিছু হটে যুদ্ধ জেতা যায় না।

ধীরে ধীরে গলার স্বর শান্ত মন্থর হয়ে এল তার। সে যে এতদিন ধরে তিলে তিলে বুকের মধ্যে একটা মধুর স্বাধীনতার স্বপ্নকে লালন করে এসেছে! নিজের যা কিছু ছিল, দু হাতে বিলিয়েছে অকাতরে। মস্যুঁর এই মজুরদের মধ্যে থাকতে থাকতে সে একীভূত হয়ে গেছে এদের দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনার সঙ্গে, কিন্তু এরা তো তাকে মন থেকে তেমন ঐকান্তিকতায় গ্রহণ করতে পারেনি! সে যে বিদেশী!

দু চোখ চকচক করে উঠল তার। এতিয়েনের দিকে ফিরে বলল, জানো, সকালের কাগজে পড়লাম মার্সেইল-এর দু'জন টুপি-বিক্রেতা লটারীতে এক লাখ ফ্রাঁ জিতে সঙ্গে সঙ্গে তা ব্যাঙ্কে জমা করেছে। সারা জীবন নাকি পায়ের ওপর পা তুলে বসে খাবে। টাকা পেলে কোন্ হতচ্ছাড়া কাজ করে! এই মনোভাবটা আমার মাথায় ঠিক ঢোকে না। যতক্ষণ গরীব মানুষগুলোর হাতে টাকা থাকে না ততক্ষণ তারা বড়লোকদের মুণ্ডপাত করে। কিন্তু যেই কিছু টাকা হাতে আসে, সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের আখের গোছায়। কখনও অন্য গরীব সহকর্মীর কথা ভাবে না।

শুধু নিজের সুখটাই কি সব? 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি' কথাটাই বুর্জোয়া মনোবৃত্তির প্রতীক। আমরা কেন এত বড় বড় কথা বলি জানো? এই সব বুর্জোয়াদের জায়গায় নিজেদের বসাতে পারি না বলে!

হ্রাসন্যর হেসে ফেলল। কি পাগল রে বাবা সুভারিন! টুপিওয়ালা দু'জন কি তবে প্রথম পুরস্কারটা জনগণের সেবায় দান করত? এটা ভাবাটাও তো বোকামি!

সুভারিন রাগে লাল হয়ে গেল। এরা কি তাকে নিয়ে ঠাট্টা করছে? অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের মতোই সুভারিনের মনোভাব এ ব্যাপারে অবিচল। তার চোখ ধক ধক করে জ্বলে উঠল।

—এই হাত দুটো দেখছ আমার? তোমাদের মতো পোকাদের দু আঙুলে টিপে মেরে আবর্জনার গাদায় ফেলে দিয়ে আসতে পারি। ওঃ, অহিংস বিপ্লববাদ! একদিন এই দশটা আঙুল লোহার সাঁড়াশী হয়ে শোষণতন্ত্রের গলায় চেপে বসবে···

মাদাম হ্রাসন্যর বললেন, ঠিক, ঠিক!

আবার সবাই খানিকক্ষণ চুপচাপ।

এতিয়েন কথা শুরু করল বেলজিয়ান মজুরদের নিয়ে। সুভারিনকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল।

সুভারিন এখন আবার অনেক শান্ত হয়ে গেছে। সে বলল, সেপাইদের মধ্যে গুলি ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। দরকার পড়লেই গুলি চালাতে হবে।

হঠাৎ খরগোশটার কথা মনে পড়ল তার। এতক্ষণ যেন ও ওটাকেই খুঁজছিল।

—পোলাণ্ড কোথায়?

হ্রাসন্যর হেসে স্ত্রীর দিকে তাকালো। তারপর বলল, পোলাণ্ড? নেই।

জঁল্যার অত্যাচারের পর থেকেই পোলাণ্ড অসুস্থ ছিল। তারপর থেকে প্রতিবারই মরা বাচ্চা দিয়েছে। শুধু শুধু এই বাজারে কে আর একটা জন্তু পোষে। তাই কর্তা-গিন্নী দু'জনেই আজ একমত হয়ে ওটাকে কেটে রান্না করে ফেলেছে।

—ঐ তো, সন্ধ্যেবেলা স্যুপের সঙ্গে নরম মাংসটা খেলে! পোলাণ্ডের ঠ্যাং। আহা, দিব্যি তো হাত চাটছিলে!

দু-এক মুহূর্ত সুভারিনের বাকস্ফূর্তি হল না। তারপর দুঃখে বিবর্ণ হয়ে গেল সে। কেঁপে উঠল। সুভারিনের মতো একজন বিপ্লবীর কঠিন হৃদয়ও দ্রবীভূত হল অকৃত্রিম বেদনায়। বড় বড় চোখ দুটো জলে ভরে গেল।

সুভারিনকে কেউ কোনোরকম সমবেদনা জানাবার আগেই দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল। শাভাল ঢুকল ক্যাথরিনকে প্রায় ঠেলতে ঠেলতে। মঁস্যুর প্রতিটি মদের দোকানে ঢুকে যথেষ্ট পয়সা খরচ করে শাভাল—লোককে দেখায় কত টাকা তার। আভঁতাজ-এ আসাটাই বাকি ছিল এতদিন।

সে ক্যাথরিনকে বলল, আমি বলেছি, তুই শুঁড়িখানায় আসবি আমার সঙ্গে, ব্যস! তুই আসবি না তোর চোদ্দপুরুষ আসবে! এই নিয়ে আমায় যদি কেউ বেঁকা কথা শোনায় তার বাপের শ্রাদ্ধ দেখিয়ে দেব।

এতিয়েনকে দেখে ভয়ে সাদা হয়ে গেল ক্যাথরিন। শাভালও এতক্ষণে এতিয়েনকে দেখেছে। হিসহিসে গলায় বলল, দুটো বীয়ার দাও। আমরা আজ খুব মাল টানবো—খনিতে কাজ শুরু হচ্ছে।

একটাও কথা না বলে বীয়ারের পাত্র দুটো ঠক্ করে টেবিলে এনে রাখলেন মাদাম হ্রাসন্যর। রাগে সমস্ত শরীর জ্বলে যাচ্ছিল তাঁর। কিন্তু কি করবেন—খদ্দেরই লক্ষ্মী। সুভারিন আর এতিয়েন একটুও নড়ল না। শাভাল গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে চায়।

—আমি জানি যে সব শালারা বলে আমি পচা ঘায়ের মতো নোংরা। কোনো বাপের ব্যাটা একথা আমার মুখের ওপর বলুক তো দেখি! কত ধানে কত চাল তাকে একবার বুঝিয়ে দিই।

এবারেও কেউ কোনো কথা বলল না।

দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শাভাল নিজের মনেই চেঁচাতে লাগল।

—কেউ খেটে খেতে ভালোবাসে, কেউ বাসে না। আমার মধ্যে বাপু কোনোরকম লুকোছাপা নেই। জ্যন্‌লঁ্যার খনির কাজে ইস্তফা দিয়ে আমি লা ভোরাতে বাবোজন বেলজিয়ান মজুরের সঙ্গে কাল থেকে কাজে লাগব। আমিই ওই দলের নেতা হয়েছি। ভালো কাজ জানি তো! এ নিয়ে কোনো হারামজাদা যদি মুখ খুলতে সাহস করে তবে মেরে তার দাঁত গুঁড়িয়ে দেব।

এ কথায়ও এতিয়েনের কোনো ভাববৈলক্ষণ্য হল না।

শাভাল ক্যাথরিনকে বলল, তুই খাবি কি না বল্! যে সব শুয়োরগুলো কাজে যেতে চায় না, তাদের বাপান্ত করে আমি এই আমার গেলাসে চুমুক দিলাম!

ক্যাথরিন নিজের গেলাসটা ঠেকালো শাভালের গেলাসের সঙ্গে—মেয়েটা ভীষণ ভয় পেয়েছে। তার হাত এত কাঁপছে যে ঠোকাঠুকি লেগে কাঁচে ঠুনঠুন শব্দ হচ্ছে ক্রমাগত। পকেট থেকে একগাদা খুচরো পয়সা বের করে টেবিলে ছড়িয়ে দিল শাভাল। —'ওঃ কত বড়লোক! নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করেছি। ইজ্জতের পয়সা! এই সব হারামীরা দশটা স্যু পকেট থেকে বার করতে পারবে?'

কেউ ঝগড়া করছে না দেখে শাভাল এবার সোজাসুজি ঝগড়া করতে শুরু করল।

—তাহলে ছুঁচোও গর্ত থেকে বের হয়? পুলিস নিশ্চয়ই নাকে সর্ষের তেল ঠেসে ঘুম দিচ্ছে, চোর জোচ্চরদের যখন এত জমজমাট আড্ডা!

এতিয়েন এবার উঠে দাঁড়ালো। দৃঢ়, নীচু গলায় বলল, দ্যাখো, অনেকক্ষণ ধরে সহ্য করছি। তুমি শালা বিশ্বাসঘাতক খচ্চর একটি! মালিকের পা-চাটা কুত্তা! আমি ছুঁচো মেরে হাত নোংরা করতে চাই না। তবে এখন বোধহয় সময় এসেছে। হয় তুমি থাকবে, নয় আমি!

শাভাল ঘুষি পাকালো।

—আয় আয় বেজন্মা! ভীতুর ডিম! ল্যাজে টান পড়লে গর্তে সেঁধোস! আমি একলাই তোকে টিপে মারতে পারি। তুই যা যা গালাগাল দিয়েছিলি সব সুদে আসলে উসুল করে দেব আজ।

ক্যাথরিন দু'জনের মাঝখানে পড়ে থামাতে চেষ্টা করল। কিন্তু কেউ তার দিকে দৃকপাতই করছে না। এমনকি তাকে সরিয়ে দিতেও চেষ্টা করল না কেউ। দু'জনেই ফুঁসছে এতদিনের চাপা আক্রোশে। নাঃ, মারপিট আজ হবেই। ক্যাথরিন আস্তে আস্তে পিছিয়ে এসে দেওয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়ালো। এত ভয় করছে তার যে সে আর কাঁপছে না। কেমন যেন স্থির হয়ে গেছে, জবাই হবার আগে রুগ্ন মুরগীর ছানার মতোই। বড় বড় অসহায় চোখ মেলে তাকিয়ে রইল। এতিয়েন—যাকে সে ভালোবেসেছিল প্রথম কৌমার্যের অবচেতন মনে আর শাভাল—যে তার শরীরী চেতনায় জাগিয়েছিল উন্মাদনার প্রথম স্পন্দন।

মাদাম হ্রাসন্যুর তড়িদগতিতে টেবিলের ওপর থেকে কাঁচের বাসনগুলো সরিয়ে ফেললেন। শুধু শুধু ভাঙবার সুযোগ দিয়ে লাভ কি? তারপর ধীরেসুস্থে চেয়ারে এসে বসলেন—ভাবখানা এমন, যেন একটু ধৈর্য ধরলেই চমৎকার একখানা নাটক দেখা যাবে। হ্রাসন্যুর বারবার চাইছিল মধ্যস্থতা করতে—ছি ছি, এ ভাবে দু'জন সহকর্মী মারামারি করে নাকি? সুভারিন তাকে জামার আস্তিন ধরে টেনে বসালো।

—রাখো তো, এ ব্যাপারে তোমার এত মাথাব্যথা কিসের? নাক গলাতে যেও না। দু'জনের মধ্যে একজনের সরে যাওয়াই ভালো পৃথিবী থেকে। আজ সে সুযোগ এসেছে।

আক্রান্ত হবার আগেই শাভাল শূন্যে হাত পা ছুঁড়ছিল। সে এতিয়েনের চেয়ে লম্বা চওড়া, বারবার প্রতিপক্ষের মুখে আঘাত হানবার চেষ্টায় উদগ্রীব—দু হাত দিয়ে আঘাত করছিল মুখে অনর্গল গালাগালেরও কমতি নেই, সম্ভবত মনে জোর আনবার জন্য।

—শালা মেয়েছেলের দালাল। তোমার ঐ নাকটা আমি ইয়েতে গুঁজে দেব। থেঁতো মুখ ভোঁতা করে দেব। শুয়োরের নোংরার গাদার মতো অবস্থা হবে তোর। তারপর দেখি কোন মাগী তোর পেছনে দৌড়য়।

এতিয়েন একটাও কথা বলছিল না। দাঁতে দাঁত চেপে তীব্র মনঃসংযোগে শাভালের আক্রমণ প্রতিহত করছিল আর মনে মনে সুযোগ খুঁজছিল পাল্টা আক্রমণের।

প্রথম দিকে কেউ কাউকে তেমনভাবে কাবু করতে পারেনি। খ্যাপা ষাঁড়ের মতো শাভাল শুধু আক্রমণ করে গেছে আর এতিয়েন তা ঠেকিয়েছে। একটা চেয়ার উল্টে পড়েছে। মেঝেটা যেন কাঁপছে ভারী জুতোর দাপাদাপিতে। দু'জনেই ঘন-ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে, চোখ মুখ রক্তবর্ণ।

শাভাল চেঁচিয়ে উঠল।

—পেয়েছি, শালাকে বাগে পেয়েছি।

সত্যিই তার প্রথম মারের আঘাতে এতিয়েনের কাঁধটা সজোরে ঝাঁকুনি খেল। যন্ত্রণায় ভেতর ভেতর ককিয়ে উঠলেও এতিয়েন মুখে তা প্রকাশ করল না। সোজা

শাভালের বুক লক্ষ্য করে একটা ঘুষি মারলো। শাভাল লাফিয়ে উঠে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করল। কিন্তু পুরোপুরি পারল না। হুড়মুড় করে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলিয়ে নিল। তারপর রাগে অন্ধ হয়ে এতিয়েনের কুঁচকি লক্ষ্য করে লাথি ছুঁড়লো।

—শালা, মেরে তোর টেংরি খুলে নেব!

এই রকম নীচ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না এতিয়েন। রীতিবিরুদ্ধ কাজ এটা। এবার সেও রেগে গেল।

—চুপ কর্, কুত্তা কাঁহাকা! ছোটলোকের মতো যেখানে-সেখানে মারলে আমি তোর ঘাড় মটকে দেব!

ব্যস্! আরও জোর লড়াই শুরু হল। হ্রাসন্যরের এবার বিরক্ত লাগছে। দু-দু'বার উঠি-উঠি করেও স্ত্রীর চোখে চোখ পড়াতে সামলে গেল। দু'জন খদ্দেরের মধ্যে কামড়াকামড়ি—সে কেন এসবের ভেতর নাক গলাবে? আগুনের দিকে এক-দৃষ্টে তাকিয়ে থাকল সে। স্বভাবিন নির্বিকার মুখে সিগারেট পাকাচ্ছে কিন্তু সেটা জ্বালছে না। ক্যাথরিন এখনও স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে—তার হাত দুটো আড়াআড়িভাবে বুকের ওপর রাখা। বারবার আঙুলগুলো মোচড়াচ্ছে, জামার খুঁটটা চেপে ধরছে। প্রাণপণ চেষ্টা করছে না চেঁচাতে—তাহলেই একজন কেউ ভাববে সে তার মৃত্যুকামনা করছে এবং সর্বনাশের আর বাকি থাকবে না কিছু। কিন্তু সে আসলে কার জীবন ভিক্ষে চাইছে এই মুহূর্তে?

শাভাল ক্লান্ত হয়ে পড়ল। দিগভ্রষ্ট আক্রমণ করছে সে—দরদর করে ঘামছে। এতিয়েন কিন্তু এত রাগেও মাথা গরম করেনি। দু-চারটে ছাড়া সমস্ত আক্রমণই ঠাণ্ডা মাথায় ঠেকিয়েছে। কানে আঘাত লেগেছে, নখের আঁচড়ে ঘাড় থেকে রক্ত পড়ছে। চিনচিনে অনুভূতি হচ্ছে একটা। এখন সেও উত্তেজনা সামলাতে না পেরে অকথ্য গালিগালাজ করছে। শাভালের শরীরে উপর্যুপরি আঘাত করছে। বুকের ওপর হঠাৎ এসে পড়া ঘুষিটা সামলাতে গিয়ে শাভাল একটু নীচু হতেই আঘাতটা সজোরে এসে নাকে লাগল। এর মধ্যেই একটা চোখ ফুলে বন্ধ হয়ে গেছে. অন্য চোখটায় সর্ষেফুল দেখছে শাভাল। নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে গলগল করে। হঠাৎ আবার আর একটা আঘাত—হুড়মুড়িয়ে মাটিতে পড়ল শাভাল।

এতিয়েন কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে।

—কি রে, আরও দু-চার ঘা হজম করার তাগদ থাকলে উঠে পড়্।

শাভাল কোনো উত্তর দিল না। দু-চার মুহূর্ত লাগল আঘাতের জেরটা সামলাতে। তারপর হাঁটু মুড়ে বসে পকেট হাতড়াতে লাগল। আবার আস্তে আস্তে দুর্বল পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালো। এবার পাগলের মতো চেঁচাতে চেঁচাতে এতিয়েনের দিকে তেড়ে এল।

ক্যাথরিনের চোখকে সে কিন্তু ফাঁকি দিতে পারেনি। নিজের সমস্ত লজ্জা ভয় ভুলে চেঁচিয়ে উঠল ক্যাথরিন

—সাবধান! ওর হাতে ছুরি আছে।

এতিয়েন সতর্ক হবার আগেই ছুরির প্রথম কোপটা তার কনুই ঘেঁষে চলে গেল। জামাটা ছিঁড়ে গেছে তীক্ষ্ণ ফলার আঘাতে। শাভালের কব্জিটা ধরে ফেলল সে—একবার হাত ছাড়াতে পারলেই শাভাল জিতে যাবে আর এতিয়েনের নিশ্চিত মৃত্যু।

শাভাল নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছিল। আস্তে আস্তে ছুরিটা নীচু হচ্ছে। আরও—আরও নীচু···এতিয়েনের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে···এতিয়েনের চামড়ায় ইস্পাতের ঠাণ্ডা স্পর্শ। হাতে যেন আর জোর নেই শেষ মোচড় দিল সে। শাভালের হাত থেকে ছুরিটা খসে পড়ল মাটিতে। শাভালের আগেই এতিয়েন শিকারী বাঘের ক্ষিপ্রতায় ছোঁ মেরে তুলে নিল সেটা। তারপর হাঁটু মুড়ে বসে থাকা শাভালের গলায় ঠেকিয়ে বলল, হারামজাদা, বেজন্মা, বিশ্বাসঘাতক! আজ তোকে শেষ করব।

নিজের হিংস্র গলার স্বরে নিজের কানেই যেন তালা ধরল এতিয়েনের। মাথার মধ্যে হাতুড়ি পিটছে কেউ। মানুষ খুন করবার ইচ্ছে কি এত তীব্র হয়? রক্তের নেশা যে মদের চেয়েও বেশী পাগল করে মানুষকে? নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল সে—শেষ পর্যন্ত তার মনের ভেতরকার সভ্য মানুষটারই জয় হল। ছুরিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এতিয়েন বলল, দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে।

এবার হ্রাসন্তর লাফিয়ে এগিয়ে এল।

—না না, আমার বাড়িতে খুন জখম না হওয়াই ভালো।

সুভারিনের কোলের কাছে ছুরিটা। এতক্ষণে শান্ত ভাবে সিগারেট ধরালো সে। ক্যাথরিন বিমূঢ় ভাবে এতিয়েন আর শাভালের মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। ওঃ ভগবান, দু'জনেই তাহলে বেঁচে আছে।

এতিয়েন চেঁচিয়ে উঠল।

—দূর হয়ে যাও, না হলে শেষ করে দেব!

শাভাল উঠে দাঁড়ালো। হাতের চেটো দিয়ে রক্ত মুছল। রক্তের নোনতা স্বাদের সঙ্গে পরাজয়ের তিক্ততা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

ক্যাথরিন নিছক অভ্যাসবশেই শাভালের পিছু নিচ্ছিল। শাভাল রাগে গরগর করে উঠল।

—খবরদার! তুই আমার সঙ্গে আসবি না। যা যা, এতিয়েনই যদি তোর মনের মানুষ হয় তবে তার সঙ্গেই শুতে যা! হারামজাদী কুত্তী! আমার বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে আর পা রেখে দেখিস—জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব! প্রাণের ভয় থাকলে কক্ষণো আসবি না!

দরজাটা সজোরে বন্ধ হয়ে গেল। ঘরে এখন শুধু চুল্লীতে কাঠকয়লা পোড়ার ফটফট শব্দ। চেয়ারটা উল্টে পড়ে আছে মেঝেতে—এখানে ওখানে রক্তের ছোপ।

* * * *

এতিয়েন আর ক্যাথরিন আভঁতাজ থেকে বেরিয়ে এল। দু'জনেই এখন চুপচাপ।

হাঁটছে। অল্প অল্প ঝিরঝিরে বরফ পডতে শুরু করেছে—পাযেব তলার বরফের আস্তরণ এখনও গলে যায়নি। আকাশ মেঘে ঢাকা—মাঝে মাঝে চাঁদ উঁকি দিচ্ছে মেঘের আডাল থেকে—ঠিক মনে হয বিবাট ঝোডো হাওযা একটা ঘন কালো কম্বলকে আকাশের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত ছুটিযে নিযে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এতিযেনদের গাযে তেমন বিশেষ হাওযা লাগছে না। আশেপাশেব বাডির ছাদ থেকে ববফ গলা জল টপটপ করে পডছে।

ক্যাথরিনকে পাশে নিযে হাঁটতে এতিযেনের রীতিমতো অস্বস্তি হচ্ছিল। হযতো সেইজন্য সে কোনো কথাই বলতে পারছিল না। এ ভাবে তো আব মেযেটাকে নিযে রকিযাব-এর গোপন আস্তানায হুট করে যাওযাও যাবে না। একবাব জিজ্ঞেস কবল ও বাবা-মাব কাছে ফিরে যেতে চায নাকি কিন্তু সে প্রস্তাবে ক্যাথরিন শামুকের মতো কেমন গুটিযে গেল—ছি ছি, বাবা-মাব সঙ্গে যে বেইমানী সে কবেছে, তারপর এ মুখ তাদেব দেখানো যায না। সুতরাং এবপব আব নতুন করে গল্প জমাবার কিছু নেই। রাস্তায় থিকথিকে কাদা। প্রথমে লং ভোব্যব রাস্তায খানিক হেঁটে তাবা ডানদিকে বেঁকল।

এতিযেন বলল, কোথাও গিযে শুতে হবে তো! আমার তো নিজস্ব কোনো আস্তানা নেই তেমন, যেখানে তোমাকে নিযে যাওযা যায…

কথা শেষ কবার আগেই তার মনে হঠাৎ একরাশ লজ্জা এসে দানা বাঁধলো। ক্যাথরিনের সঙ্গে সেই অনুচ্চারিত পুরনো সম্পর্কের কথা মনে পডে গেল। কি অসাধারণ সংযমেই না সেদিন তারা দু জন দু'জনকে দূরে সরিযে রেখেছিল! আচ্ছা, এতিয়েন কি এখনও ক্যাথরিনকে তেমন করে চায? তা যদি নাই হবে, তবে আজ এতদিন পর মনটা এমন উথালপাথাল করে কেন? গাস্তঁমারিতে সেদিন তো ক্যাথরিন তাকে চড মেরেছিল—আজ সে কথা মনে পডে রাগ তো নযই ববং অদ্ভুত উত্তেজনা হতে লাগল হ্যাঁ, সে ইচ্ছে করলেই ক্যাথরিনকে রকিযাবে নিযে যেতে পারে। সে অধিকার তার আছে—আর সেটাই ববং খুব স্বাভাবিক হবে।

—ক্যাথরিন, মন ঠিক করে বলো তোমাকে কোথায নিযে যাব। না কি তুমি আমায এতই ঘেন্না কর যে আমাব সঙ্গে কোথাও যেতে তোমাব সম্মানে লাগবে!

ক্যাথরিন অলস পাযে এতিযেনকে অনুসরণ করছিল।

চোখ না তুলেই সে জবাব দিল, যথেষ্ট অশান্তি হযেছে, আব আমার কষ্ট বাডিও না! আমাব একজন প্রেমিক আছে আর তুমিও একজন ভালোবাসাব মানুষ পেয়েছ—এখন পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ কি?

ক্যাথরিন মুকেতের কথা বলতে চাইছে। ভেবেছে এতিযেন ওর সঙ্গে খুব ফুর্তি করছে। অবশ্য ক্যাথরিন একা কেন, আশেপাশের অনেকেই তা ভেবেছে। এতিযেন এ ব্যাপারে প্রতিবাদ জানালে ক্যাথরিন অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়লো। ও যে নিজের চোখে দেখেছে এতিযেন আর মুকেত দু'জন দু'জনকে চুমু খাচ্ছে!

একটু চুপ করে থেকে এতিয়েন বলল, ছেলেমানুষের মতো কোরো না। ঢের ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। তুমি আর আমি কত সুখী হতে পারতাম।

ক্যাথরিন থেমে থেমে জবাব দিল, না, এ নিয়ে আমি কোনোরকম আফসোস করি না। আর তুমিও তেমন কিছু হারাওনি। আমি রোগা, বিশ্রী—তার ওপর অত পরিশ্রম, আমি কখনই তোমাকে অত সুখ দিতে পারতাম না। অমন সুস্থ সবল মেয়ের পূর্ণতা তো আমি পাইনি।

নির্লজ্জভাবে নিজের হতশ্রী, অপরিণত যৌবনের কথা বলে যাচ্ছিল ক্যাথরিন। যদিও শাভাল তাকে অন্য সমবয়েসী মেয়েদের কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার হিম্মত দিয়েছে—সকলে জানে তারও একজন প্রেমিক আছে কিন্তু সেটাই তো সব নয়। শরীরের খুঁত না থাকলে সে এখনও মা হতে পারল না কেন? সময়মতো স্বাভাবিক শারীরিক ধর্মের ত্রুটিই তার এই মনোবেদনার কারণ। সময় হয়ে গেছে কবে, অথচ আজও সে ঋতুমতী হয়নি।

এই সব একান্ত মেয়েলী গোপন কথাবার্তা স্পষ্ট, দ্বিধাহীন ভাবে ক্যাথরিন জানিয়ে দিল এতিয়েনকে—তার এতটুকু সঙ্কোচ হল না। এতিয়েনের খুব কষ্ট হচ্ছিল ওর জন্য।

কালো মেঘে চাঁদটা এখন একেবারে ঢেকে গেছে। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না অন্ধকারে। দু'জনে দু'জনের স্পর্শ অনুভব করছে। কখন অজান্তেই এত দিনের সুপ্ত ইচ্ছেটা যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল কিন্তু ঠিক সেই সময় মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল চাঁদ, আলোর বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল চতুর্দিক—পরস্পরের আলিঙ্গন থেকে ছিটকে সরে গেল দু'জনেই—সেই পুরনো সঙ্কোচ, বিনয়, ভদ্রতা আর নিষ্পাপ বন্ধুত্ব। আবার দু'জনে হাঁটতে লাগল শুকনো ঘাসে পা ডুবিয়ে।

এতিয়েন নীরবতা ভেঙে বলল, তুমি তাহলে সত্যিই চাও না।

—না। শাভালের পর আর নয়। এরপর তুমি, তারপর হয়তো অন্য কেউ। আমার নিজের ওপর ঘেন্না ধরে যায় এ সব ভাবলে—যদি আমি কোনো সুখই না পেলাম তবে এই ঠুনকো ভালোবাসায় কাজ কি?

আবার তারা দু'জনেই চুপ করে রইল।

—কিন্তু ক্যাথরিন, তুমি এখন কোথায় যাবে? এই শীতের রাতে এভাবে তো তোমাকে একলা ছেড়ে দিতে পারি না।

সহজ গলায় ক্যাথরিন বলল, আমি ফিরে যাচ্ছি। শাভাল আমার ভালোবাসার লোক। অন্য কোথাও আমি রাত কাটাতে পারব না।

—ও তোমাকে মেরে ফেলবে।

নতুন করে আবার নিস্তব্ধতা। কাঁধ ঝাঁকালো ক্যাথরিন। হ্যাঁ, মার খাবে নির্ঘাত আজ, কিন্তু তারপর ক্লান্ত হয়ে এক সময় না এক সময় তো থামবে ঠিকই। সেই মার খাবার ভয়ে নির্জন রাস্তায় এ ভাবে বেশ্যার মতো সে ঘুরে বেড়াতে

পারবে না। তা ছাড়া কারণে অকারণে মার খেযে খেয়ে তার পিঠ শক্ত হবে গেছে। খোঁজ করলে দেখা যাবে এই অঞ্চলে প্রতি দশটা মেয়ের মধ্যে আটজনেরই এই রকম অবস্থা। অবশ্য কোনোদিন যদি শাভাল ওকে বিয়ে করে, তবে তো অনেক ভাগ্যের ব্যাপার।

দু'জনে মঁস্যুর দিকে এগোল। যত বাড়ির কাছাকাছি আসছে, ততই নীরবতা গাঢ় হচ্ছে—যেন কেউ কারুর সঙ্গে হাঁটছে না। শাভালের মতো হাড়বজ্জাত লোকের কাছে ক্যাথরিনকে পাঠাতে বুকটা ভেঙে যাচ্ছিল এতিয়েনের কিন্তু অবুঝ সরল মেয়েটাকে সে কি করে আটকাবে? তার ওপর সে নিজে নিঃসম্বল। যে কোনো মুহূর্তে মালিকপক্ষের ভাড়া করা গুণ্ডারা তার দেহটা বন্দুকের গুলিতে এ-ফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে পারে। এই অবস্থায় একটা মেয়ের জীবন নিজের সঙ্গে জড়ানোটাও ঠিক হবে না। আবার হেরে গেল এতিয়েন—ক্যাথরিন চলে যাচ্ছে। বুকভরা ভালোবাসা আর মমতা দিয়েও তাকে আটকাতে পারা গেল না।

পিকেত-এর আস্তানা (যেখানে শাভাল থাকে) থেকে প্রায় কুড়ি মিটার দূরে থেমে গেল ক্যাথরিন।

—এতিয়েন, আর এসো না। ও যদি তোমায় দেখতে পায় তবে নতুন করে অশান্তি শুরু করবে।

দূরে কোনো পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে এগারোটা বাজলো। মদের দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। তবে খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে।

ক্যাথরিন ফিসফিসিয়ে বলল, আসি।

তার পাখির মতো নরম হালকা মুঠিটা শক্ত করে চেপে ধরল এতিয়েন। ধীরে ধীরে তা ছাড়িয়ে নিল ক্যাথরিন। আর একবারও পেছন ফিরে তাকালো না দোকানের পাশের ছোট্ট দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল কোন অদৃশ্য চুম্বকের টানে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল এতিয়েন। ভেতরে কি হচ্ছে কে জানে! কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করল। ঐ কি, মেয়েলী গলায় তীব্র আর্তনাদ শোনা গেল? কই, না তো! সব চুপচাপ, শান্ত! বাড়িটা অন্ধকার। দোতলার জানলায় একটা আলো দেখা গেল। খোলা জানলায় ক্যাথরিন। লাফিয়ে এগিয়ে গেল এতিয়েন

ক্যাথরিন ফিসফিস করে বলল, ও এখনও ফেরেনি। আমি শুতে যাচ্ছি। তুমি এবার চলে যাও লক্ষ্মীটি!

এতিয়েন হাঁটতে শুরু করল। এখন বেশ জোরেই তুষারপাত হচ্ছে। আশে-পাশের বাড়িগুলোর ছাদ দিয়ে হু হু করে জল পড়ছে। বাড়ির দেওয়ালগুলো সব ভিজে স্যাঁতসেঁতে। এতিয়েন প্রথমে ভাবলো রকিয়ারে ফিরে যাবে। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। কিন্তু তারপরই ল্য ভোর‍্যুর কথা মনে পড়ল। কাল থেকেই হয়তো বেলজিয়ান মজুররা খনিতে নামবে। স্থানীয় মজুরদের বিক্ষোভ আরও জোরদার হবে। এতিয়েনের পা-জোড়া তাকে ল্য ভোর‍্যুর দিকে টানতে লাগল। যখন সে খনির কাছাকাছি এসেছে আবার চাঁদ ঝিকমিকিয়ে উঠল মেঘের কোল থেকে। মেঘ-

গুলো এখন অনেক সাদাটে, ক্ষয়া ক্ষয়া চেহারার, স্বচ্ছ। চাঁদ একবার ঢাকা পড়ছে আবার বেরিয়ে আসছে মেঘের খোলস ছেড়ে।

জ্যোৎস্নায় এতিয়েনের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। হঠাৎ সামনের খাড়া স্তূপটার দিকে নজর পড়ল। ওই তো, সেপাইটা কাঁধে বন্দুক নিয়ে তালে তালে পা ফেলে পাহারা দিচ্ছে। বন্দুকের নলটা ঝিকিয়ে উঠছে চাঁদের আলোয়। কিন্তু সেপাইটার পেছনে কুঁড়েঘরটার দিকে কে যেন উবু হয়ে বসে চুপিসারে এগোচ্ছে না? আরে, ও তো জঁল্যাঁ! ওর হাঁটাচলা সবই এতিয়েনের একেবারে মুখস্থ। কিন্তু এখানে ও কি করছে? নিশ্চয়ই কোনো বদ মতলব আছে! বারবার ছেলেটা ওকে জিজ্ঞেস করেছে কবে মজুররা এই সব খুনে সেপাইদের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

একবার এতিয়েন ভাবলো চেঁচিয়ে জঁল্যাঁকে ডাকবে—বারণ করবে বোকার মতো কোনো কাজ করতে! কিন্তু হঠাৎই মেঘের আড়ালে চাঁদ ঢাকা পড়ে গেল। জঁল্যাঁকে আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সান্ত্রীটারও কিছু নজরে পড়েনি। আবার চাঁদ উঁকি মারলো। আরে, জঁল্যাঁ যে লাফিয়ে পড়তে চাইছে লোকটার ঘাড়ে। আবার একরাশ মেঘ—তার মধ্যেই জঁল্যাঁ ঝাঁপিয়ে পড়ল সেপাইটার ওপর। ঘ্যাঁচ করে একটা ছুরি বসিয়ে দিল লোকটার গলায়। দু হাতে ঘোরাতে লাগল ছুরিটা পাগলের মতো—ঠিক যেমন করে মুরগির গলা কাটে। পুরো ব্যাপারটাই চোখের পলকে ঘটে গেল। সেপাইটা টুঁ শব্দ করতে পারল না। ঠং করে বন্দুকটা মাটিতে পড়ল।

এতিয়েনের পা দুটো যেন আঠা দিয়ে মাটিতে সেঁটে দিয়েছে কেউ। ভয়ে তার মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না—সে কি এতক্ষণ দুঃস্বপ্ন দেখছিল? কই, না তো! ঐ তো স্তূপটা খালি—সেপাইটা নেই। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে দৌড়ে গেল এতিয়েন। চার হাত পায়ে গুঁড়ি মেরে মৃতদেহটার সামনে বসে আছে জঁল্যাঁ। একফোঁটা রক্তও বাইরে পড়েনি—ছুরিটা এখনও আমূল বেঁধানো রয়েছে গলায়

এক ধাক্কায় জঁল্যাঁকে মাটিতে ফেলে দিল এতিয়েন।

—কেন এমন করলি?

জঁল্যাঁ উঠে বসল। ঠিক একটা বনবেড়ালের মতো দেখাচ্ছে ওকে। উত্তেজনায় চকচক করছে সবুজ চোখ দুটো।

—জানি না, এমনিই।

জঁল্যাঁর মুখ থেকে অন্য কোনো কৈফিয়তও বের করা গেল না। গত তিনদিন যাবৎ ও ঠিক করেছিল এই লোকটাকে মারবে—আর এ নিয়ে অকারণ এত হৈচৈ করবারই বা কি আছে! ওরাও তো মজুরদের প্রায় মেরেই রেখেছে।

জঁল্যাঁকে একজন খুদে সন্ত্রাসবাদী বলে মনে হচ্ছিল। না, কেউ তাকে এ কাজ করতে বলেনি। নিজের বুদ্ধি বিবেচনামতোই সে লোকটাকে শেষ করে দিয়েছে।

একটা কিশোরের মনে এই রকম অপরাধের বীজ? এতিয়েন আতঙ্কিত হল। তারপর সজোরে জঁল্যাঁকে একটা লাথি মারল। ছিটকে পড়ল জঁল্যাঁ। জন্তু

পেযেছে এতিযেন। কে জানে, হযতো বা সন্দেহবশত অন্য পাহারাদাররা দৌড়ে আসতে পারে। তাছাড়া সান্ত্রী বদল হয ঘণ্টা হিসেব করে। কিন্তু কেউ ছুটে এল না। এতিযেন মৃত লোকটার বুকে কান পাতল। নাঃ, কোনো ধুকপুকুনি শোনা যাচ্ছে না। শুধু ছুরির লম্বা বাঁটটা চকচক করছে চাঁদের আলোয।

মৃত সেপাইটার মুখের দিকে তাকালো এতিযেন। ইস্, জুল বলে সেই নিরীহ লোকটা! একদিন সকালে এর সঙ্গেই এতিযেন কত কথা বলেছে, গল্প করেছে দুঃখে মনটা ভরে উঠল তার—আহা রে! বেঘোরে প্রাণ দিল ছেলেটা। জুলের আতঙ্কগ্রস্ত নীল চোখ দুটো পুরো খোলা—যেন দিগন্তে কোনো কিছু দেখতে চেষ্টা করছে—কি? স্বদেশ? নিজের গ্রাম? ছোট্ট কুঁড়েঘর? আরও দূরে তার মা আর বোন রুমাল নাড়াচ্ছে তারা যেন দেখতে পাচ্ছে জুলকে। সারা জীবন অপেক্ষায থাকবে তার জন্য। একজন গরীব মানুষ অন্য এক গরীব মানুষকে মেরে ফেলল শুধু বড়লোকদের প্রতি আক্রোশবশত।

কিন্তু এই মৃতদেহটাকে নিযে এখন কি করা যায়! যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরিযে ফেলা দরকার। এতিযেন ধীরে ধীরে উত্তেজিত হচ্ছিল। আচ্ছা, দেহটা রকিযারে টেনে নিযে গিযে কবর দিলে কেমন হয? কাক পক্ষীটিও জানতে পারবে না।

সে জ্যঁলাকে কাছে ডাকলো।

জ্যঁলা সন্দিগ্ধ হযে তাকালো।

—না, আমি যাব না। তুমি আমায মারবে। তাছাড়া আমার অন্য জরুরী কাজ আছে। আমি যাচ্ছি।

আসলে জ্যঁলা ঠিক করেছিল এদিকের কাজ মিটে গেলে বেবের আর লিডির সঙ্গে গোপন আস্তানায দেখা করবে, ল্য ভোর‍্যর পেছনে যে কাঠের গাদাটা আছে—সেইখানে। আজ রাতে বাড়ি ফিরবে না কেউ- বেলজিযানরা খনিতে নামবে কিনা সে ব্যাপারে কড়া নজর রাখতে হবে।

এতিযেন বলল, এদিকে আয। তা না হলে এক্ষুণি সেপাই ডেকে তোকে ধরিযে দেব। ওরাও তোর ধড় থেকে মুণ্ডুটা কচ্ করে কেটে নেবে।

মনস্থির করে জ্যঁলা এগিযে এল। উপায কি আছে আর! পড়েছে মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে!

এতিযেন পকেট থেকে রুমাল বের করে জুলের গলাটা ভালো করে পেঁচিযে দিল ছুরিটাও খুলে নিল না। অনর্থক রক্তপাত হলে ঝামেলা বাড়বে। বরফ গলে যাচ্ছে! ভালোই হল—সকালে কারুর পাযের ছাপও থাকবে না।

—তুই পা দুটোকে ধর।

জুলের পিঠে শক্ত করে বন্দুকটা বেঁধে দিযেছে এতিযেন। তারপর দু'জনে ধরাধরি করে লাশটা তুললো। সাবধানে পা ফেলে এগোতে লাগল তারা। পাথরে ঠোক্কর খেলেই সর্বনাশ! কি সৌভাগ্য যে চাঁদটা আবার মেঘের আড়ালে চলে

গেছে। অন্ত পাহারাদারদের নজরে পড়বে না। খানিক বাদেই আবার চাঁদ দেখা গেল। এতিয়েনদের কপাল ভালো যে কেউ তাদের দেখতে পেল না। কিন্তু একজন মানুষকে কাঁধে করে এতখানি রাস্তা বয়ে নিয়ে যাওয়া কি চাট্টিখানি কথা নাকি! বকিয়ারের কাছে একটা পাহারাদারকে দেখে চট করে তারা আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। খানিক পরেই আর একটা লোক, তবে সে ব্যাটা কি ভাগ্যিস মদে চুর হয়ে আছে। শেষ পর্যন্ত তারা খাদের ধারে এসে পৌঁছল।

এতিয়েন আগেই বুঝেছিল মৃতদেহটাকে এভাবে নীচে নামানো কঠিন হবে। জ'ল্যাঁ আগে নামলো। তারপর ওপর থেকে এতিয়েন সাবধানে দেহটা নামিয়ে দিল। লোহার সিঁড়িগুলো আবার জায়গায় জায়গায় ভাঙা। অতগুলো মই তো! প্রতে কটা মই এইভাবে পেরোতে হবে। ইতিমধ্যে এতিয়েনও ভেতরে নেমে এসেছে। তিরিশটা মই। দুশো দশ মিটার গভীর খাদ। বারবার ঠাণ্ডা নিথর দেহটার সঙ্গে এতিয়েনের ধাক্কা লাগছিল। কিন্তু এতিয়েন চায় না জ'ল্যাঁ মোমবাতি নিয়ে আসুক। এতিয়েনের গোপন আস্তানায় একটা মোমবাতির দাম এক বস্তা সোনার মতোই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নীচে পৌঁছে এতিয়েন জ'ল্যাঁকে মোমবাতি আনতে পাঠালো তার কুঠুরী থেকে। আর নিজে বসে রইল জুলের শরীরটার পাশে।

জ'ল্যাঁ মোমবাতি নিয়ে ফিরে আসার পর এতিয়েন তাকে জিজ্ঞেস করল মড়াটাকে কোথায় চালান করা যায়। এ ছোকরা খুব কাজের। সব জায়গায় ক্ষুদে বাঁদরের মতো চলাফেরা করতে পারে। জ'ল্যাঁর কথামতে আরও এক কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হল। ওঃ, সে কি রাস্তা! পাথুরে আর এত নীচু ছাদ যে বুক ঘষটে ঘষটে আসতে হয়। একটা লম্বা কাঠের বাক্সও মিলল। তাতে জুলের শরীরটা সাবধানে শুইয়ে দিল এতিয়েন। পাশে রাখল বন্দুকটা—তারপর ছাদের ওপর আঘাত করতে লাগল। আস্তে আস্তে চাঙড়গুলো আলগা হচ্ছে—ছিটকে সরে এল দু'জন। একটু পরেই হুড়মুড় করে ধসে পড়ল সমস্ত ছাদটা জুলের শরীরটার ওপর। একটা তাজা প্রাণ নিঃশেষ হয়ে গেল কয়েক ঘণ্টার মধ্যে।

এতিয়েনের কুঠুরীতে ফিরে এসে খড়ের গাদার ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল জ'ল্যাঁ।

—বাপরে! লিডিয়া আবার অপেক্ষা করে আছে আমার জন্য। দূর শালা! আজ আর নড়তে পারছি না। এখন বেশ জম্পেশ করে একটা ঘুম লাগাবো।

একটুখানি মাত্র মোমবাতি বাকি আছে। এতিয়েন এক ফুঁয়ে আলোটা নিভিয়ে দিল। তারও অসম্ভব ক্লান্ত লাগছে কিন্তু চোখে ঘুম নেই। বিশ্রী অনুভূতি হচ্ছে কেমন। জিভ, গলা সব বিস্বাদ লাগছে—মাথার ভেতরটা ভোঁ ভোঁ করছে। ধীরে ধীরে অন্য এক চিন্তা মনের ভেতরে চেপে বসল তার: সে কেন শাভালকে খুন করল না? এত বড় সোনার সুযোগটা হেলায় হারালো? আর এ দিকে এই একরত্তি ছেলেটা কেমন চোখের পাতা পর্যন্ত না কাঁপিয়ে খুন করে ফেলল! তবে কি সে কাপুরুষ? তার অহিংসা, ভদ্রতা—এ সব ভীরুতারই নামান্তর মাত্র? জ'ল্যাঁ কেমন দিব্যি নাক ডাকছে—যেন এক পেট মদ টেনেছে। রক্তের নেশা হয়েছে তো—মদের

থেকেও বেশী চুর করে রাখে মানুষকে। ওঃ, অসহ্য লাগছে—এত নাক ডাকাচ্ছে ছেলেটা! হঠাৎ কেঁপে উঠল সে। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল তার। এই তো একটু দূরেই টাটকা মড়া একটা! খানিক আগেও বেঁচে ছিল—হাড় পর্যন্ত শিরশির করে উঠল এতিয়েনের। ঐ তো কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলছে! উঠে আলোটা জ্বালবে? কই, কেউ নেই তো! দূর, সব মনের ভুল!

মোমবাতিটা পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে একই ভাবে আরও পনেরো মিনিট কাটলো। তার পর দপ্ করে বাতিটা নিভে গেল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। জ্যঁল্যাকে মারতে ইচ্ছে করছিল এতিয়েনের। শুয়োরটা কেমন নির্বিকারভাবে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে ত্যাখো! বাইরের বাতাসে বুকভরা শ্বাস নেবার জন্য প্রাণটা আকুলিবিকুলি করছিল। যেন পেছনে কোনো অশরীরী আত্মা তাড়া করেছে সেইভাবে শ্যাফ্ট বেয়ে ওপরে উঠে এল এতিয়েন। ঘুমন্ত জ্যঁল্যার সঙ্গ আর সহ্য হচ্ছে না।

বাইরে এসে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। নিজের হাতে খুন করবার সাহস নেই তার। তার চাইতে বন্দুকের নলের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানো অনেক সোজা। এতিয়েন মনে মনে নিজেকে বিপ্লবের প্রথম শহীদ হিসেবে চিন্তা করল। হ্যাঁ, যদি মজুররা সরাসরি যুদ্ধে নামে, সে-ই প্রথম সারিতে নেতৃত্ব দেবে। লা ভোরাব চত্বরে সদর্পে পায়চারি করতে লাগল এতিয়েন।

রাত দুটো বাজলো। ডেপুটিদের ঘর থেকে কথাবার্তার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। মজুরদের কাজকর্ম ভাগ করে দেওয়া নিয়েই সম্ভবত আলোচনা হচ্ছে। সান্ত্রী জুলের অনুপস্থিতি এদের নজরে পড়েছে। প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিল অনেকে। পরে ভেবেছে ছোকরা নির্ঘাত পিটটান দিয়েছে।

এতিয়েন তুষার ঝড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখছিল: শেষ পর্যন্ত হয়তো বিপ্লব আসবে!

ভোর পাঁচটা পর্যন্ত বেলজিয়ানদের জন্য অপেক্ষা করল এতিয়েন। দেখা মিলল না। নির্ঘাত মালিকরা ওদের আগেই খনিতে নামিয়ে দিয়েছে। দুশো চল্লিশ নম্বর কলোনীর যে সব বাসিন্দার ওপর নজর রাখার ভার দেওয়া হয়েছিল তাদের সঙ্গে কথা বলল এতিয়েন। সবাই দৌড়ল অন্যদের খবর দিতে। একা দাঁড়িয়ে থাকল এতিয়েন। প্রায় ছ'টা বাজলো। সূর্য উঠেছে—লালচে নরম আলোয় ভরে গেছে চারদিক। র‍্যাভিয়েকে দেখা গেল—হাঁটতে বেরিয়েছেন। প্রতি সোমবার সকালে নিয়ম করে তিনি দূরের এক গীর্জায় প্রার্থনাসভার আয়োজন করেন।

এতিয়েনকে দেখে তিনি বললেন, সুপ্রভাত, বন্ধু।

দু চোখের শ্যেনদৃষ্টিতে এতিয়েনের আপাদমস্তক জরিপ করলেন। এতিয়েন কোনো উত্তর দিল না। দূরে আবছা মতো একটা মেয়ের মূর্তি—ঠিক মনে হল ক্যাথরিন। সেদিকে ছুটল এতিয়েন।

সারা রাত ধরে ক্যাথরিন হাঁটছে। বাড়ি ফিরে এসে শাভাল তাকে ঘাড় ধরে বিছানা থেকে টেনে তুলেছে। কানের ওপর প্রচণ্ড আঘাত করে ওই শীতের রাতে

ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। এও বলেছে মানে মানে বেরিয়ে না গেলে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। দু পায়ে, উরুতে অজস্র লাথি মেরেছে ক্যাথরিনকে। গরম জামাকাপড় না পরেই হি হি করে শীতে কাঁপতে কাঁপতে পথে বেরিয়ে এসেছে ক্যাথরিন। খানিকক্ষণ একটা পাথরের ওপর বসে অপেক্ষাও করেছিল, রাগ পড়লে যদি শাভাল তাকে ডেকে নেয়। কিন্তু সে আশায় ছাই পড়েছে।

দু ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর ক্যাথরিন হাঁটতে শুরু করেছে। রাস্তার ঘেয়ো কুকুরের মতো তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে শাভাল। সাহস করে শাভালের ঘরের দরজায় সে ধাক্কা দিতে পারেনি—শেষে ঠিক করেছে মান ইজ্জত শিকেয় তুলে রেখে বাবা-মার কাছেই ফিরে যাবে। তাই যেতও শেষ পর্যন্ত কিন্তু হঠাৎ এত লজ্জা করল যে আবার বাগানের ভেতর দিয়ে ছুটে পালিয়ে এসেছে—ভয় পেয়েছে পাছে চেনাজানা কারও নজরে পড়ে যায়। অবশ্য সবাই এখন ঘুমোচ্ছে।

এদিক ওদিক ছন্নছাড়ার মতো পায়চারি করছিল ক্যাথরিন। প্রতিটি পাতা ঝরার শব্দে ভয় পেয়ে ভেবেছে এই বুঝি কেউ তাকে ধরে বেশ্যাবাড়িতে নিয়ে গেল। দু-দু'বার সেপাইদের গলার স্বরে চমকে উঠে পালিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত সাহস করে রকিযারে এসেছে—যদিও জায়গাটা মোদো মাতালের আড্ডা তবু মনে ভরসা ছিল হয়তো এতিয়েনের দেখা পেয়ে যাবে।

শাভালের আজ ভোরে খনিতে আসার কথা। ক্যাথরিন যদিও জানে তার সঙ্গে কথা বলে কোনো ফল হবে না, সব সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে তবু শেষ বারের মতো একবার চেষ্টা করে দেখতে চায়। জঁ-বারে সব কাজ বন্ধ কিন্তু ক্যাথরিনকে ল্য ভোরাতে আসতে বারণ করেছে শাভাল। মেয়েটা নাকি এলেই গণ্ডগোল পাকাবে। কিন্তু তাহলে কোথায় যাবে ক্যাথরিন? না খেয়ে মরবে, নাকি মুখে রং মেখে সন্ধ্যেবেলা কুঠিঘরের দরজায় দাঁড়াবে? দুর্বল পা দুটো টেনে টেনে হাঁটছিল ক্যাথরিন। তার মাথা এখন আর কাজ করছে না।

সকাল হয়ে এল। ওই তো শাভাল—তার চওড়া পিঠটা দেখা যাচ্ছে খনির চত্বরে। লিডি আর বেবেরের কচি মুখ দুটো উঁকি দিচ্ছে কাঠের গাদার পেছন থেকে—সারা রাত ধরে দুটো বাচ্চা নজর রেখেছে। জঁল্যাঁর কড়া হুকুম ছিল সে না আসা পর্যন্ত কেউ যেন এক পা অন্য কোথাও না যায়। এদিকে জঁল্যাঁ তো ঘুমে অচেতন। বাচ্চা দুটো শীতে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে শরীর গরম রাখছিল। বাদাম গাছের পাতা কাঁপিয়ে শনশন করে বাতাস বইছে—দু'জনে গুটিশুটি মেরে শুয়ে আছে, লিডি যমের মতো ভয় পায় জঁল্যাঁকে অথবা বলা চলে চুপ করে মার খাওয়া স্ত্রীর মতোই তার ব্যবহার। বেবেরও সোজাসুজি জঁল্যাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করতে সাহস করছিল না। সারারাত হিম পড়েছে। বাচ্চা দুটোর গাল লাল খসখসে হয়ে গেছে তুষারকণার দাপটে। নাঃ, আর তো পারা যায় না! দু'জনেই বিদ্রোহী হয়ে উঠল। জঁল্যাঁর অদৃশ্য উপস্থিতি আর নিষেধ অগ্রাহ্য করে তারা পরস্পরকে চুমু খেল—নিষ্পাপ, পবিত্র সে আশ্লেষ—এত দিনের সুপ্ত ভালোবাসার বীজ এক মুহূর্তেই

সুবিশাল মহীরুহ হয়ে ছোট্ট ছেলেমেয়ে দুটোর হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বিছিয়ে দিল শিকড় আর ডালপালা। এত সুখ যে ভালোবেসে পাওয়া যায়, তা এদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। মেলায় পুতুল কিনে, ফুর্তি করে, লজেন্স-বিস্কুট খেয়েও বোধহয় এত আনন্দ আর কখনও অনুভব করেনি লিডি আর বেবের।

একটা ঘণ্টার আওয়াজে চমক ভাঙলো ক্যাথরিনের। সে মুখ তুলে দেখল সান্ত্রীরা বন্দুক কাঁধে দাঁড়িয়ে। এতিয়েন দৌড়ে এগিয়ে আসছে। গোপন জায়গা থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল লিডি আর বেবের। ধীরে ধীরে রোদ্দুর উঠছে। দূরে গ্রাম থেকে দলে দলে মেয়ে পুরুষ এগিয়ে আসছে লা ভোরার দিকে। তাদের উদ্যত মুঠি আকাশের দিকে তুলে ধরা, প্রতি পদক্ষেপে দৃঢ়তার ছাপ।

* * * *

লা ভোর‍্যর সব কটা প্রবেশপথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, শুধু একটা ছাড়া। সেই দরজায় পাহারা দিচ্ছে ষাটজন সশস্ত্র রক্ষী। খনিতে যাবার এটাই এখন একমাত্র পথ। এরপর সরু সিঁড়ি পেরিয়ে লকার-রুম আর ডেপুটিদের ঘরে যাওয়া যায়। এমনভাবে রক্ষীদের লাইনে দাঁড় করানো হয়েছে যাতে পেছন থেকে কেউ আক্রমণ করতে না পারে।

বিক্ষুব্ধ মজুররা সংখ্যায় পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। প্রথম দিকে তারা অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে নীচু গলায় তর্কাতর্কি করছিল।

এর মধ্যে মায়্যু-গিন্নী এস্তেলকে বুকে নিয়ে আলুথালু পোশাকে এসে হাজির। সে বারবার চেঁচাতে লাগল, কাউকে খনিতে ঢুকতে বা বেরোতে দিও না! যারা ভেতরে গেছে তাদের সবাইকে আটকে রাখো!

মায়্যু তার বউকে সমর্থন করছিল বুড়ো মুক্যও রকিয়ার থেকে এসে হাজির হয়েছে। সবাই তাকে পরামর্শ দিচ্ছিল এই ঝুটঝামেলায় না আসতে—কিন্তু কে শোনে কার কথা! সে ভেতরে যাবেই। তার দুটো ঘোড়া। একটা মরে গেছে —অন্যটাকে ঠিকমতো দেখভাল করতে হবে। মরা ঘোড়াটাকে বাইরে আনা দরকার। অবলা জন্তুর ওপর গায়ের ঝাল মিটিয়ে কি লাভ! এতিয়েন মুক্যকে আটকালো না। সেপাইরাও তাকে খনিতে ঢুকতে দিল। পনেরো মিনিটের মধ্যে ধর্মঘটীদের সংখ্যা আর বিক্ষুব্ধ ধিক্কার ধ্বনি বাড়তে লাগল। এরই মধ্যে খনির বড় দরজাটা খুলে গেল। কয়েকজন কর্মী একটা ঘোড়ার মৃতদেহ ধরাধরি করে বাইরে এনে বরফের ওপর শুইয়ে দিল। সবাই তখন এত হতভম্ব হয়ে গেছে যে ঐ সব কর্মীদের পথ অবরোধ করবার কথা তাদের মাথাতেই এল না। ঘোড়াটাকেও চিনতে পেরেছে সবাই।

—আরে, ত্রোপেত না? হ্যাঁ, তাই তো!

সত্যিই তাই। কোনোদিনই ত্রোপেত খনির বদ্ধ আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেনি। এই মাল বওয়ার কাজ করতে ইচ্ছে করত না ওর—বার-বার বাইরের আলোর জন্য অস্থির হয়ে উঠত। বাতাঈ কতবার ওর গায়ে নাক ঘষে

ওকে শান্ত করবার চেষ্টা করেছে। বাতাঈ-এর কাছ থেকে ভয়ংকর অতীতের কাহিনী শুনে ভযে শরীরটা কেঁপে উঠত ত্রোপেতের। যখনই নিজেদের মধ্যে কথা হত, শুধু আফসোস আর আফসোস—জীবনটা এই অন্ধকূপেই কেটে গেল। বাতাঈ নীরবে কাঁদে কারণ সুখের জীবনটা অনেক ভেবেও সে মনে করতে পারে না বলে, আর ত্রোপেত—কারণ সেটাকে ও এখনও ভুলতে পারে না। দুটিতে আস্তাবলে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখত—দিনের আলো, সবুজ মাঠ, সাদা রাস্তা, সোনালী সূর্য। তারপর—আজ মরে গেল ত্রোপেত। বাতাঈ ওর গা শুঁকছিল—বন্ধু চলে গেল। খনিতে আজ থেকে কোনো আনন্দ থাকবে না সুখ-দুঃখের অংশীদার হবে না কেউ। ত্রোপেত তাকে বাইরের জীবনের গল্প বলত। খানিকক্ষণের জন্য হলেও বাতাঈ ভুলতো অন্ধকূপের জীবন।

মুক্যা কিন্তু খনির ওভারম্যানকে সপ্তাহখানেক যাবৎ ত্রোপেতের অসুখের কথা বলে যাচ্ছিল। কিন্তু একটা ঘোড়াকে নিয়ে আর কারই বা মাথাব্যথা। এমনিতেই কত রকমের ঝামেলা চারদিকে। কিন্তু এখন তো মরা জন্তুটাকে সরাতেই হবে। মুক্যা আর তার দুজন সঙ্গী ত্রোপেতের শরীরটা শক্ত করে দড়ি দিয়ে বেঁধেছে—ওপরে তুলতে হবে তো। ত্রোপেতের শরীরটা গাড়িতে তুলে দিয়েছিল লোকজনেরা। সেই গাড়ি টানছিল বাতাঈ। সরু গলিপথ দিয়ে খুব ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল বুড়ো ঘোড়াটা। আহা। যদি বন্ধুর গায়ের চামড়া ছড়ে যায়। এইভাবে খনির মুখটার ঠিক নীচে এসে পৌছল সকলে। খাঁচা আর জাল ঠিক করাই ছিল। ঘণ্টা বাজিয়ে মজুররা ত্রোপেতকে প্রথমে ধীরে ধীরে ওপরে তোলার ব্যবস্থা করল। তারপর হঠাৎ একটা জোর ঝাঁকুনি—আর ত্রোপেতকে দেখা গেল না। ঘাড় উঁচু করল বাতাঈ। বন্ধু হারিয়ে গেল—হারিয়ে গেল বাইরের জীবনের স্মৃতিটুকু। ধীরে ধীরে কাঁপা কাঁপা পায়ে আস্তাবলের দিকে এগোল বাতাঈ। এইভাবে তার জীবনও শেষ হয়ে যাবে একদিন।

ওপরে ত্রোপেতের দেহটা দেখে সকলে ভীড় করে এগিয়ে এল।

একজন মেয়ে-মজুর মৃদু গলায় বলল, একজন মানুষ নিজের ইচ্ছে হলে তবেই খনিতে কাজ নেয় আর এই জন্তুটা ও তো অন্যের ইচ্ছেয় নিজেকে বলি দিল।

আরও মজুররা এগিয়ে আসছে এদিকে। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে লেভাক। লেভাকের পেছনে তার বউ আর বুতলু। লেভাক চেঁচাচ্ছে:

—বেলজিয়ানরা নিপাত যাও। বিদেশী হামলা চলবে না। সব কটাকে নিকেশ কর।

সবাই কাছে এসে পড়েছে। এতিয়েন অতি কষ্টে তাদের আটকালো। এরপর সে এগিয়ে গেল রক্ষীবাহিনীর নেতার দিকে। বছর আটাশের রোগা লম্বা একটা ছোকরা, চোখে মুখে দৃঢ়তার ছাপ। এতিয়েন তাকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল, কি দরকার অনর্থক রক্তপাতে? ন্যায় বিচার মজুরদের পক্ষে। সবাই এখানে মিলেমিশে কাজ করতে চায়।

ক্যাপ্টেন একটু কেঁপে উঠেই ফেটে পড়লেন রাগে।

—দূরে সরে যাও। আমার কাজে বাধা দিও না!

তিন-তিনবার এতিয়েন চেষ্টা করল। পেছনে তার সহকর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ আর চাঞ্চল্য বাড়ছে। খবর ছড়ালো মঁসিয় এনবো খনিতে আছেন। ভীড়ের ভেতর থেকে কে যেন বলল, হারামজাদাটার ঘাড় ধরে টেনে এনে দেখিয়ে দাও কত ধানে কত চাল।

কিন্তু খবরটা মিথ্যে। নেগ্রেল আর দঁসের আছে শুধু—খনির অফিস-ঘরের জানলার ফাঁক দিয়ে একবার উঁকি মেরে দেখেও গেল দু'জনে। পিয়েরোঁর বউয়ের সঙ্গে সেই কেলেঙ্কারীর ব্যাপারটা জানাজানি হবার পর থেকেই দঁসের একটু আড়ালে আবডালে থাকছে। নেগ্রেল কিন্তু মাথা উঁচু করে সবাইকে লক্ষ্য করছিল। ক্ষীণ বিদ্রূপের হাসি তার ঠোঁটের কোণায়। কিন্তু সবাই তাকে উদ্দেশ্য করে এমন চোখা চোখা মন্তব্য ছুঁড়তে শুরু করল যে পালিয়ে মান বাঁচাতে হল। এখন শুধু স্যুভারিনের মুখটা দেখা যাচ্ছে। ধর্মঘট চলাকালীন সে একদিনের জন্যও কাজে কামাই করেনি। তবে অদ্ভুত উত্তেজনা আর দৃঢ়তায় তার চোখ দুটো ইস্পাতের মতো চকচক করছিল।

ক্যাপ্টেন আবার চেঁচিয়ে উঠলেন।

—তফাত যাও। আমার ওপর হুকুম আছে এই খনি রক্ষা করতে হবে এবং আমি তা জান দিয়ে রক্ষা করব। আমার লোকদের উত্তেজিত করবার চেষ্টা কোরো না। তাহলে আমাকেও বাধ্য হয়ে অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

ক্যাপ্টেনের গলার স্বর একটু কেঁপে উঠল কি? যে হারে স্রোতের মতো মজুরদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে, তাতে যে কোনো লোকেরই ভয় পেয়ে যাওয়ার কথা। দুপুরবেলা ডিউটি বদল হবে—ততক্ষণ পর্যন্ত মানসম্মান নিয়ে টিঁকে থাকতে পারলে হয়। আরও নতুন সৈন্য আনা দরকার—ক্যাপ্টেন একটা ছোকরাকে মঁস্যুর দিকে পাঠালেন।

মজুররা চেঁচিয়ে উঠল।

—বিদেশীরা নিপাত যাও! বেলজিয়ানদের রক্ত চাই! আমরাই আমাদের খনির মালিক।

এতিয়েন কয়েক পা পিছু হটল। সে কেমন অসুস্থ বোধ করছে। এখন যুদ্ধ আর মৃত্যু—এ ছাড়া কোনো পথ নেই। সঙ্গীদের শান্ত করবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল। মজুররা সংখ্যায় প্রায় চারশো—আশেপাশের গ্রাম থেকে আরও আসছে। সবার কণ্ঠে সংগ্রামের সুর। মায়ু আর লেভাক পাগলের মতো সেপাইদের উদ্দেশ্য করে বলছে, চলে যাও ভাই সব। তোমাদের সঙ্গে তো আমাদের কোনো বিবাদ নেই।

মায়ু-গিন্নী বলল, তোমরা এ ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছো কেন? আমাদের সমস্যা আমাদের বুঝে নিতে দাও!

লেভাকের বউ হিংস্র গলায় বলল, লাশ পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত বুঝি রাস্তা ছাড়বে না? জানের মায়া থাকলে সরে যাও!

এমন কি সমস্ত আবহাওয়া খানখান করে দিয়ে লিডির তীক্ষ্ণ রিণরিণে কণ্ঠস্বর : বেবের, থ্যাথ্ পুলিসগুলো ঠিক যেন শুয়োরের মাংসের তাল !

ক্যাথরিন একটু দূরে দাঁড়িয়ে সব কথাবার্তা শুনছিল। কি করা উচিত তাই সে ভেবে পাচ্ছিল না। নিজের কপাল তো যা পোড়ার তা পুড়েইছে। এইভাবে ভগবান তাকে কষ্ট দিচ্ছেন কেন ? গতকাল পর্যন্ত কিছুতেই ভেবে পায়নি মজুরদের এত বিক্ষোভের কারণ কি ? কিন্তু এখন মালিকপক্ষের প্রতি তীব্র ঘৃণায় মন ভরে গেছে। শাভালের সঙ্গে ঘর ছাড়ার আগে প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা এতিয়েন তাদের বাড়িতে যে সব কথা বলত, তার অর্থ যেন নতুন করে অনুভব করা যাচ্ছে। এখনও এতিয়েন কেমন সুন্দর মাথাঠাণ্ডা রেখে সেপাইদের বোঝাতে চেষ্টা করছে যে তারাও মেহনতী মানুষের একজন। মজুররা তাদের সঙ্গে বিরোধে আসতে চায় না—যারা এত দিন গরীবদের শোষণ করে গেল তাদের বিরুদ্ধেই এই সব ভুখা আদমীদের সংগ্রাম আর সেপাইদেরও উচিত এই লড়াইয়ে সামিল হওয়া।

জনতা হঠাৎ দু ভাগে ভাগ হয়ে কাকে যেন পথ ছেড়ে দিল। একটা বুড়ি। আরে, মা ব্রুলে। চামড়া কুঁচকে ঝুলে গেছে, শরীরের হাড় ক'টা গোনা যায়। কিন্তু কি গলার তেজ। হাওযায় পাকা চুলগুলো শনের নুড়ির মতো উড়ে চোখে মুখে এসে পড়ছে।

—আমি এসে গেছি। হারামজাদা পিয়েরোঁটা আমাকে চিলেকোঠায় বন্ধ করে রেখেছিল।

সৈন্যদের এবার সে কুৎসিত গালিগালাজ করতে লাগল।

—রক্তচোষা বাদুড় কোথাকার ! নোংরা বেজন্মা কুত্তা। যা যা, মনিবের পা চাটগে ! যত তম্বি বুঝি গরীবের ওপর ?

অন্যরাও তার সঙ্গে গলা মেলালো।

—নিকেশ কর হতচ্ছাড়াদের—শ্যাফ্‌টের ভেতর ফেলে দাও। সব লালকুর্তাদের কুত্তা দিযে খাওয়াও।

একটু আগেই মজুররা কেমন মিষ্টি কথায় সেপাইদের মন ভেজাবার চেষ্টা করছিল। সোজা আঙুলে ঘি উঠল না দেখেই তাদের এত আক্রোশ। এতেও কিন্তু সৈন্যদের কোনো ভাববিকার হল না। চোখের পাতা পর্যন্ত কাঁপল না কারও। সেই আগের মতোই নিরাসক্ত, নির্বিকার মুখ। ক্যাপ্টেন খোলা তলোযার হাতে দাঁড়িয়ে। মজুররা ভয় দেখাচ্ছে, সেপাইদের দেওয়ালের সঙ্গে পিষে মেরে ফেলবে। ক্যাপ্টেন আদেশ দিলেন বেয়নেট উঁচিয়ে ধরার। ঝকঝকে ইস্পাতের ফলা সূর্যের আলোয় ঝিকিযে উঠল মজুরদের প্রায় বুকের ওপর।

—বেজন্মা কোথাকার ! থুঃ · থুঃ ··

পিছু হটলো মা ব্রুলে।

কিন্তু আবার ধেয়ে এল তারা। এতই মরীয়া হযে উঠেছে যে মৃত্যুভয়ও নেই। মেয়েরাও এগিয়ে গেল সামনের দিকে। মায়্যু আর লেভাকের বউরা চেঁচাতে লাগল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, মেরে ফেল আমাদের। মাটি কামড়ে থাকব তবু দাবী ছাড়বো না!

লেভাক নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে তিনটে বেয়নেটের ফলা হাতে নিয়ে জোরে মুচড়ে ধরল—সাধারণ শক্তি দিয়ে নয়। আজ প্রায় দশটা মানুষের জোর তার দু হাতে কিন্তু বুতলু লেভাকের পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল।

মাহ্যু বলল, যদি মরদের বাচ্চা হোস তবে আমাদের কলজের জোর আজ দেখতে পাবি তোরা!

সে টান মেরে গা থেকে কোট শার্ট সব খুলে ফেলল। বড় বড় লোমে ভরা চ্যাটালো বুক—কয়লার গুঁড়ো দীর্ঘদিন ধরে লেগে লেগে এমন দেখাচ্ছে যেন কালি দিয়ে উল্কি পরিয়েছে কেউ। বেয়নেটের তীক্ষ্ণ ফলার গাযে নিজেকে বিঁধিযে বুক টান করে দাঁড়ালো মাহ্যু। বুকে খোঁচা লাগল। কযেক ফোঁটা রক্ত। পাগলের মতো সে আরও জোরে নিজেকে চেপে ধরল যেন পাঁজরগুলো ভেঙে গেলে তার আশ মেটে।

—ভীরু কাপুরুষের দল! আমার পেছনে আরও দশ হাজার মজুর আছে। ক'জনকে মারবি তোরা?

সৈন্যরা ক্রমশ বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে। তাদের ওপর কড়া নির্দেশ আছে নিতান্ত প্রয়োজন হলে তবেই যেন অস্ত্র ব্যবহার করা হয। কিন্তু এই উন্মাদ মজুরগুলোকে কি করে ঠেকানো যায়? তাছাড়া এত লোক জমা হযেছে যে তিল ধারণের জায়গা নেই। সৈন্যদের পিছু হটবারও জাযগা নেই। সরতে সরতে প্রায় দেওয়ালের সঙ্গে মিশে গেছে তারা। শয়ে শযে মজুরদের বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র সৈন্য এখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়িযে আছে। ক্যাপ্টেন দাঁতে দাঁত চেপে সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দিচ্ছেন অন্যদের—তাঁর একটাই ভয়, ক্রমাগত গালিগালাজ শুনতে শুনতে যদি সৈন্যদের ধৈর্যহানি হয়। এর মধ্যেই একজন সার্জেন্টের চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে। আর একজন সৈন্যের হাতের বেযনেট এক টুকরো খড়ের মতোই দুমড়ে গেছে। বাপ-মা তুলে গালিগালাজ করলে ক'জনেরই বা মাথা ঠাণ্ডা থাকে! মজুরদের অশ্রাব্য উক্তির তোড়ে ভেসে যাচ্ছিল সবাই। যেন মুখের ওপর দলা দলা থুথু ছিটোচ্ছে—কিন্তু তাহলেও তো নিয়ম ভাঙা যায় না।

মুখোমুখি লড়াই বাধবার ঠিক আগের মুহূর্তে রিশোম এল। পাকা চুলে ভরা মাথা আর মমতামাখানো দৃষ্টি নিয়ে এসে দাঁড়ালো মজুর আর সৈন্যদের মধ্যে।

—শোনো ভাই সব। তোমরা তো জানো আজ কতদিন হল এ খনিতে আমি কাজ করছি। সব সময়ই আমি তোমাদের পক্ষে ছিলাম। কথা দিচ্ছি যদি তোমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা না হয়, তোমাদের ওপর সুবিচার করা না হয়, আমি নিজে মালিকদের কথা শুনিয়ে দেব। ছাড়বো না। কিন্তু তোমরাও উত্তেজিত হয়ে বড় বাড়াবাড়ি করে ফেলছ—এভাবে বাজে গালাগাল দিলেই কি লড়াইয়ে জিতে যাবে?

সবাই চুপ করে রিশোমের কথা শুনছিল। একটু দ্বিধান্বিতও হল হয়তো বা। কিন্তু

এমনই কপাল, ঠিক সেই সময় ওপরে জানলার ফাঁক দিয়ে নেগ্রেলকে দেখা গেল। নিজের গা বাঁচাতে সে রিশোমকে পাঠিয়েছে। একবার কি বলতে চেষ্টা করল নেগ্রেল কিন্তু গোলমাল ততক্ষণে এত বেড়ে গেছে যে তাড়াতাড়ি নিজেকে সে। সরিয়ে নিল। তাকে দেখেই জনতা খেপে উঠেছে। রিশোমের কথা কানেই তুলছে না কেউ। সবাই তাকে মালিকপক্ষের দালাল ভেবে সন্দেহ করছে, কটূক্তি করছে কিন্তু রিশোমও ছাড়বার পাত্র নয়।

—ঠিক আছে। আমি মরি তো মরব কিন্তু তোমরা যদি বোকার মতো লড়াই করতে চাও, আমিও তোমাদের সঙ্গে আছি।

এতিয়েনের কাছে সাহায্যের আবেদন করল রিশোম। অসহায়ের মতো কাঁধ ঝাঁকালো এতিয়েন। এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। এতক্ষণে মজুরদের দিকে পাঁচশোরও বেশী লোক। সবাই যে খনির কর্মী তাও নয়। কিছু সাধারণ লোকও মজা দেখতে জমা হয়েছে। খানিকটা দূরে জাশারী আর ফিলোমিন দাঁড়িয়ে—যেন মজা দেখছে। আর এত বোকার বেহদ্দ যে দুটো বাচ্চাকেও ট্যাকে করে নিয়ে এসেছে। বকিয়ার থেকে আরও ধর্মঘটীরা এসে পড়ল। মুকে আর মুকেতও ছিল। মুকে এসে প্রথমেই জাশারীর কাঁধে একটা চাপড় মারলো কিন্তু ওর বোন মুকেত সোজা ছুটে চলে এল মায়্যুদের দলে।

ক্যাপ্টেন মঁসুর রাস্তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন। সাহায্যের আবেদন জানিয়ে লোক পাঠিয়েছিলেন তিনি কিন্তু এখনও কেউ এসে পৌছল না। তাঁর অধীনে মাত্র ষাটজন লোক, এই বিক্ষুব্ধ মজুরদের ঠেকাবে কেমন করে? হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি এল তাঁর। সৈন্যদের বললেন সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে বন্দুকে গুলি ভরে নিতে, যদি তাতে ভয় পাওয়ানো যায়। কিন্তু এতে উত্তেজনা আর অসন্তোষ বাড়লো শুধু। আরও বিদ্রূপ আর চোখা চোখা মন্তব্য ভেসে এল।

—ছাখ্ ছাখ্, শয়তানগুলো নিশানা ঠিক করছে!

মা ব্রুলে, লেভাক-গিন্নী আর অন্য মেয়েরা চেঁচিয়ে উঠল। এস্তেল জেগে গিয়ে তারস্বরে চেঁচাতে শুরু করেছে। তাকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে আরও এগিয়ে এল মায়্যু-গিন্নী।

আর থাকতে না পেরে একজন সার্জেন্ট বলে উঠল, কি রকম আক্কেল তোমার, এই দুধের বাচ্চাকে নিয়ে এখানে এসেছ মরতে?

গর্জে উঠল মায়্যুর বউ।

—নিজের চরকায় তেল দে! দেখি না কেমন করে বাচ্চাটার খুলি উড়িয়ে দিতে পারিস!

সেপাইরা কাঁধ ঝাঁকালো। এরা বিশ্বাসই করছে না যে প্রয়োজন হলে গুলিগোলা চলবে।

লেভাক বলল, ফাঁকা কার্তুজ ভরা আছে।

মায়্যু বলল, এত ভয় তোদের? ছোঃ! এই নাকি তোদের দেশরক্ষার নমুনা!

বিপদ তুচ্ছ করে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল বন্দুকের নলের সামনে। যা হয় হবে। বুলেট শরীর ঝাঁঝরা করে দিলেও বিনাযুদ্ধে কেউ হটে যাবে না।

মুকেত অবিশ্বাসী চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে। সেপাইরা কি দরকার হলে মেয়েদের শরীরও ঝাঁঝরা করে দেবে? ওদের কি ঘরে মা-বউ-বোন নেই? মুকেতের সব অকথ্য গালাগালির পুঁজি নিঃশেষ। হাতে নতুন আর কি অস্ত্র আছে? হঠাৎ স্কার্টটা খুলে ফেলল মুকেত। নীচে এক চিলতে কাপড়ও নেই। মাংসল ভরাট নিতম্ব। সেপাইদের দিকে পেছন ফিরে বলল, ছাখ্ হতচ্ছাড়ারা, এটা তোদের জন্য। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিস তো? শালা শুয়োরের বাচ্চা! এবার গুলি করে উড়িয়ে দে তো দেখি!

ঘুরে ঘুরে পাক খেতে লাগল মুকেত—যাতে সবাই তার শরীরের গোপন অংশ ভালোভাবে দেখতে পায়।

—এইটা তোদের বড়কর্তার জন্য। এইটা সার্জেণ্ট আর সাধারণ পুলিসের জন্য।

মজুররা সবাই হো হো করে হেসে উঠল। বেবের আর লিডির তো হাসতে হাসতে পেটে প্রায় খিল ধরে গেছে। এমন কি এতিয়েনও বেশীক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকতে পারছে না। সকলে ধিক্কার দিতে লাগল সৈন্যদের, একমাত্র ক্যাথরিন ছাড়া। একপাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে সে—সমস্ত বুকটা যেন ঘেন্নায় ফেটে যাচ্ছে।

ক্যাপ্টেনের মনে হল এবার কিছু একটা করা দরকার। এভাবে নপুংসকের মতো হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে সেনাদলের মনোবলে চিড় খাবে। মুকেত আর একটু এগোতেই তাকে গ্রেপ্তার করা হল। তারপর লেভাক আর আরও দু'জনকে। তাদের নিয়ে যাওয়া হল ডেপুটির ঘরের দিকে। নেগ্রেল আর দঁসের ওপর থেকে ক্যাপ্টেনকে হাঁক দিল ঘরে চলে আসার জন্য। কিন্তু ক্যাপ্টেন নিজের কর্তব্যে অবিচল। কারণ দরজায় তালা দেবার ব্যবস্থা নেই। এখন ভয় পেয়ে গর্তে সেঁধোলে ক্ষুব্ধ মজুররা টেনে আনবে বাইরে। তার চাইতে যা হবার সোজাসুজি হওয়াই ভালো। ষাটজন সশস্ত্র সৈন্য দাঁড়িয়ে উদ্যত বন্দুক হাতে নিয়ে।

প্রথমে মুকেত আর অন্য তিনজনের গ্রেপ্তার হওয়া দেখে মজুররা একটু থতিয়ে গিয়েছিল। তারপর দাবী উঠল বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। কেউ একজন বলে উঠল, নির্ঘাত ভেতরে ওদের মেরে ফেলা হয়েছে—ব্যস সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ খেপে উঠল সকলে। বদলা চাই! রক্তের বদলে রক্ত! বাচ্চারা দৌড়ে ইঁটের পাঁজা থেকে ইঁট কুড়িয়ে আনতে লাগল। মেয়েরা জামায় তা সংগ্রহ করতে লাগল। খানিক পরেই সকলের পায়ের কাছে জমে উঠল ইঁটের স্তূপ—তারপরই বৃষ্টির মতো ইঁটের টুকরো ছোঁড়া শুরু হল।

মা ব্রুলেই প্রথম যুদ্ধ শুরু করল। হাঁটু দিয়ে চেপে কি অবলীলায় দু টুকরো করে নিল সে ইঁটগুলোকে। লেভাকের বউ ভীষণ মোটা হয়ে গেছে—দূর থেকে লক্ষ্যভেদে অসুবিধে হতে পারে বলে সে আরও খানিকটা এগিয়ে এল। এদিকে বুতলু তাকে [illegible] নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে সমানে। লেভাক যখন ধারেকাছে নেই, তখন বাড়িতে

চলে যাওয়াই ভালো। এসব ঝুটঝামেলার কি দরকার! মেয়েরা পাগলের মতো ইঁট ছুঁড়ছে। এর মধ্যে মুকেত বেরিয়ে এসেছে। উরুর ওপর হাতের চাপ দিয়ে ইঁট ভাঙতে গিয়ে চামড়া ছড়ে রক্ত পড়ছে। দূর ছাই, আস্ত ইঁটই সই! বাচ্চারাও বাদ যায়নি। বেবের লিডিকে শেখাচ্ছে কি করে নিশানা ঠিক রাখতে হয়। ক্রমাগত যেন শিলাবৃষ্টি হচ্ছে। হঠাৎ দেখা গেল কোথা থেকে সকলের মাঝখানে চলে এসেছে ক্যাথরিন। কি অপরিসীম ঘৃণায় তার সমস্ত চোখ মুখ বিকৃত হযে গেছে—পাগলের মতো সেও ইঁট ছুঁড়ছে। এইবার কি দুঃখের দিন শেষ হবে? অনেক কষ্ট তো করা হল, শাভালের পিছু পিছু রাস্তার মাদী কুকুরের মতো ঘোরা, বাড়িতে বাবা-মা, ভাই-বোনদের অনাহার নিজের চোখে দেখা। সব কিছু ধ্বংস করে দিতে হবে! ওই তো রক্ত! কারও চোয়াল ভেঙেছে? কার? তাতে কি যায আসে! রক্ত চাই, রক্ত!

এতিয়েন সৈন্যদের ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। উড়ে আসা একটা ইঁটের ঘায়ে মাথাটা দু ফাঁক হতে হতে বেঁচে গেল তার। পেছন ফিরে তাকালো সে। কানটায আঘাত লেগেছে—বিশ্রীভাবে ফুলে উঠেছে। ইঁটটা ছুঁড়েছে ক্যাথরিন। নিজের জীবন বিপন্ন। তবুও কিন্তু নিজের জাযগা ছেড়ে এক পা নড়ল না এতিয়েন। একদৃষ্টে তাকিযে রইল ক্যাথরিনের হিংস্র মুখের দিকে। পুরুষেরা অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে—নিছক দর্শকমাত্র। মেযেরা এত উত্তেজিত হযে উঠেছে। মুকে তো এমন ভাবে তাকিযে আছে যেন বাচ্চাদের খেলনা বন্দুক নিশানা করে বেলুন ফাটানো হচ্ছে: 'আরে দারুণ টিপ তো। এঃ হেঃ, ফস্কে গেল রে।' জাশারীকে কনুই দিযে খোঁচাতে খোঁচাতে হি হি করে হাসছে সে। এদিকে জাশারীর সঙ্গে ফিলোমিনের দারুণ তর্ক বেধে গেছে। বাচ্চা দুটো ভালো করে মজা দেখতে পাচ্ছে না। তারা বাবার কাঁধে উঠে দেখতে চায। তাতে জাশারীর ঘোরতর আপত্তি। দূরে অনেক লোক জমে গেছে। পাহাড়ের ওপর যেখানে বসতির সীমানা শুরু, বুড়ো বোন্‌মরা:কে দেখা গেল। মরচে রঙা আকাশের কোলে ঠিক লাঠি হাতে বুড়ো পুতুলের মতো।

ইঁট বৃষ্টি শুরু হওযার পর থেকেই রিশোম এসে সৈন্য আর মজুরদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল। এই বিপর্যয় দেখে তার দু গাল বেযে অঝোরে জল পড়ছে। হে ভগবান, মানুষের এ কি দুর্বুদ্ধি হল। বারবার সে সবাইকে থামাতে চেষ্টা করছিল কিন্তু স্রোতের মুখে কুটোর মতোই ভেসে যাচ্ছিল তার উপদেশ।

এবার দলের পুরুষরাও হাত লাগিয়েছে মেয়েদের সঙ্গে। মায়ু্য-গিন্নীর নজরে পড়ল তার স্বামী খালি হাতে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। রাগে ফেটে পড়ল সে।

—কি হল? এমন সঙের মতো হাত পা গুটিয়ে দাঁড়িযে আছ কেন? ভয় পেয়েছ নাকি? তুমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখবে আর তোমার বন্ধুদের সেপাইরা ধরে নিযে যাবে? যদি কোলে বাচ্চাটা না থাকত, তোমায় মজা দেখিয়ে দিতাম!

এত গণ্ডগোল দেখে এস্তেল মায়ের কাঁধ দু হাতে আঁকড়ে ধরে চিল চিৎকার

করছে। ইচ্ছে থাকলেও মায়্য-গিন্নী তাই অন্য মেয়েদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেনি। মায়্যু নির্বোধের মতো তাকিয়ে রয়েছে দেখে নিজের পা দিয়ে সে কতকগুলো ইটের টুকরো এগিয়ে দিল।

—আমার মরামুখের দিব্যি! এগুলো কুড়িয়ে নাও। তুমি কি চাও একগাদা লোকের সামনে ঘেন্নায় তোমার মুখে আমি থুথু দিই? তোমার কি কোনোকালে বুদ্ধিসুদ্ধি হবে না?

সমস্ত মুখ লাল হয়ে উঠল মায়্যুর। ইঁটগুলো কুড়িয়ে নিয়ে পাগলের মতো ছুঁড়তে লাগল। পাশে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চাবুকের মতো কথার আঘাতে সমানে তাকে ছিন্ন-বিছিন্ন, রক্তাক্ত করছিল তার বউ। উত্তেজনায় কোলের বাচ্চাটাকেও জোরে চেপে ধরছিল মায়্যু-গিন্নী। শেষে মায়্যু একেবারে বন্দুকের সামনে চলে এল।

ষাটজন সেনার ছোট দলটাকে ইঁটবৃষ্টির মধ্যে এখন প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। এবার কি করা যায়? এক মুহূর্তের জন্য ক্যাপ্টেন পিছু হটে যাবার কথা ভাবলেন কিন্তু তাহলে এরা তো আরোই জো পেয়ে যাবে। তাছাড়া পেছন ফিরলেই মজুরদের সুবিধে হবে আক্রমণ করতে। রাগে, অপমানে সমস্ত শরীর দিয়ে আগুন বেরোতে লাগল তাঁর। একটা আধলা ইঁটের ঘায়ে শিরস্ত্রাণটা ভেঙে গেছে। কপাল বেয়ে সরু রক্তের ধারা। অনেক সৈন্যই অল্পবিস্তর আহত। মরীয়া হয়ে তারা আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। হুকুম দিলেও ক'জন তা মানবে কে জানে। সহ্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে সকলে। সার্জেন্টের কাঁধ গুরুতরভাবে জখম হয়েছে। সেনাবাহিনীতে নতুন যোগ দিয়েছে এমন একজন তরুণের হাতের বুড়ো আঙুল থেঁতলে গেছে, হাঁটু থেকে রক্ত ঝরছে। একজনের কুঁচকিতে ভীষণ জোরে একটা ইঁট এসে লাগল। ব্যথায় তার সমস্ত মুখটা সবুজ হয়ে গেছে। দু হাতে সে বন্দুক তুলে ধরল। তিন-তিনবার গুলি চালাবার আদেশ দিতে গিয়েও থেমে গেলেন ক্যাপ্টেন। শেষ পর্যন্ত মজুরদের পক্ষ থেকে আক্রমণ আরও জোরদার হলে তিনি যখন সবে মনস্থির করে গুলি চালাবার আদেশ দেবেন, তখনই সৈন্যদের সব ক'টা বন্দুক একই সঙ্গে গর্জে উঠল। প্রথমে তিনটে, তারপর পাঁচটা, তারপর অঝোরে গুলিবৃষ্টি হতে লাগল। শেষ গুলির শব্দ থেমে যেতেই সমস্ত এলাকাটা জুড়ে প্রগাঢ় স্তব্ধতা নেমে এল।...সবাই চুপ করে গেছে। সত্যিই তাহলে গুলি চলল! কেউ যেন নিজের চোখ কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। তারপর অনেকে চেঁচিয়ে উঠল। গরু ভেড়ার মতো কাদা ভেঙে ছুটলো সকলে প্রাণের ভয়ে।

প্রথম তিনটে গুলি শুইয়ে দিয়েছে বেবের আর লিডিকে। মেয়েটার মুখে গুলি লেগেছে—ছেলেটার বাঁ কাঁধে। লিডি সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে। বেবের একটু নড়ে উঠল। শরীরটা শেষবারের মতো কেঁপে উঠল, তারপর দু হাত দিয়ে লিডিকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ল। এতদিন ধরে সে লিডিকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে চেয়ে এসেছে। বেঁচে থাকতে জঁলঁ্যার ভয়ে যা পারেনি আজ মৃত্যু তাকে সেই সোনার সুযোগ করে [illegible] সেই মুহূর্তে ঘুমভাঙা চোখে রকিয়ার থেকে এসে পৌঁছেই জঁলঁ্যা অবাক

হযে দেখল তার ছোট্ট বউটা কেমন পরম নিশ্চিন্তে বেবেরের দু হাতের মধ্যে ঘুমিয়ে রয়েছে।

পরের পাঁচটা গুলিতে মারা গেল মা ব্রুলে আর রিশোম। পিঠে গুলি লাগবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত রিশোম তার সহকর্মীদের কাছে এই লড়াই বন্ধ করবার আবেদন জানাচ্ছিল। গুলিটা পিঠে লাগতেই হাঁটু মুড়ে পড়ে গেল—এখনও তার চোখভরা জল। মা ব্রুলের শীর্ণ শিরা বের হওয়া বুকটা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে—ঠিক যেন পুরনো কাঠের তক্তায় চড়চড় করে ফাটল ধরল। তার গলা দিয়ে এক ঝলক রক্তের সঙ্গে বেরিয়ে এল মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে অন্তিম বিষোদ্গার।

তারপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলিবৃষ্টি। অনেক নিরীহ দর্শক মারা গেল। সৈন্যরা রেহাই দিল না কাউকে।

একটা বুলেট সোজা মুকের হাসিভরা মুখের ভেতরে ঢুকে গেল। নিমেষে পুরো মুখটা ফেটে চৌচির হয়ে গেল তার। জাশারী আব ফিলোমিনের পায়ের কাছে পড়ে গেল। জাশারীর হাঁটু ধরে দাঁড়িয়ে থাকা বাচ্চা দুটোর সমস্ত শরীরে টাটকা রক্তের ছিটে এসে লাগল। সেই মুহূর্তে দুটো বুলেট এসে মুকেতের পেটটা ঝাঁঝরা করে দিল। সৈন্যদের বন্দুক তুলতে দেখেই সে সমস্ত শরীর দিয়ে ক্যাথরিনকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল। তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেল। দৌড়ে গেল এতিয়েন যদি পাঁজাকোলা করে তুলে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া যায় তাকে। কিন্তু হাত নেড়ে বারণ করল মুকেত। হিক্কা উঠতে শুরু হল। এত যন্ত্রণাতেও ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি। আজ অনেকদিন বাদে ক্যাথরিন আর এতিয়েনকে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে এত সুখী!

কয়েকটা গুলি দূরে গ্রামের বাড়ির দেওয়ালে এসে বিঁধেছে। এমন সময় শেষ গুলিটার শব্দ। সোজা এসে বিঁধল মায়্যুর হৃৎপিণ্ডে। ঘুরে গেল মায়্যু, তারপর মুখ থুবড়ে পড়ল কালো পাঁকের মধ্যে।

মায়্যুর বউ বিমূঢ় ভাবে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরল তার।

—ওগো তুমি ওঠো! কিচ্ছু হয়নি তোমার!

এখনও এস্তেলকে বুকের সঙ্গে চেপে রেখেছে তার মা। হাতের তলায় ভর দিয়ে সে স্বামীর মাথাটা ঘোরাবার চেষ্টা করল।

—কথা বলছ না কেন? কোথায় ব্যথা লাগল তোমার?

মায়্যুর চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে, মুখ দিয়ে রক্তমাখা ফেনা গড়াচ্ছে। এবার তার বউ যেন সব বুঝল। তার স্বামী আর নেই। কাদার ওপর বসে পড়ল সে। এখনও বুকের ওপর বাচ্চাটা। এতদিনের সুখ-দুঃখের সঙ্গীর দিকে ব্যথাতুর চোখে তাকিয়ে রইল মায়্যু-গিন্নী।

খনির সামনেটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। ক্যাপ্টেন ভাঙা শিরস্ত্রাণটা একবার খুলে আবার পরে নিলেন। পরিস্থিতি এখন অনেক শান্ত। তবুও মনের ভেতরটা কেঁপে উঠল তাঁর। হাজার হোক তিনিও তো একজন মানুষ! ভয়ার্ত মুখে জানলায় এসে

দাঁড়ালো নেগ্রেল আর দঁসের। তাদের ঠিক পেছনে সুভারিন। তার ভুরুটা কুঁচকে গেছে। রক্তাক্ত বিপ্লবের কি এই পরিণতি। নিজের মনের মধ্যেই জবাবটা সে খুঁজতে লাগল। বুড়ো বোন্‌মর এখনও লাঠিতে ভর দিয়ে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা হাত চোখের ওপর রেখে নজর করতে চেষ্টা করছে ছেলের দিকে—তারই আত্মজ! নিজের রক্তমাংসই যেন ছিটকে গেছে চারদিকে। আহতদের আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠেছে আকাশ-বাতাস। মৃতদেহগুলো আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে যাচ্ছে। বরফ পড়ছে অল্প অল্প। এতদিনের ঝুলকালিগুলো গলা বরফের সঙ্গে মিশে বেরিয়ে গিয়ে জায়গায় জায়গায় কাদা কাদা করে দিচ্ছে। এতগুলো মানুষের মৃতদেহের মধ্যে ত্রোপেত্তের বাসী ফুলে ওঠা দেহটা একতাল মাংসের মতো পড়ে আছে।

এতিয়েন আহত হয়নি। গুলি লাগেনি তার। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। পাশে ক্যাথরিন—ক্লান্তি আর দুঃখের বোঝা সামলাতে পারেনি। মাটিতে বসে পড়েছে মেয়েটা। হঠাৎ কে যেন কথা বলে উঠল। দূরের গ্রাম থেকে ফিরে এসেছেন রাঁভিয়ে। দু হাত ওপরে তুলে ঈশ্বরের দরবারে আবেদন জানাচ্ছেন তিনি—ভগবান যেন আর চোখ বুজে না থাকেন—এইসব বুর্জোয়া শাসকগোষ্ঠীর মাথায় নেমে আসুক উদ্যত বজ্র সুবিচার হোক সর্বহারাদের ওপর। অযথা রক্তপাত করেছে মালিকপক্ষ, অন্যায় আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করেছে অসহায় মজুরদের। ঈশ্বর, তুমি এর বিচার কোরো!

সপ্তম পর্ব

মঁস্থতে সৈন্যদের বন্দুকের গুলির আওয়াজ দূরদূরান্তে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল—এমন কি প্যারিসেও, যদিও আক্ষরিক অর্থে নয়। চারদিন ধরে বিরোধী দলগুলো কাগজে কাগজে নানা রোমহর্ষক খবর ছড়াচ্ছিল: পঁচিশজন আহত, চোদ্দজন নিহত—দু'জন শিশু আর তিনজন মহিলাসমেত। তা ছাড়াও অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। লেভাক তো একজন ছোটখাটো নায়ক হয়ে গেছে। এই ক'টা গুলিই সাম্রাজ্যবাদের ভিত নড়িয়ে দিয়েছে—কিন্তু শ্রমিকপক্ষের ক্ষয়ক্ষতিই কি কিছু কম হয়েছে? সবাই এই ভেবে সান্ত্বনা পেয়েছে যে অনেক দূরে কালো হীরের দেশে একটা দুঃস্বপ্নের রাত এসেছিল। প্যারিসের 'সম্ভ্রান্ত সমাজ' থেকে অনেক—অনেক দূরে সেই দেশ। যত তাড়াতাড়ি এই স্মৃতি মন থেকে মুছে যায় ততই মঙ্গল। ওপর মহল থেকে কোম্পানিকে চাপ দেওয়া হচ্ছে পুরো ব্যাপারটা ভালোয় ভালোয় মিটিয়ে ফেলবার জন্য—নয়তো কে বলতে পারে এই ধর্মঘট হয়তো শেষ পর্যন্ত স্থায়ী সামাজিক সমস্যায় দাঁড়িয়ে যাবে।

পরের বুধবার সকালবেলা তিনজন কর্মকর্তা মঁস্থতে এসে পৌছলেন। পুরো এলাকাটা চাপা উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছিল। উচ্চ আর মধ্যবিত্ত সমাজ এই গুলিচালনার সমর্থনে একটুও হই হল্লা বা আনন্দ করতে পারেনি। মজুরগুলো য গোঁয়ার, হয়তো ঘরবাড়িই জ্বালিয়ে দেবে। এখন বড়কর্তাদের দেখে সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। আবহাওয়া এখন চমৎকার। ঝলমলে রোদ্দুর উঠেছে, লাইলাক ফুলে ভরে গেছে সব বাগান।

অফিস-ঘরের দরজা জানলা খুলে ঝাঁটপাট দেওয়া হয়েছে। নতুন করে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। এই ধরনের গুজবও রটেছে যে অনর্থক রক্তপাতে কর্মকর্তাদের পিতৃহৃদয় দুঃখে বিগলিত, ব্যথিত। তাঁরা অবুঝ দরিদ্র সন্তানদের দিকে সাহায্য আর মমতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। প্রথমেই বেলজিয়ান মজুরদের যথোপযুক্ত মজুরী দিয়ে বিদায় করা হল। সৈন্য প্রহরা উঠিয়ে নেওয়া হল খনির চারদিক থেকে। অবশ্য সেটা না করলেও চলত কারণ মজুরদের এখন আর ফিরে আঘাত করবার মনোবল নেই। ল্য ভোর‍্যর সান্ত্রী উধাও হয়ে যাওয়া নিয়েও কোনো তদন্ত হল না। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও যখন তার দেহ বা বন্দুক পাওয়া গেল না তখন তাকে নিরুদ্দিষ্ট বলে ঘোষণা করা হল। অবশ্য কর্তৃপক্ষ মনে মনে ব্যাপারটা মেনে নিলেন না। মোট কথা—প্রতিটি পদে পদে সতর্ক হয়ে মজুরদের আপাতসন্তুষ্টির ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট হলেন তাঁরা। কি সাহস এই গরীব খেটেখাওয়া মানুষগুলোর যে এতকালের বিশ্বাস আর নিয়মে চিড় ধরাতে চায়! অফিসে কাজকর্ম চলতে লাগল নিয়মমতো। মঁসিয় এনবো রোজই সকালবিকেল মঁসিয় হুক্সল্যার সঙ্গে আলোচনায় বসতে লাগলেন।

ভঁদাম কিনে নেবার ব্যাপারে ছন্নল্যাঁর সঙ্গে ব্যবসায়িক কথাবার্তা পাকা করতে হবে। মঁসিয় ছন্নল্যাঁ নিশ্চয়ই লোভনীয় সুযোগ হাতছাড়া করবেন না।

কিন্তু সবচেয়ে চাঞ্চল্য আনলো বড় বড় হরফে হলদে কাগজে ছাপা নোটিশটা—কোম্পানি কর্তৃপক্ষ রাতারাতি সব বাড়ির দেওয়ালে টাঙিয়ে দিয়েছেন :

খনির মজুররা অবধান কর :

যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেছে তার জন্য আমরা কাউকে বরখাস্ত বা শাস্তি দিতে চাই না। তোমাদের ওপর আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে। আগামী সোমবার সমস্ত খনির কাজ নতুন করে শুরু হবে। কাজ আরম্ভ হলে তোমাদের সুখসুবিধার ব্যাপারে কোম্পানি পূর্ণ তদন্তভার গ্রহণ করবে। মজুরদের উন্নতিকল্পে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। আমরা সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে তোমাদের সহায় হব।

কিন্তু দশ হাজার মজুর নোটিশটাকে দেখেও দেখল না। মাথা নেড়ে নিতান্ত নিরাসক্ত ভঙ্গিতে চলে গেল। মুখের একটি রেখাও পলকের জন্য কাঁপলো না।

দুশো চল্লিশ নম্বর কলোনির সবাই এখনও দাঁতে দাঁত চেপে নীরবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে--কর্তৃপক্ষের অবিচারের বিরুদ্ধে আর অন্তহীন দারিদ্র্যের সঙ্গে। যে নিরপরাধ মানুষগুলোর রক্তে পিছল হয়েছে খনির মাটি, তাদেরই অশরীরী আত্মা অর্ধমৃত অন্য মানুষগুলোর সংগ্রামে অফুরন্ত মানসিক শক্তির যোগান দিচ্ছে। জনা দশেক মজুরও বোধহয় খনির কাজে যোগ দেয়নি, দু-চারটে নেমকহারাম দালাল গোছের লোক ছাড়া। তাদের মধ্যে পিয়েরোঁও আছে। অন্যরা তাদের নীরবে যেতে দেখেছে, আবার মাথা নীচু করে ফিরে আসতেও দেখেছে। কেউ একটা কথা বলেনি, কটু মন্তব্যও করেনি। গীর্জার দেওয়ালেও নোটিশ ঝুলেছে—মানুষগুলোর অবিশ্বাসই তাতে বেড়েছে শুধু। কোম্পানি নিঃশর্তে সবাইকে কাজে নেবে নাকি সুযোগ বুঝে ছাঁটাই করবে, সেই দ্বিধাদ্বন্দ্বের বিরামহীন টানাপোড়েন চলছে। যদি সত্যিই অন্যায় অবিচার হয়, সকলকেই একই সঙ্গে গর্জে উঠতে হবে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা আরও পরিষ্কার হওয়া দরকার। সমস্ত বাড়িগুলোয় অদ্ভুত নিস্তব্ধতা—এখন আর নিজের জ্বালাতেও চেঁচায় না কেউ। মৃত্যু তো অনেককেই ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, আমরাই বা বাদ যাই কেন—এই রকম একটা নৈর্ব্যক্তিক মনোভাব।

কিন্তু অন্য বাড়িগুলোর তুলনায় একটা বাড়ি যেন বড় বেশী অন্ধকার, অনেক বেশী ঝিমিয়ে আছে—মায়্যুদের বাড়ি। অতর্কিত আঘাতে তারা শোকে পাথর হয়ে গেছে। স্বামীকে কবরে শুইয়ে দেবার পর থেকে মায়্যু-গিন্নী আর একটিবারের জন্যও মুখ খোলেনি। এতিয়েন ক্যাথরিনকে বাড়িতে নিয়ে এসেছে আধমরা আর কাদামাখা অবস্থায়—তাও তার মা কোনো উচ্চবাচ্য করেনি। কিন্তু এতিয়েনের সামনেই নিজের হাতে মেয়েকে সেদিন জামাকাপড় ছাড়িয়ে হাত পা পরিষ্কার করে দিচ্ছিল। একবার হঠাৎ চোখ পড়ল ক্যাথরিনের রক্তাক্ত সেমিজের দিকে। ছোপ ছোপ টাটকা রক্ত। মায়্যু-গিন্নী প্রথমে ভেবেছিল ক্যাথরিনও গুলিতে আহত হয়েছে। কিন্তু একটু পরেই অভিজ্ঞ চোখে পরীক্ষা করে বুঝল, অকস্মাৎ তীব্র মানসিক আঘাতে আজ

এত বছর পর তার মেয়ে কিশোরী থেকে এক মুহূর্তে যুবতী হয়ে গেছে—এখন সে পরিপূর্ণ এক নারী! মেয়েকে এত দিনে ঋতুমতী হতে দেখে, তার সুস্থতায়, তার স্বাভাবিকতায় যেন মমতায় টনটন করে উঠল মায়ের বুক। তারপরই দুঃখের কালো ছায়া ঘনিয়ে এল মনে—ক্যাথরিন তার পরিপূর্ণ নারীত্ব নিয়ে এরপর স্বাদ পাবে মাতৃত্বের—আর তারপর তার ছেলেমেয়েও একই ভাবে পুরুষ পরম্পরায় হারিয়ে যাবে খনির অন্ধকারে। মেয়েকে এ নিয়ে কিছুই বলল না, এতিয়েনকে তো নয়ই। এতিয়েন এখন জ'ল্যাঁর সঙ্গে শোয়। যে কোনো মুহূর্তে হাতে হাতকড়ি পড়তে পারে, তবু রকিয়ার-এ ফিরে যায়নি। জুলের অদৃশ্য প্রেতাত্মা তাকে যেন তাড়া করে বেড়ায়। তার চাইতে কয়েদখানায় পচে মরাও ভালো। আর আসল ব্যাপার হল এই যে পরাজয়ের তিক্ত গ্লানির হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায় এতিয়েন। কিন্তু কই, কেউ তো আসে না আদালতের সমন নিয়ে! মাঝে মাঝে এতিয়েন আর ক্যাথরিনের দিকে বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মায়্যু-গিন্নী, বোধহয় জিজ্ঞেস করতে চায় ওরা দু'জন এখানে থাকছে কেন!

অনেকদিন পরে সবাই একসঙ্গে গাদাগাদি করে শুচ্ছে আবার। যেখানে আগে লেনোর আর অঁরি শুত, সেখানেই এখন বুড়ো ঠাকুর্দা শোয়। এখন তো আর আলজির নেই। ক্যাথরিনের সঙ্গে তাই বাচ্চা দুটো এক বিছানায় ঘুমোয়। রাতে ঠাণ্ডা বিছানায় ঘুম আসে না মায়্যু-গিন্নীর। এপাশ ওপাশ করে সে, এস্তেলকে বুকে নিয়ে—স্বামীর শূন্য জায়গাটা পাগলের মতো হাতড়ায়। চুপ করে কাঁদে, চোখের জলে ভিজে যায় বালিশ, বিছানা। আবার সেই আগের কষ্ট শুরু হয়েছে। একদানা খাবার নেই, রুটি নেই, এমন কি মরবার মতো কপাল করেও আসেনি। কোনো কিছুই বদলায়নি, শুধু ঘরের মানুষটাই চলে গেছে অনেক—অনেক দূরে!

পাঁচ দিনের দিন বিকেলবেলা মায়্যুর বউয়ের পাথরচাপা নীরবতা আর সহ্য করতে পারলো না এতিয়েন। গুটিগুটি বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। পাথুরে রুক্ষ রাস্তায় পায়চারি করতে শুরু করল। দিনের পর দিন অলসভাবে কেটে যাচ্ছে, মনের অস্থিরতা বাড়ছে শুধু। এইভাবে আধঘণ্টা কাটলো। তার সহকর্মীরা যে যার বাড়ির দরজার সামনে এসে নীরবে তাকে দেখে যাচ্ছে। যেটুকু জনপ্রিয়তা ছিল, এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর সেটুকুও বুঝি বা গেছে। যেখানেই যায়, সকলের নীরব ঘৃণা তাকে যেন ছায়ার মতো অনুসরণ করে। হঠাৎ চোখ তুললে দেখা যায় মজুরদের হিংস্র মুখ। তাদের বউরা এতিয়েনকে দেখে জানলায় পর্দা টেনে দেয়। অনাহারে আর কান্নায় সকলের চোখ মুখ বসে গেছে। মাঝে মাঝে এতিয়েনের মনে হয় এই বুঝি বা সকলে মিলে তাকে ঘিরে ফেলে অভিযোগ, অনুযোগ করতে শুরু করল। চোরের মতো মাথা নীচু করে ঘরে ফিরে আসে।

কিন্তু এইদিন একটা অন্য ব্যাপার ঘটায় এতিয়েন আরও বিচলিত হয়ে পড়ল। বুড়ো বোন্‌মর নিজের চেয়ারে আঠার মতো সেঁটে বসে আছে, সামনে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া ফায়ারপ্লেস। যেদিন ছেলে গুলি খেয়ে মরল সেইদিন থেকেই বাজে পোড়া

তালগাছের মতো দেখায় বুড়োকে। লেনোর আর ঝঁরি খিদের জ্বালায় গতরাতের বাঁধাকপি সেদ্ধ করার বাসনটাই খুঁটছে পাগলের মতো। মায়্যু-গিন্নী এস্তেলকে টেবিলের ওপর বসিয়ে রেখে ক্যাথরিনকে বকুনি দিচ্ছে খুব উত্তেজিতভাবে।

—আর একবার ও কথা বলে দ্যাখ্ পোড়ারমুখী! একবার বলে দ্যাখ্!

ক্যাথরিন আসলে ল্য ভোরয়তে আবার কাজে যেতে চায়। প্রতিদিন এই দুঃখ-দুর্দশা দেখে এভাবে জন্তুর মতো ধুঁকতে ধুঁকতে সে আজ মরীযা হয়ে উঠেছে। শাভালকে ভয় না পেলে গত মঙ্গলবারই হয়তো নিজের ডেরায় ফিরে যেত।

ক্যাথরিন দুর্বল গলায় বলতে লাগল, তুমি তাহলে কি চাও? আমায় কি করতে বলো? কিছু না করে এইভাবে মরতে হবে? অন্তত রুটির ব্যবস্থাটুকু তো করতে দেবে?

তার মা থামিয়ে দিল।

—ভালো করে শুনে রাখ্ হারামজাদী! তোরা যে কেউ খনিতে যাস না কেন, প্রথমেই আমি তার গলা টিপে মেরে ফেলব। ছি ছি, বাপকে মেরে ছেলেমেয়েদের বশে আনতে চায়! তার চেয়ে তোরা চারজন না খেতে পেয়ে মুখে রক্ত উঠে মরিস, সেও ভালো!

মায়্যু-গিন্নীর এতদিনের নীরবতা তাহলে ভাঙলো!

খুব সাশ্রয় হবে সংসারে! ক্যাথরিনের তিরিশ স্যু, জ্যঁল্যঁা কাজ পেলে আরও কুড়ি—এই পঞ্চাশ স্যু আর সাত সাতটা রাক্ষুসে পেট! বাচ্চাগুলোর তো দিনরাত শুধু খাই-খাই। বুড়ো ঠাকুর্দার তো সেইদিন থেকে যে কি হয়েছে, সে নড়েও না, চড়েও না। ওইদিন গুলি চলতে দেখে অজ্ঞান হয়ে যাবার পর থেকেই একই অবস্থায় আছে।

তার দিকে তাকিয়ে মায়্যুর বউ বলল, ওরা আপনাকেও শেষ করে দিল! শরীরে সামর্থ্য থাকতেও ওরা আপনাকে খেটে খেতে দেবে না।

বোন্‌মর ঘোলাটে শূন্য দৃষ্টিতে ছেলের বউয়ের দিকে তাকালো। এইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অথর্বের মতো বসে বসে কাটিয়ে দেয় সে। শুধু মাঝে মাঝে ছাইদানে থুথু ফেলে—তাতে বোঝা যায় প্রাণটুকু এখনও আছে।

—পেনশনটা পর্যন্ত ঠিক করে দিল না। আমরা যে বিদ্রোহ করেছি, ওরা তার শোধ নেবে এই বুড়ো মানুষটার ওপর। না না, ওদের সঙ্গে কোনোরকম আপোস নেই!

ক্যাথরিন মাকে বোঝাতে চেষ্টা করল।

—কিন্তু ওরা যে নোটিশে বলেছে ··

—মুখ সেলাই করে দেব হারামজাদী! ওটা আমাদের ফাঁদে ফেলার মতলব, তাও বুঝিস না? যদি ওরা সত্যিই দয়ার অবতার হবে তবে আমাদের জানে মারলো কেন?

—কিন্তু মাগো, আমরা তবে কোথায় যাব? এখানে তো বেশীদিন আমাদের থাকতেও দেবে না।

মায়ুর বউ হিংস্র ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো। কোথায যাবে, কি করবে কিছুই জানে না, ভাবতেও চায না আর—পাগল হতে বাকি আছে শুধু। কোথাও না কোথাও চলে গেলেই হবে। এত বড পৃথিবীতে কি আর এই ক'টা মানুষের জাযগা হবে না?

লেনোর আর জঁরি এত জোবে জোবে এঁটো বাসনটা খোঁচাচ্ছে—তুম্ করে মাথায রক্ত উঠে গেল তার। কষে কান মলে দিল দুটো বাচ্চাব। এর মধ্যে টেবিল থেকে বেকায়দায পড়ে গিয়ে তারস্বরে কান্না জুড়েছে এস্তেল। একে মা মনসা, তায ধুনোর গন্ধ। একেও দু ঘা কষিয়ে দিল তাব মা। বাচ্চাটা ককিয়ে উঠে চুপ করে গেল।

—এত লোক মরে, এর যেন কই মাছেব প্রাণ! পড়ে মলেও তো বাঁচতাম!

আলজিরের কথা বলতে শুরু করল মায়ুব বউ। হতভাগী মরে বেঁচেছে। অন্য ছেলেমেয়েগুলো যদি তার মতো মরাব কপাল করেও আসতো! তারপবই পাগলের মতো দেওযালে মাথা ঠুকতে লাগল—আব সেই সঙ্গে কি বুকফাটা কান্না!

এতিযেন এক পাশে চুপ কবে দাঁড়িযে ছিল। কোনো কথা বলতে সাহস করেনি। ও যে বাইরের লোক। বাচ্চারা পর্যন্ত আজকাল এড়িযে চলে কিন্তু মায়ুব বউয়ের কান্নায বুকের ভেতরটা কেমন কবে উঠল। বলল, মনে সাহস আনো। আমবা নিশ্চযই এ অবস্থা কাটিযে উঠব।

ক্যাথরিনের মা যেন শুনতেই পেল না। নীচু গলায একটানা কেঁদে চলল। ভগবান, কত কান্না ছিল ওর বুকে!

—হে ঈশ্বর! আমরা এখনও কি কবে বেঁচে আছি! এখনও তো ঠিক আগের মতোই দিন যায় রাত আসে। আগে শুকনো রুটি জুটলেও সবাই ভাগ করে খেতাম! এখন একে একে পাতার মতো ঝবে যাচ্ছে আমার আপন জনেরা—পাঁজরগুলো খসে যাচ্ছে। কি অপরাধ করেছি যে এত বড় শাস্তি দিলে? কতজনকে মেরে ফেলেছে ওরা! যারা বেঁচে আছে তাবাও প্রতি পলে পলে এগিয়ে যাচ্ছে মরণের দিকে। দারিদ্র্য আর শোকের জোযাল আমাদের অশক্ত কাঁধে জোর কবে চাপিয়ে দিযেছে। পশুরও অধম হযে বেঁচে আছি। শুধু লাথি ঝাঁটা খেযেই জীবনটা কেটে গেল। আমাদের বুকেব রক্ত শুষে মালিকেরা ইমারত গড়ে গেল একে একে—আমাদের কি কিছুই পাওনা ছিল না তোমাব কাছে? বুক ভরে শ্বাস নেব, সে স্বাধীনতাটুকুও কি আমাদের থাকতে নেই? জানি, এভাবে কিছুতেই চলতে পারে না। যদি আমরা আরও আগে সব বুঝতে পারতাম! সুবিচার, সুবিচার! ওই সর্বনেশে কথাটা পৃথিবীর কোনো অভিধানে আজ পর্যন্ত লেখা হয়েছে কি?

ক্যাথরিনের মা অপরিসীম বেদনায ছটফট করছিল। কান্নার দমকে ঘনঘন ওঠানামা করছিল তার বুক। গলা বুজে আসছিল। সে বলে চলল, আর এই গরীব মানুষের মাথা খাবার মতো চালাক লোক তো অনেক আছে সংসারে,·· তারা আমাদের উত্তেজিত করে, উপদেশ দেয় যে একদিন না একদিন সুসময় আসবে। তার জন্য দরকার নাকি সামান্য একটু আত্মত্যাগ। স্রোতের মুখে পলকা কুটোর মতোই

ভেসে যাই আমরা। ঘা খেতে খেতে এমন হয়ে গেছি যে অনেক অসম্ভব জিনিসও তখন কল্পনা করে নিতে সাধ জাগে। কিন্তু আমার দিকে তাকাও—আমিও বোকার বেহদ্দ। ভেবেছিলাম সুদিন আসবে। স্বামী আর ছেলে-মেয়েদের সকলকে নিযে মোটামুটি সচ্ছলভাবে দিন কাটিযে দেব। হাওয়ায ভাসতে শুরু করেছিলাম কিন্তু নিষ্ঠুর বাস্তব মাটিতে আছড়ে ফেলে দিল আমাকে। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলাম। না না, সব ভাঁওতাবাজি। যে সব স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম, তা ফুটো বেলুনের মতোই চুপসে গেছে। যা আছে আর থাকবে তা হল অন্তহীন দুঃখ, দারিদ্র্য আর বন্দুকের গুলি!

প্রতিটি অশ্রুবিন্দু এতিযেনকে তীব্রভাবে আঘাত করছিল। কোনো ভাবেই সে এখন ক্যাথরিনের মাকে সান্ত্বনা দিতে পারবে না—দুঃখের তীব্র আঘাতে তার সমস্ত শরীর আর মন চূর্ণবিচূর্ণ হযে গেছে।

এতিযেনের প্রতি এতক্ষণে নজর পড়ল তার। চেঁচিযে উঠল।—কি মতলব তোমার? নিশ্চযই মনে মনে খনিতে ফিরে যাবার ধান্দা করছ? আমাদের অনেক সর্বনাশ তো ডেকে এনেছ, এবার নিজের আখেরটি তো গোছাতে হবে। যদি আমি তোমার জুতোর শুকতলাও হতাম, তবে বন্ধুদের কি সর্বনাশ করেছি—এই ভেবে অন্তত মরমে মরে থাকতাম।

এতিযেন একবার ভাবলো, কড়া করে কিছু উত্তর দেয। কিন্তু কাঁধ ঝাঁকিযে থেমে গেল সে। প্রায অপ্রকৃতিস্থা এই মহিলাটিকে কিই বা বোঝাবে। এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখা যায না। বাধ্য হযে আবার রাস্তায পা দিল এতিযেন।

কিন্তু সেখানেও নিস্তার নেই। প্রতিটি বাড়ির সামনে মজুররা সপরিবারে দাঁড়িয়ে। তাকে দেখেই ফিসফিসানি শুরু হল। তারপর চোখা চোখা কথা। সবাই তাকে কোণঠাসা করে ফেলল। অনেকে তো ইতিমধ্যে আস্তিন গুটিযেছে। মায়েরা বাচ্চাদের আঙুল দিযে চিনিযে দিচ্ছে, বুড়োরা ঘেন্নায থুথু ফেলছে। পরাজয়ের পর তো এই ব্যবহারই প্রাপ্য। জনপ্রিয়তার এই হল বিপরীত দিক। প্রতিটি মানুষ এখন মরীয়া হযে উঠেছে। তাদের অনাহার আর মৃত্যুর জন্য এতিযেনই দাযী।

জাশারী ফিলোমিনের সঙ্গে আসছিল। ইচ্ছে করেই এতিয়েনকে একটু ধাক্কা দিল। তারপর চেঁচিযে বলল, দ্যাখো, এ লোকটার গাবেগতরে দিব্যি মাংস লেগেছে! মরা মানুষগুলোর পয আছে বলতে হবে।

লেভাক-গিন্নী বুতলুর সঙ্গে দরজায দাঁড়িযে। তার ছেলে বেবের সেদিন গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে। সে বলে উঠল, হ্যাঁ, জগতে অনেক কাপুরুষ আছে যারা বন্দুকের সামনে বাচ্চাদেরও এগিযে দেয়। কই, আমার কোলের বাছাকে কবর থেকে খুঁড়ে আমার সামনে এনে দিক!

এতদিন কিন্তু স্বামীর কথা মনেই আসেনি তার। আসলে লেভাক জেলখানায় থাকলে কি হবে, বাড়িতে বুতলু ছিল তো! হঠাৎই যেন সে কথা মনে পড়ায় সে

চেঁচিয়ে উঠল, দূর হও শয়তান কোথাকার! গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াতে লজ্জা করে না? এদিকে কত লোক যে জেলে পচে মরছে!

দৌড়ে সরে যেতে চেষ্টা করল এতিয়েন কিন্তু এবার পিয়েরোঁর বউয়ের মুখোমুখি! যদিও বুড়ি মায়ের মৃত্যুতে গুণধর মেযের হাড় জুড়িয়েছে, লিডি মরে যাওয়াতেও ভেতর ভেতর খুব খুশী, হাজার হোক সৎ মেযে তো, কিন্তু এখন হঠাৎ ওই দু'জনের জন্য যেন শোক উথলে উঠল তার। আর সবাইকে দেখাতে চাইল সে-ও তাদেরই দুঃখে দুঃখী।

—কই, আমার বাড়ির দু-দুটো জলজ্যান্ত মানুষ যে মরে গেল? আমরা দেখেছি তুমি ওদের পেছনে লুকিয়েছিলে। বন্দুকের গুলি আসলে তোমার জন্যই ছিল—ওরা নিজেদের জান দিয়ে তোমাকে বাঁচালো।

এতিয়েন এখন কি করবে! সব ক'টাকে গলা টিপে শেষ করে দেবে? এক মুহূর্তের জন্য তার মনে হল শরীরের সমস্ত রক্ত মাথায় গিয়ে জমা হয়েছে। ছি ছি, তার সহকর্মীরা এত নীচ হয়ে গেছে! অবশ্য যা শিক্ষাদীক্ষা—এদের জন্য ভালো কিছু করতে যাওয়াই ভুল হয়েছিল। নতুন করে বোঝাতে যাওয়াও মূঢ়তা হবে। জোরে পা চালালো সে। এপাশ ওপাশ থেকে তীক্ষ্ণ অপমানজনক উক্তি ভেসে আসছিল। প্রত্যেকটি বাড়ি থেকে টিটকিরি দিচ্ছে, অভিশাপ দিচ্ছে। সমস্ত দোষ যেন তারই। সে খুনী, এদের চরম দুর্দশার জন্য দায়ী। এইবার সে ছুটতে শুরু করল। পুরো দলটা ধাওয়া করল পেছনে। খানিক বাদে অনেকে হাল ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কয়েকজন তখনও সঙ্গ ছাড়েনি। আর্ভঁতাজের সামনে এতিয়েন উল্টোদিকে ল্য ভোরো থেকে আসা অন্য একটা দলের মুখোমুখি হল।

তাদের মধ্যে বুড়ো মুক্য আর শাভাল ছিল। ছেলেমেয়ে দু'জনেই মারা যাবার পর এতদিন পর্যন্ত বিনা অভিযোগে নির্বিবাদে খনির কাজ করে গেছে মুক্য। কিন্তু আজ হঠাৎ এতিয়েনকে দেখে পাগলের মতো অভিশাপ দিতে দিতে ছুটে এল।

—নোংরা ছোটলোক কোথাকার! শুয়োরের বাচ্চা! আমার ছেলেমেয়ে দুটোর রক্ত চুষে খেয়েছিস! তোকে আজ মেরে ফেলব!

একটা ইঁট তুলে দু টুকরো করে সে এতিয়েনের দিকে ছুঁড়লো।

শাভাল দাঁত বের করে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, শয়তানটাকে শেষ করে দেওয়াই ভালো। নয়তো আরও কত লোকের সর্বনাশ করবে, কে জানে! আমরাও পালা করে ওকে মারবো। দেওয়ালের সঙ্গে পিষে ফেলব ওর শরীরটা।

এতদিন পর এতিয়েনকে বাগে পেয়ে শাভালের চোখ দুটো শকুনির চোখের মতো ক্রূর হয়ে উঠেছিল। শিকার হাতে পেয়ে যেন লোভে চকচক করছে সে দুটো। সেও পাথর ছুঁড়তে শুরু করল এতিয়েনকে লক্ষ্য করে। প্রত্যেকে হিংস্র হয়ে উঠেছে। সৈন্যদের মারতে পারেনি, এখন এতিয়েনের ওপর দিয়ে আক্রোশ মেটাতে চায়। এতিয়েন এত অবাক হয়ে গেছে যে নড়তে পারছে না। সামনাসামনি দাঁড়িয়ে সে সকলকে শান্ত করবার চেষ্টা করছিল। যে মিষ্টি কথা মজুররা এতদিন বেদ বাক্যের

মতো মানতো, আজ তার সম্মোহনী শক্তি নির্মূল হয়ে গেছে। ইটের টুকরো তার প্রতিটি কথার প্রত্যুত্তর দিচ্ছিল। এর মধ্যেই তার বাঁ হাতটা জখম হয়েছে। পিছু হটতে শুরু করল সে। পিঠ ঠেকল আভঁতাজের দেওয়ালে।

দরজা খুলে বেরিয়ে এল হ্রাসন্যর।

—ভেতরে চলে এস।

এতিয়েন দ্বিধা করছিল। হ্রাসন্যরের সাহায্য নিতে হয়তো বা ঘৃণাও হল কিন্তু প্রাণ আগে না মান?

হ্রাসন্যর আবার বলল, ভেতরে এস। ওদের সঙ্গে আমি কথা বলছি।

অবস্থা প্রতিকূল বুঝে দৌড়ে ভেতরে এসে টেবিলের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল এতিয়েন।

হ্রাসন্যর দরজা আড়াল করে দাড়ালো।

—শোনো তোমরা, অযথা মাথা গরম কোরো না। দেখলে তো, সহিংস পথ নিয়ে আজ কি অবস্থা হয়েছে তোমাদের? যদি আমার কথা শুনতে, ভদ্রভাবে, শান্তিপূর্ণভাবে মিটমাটের রাস্তায় যেতে, তবে এই দুর্দশা হত না আজ!

হাত পা নেড়ে কথা বলছিল হ্রাসন্যর। অনেকদিন বাদে লম্বা চওড়া বক্তৃতা দেবার সুযোগ পাওয়া গেছে। পুরনো বাগ্মিতা ফিরে এসেছে। ঠিক কায়দা করে হারিয়ে যাওয়া জনপ্রিয়তা আদায় করে ফেলল হ্রাসন্যর যেন কোনোদিনই তাকে বিরুদ্ধতা সহ্য করতে হয়নি।

আশেপাশের লোকেরা সমর্থনসূচক জয়ধ্বনি দিল।

—ঠিক বলেছ! তোমার কথাই ঠিক!

সবাই হৈ হৈ করে উঠল।

দোকানের ভেতরে বসা এতিয়েনের সমস্ত মন তিক্ততায় ভরে উঠল। ঠিক আখের গুছিয়ে নিল হ্রাসন্যর। জঙ্গলে সভার দিন যে অপমান সহ্য করতে হয়েছিল, আজ হাসিমুখে তার প্রতিটি অণু-পরমাণু এতিয়েনকে ফিরিয়ে দিল সে। আর এই বুদ্ধুগুলো! নিজেদের কোনো বিচারবুদ্ধি নেই। যখন যেভাবে নাচাও, সেভাবেই নাচবে। মাঝখান থেকে সব খুইয়ে বসল সে নিজে! নেতা হবার সাধ ছিল তো খুব, তাই আজ মুখের ওপর এমন জুতোর বাড়ি খেল! নিজের প্রতি ঘৃণাবোধ করছিল এতিয়েন।

হ্রাসন্যরের গলার জোর বাড়লো।

—হিংসার দ্বারা কোনো মহৎ কাজ হয় না। একদিনেই কি পৃথিবীকে বদলে দেবার শপথ নেওয়া যায়? যারা এ ধরনের বড় বড় কথা বলে তারা হয় ঠাট্টা করে নয়তো জাত বদমাইশ!

সবাই সমর্থন করল হ্রাসন্যরকে।

তাহলে বুঝি সব দোষই এতিয়েনের? ঘরের মধ্যে লুকিয়ে বসে যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছিল সে। এই যে অসহায় মানুষগুলো মরল, তার জন্য কি এতিয়েনের কষ্ট

হয় না? দিনের পর দিন অকথ্য অবিচার দেখেই তো সে প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল। জনতার অকুণ্ঠ সমর্থন না পেলে এত বড় কাজে সে কোন ভরসায় হাত দিত? আজ ব্যর্থতা এসেছে বলে সবাই তাকে দোষারোপ করছে—যদি সফল হত, তখন তো সকলে তাকেই মাথায় তুলে নাচতো। এ কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল এতিয়েন যে যাদের প্রথম চেতনার কুঁড়ি ফুটেছে তার হাতে, তারাই তাকে ঢিল ছুঁড়বে, অভিশাপ দেবে? কিংবা হয়তো এতিয়েনেরই দোষ—সঠিক পথে, সঠিক ভাবে নেতৃত্ব দিতে পারেনি। কিন্তু যাই হোক না কেন, তার সমস্ত সাহস আর শক্তি আজ নিঃশেষ। এদের মুখোমুখি হয়ে দুটো কথাও সে বলতে পারবে না। এতগুলো ক্রুদ্ধ লোকের বাক্যবাণের ভার বইবার মতো ক্ষমতা কই তার?

আস্তে আস্তে এই গরীব মানুষগুলোর ওপর যেন ঘেন্না ধরতে শুরু করল। 'আমি কেন এখনও এখানে এত কষ্টের মধ্যে পড়ে আছি?' এই বোধটাই যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল।

বাইরে জয়ধ্বনি উঠল।

—হ্রাসন্তর জিন্দাবাদ! অহিংস আন্দোলনের জয় হোক!

এবার ভেতরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল হ্রাসন্তর। বাইরে ভীড় ক্রমশ পাতলা হতে শুরু করেছে। এতিয়েন একবার হ্রাসন্তরের দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকালো। তারপর দু'জনে দুটো বীয়ারের গ্লাস নিয়ে বসল।

এই দিনেই, যখন এখানে এত কাণ্ড হচ্ছে, তখন লা পিয়োলেইন-এ বিরাট ভোজের আয়োজন চলছে। সেসিল আর নেগ্রেলের বিয়ের ব্যাপারে আজ পাকা কথা হবে। ঘরদোর ঘষে মেজে চকচকে করা হচ্ছে আগের দিন থেকেই। রান্নাঘরে প্রচুর খাবারদাবার তৈরী করতে ব্যস্ত মেলানি। সমস্ত বাড়ি সুগন্ধে ম-ম' করছে। অনোরিনকে পরিবেশন করতে সাহায্য করবে ফ্রান্সিস—সে এ বাড়ির কোচোয়ান। বাসনপত্র ধোবে মালির বউ। সম্মানিত অতিথিদের জন্য দরজায় হাজির থাকবে মালি। এত বড় অনুষ্ঠান শেষ কবে এ বাড়িতে হয়েছে মনে পড়ে না।

সব কিছুর বন্দোবস্তই চমৎকার। সবাই এসে গেছেন। মাদাম এনবোর মিষ্টি ব্যবহারে সেসিল মুগ্ধ। তিনি নেগ্রেলের দিকে মাঝে মাঝে সস্নেহ প্রশ্রয়ের ভঙ্গিতে তাকাচ্ছেন। মঁসিয় এনবোও খুবই অমায়িক ব্যবহার করছেন। সবাই বুঝতেই পারছেন কর্তৃপক্ষের নেকনজরে আছেন ভদ্রলোক। কিছুদিনের মধ্যেই পদোন্নতি ঘটতে পারে। খনির ঝুটঝামেলার সাম্প্রতিক অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটা সবাই সন্তর্পণে এড়িয়ে চলছিলেন। যাক্ গে, ভালোয় ভালোয় সব মিটে গেলেই হল! মজুরগুলোর উচিত শিক্ষা হয়েছে! যেমন কুকুর তেমন মুগুর! গ্রেগোয়ারদের অবশ্য ইচ্ছে—গ্রামে গ্রামে ঘুরে সকলকে সান্ত্বনা দেওয়া হোক।

খাবার টেবিলে বসে একটা চিঠি বের করলেন মঁসিয় এনবো। বিশপ লিখেছেন—'র‍্যাঁভিয়েকে বরখাস্ত করা হল।' এটাই দরকার ছিল। লোকটা সমস্ত দিন ছোটলোকগুলোকে খেপিয়ে বেড়াতো।

মঁসিয় গ্রেগোর্যাঁও উপস্থিত ছিলেন দুই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। মনোকষ্টটা যথাসাধ্য গোপন করতে চেষ্টা করছিলেন। ঐদিন সকালেই ভঁদাম বিক্রী করার চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছেন তিনি। দেওয়ালে পিঠ রেখে আর লড়াই চালানো গেল না। মঁসুর কর্তৃপক্ষের টাকার ধারালো ছুরিটা সর্বক্ষণ তাঁর কণ্ঠনালীর ওপর চাপ দিচ্ছিল। যে টাকা পাওয়া যাবে তাই দিয়ে পাওনাদারদের হয়তো কোনোক্রমে ঠেকানো যাবে। শেষ মুহূর্তে বিভাগীয় ইঞ্জিনীয়ারের চাকরিটাও গ্রহণ করেছেন তিনি। যে খনির উন্নতির জন্য অজস্র টাকা আর পরিশ্রম ব্যয় করেছেন, সেখানেই আজ মাস মাইনের চাকরি! এই ধর্মঘটের সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা তাঁর ওপর দিয়েই গেল! সকলে পানীয়ের পাত্রে চুমুক দিচ্ছে—গ্রেগোর্যাঁর মনে হচ্ছে যেন তাঁরই রক্তপান করা হচ্ছে পরোক্ষে। একমাত্র সান্ত্বনা, মেয়ে দুটো। সুখে, দুঃখে ওরা অন্তত সর্বদা বুড়ো বাপের সহায় হবে।

কফি খেতে খেতে বসবার ঘরে ঢুকলেন সকলে। গ্রেগোর্যাঁকে ডেকে মঁসিয় গ্রেগোয়ার এই ব্যাপারে আবার অভিনন্দন জানালেন।

—ভালোই করেছ, বুঝলে? শুধু শুধু সারা জীবন এইভাবে খনিতে টাকা ঢেলে, মজুরদের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে লাভটা কি হত? বাড়তি ঝামেলা যত! তার চেয়ে কাঁচা টাকা হাতে পাবে। আমার মতো ব্যবসাতে লগ্নী করো, নিজে আর কোনো নতুন ব্যবসায় নেমো না। এই বয়সে অত পরিশ্রম সয় নাকি? তাছাড়া নিরাপত্তাই বা কোথায়? ভালো কোম্পানির হাতে এসব ছেড়ে দেওয়াই ভালো। ওরা মজুর খাটিয়ে অভ্যস্ত, ওরাই পারবে সব ঠিকমতো চালাতে। ছাখো তো আমাকে, কেমন পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খাচ্ছি। আমার তো বটেই, এর পরের তিন-চার পুরুষও শুয়ে বসে দিব্যি কাটিয়ে দিতে পারবে।

* * * *

রবিবার রাত হলে এতিয়েন গ্রামের বাইরে পা দিল। আকাশ নির্মল, মেঘমুক্ত। অগুনতি তারার ঝিকিমিকি। হালকা নীলচে আলোয় কেমন চারদিক ভরে গেছে। সে মার্শিয়েনের দিকে হাঁটতে শুরু করল। এই রাস্তাটা খুব ভালো লাগে এতিয়েনের। নরম ঘাসে ভরা, সরু লম্বা পথ, পাশে রুপোলী ফিতের মতো খাল—ঝিরঝির করে জল বয়ে যাচ্ছে।

সাধারণত এই রাস্তাটা বেশ নির্জন। কারও সঙ্গে বড় একটা দেখাই হয় না এ পথে। আজ কিন্তু এতিয়েন অবাক হয়ে দেখল একটা লোক তার দিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু আলো খুব কম। একদম মুখোমুখি না হওয়া পর্যন্ত কেউ কাউকে চিনতে পারেনি।

এতিয়েন বলল, ওঃ তুমি!

সুভারিন নীরবে মাথা নাড়লো। এক মুহূর্ত চুপ করে রইল দু'জনে। তারপর একসঙ্গেই পা বাড়ালো মার্শিয়েনের দিকে। দু'জনেই চুপচাপ চিন্তা করছে নিজের এমন ভাবে পথ চলছে যেন অন্যজন সেখানে উপস্থিত নেই।

এতিয়েনেই প্রথমে নীরবতা ভাঙলো।

—দেখেছ, প্যারিসে প্লুশার কি অভূতপূর্ব সাফল্যই না পেয়েছে। বেলভিল-এ সভার পর দলে দলে লোক রাস্তায় অপেক্ষা করছিল তাকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য। যাক, এতদিনে ও তাহলে সঠিক পথটা খুঁজে পেয়েছে। এবার ও যা চাইবে, তাই পাবে।

সুভারিন কাঁধ ঝাঁকালো: যে সব লোক লম্বা চওড়া কথা বলে, অন্যদের বোকা বানায়, তাদের ও ঘৃণা করে। এইভাবে কথার খেলায়, রাজনীতির মারপ্যাচে সাধারণ লোকেরা বুদ্ধু বনে যায়। আর সুবিধাবাদীরা টাকার পাহাড় বানায়।

এতিয়েন এদিকে এতদিনে ডারউইনের লেখা পড়ে ফেলেছে। ঠিক লেখা নয়। ডারউইনের মতবাদের সংক্ষিপ্তসার। যা পড়েছে, হজম করতে পেরেছে তার অর্ধেক। আর তাতেই যেন অন্য রকম উৎসাহ পেয়েছে। টিঁকে থাকার সংগ্রাম, যে শক্তিমান সে-ই বেঁচে থাকবে ইত্যাদি অনেক বড় বড় কথা তার মাথায় ঢুকে গেছে। এখানে তো মজুররাই দলে ভারী সুতরাং সংখ্যালঘু বুর্জোয়াদের পরাজয় ঘটবেই।

বিরক্তভাবে তাকে থামিয়ে দিল সুভারিন। ডারউইনের এই সব মতবাদ এক্ষেত্রে খাটে না বিজ্ঞাননির্ভর বৈষম্যবাদ ব্যাপারটাই ভুয়ো—বুদ্ধিজীবী সমাজের ভাওতাবাজি। কিন্তু এতিয়েনও নিজের জেদ ছাড়বে না। তাই বাধ্য হয়ে গলা চড়াতে হল দুজনকেই সুভারিন এখনও ধ্বংসাত্মক মতবাদে বিশ্বাসী। তর্ক জোরদার হল

আচ্ছা, যদি এমন হয় যে পুরনো বস্তাপচা সমাজটার, ঘুণধরা পৃথিবীটার খোলনলচে পাল্টে যে ভাবেই হোক নতুন পৃথিবীর জন্ম হল। কিন্তু সেখানেও তো এমন হতেই পারে—কেউ গরীব থাকবে, কেউ বা ধনী—যারা বুদ্ধিমান, বিদ্বান তারা সব সময়ই আখের গুছিয়ে নিতে চেষ্টা করবে। যারা বোকা আর অলস তারাও কিছু না বুঝেই সেই তালে তাল দেয়। তার মানে এই রকমই কমবেশী খারাপ অবস্থা বৈষম্যমূলক পরিণতি আবহমান কাল ধরে চলতে থাকবে।

সুভারিন পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠল।

—না না দরকার হলে সমস্ত মানুষকে ধ্বংস করে দিতে হবে, যদি অবস্থার উন্নতি না হয়। দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজ আর পচনশীল অঙ্গ একই রকম। দরকার হলে তা কেটে বাদ দিতে হবে জীবন থেকে শরীর থেকে।

দুজনেই আবার চুপ করে গেল

সুভারিন অনেকক্ষণ নরম ঘাসে পা ডুবিয়ে চুপচাপ হাঁটছিল মাথা নীচু করে। কোনোকিছু গভীর ভাবে চিন্তা করছে। জলের একদম ধার ঘেঁষে চলছিল, ঘোরলাগা মানুষের মতো। হঠাৎ চমকে মুখ তুলে তাকালো। তার মুখ রক্তশূন্য। এতিয়েনকে নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, তোমাকে কি কখনও বলেছি, সে কিভাবে মারা গিয়েছিল?

—কে? কার কথা বলছ?

—আমার·· আমাব বউ। বাশিযায।

এতিয়েন বিব্রতভাবে মাথা নাডলো। ভীষণ অবাক হযে গেছে সে। স্থভাবিন এত অসামাজিক, নিজেব কথা কখনো বলতে চায না। কাঁপা কাঁপা গলায কথা বলছে স্থভাবিন। হযতো চাইছে এতদিন বাদে কাউকে সবকিছু খুলে বলে মনেব বোঝা হালকা কবতে। এতিযেন শুধু জানত মেযেটি ওব প্রেমিকা ছিল আব তাকে ফাঁসী দেওযা হয প্রকাশ্য দিবালোকে, সর্বজনসমক্ষে।

স্থভাবিন তার গল্প শুরু কবল তাব স্বপ্নমদিব দৃষ্টি রূপোলী স্রোতের দিকে, দিগন্তব্যাপী বনানীব দিকে।

—আমাদেব সব পবিকল্পনা ভেস্তে গেল চোদ্দ দিন মাটিব নীচে একটা গর্তে লুকিযে ছিলাম বেললাইন উডিযে দেবাব কথা ছিল। কিন্তু বাজপবিবারেব ট্রেনেব বদলে উডে গেল সাধাবণ মানুষভর্তি একটা গাডি। তাবপবই ওবা আনুশকাকে গ্রেপ্তার করল। ও প্রতেকদিন আমাদেব খাবাব নিযে আসতো, চাষীবউদেব মতো পোশাক পবে। ও-ই ডিনামাইটেব সলতেতে আগুন দেয কাবণ বেললাইনে একজন শক্তসমর্থ পুরুষকে ঘুবতে দেখলে রক্ষীদেব সন্দেহ হত। ছ'দিন ধবে বিচার চলল। প্রত্যেকদিন আমি উপস্থিত থাকতাম, ভীডেব মধ্যে লুকিযে সব শুনতাম, দেখতাম।

গলা আবেগে বুজে এল তাব, আব তা চাপা দিতেই শব্দ কবে কেশে উঠল

—দু'বার এমন হযেছে যে আমি চেঁচিযে উঠতে গেছি। ভীড ঠেলে ওব কাছে ছুটে যেতে চেযেছি। কিন্তু তাতে কিই বা লাভ হত? আবও একটা প্রাণ শেষ হযে যেত—তাব মানে আবও একজন মুক্তিযোদ্ধা কমে যেত। আর যতবারই ওব চোখে চোখ পডেছে, নীববে আমায সতর্ক কবে দিযেছে যাতে ঝোঁকেব বশে কিছু না করে ফেলি। শেষ দিনও আমি ছিলাম। প্রকাশ্য রাজপথে বিচার হয। ঝমঝম করে বৃষ্টি পডছিল। ওব সঙ্গে আবও চাবজনেব ফাসী হয। কুডি মিনিটেব মধ্যে ওই চাবজনকে ঝোলানো হয। শেষজন আবাব দডি ছিঁডে যাওযায খানিকক্ষণ আটকে ছিল। আনুশকা শান্তভাবে দাঁডিযে অপেক্ষা কবছিল কতক্ষণে ওর পালা আসে। ও অবশ্য আমায প্রথমে দেখতে পাযনি তবে ওর চোখ দুটো আমায খুঁজছিল আমি তাই একটা পাথবেব চাঁইযেব ওপব উঠে দাঁডালাম। ও আমায দেখতে পেল। তারপব যতক্ষণ না সব শেষ হযে যায ততক্ষণ আমরা দু'জনে দু'জনেব ওপর থেকে চোখ সরাইনি। এমন কি মরে যাবাব পবও ওব চোখ দুটো ঠিকবে বেরিযে এসেছিল, তখনও আমাবই দিকে তাকিযে ছিল—যন্ত্রণায, ভালোবাসায, বিশ্বাসে। আমি টুপিটা খুলে তাকে শেষ সম্মান জানিযে চলে আসি।

আবাব অস্বস্তিকর নীরবতা। যেন দু'জন অচেনা মানুষ পাশাপাশি হাঁটছে। বাঁকের মুখে খালটা হারিযে গেল। না, ঐ তো দূরে জল চিকচিক করছে।

স্থভারিন বলে উঠল, এভাবেই আমরা শাস্তি পেলাম। পরস্পরকে ভালোবাসাটাই [redacted] অপরাধ হয়েছিল। অবশ্য ও মৃত্যুদণ্ড পাওয়াতে, নবীন যোদ্ধারা উৎসাহ পায।

আর আমারও মনের সব রকম কোমলতা বিসর্জন দিতে সুবিধে হয়। পরিবার নেই, স্ত্রী-বন্ধু আত্মীয়-পরিজন কেউ নেই। সুতরাং কখনও কাউকে প্রাণে মারতে গেলেও অভিশাপ কুড়োবার ভয়ে অন্তত আমার হাত কাঁপবে না।

এতিয়েন কিছু বলল না। রাত গভীর হয়েছে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে।

—চলো সুভারিন, এবার ফেরা যাক। কথায় কথায় অনেকটা পথ চলে এসেছি।

দু'জনে নীরবে ফিরতি পথ ধরল। ল্য ভোর্যর দিকে।

একটু পরে এতিয়েন বলল, নতুন নোটিশটা দেখেছ?

সেদিন সকালে নতুন নোটিশ বেরিয়েছে। হলুদ কাগজে। কোম্পানি বেশ খোলাখুলি জানিয়ে দিয়েছে, যে সব মজুর পরদিন থেকে কাজে যোগ দেবে তাদের বিরুদ্ধে কোনোরকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। এমন কি দলের নেতাদের ওপর থেকেও।

—হ্যাঁ। দেখেছি।

—তোমার কি মনে হয়?

—ব্যাস! সব মিটে গেল! বুদ্ধুগুলো ভেড়ার পালের মতো সুড়সুড় করে খনিতে ফিরে যাবে। যত সব ভীতুর ডিম!

এতিয়েন সুভারিনকে বোঝাতে চেষ্টা করল। আসলে একজন মানুষ বুকে সাহস নিয়ে মাথা উঁচু করে চলতে পারে। কিন্তু দলে দলে সকলে বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে না খেয়ে আছে। এ ভাবে খালি পেটে কতদিন বিপ্লব চলবে?

ল ভোর্যর সামনে এসে দাঁড়ালো দু'জনে। এতিয়েন শপথ করবার ভঙ্গিতে বলল, সে নিজে জান থাকতে খনিতে নামবে না। কিন্তু যদি কেউ অভাবের জ্বালায় সত্যিই কাল থেকে কাজে যায় তাকে বাধাও দেবে না।

এতিয়েনের কানে এসেছে শ্যাফটের লাইনিং নষ্ট হয়ে গেছে। খবরটা কি ঠিক? মাটির চাপে শ্যাফটের জ্যাকেট এমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে পাঁচ মিটার মতো রাস্তায় খাঁচা উঠে আসার পক্ষে যথেষ্ট পরিসর নেই? সুভারিন এ কথা সমর্থন করল। ও আগের দিন কাজে গিয়েছিল। খাঁচাটা ওঠবার বা নামবার পথে বিশ্রী রকম আটকে যাচ্ছে। তাই চালককে গতি বাড়াতে হচ্ছে বিপজ্জনকভাবে যাতে চট্ করে কোনভাবে ঐ পথটুকু ওঠা নামা করা যায়। যতবারই কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে ততবারই এক কথা—কয়লা চাই, ব্যস! মেরামতের কথা পরে হবে।

এতিয়েন বলল, তাহলে তো যে কোনো মুহূর্তে একটা কাণ্ড হয়ে যেতে পারে?

ছায়া-ছায়া অন্ধকারে খনির দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় সুভারিন বলল, যদি তাই হয়, তোমার বন্ধুরা জানতেই পারবে। তুমি তো ওদের কাজে যোগ দিতে বলেছ।

মঁসুর ঘড়িতে ঢং ঢং করে ন'টা বাজলো। এতিয়েন জানালো ও এবার বাড়িতে শুতে যাবে।

সুভারিন নিরাসক্ত গলায় জানালো, তাহলে বিদায়! আমি চলে যাচ্ছি

—চলে যাচ্ছ? কোথায়?

—আমাকে অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করতে বলা হয়েছে। কোম্পানির চালাকিতে আমি অন্তত ভুলছি না। ঠিক করেছি, চলে যাব।

এতিয়েন বিস্ময়ে, বেদনায় তাকিয়ে রইল তার এত কালের সঙ্গীর দিকে। এই দু ঘণ্টা তারা একসঙ্গে ছিল, কথা বলেছে অথচ তাকে একবার ঘুণাক্ষরেও এ কথা জানায়নি স্যুভারিন! আজ এতদিন পরে স্যুভারিন চলে যাবে!

—কোথায় যাবে তুমি?

—জানি না। হবে কোথাও। কিছু একটা কাজ জুটে যাবে ঠিক!

—আমার সঙ্গে দেখা হবে তো?

—মনে হয় না।

দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইল। কেউ কোনো কথা খুঁজে পেল না সেই মুহূর্তে।

—তাহলে বিদায়!

—বিদায়!

এতিয়েন যখন গ্রামের পথে, স্যুভারিন আবার আগের রাস্তায় ফিরে চলল। মাথা নীচু করে। গাঢ় অন্ধকারে ছায়ার মতো হাঁটছিল সে। মাঝে মাঝে ঘড়ির আওয়াজ শুনে থামছিল। রাত বারোটা বাজলে সে খনির দিকে ফিরে চলল।

রাতের এই সময়টা খনিতে লোকজন বিশেষ থাকে না। শুধু একজন ডেপুটির সঙ্গে দেখা হল। সেও প্রায় ঢুলছে ঘুমে। ফার্নেস জ্বলবে না রাত দুটোর আগে। তারপর কাজ শুরু। স্যুভারিন এমন ভাব করল যেন একটা ফেলে যাওয়া কোট খুঁজতে এসেছে। আসলে আগে থেকেই কাঠের একটা আলমারির পেছনে ওটা ঝুলিয়ে রাখা ছিল। কোটের মধ্যে কয়েকটা যন্ত্রপাতি— তুরপুন ঘোরাবার যন্ত্র, তুরপুনের বিঁধ, একটা ছোট্ট অথচ ধারালো করাত, হাতুড়ি আর বাটালি। তারপর ও বেরিয়ে গেল। কিন্তু লকার রুম দিয়ে না বেরিয়ে সরু করিডোর ধরে এগিয়ে গেল এসকেপ শ্যাফ্‌টের দিকে। এক বগলের তলায় শক্ত করে কোটটা ধরা—মই বেয়ে নীচে নামতে শুরু করল সে—আলো ছাড়াই। মই গুনে গুনে খনির গভীরতা যাচাই করে নিচ্ছিল। যেখানে খাঁচাটা আটকে যায়, সেটা তিনশো চুয়াত্তর মিটার গভীরে—নীচের লাইনিং-এর পঞ্চম অংশটায়। চুয়ান্নটা মই গুনে নামার পর হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করল দেওয়াল। হ্যাঁ, এই তো! এখানকার কাঠটা অনেকটা ফেঁপে উঠেছে। এই জায়গাই!

তারপর শান্তভাবে দক্ষ কারিগরের মতো কাজ শুরু করল। প্রথমেই মূল শ্যাফ্‌ট আর এসকেপ শ্যাফ্‌টের মধ্যে একটা সুড়ঙ্গ খুঁড়ে ফেলল করাত চালিয়ে। মাঝে মাঝে একটা দুটো দেশলাইকাঠি জ্বালিয়ে লাইনিং আর নতুন মেরামতির জায়গাগুলো পরখ করে নিচ্ছিল।

ক্যালে আর ভালঁসিয়েন-এর মধ্যে খাদের শ্যাফ্‌টগুলো বসাবার সময় যথেষ্ট [illegible] সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ উপত্যকার গভীরতম তলে যে সব হ্রদ আছে

সেগুলোর মধ্যে দিয়ে শ্যাফ্‌টগুলো নীচে চলে গেছে। সুতরাং জায়গায় জায়গায় জলের তোড় আটকাতে শক্ত মজবুত কাঠের লাইনিং প্রয়োজন। এগুলো জলের মধ্যে শ্যাফ্‌টগুলোকে টানেলের মতো আলাদা করে রেখেছে। এই লাইনিং-ই শ্যাফ্‌টকে জলের স্রোত থেকে বাঁচিয়ে রাখে। শ্যাফ্‌টের দেওয়ালের বাইরের গায়ে কালো রহস্যময় ঢেউ আছড়ে পড়ছে ক্রুদ্ধ গর্জনে দিন রাত অবিরাম। ল্য ভোর্‍্য একবার ডুবে গিয়েছিল। তারপরই দুটো লাইনিং দেওয়া হয়। প্রথমটা শ্যাফ্‌টের ওপরের অংশে—চুনাপাথরের স্পঞ্জের মতো স্তর (যাতে জল শুষে নেয়) ভেদ করে শ্যাফ্‌টের যে অংশ নেমেছে। আর একটা নীচে সেইখানে—যেখানে শ্যাফ্‌ট নরম ময়দার মতো মিহি বালির স্তর ভেদ করে গেছে। এই নীচের লাইনিং-এর ঠিক পেছনেই ভূগর্ভস্থ সমুদ্র—যার প্রচণ্ড উন্মত্ততা, ভয়াল প্রকৃতি, অজানা অচেনা বিপজ্জনক আচরণ উত্তরাঞ্চলের কয়লাখনিগুলোর কাছে বিভীষিকাস্বরূপ। সাধারণত লাইনিংগুলো যথেষ্ট মজবুত করেই তৈরী করা হয়। কিন্তু ভয়ের কারণ ঘটে যখন ওপরে খনির গ্যালারীতে কয়লার স্তর কাটতে গেলে পৃথিবী তার ভারসাম্য বজায় রাখবার জন্য কেঁপে ওঠে। শিলাস্তর বসে যায় ধীরে ধীরে—আগেভাগেই সতর্ক থাকতে হয় সেজন্য। চেপে-চুপে আবার ঠিকঠাক মতো টিম্বারিং করা হয়। না হলেই বিপদ। যে কোনো মুহূর্তেই দেওয়াল সঙ্কুচিত হয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। অনেক সময় ফাটলের সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে ফাটল দীর্ঘতর হতে হতে কাঠের লাইনিং পর্যন্ত পৌছায় এবং চাপে শ্যাফ্‌টের লাইনিং-এর ক্ষতি হয় যথেষ্ট। হু হু করে জল কাদা ঢুকতে পারে—তাতে খাদ ধসে কেলেঙ্কারী কাণ্ড ঘটবে!

সুভারিন লাইনিং-এর পাঁচ নম্বর অংশের ফেঁপে ওঠা জায়গাটা হাত দিয়ে অনুভব করল। কাঠগুলো ফুলে ফেঁপে বেরিয়ে এসেছে ফ্রেম থেকে তার মধ্যে আবার কয়েকটা বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে। জোড়ের মুখে অনেকগুলো ফুটোও হয়েছে। কোনোরকমে শুধু লোহার গোঁজ দিয়ে ঠেকা চালানো হয়েছে- ভালো করে স্ক্রুগুলো লাগাবার সময়ও মিস্ত্রীদের হয়নি দেখা যাচ্ছে।

চটপট আলগা স্ক্রুগুলো খুলে ফেলল সুভারিন যাতে সামান্য ঠেলা মারলেই সব আলগা হয়ে খসে পড়ে। এ ধরনের বিপজ্জনক কাজ করতে যথেষ্ট মনের জোর দরকার। কয়েকবার পড়েও গেল সে টাল সামলাতে না পেরে। কিন্তু মরার ভয় আর করে না সুভারিন। তাকে শেষ করতেই হবে। নিজের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দে নিজেই চমকে চমকে উঠছিল। প্রথমে হাতুড়ি দিয়ে অনুভব করে নিচ্ছিল, তারপর হাতুড়ি আর বাটালির কাজ। একবার তো একটা ছোট্ট যন্ত্র হারিয়েই গেল। সেটা খুঁজে পাবার জন্য আবার দেশলাই জ্বালতে হল। সব স্ক্রুগুলোকে আলগা করার কাজ শেষ হলে পর তক্তাগুলোর পেছনে লাগল। এগুলো নষ্ট করতে পারলে বিপদ আরও বাড়বে। মূল তক্তাটা সে খুঁজে বের করল—যার ওপর অন্য তক্তাগুলো দাঁড়িয়ে আছে। এবার করাত চালিয়ে এটার বারোটা বাজানোর অপেক্ষা শুধু! ধীরে ধীরে পাতলা হয়ে যাচ্ছে কাঠটা। এই তো ফিনকি দিয়ে ঠাণ্ডা জল ঢুকে ভিজিয়ে

দিল স্থভারিনের চোখ মুখ। দেশলাইয়ের দুটো কাঠি নিভে গেল। পুরো বাক্সটাই ভিজে গেল তারপর। এখন শুধু নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

ঠিক ভূতে-পাওয়া মানুষের মতো কাজ করে যাচ্ছিল স্থভারিন। কে যেন অলক্ষ্যে থেকে তাকে নির্দেশ দিচ্ছে সবকিছু শেষ করে দেবার জন্ত। নিকষ কালো অন্ধকার। জলের হিমেল স্পর্শ তাকে ধ্বংসের উন্মাদনায় মত্ত করে তুলেছে। যেখানে পারছে, সেখানেই আঘাত হানছে—সবকিছু ছাবখার করে দিতে হবে। যেন কোনো ঘৃণ্য মানুষের বুকে বারবার ছুরি বেঁধাচ্ছে সে। এই খনিটাকে শেষ করে দিয়ে যাবে—এই দৈত্যটার রাক্ষুসে হাঁ চিরকালের মতো বুজিয়ে দিয়ে যাবে। ক্রমাগত আঘাত চালালো স্থভারিন।

নিজের হিসেবমতো সবটুকু কাজ শেষ করল—তারপর নিজের শরীরটাকে ওখান থেকে টেনে নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে নীচে নামলো। অদ্ভুত উপায়ে আবার ওপরে উঠতে শুরু করল। হাতুড়ি আর করাতের শব্দ তখনও তাকে তাড়া করে চলেছে নিরবচ্ছিন্নভাবে যেন কোনো রাতজাগা পাখি গীর্জার ঘণ্টাঘরের কড়িকাঠে উড়ে এসে বসছে বারবার।

কিন্তু এবার মাথাটা একটু ঠাণ্ডা করা দরকার। সে কি সত্যিই পাগল হয়ে গেল? হাঁপাতে লাগল স্থভারিন। তারপর এসকেপ শ্যাফ্‌টে ঢুকল। যে কাঠের টুকরো কেটে সুড়ঙ্গ বানিয়েছিল, সেটা আবার ফোকরের মুখে আলগা করে বসিয়ে দিল। এই যথেষ্ট হয়েছে। বেশী বাড়াবাড়ি করে ফেললে সন্দেহ জাগতে পারে। তাহলে আবার সব দেখেশুনে হয়তো তড়িঘড়ি মেরামতির কাজ শুরু করে দেবে মালিকেরা। তবে যা ব্যবস্থা করে রাখল স্থভারিন, ধরা না পড়লে কাল সন্ধ্যের মধ্যেই ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত পরিমাণটা আঁচ করা যাবে। এবার সে ঠাণ্ডা মাথায় নিজের নামটা কাঠে খোদাই করে রাখলো—পরে যাতে সকলে শিউরে ওঠে তা দেখে, বুঝতে পারে স্থভারিন কতটা ভয়ঙ্কর। কাজ শেষ করে জিনিসপত্র গুছিয়ে কোটের ভাঁজে নিয়ে আস্তে আস্তে মই বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। শ্যাফ্‌ট থেকে যখন বেরিয়ে এল, তখনও কেউ তাকে দেখল না। এমন কি জামাকাপড় বদলাবার কথাও মাথায় এল না তার।

এখন রাত তিনটে। রাস্তার ধারে চুপ করে মজুরদের খনিতে আসার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল স্থভারিন।

এদিকে সেই সময় দুশো চল্লিশ নম্বর কলোনিতে মায়্যুর বাড়িতে অন্য এক দৃশ্য। এতিয়েন অনেকক্ষণ থেকেই বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছিল। তার ঘুম আসছিল না। ঘরে একটা খুট্ করে আওয়াজ হল। বাচ্চারা ঘুমোচ্ছে শান্তভাবে। বোনমর আর মায়্যু-গিন্নীর নাক ডাকছে। জঁল্যাও বাদ নেই। নাকে কেমন হালকা শিস দেওয়ার মতো শব্দ হচ্ছে। নির্ঘাত কোনো স্বপ্ন দেখছে ছেলেটা। তাহলে ওই আওয়াজটা কিসের? গুটিশুটি মেরে আবার পাশ ফিরে শুল এতিয়েন। ঐ তো, শব্দ হচ্ছে। ঠিক যেন সন্তর্পণে বিছানা থেকে উঠছে কেউ। খুব সাবধানে, যেন

পাশের লোকেরও ঘুম না ভাঙে। নিশ্চয়ই ক্যাথরিন, কোনো কারণে হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

এতিয়েন ফিসফিস করে বলল, কি হল? তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?

এ কথার কোনো উত্তর নেই। শুধু অন্যদের নাসিকাগর্জন। পাঁচ মিনিট দিব্যি চুপচাপ কাটলো। তারপর আবার সেই শব্দ। এইবার এতিয়েন নিশ্চিত হল যে তার বুঝতে ভুল হয়নি। উঠে পড়ল সে। ঘরের ওপাশে ক্যাথরিনের খাট। অন্ধকারে সাবধানে হাতড়ে হাতড়ে ঠিক পৌঁছে গেল এতিয়েন। আন্দাজ করে সতর্ক হয়ে হাত বাড়ালো। হঁ্যা, এই তো ক্যাথরিন খাটের ওপর শক্ত হয়ে বসে আছে

—কি হয়েছে? উত্তর দিচ্ছ না কেন? কোথায় যাচ্ছ?

শেষ পর্যন্ত ক্যাথরিন বলে উঠল, তৈরী হচ্ছি।

—কেন?

—খনিতে কাজে যাব।

এতিয়েনের বুকের ভেতরটা আবেগে মুচড়ে উঠল। সে খাটে বসে পড়ল। ক্যাথরিনের ঠিক পাশে। ক্যাথরিন এতিয়েনকে সব কিছু বোঝাতে চেষ্টা করছিল। এ ভাবে তো কিছু না করে বেঁচে থাকা যায় না। দিনের পর দিন সবাই না খেয়ে রয়েছে। এমন করে শরীর মনকে কষ্ট দিয়ে কি লাভ? যদিও খনিতে ফিরলে শাভাল তাকে একচোট নেবে, তবু মা ভাই বোনদের মুখ চেয়ে তাকে যেতেই হবে। যদি মা জেদ করে তার টাকা না ছোঁয় ঠিক আছে, সে নিজে অন্তত দু মুঠো খেয়ে বাঁচবে।

ক্যাথরিন এতিয়েনকে বলল, তুমি নিজের খাটে চলে যাও। আমি জামাকাপড় বদলে নিই। আর দয়া করে এ কথা কাউকে এখন বোলো না, কেমন?

এতিয়েন কিন্তু চলে গেল না। দু হাতে ক্যাথরিনের কোমর জড়িয়ে ধরল, পরম মমতায়, ভালোবাসায়। এখনও খাটটা গরম হয়ে আছে। দু'জনে খাটের একেবারে কিনারায় বসে ছিল। পরস্পরের নিঃশ্বাস, শরীরের স্পর্শ—নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করল ক্যাথরিন, তারপর হাল ছেড়ে দিল। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে দু হাতে এতিয়েনের গলা জড়িয়ে ধরল সে, চরম আবেশে আলিঙ্গন করল। সেই ভাবেই স্থির হয়ে বসেছিল দু'জনে, অন্য কোনো কামনা ছিল না, শুধু অতীতের অসুখী, অতৃপ্ত ভালোবাসার স্মৃতি ছাড়া। তাহলে কি সত্যিই ওদের মধ্যে সব সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়নি? কোনো একদিন সবকিছু অগ্রাহ্য করে দু'জন আবার কাছাকাছি আসতে পারবে? এখন আর কোনো বাধাও তো নেই! যদি সামান্যতম সুখও পাওয়া যেত, তাহলেও অতীতকে কবর দেওয়া যেত—যে অতীত দুঃস্বপ্নের মতো তাদের মধ্যে বাধার প্রাচীর ছিল।

ক্যাথরিন নীচু গলায় বলল, যাও, শুতে যাও। আমি আলো জ্বালতে চাই না, তাহলেই মা জেগে যাবে। কিন্তু আমায় তৈরী হতে হবে। ছাড়ো।

সে কথায় কর্ণপাত করল না এতিয়েন। একই ভাবে ক্যাথরিনকে আঁকড়ে ধরে

হইল। সমস্ত মন কি এক অজ্ঞাত কারণে ব্যথায় ভরে গিয়েছে তার। এতদিন পর সামান্য শান্তি আর সুখের জন্য সে কাঙাল হয়েছে। চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা দৃশ্য: বিবাহিত জীবন, ছোট্ট সুখী সংসার। কিছু না, শুধু দু'জনে যদি আমৃত্যু একসঙ্গে জীবন কাটাতে পারত। শুকনো রুটি হলেই তাদের চলে যাবে, তাই দু জনে ভাগ করে নেবে। আর কিছু চায় না সে।

ক্যাথরিন নিজেকে ছাড়িয়ে নিল।

—আমায় যেতে দাও লক্ষীটি।

ভালোবাসায় আপ্লুত এতিয়েন উত্তর দিল একটু অপেক্ষা কর আমার জন্য আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না এতিয়েন। তার মুখ দিয়ে এই কথাটা বেরোল? কই, এক মুহূর্ত আগেও তো এই কথা তার মাথায় আসেনি? এ নিয়ে কারও সঙ্গে পরামর্শও করেনি। কিন্তু এর পরই সমস্ত মন প্রশান্তিতে ভরে গেল। না, আর কোনো দ্বিধা নেই। পুনর্জীবন পেয়েছে সে।

ক্যাথরিন ভয় পেল এ কথা শুনে। সে বুঝতে পারছিল তার জন্যই এতিয়েন এই স্বভাববিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বারবার তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করছিল ক্যাথরিন। কিন্তু কে শোনে কার কথা। এতিয়েন কোন কিছুতেই বুঝতে চাইছে না, খনিতে ফিরে গেলে সকলে তাকে অপমান করবে, কথা শোনাবে। হাসি মুখে এই সব কথা উড়িয়ে দিল এতিয়েন। নোটিশে তো বলাই হয়েছে যে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। সেটাই যথেষ্ট। অন্য কিছু সে এখন গ্রাহ্য করবে না।

—দ্যাখো ক্যাথরিন, আমি কাজ করতে চাই। চলো, চুপচাপ তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়া যাক।

অল্প পরেই তৈরী হল দু'জনে, হাজারো সাবধানতা অবলম্বন করে। আগের দিনই কাজে যাবার পোশাক লুকিয়ে ঠিকঠাক করে রেখেছিল ক্যাথরিন। এতিয়েনও তার জামাকাপড় কাঠের আলমারির মধ্যে পেয়ে গেল। সেদিন কেউ হাত মুখ ধুল না পাছে জল পড়ার শব্দে অন্যরা জেগে যায়। সবাই এখন গাঢ় ঘুমে অচেতন। কিন্তু কপাল এমন যে সরু প্যাসেজের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় মাহ্যু-গিন্নীর ঘুম ভেঙে গেল। সে এখন এখানেই শোয়। বিড়বিড় করে জিজ্ঞেস করল, কে রে ওখানে?

ভয়ে শক্ত করে এতিয়েনের হাত চেপে ধরল ক্যাথরিন।

এতিয়েন বলল, আমি। বড্ড গরম লাগছে, তাই একটু বাইরে যাচ্ছি।

—আচ্ছা।

আবার ঘুমিয়ে পড়ল ক্যাথরিনের মা। খানিকক্ষণ ক্যাথরিন নড়াচড়া করল না। তারপর আস্তে আস্তে নীচে নেমে এল। আগের দিন মঁসুর এক মহিলা তাকে এক টুকরো রুটি দিয়েছিলেন। সেটাকে দু ভাগ করে কাগজে মুড়ে নিল। তারপর দরজাটা আস্তে বন্ধ করে দু'জনে রাস্তায় এসে নামলো।

সুভারিন তখনও আভঁতাজের কাছে দাঁড়িয়ে। আধঘণ্টা ধরে সে দেখছে মজুরর

অনেকেই খনিতে কাজে যোগ দিতে যাচ্ছে, গরু ভেড়ার পালের মতো! ঠিক কশাই যেমন করে জন্তুগুলোকে গোনে, সেইভাবে স্থভারিন গুনে যাচ্ছিল। জীবনেও এক-সঙ্গে এত কাপুরুষ দেখেনি সে। দলে দলে লোক যাচ্ছে—ঠাণ্ডা নিরাসক্ত চোখে দাঁতে দাঁত ঘষে তা দেখছিল স্থভারিন। তবুও মাঝে মাঝে তার চোখ দুটো জলে উঠছিল কি?

তারপরই কেঁপে উঠল। অনেককেই এই আবছা অন্ধকারে চেনা যাচ্ছে না। কিন্তু একটা মুখ যেন বড় পরিচিত বলে মনে হল। দু পা সামনে এগিয়ে এল স্থভারিন। লোকটাকে থামালো।

- তুমি কোথায় যাচ্ছ?

এতিয়েন এত চমকে গেছে যে উত্তর দেবার বদলে থতমত খেয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি এখনও যাওনি?

তারপর ভেঙে পড়ে সবকিছু স্বীকার করল। হ্যাঁ, সে কাজে যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে আছে তার। খানিক আগেই সে প্রতিজ্ঞা করেছিল কিন্তু হাত পা গুটিয়ে কত-দিন আর বসে থাকা যায়? একশো বছর? তাছাড়া ব্যক্তিগত কারণও আছে।

শুনতে শুনতে মনে মনে বিচলিত হচ্ছিল স্থভারিন। হঠাৎ এতিয়েনের কাঁধে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে হিসহিসিয়ে বলে উঠল, চলে যাও! বাড়িতে ফিরে যাও তুমি! আমার কথা শোনো!

কিন্তু ততক্ষণে ক্যাথরিন এসে গেছে। স্থভারিন তাকে চিনতে পারলো। এতিয়েনও প্রতিবাদ করতে শুরু করেছে। সে যা করছে, স্বেচ্ছায় নিজের দায়িত্বে করছে। এ ব্যাপারে অন্য লোকের মতামত নিতে যাবেই বা কেন? স্থভারিনের চোখ দুটো ঘুরে ফিরে দু'জনের মুখের ওপর পড়ছিল। শেষ পর্যন্ত এদের জেদের কাছে হার মেনে পিছু হটল। যখন কোনো মানুষ কোনো বিশেষ মেয়ের প্রতি দুর্বল হয় তখন তাকে আর কোনো কিছুই বোঝাবার থাকে না—সে মরতেও রাজী থাকে। স্থভারিনের চোখের ওপর এই মুহূর্তে সম্ভবত তার প্রেমিকার মৃতদেহটা ভেসে উঠল। ওই মেয়েটির মৃত্যুর পর তার সমস্ত পার্থিব বন্ধনমুক্তি ঘটে গেছে। কোনো কিছুতেই আর কিছু এসে যায় না।

সে বলল, ঠিক আছে, তুমি যাও।

এতিয়েন একটু অস্বস্তিবোধ করছিল। সে মনে মনে কথা খুঁজছিল যা এই মুহূর্তে স্থভারিনকে বলা যেতে পারে

- তুমি তাহলে সত্যিই চললে?

—হ্যাঁ।

—তাহলে শেষবারের মতো করমর্দন করা যাক। বিদায় বন্ধু! তোমার যাত্রা শুভ হোক! আর, আমাকে ভুল বুঝো না।

স্থভারিনের হাত শীতল। কোনো বন্ধু নেই, কোনো স্ত্রীলোক নেই তার জীবন-টাকে ফুলে ফুলে ভরিয়ে তুলতে···

—চলি তাহলে।

—এস।

সুভারিন দাঁড়িয়েই রইল। অন্ধকারে। একা একা। ক্যাথরিন আর এতিয়েন লা ভোরার খনিতে প্রবেশ করল।

* · * *

ভোর চারটেয় খনিতে নামা শুরু হল। দঁসের নিজে বাতিঘরে উপস্থিত থেকে মজুরদের নাম তালিকায় তুলছিল। দেখছিল সবাইকে ঠিকমতো বাতি দেওয়া হচ্ছে কিনা। কারুর প্রতিই সে কোনো মন্তব্য করছিল না—নোটিশে তো সেই রকমই বলা আছে। কিন্তু এতিয়েন আর ক্যাথরিনকে জানলা দিযে দেখেই সমস্ত মুখ রাগে লাল হয়ে গেল। চেঁচিয়ে বলতে যাচ্ছিল প্রায় যে ওদের কাজে নেওয়া হবে না কিন্তু শেষ মুহূর্তে অতি কষ্টে নিজেকে সামলালো দঁসের: বাঃ বাঃ মহান নেতাটিও শেষ পর্যন্ত ফাঁদে পা বাড়ালেন! তাহলে কোম্পানির এখনও কিছু রমরমা আছে যে কলির দেবতাকেও এখানে রুটি ভিক্ষে করতে আসতে হয়! এতিয়েনও আর সকলের মতো চুপচাপ বাতি নিযে ক্যাথরিনের সঙ্গে চলে গেল।

কিন্তু ক্যাথরিন ভয় পাচ্ছিল অন্য কারণে। অন্য মজুররা এতিযেনকে আর ছেড়ে কথা বলবে না। ওপরের সিঁড়ির মুখে দেখা হল শাভালের সঙ্গে; আরও প্রায় জনা কুড়ি মজুরের সঙ্গে খালি খাঁচার জন্যে অপেক্ষা করছে। শাভাল ক্যাথরিনের ওপর রাগে অন্ধ হয়ে গিযে প্রায় ঝাঁপিয়েই পড়ত কিন্তু এতিয়েনকে দেখে তখনকার মতো সামলে গেল। তারপর ঠোঁট বেঁকিযে কাঁধ ঝাঁকালো। ওঃ, তার মানে এতিয়েন এর মধ্যে আবার ক্যাথরিনদের বাড়িতে ঢুকেছে! ঢুকবেই তো! মা মেয়ের শরীরের তাপে এখনও যে বিছানা গরম! যাক গে, মাগী গেছে—আপদের শান্তি হয়েছে! পরের এঁটো পাত চেটে যদি এতিয়েন খুশী থাকে, তাতে শাভালের কি!

কিন্তু এ সবই শাভালের মুখের কথা! আসলে ভেতর ভেতর সে রাগে, হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরছে। চোখ দুটো জলজ্বল করছে আক্রোশে, ক্ষোভে। কেউ এতিয়েনকে দেখে এক পা নড়ল না। এক অস্বস্তিকর নীরবতা। শুধু আড়চোখে এদের দু'জনকে দেখতে লাগল, তারপর পেছন ফিরে শ্যাফ্‌টের দিকে তাকিয়ে রইল। আসলে উপেক্ষা করতে চায়। বড় চালাটার নীচে দাঁড়িয়ে ছিল সবাই। ঠাণ্ডা শিরশিরে বাতাস বইছে।

শেষ পর্যন্ত খাঁচাটা এসে দাড়ালো। ভেতরে যেতে বলা হল সবাইকে। পিয়েরোঁ আর অন্য দু'জন মজুরের সঙ্গে একই টবের মধ্যে গাদাগাদি করে বসল এতিয়েন আর ক্যাথরিন। পাশের টবটাতে শাভাল। সে মুক্যকে উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে বলল, কেন যে কর্তারা এই সুযোগে গণ্ডগোলের নায়কদের পাকড়াচ্ছে না, কে জানে!

কিন্তু ছেলেমেয়ে মারা যাবার পর থেকেই বুড়ো মুক্য এখন কেমন যেন নির্জীব হয়ে গেছে। কোনোমতে নিজের কাজটুকু চালিয়ে যায়। কোনো কথা না বলে সে মাথা নাড়লো।

খাঁচাটা নামতে শুরু করল। চারদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। কেউ কোনো কথা বলছে না। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ পথ নেমে যাবার পর প্রচণ্ড জোরে ঘরঘর করে একটা শব্দ হল। লোহাগুলো মরমর করে উঠল যেন। খাঁচার লোকগুলো একে অন্যের ঘাড়ে পড়েছে।

এতিয়েন দাঁতে দাঁত চেপে বলল, হে ভগবান, ওরা কি চায় এইভাবে আমাদের চাপা দিয়ে মারতে! লাইনিং সারায় না কেন ঠিকমতো? আর ওরা তো জানে যে এবার মেরামত করা দরকার।

যাই হোক বাধা পেরিয়ে খাঁচাটা নামতে শুরু করল। কিন্তু এত বেশী জলের মধ্যে দিয়ে নামতে হচ্ছে যে হুড়হুড় করে তোড়ে বৃষ্টির জল পড়ার মতো শব্দে মজুররা ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে উঠল। কি সর্বনাশ! তার মানে এত ফাটল ধরেছে? আর কর্তৃপক্ষ নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে?

পিয়েরোঁ বেশ কয়েকদিন আগেই কাজে যোগ দিয়েছে। এ নিয়ে সবাই তাকে প্রশ্ন করছিল। কিন্তু পাছে তার কথা আবার বড় কর্তাদের প্রতি বিরূপ সমালোচনার সৃষ্টি করে, সেই ভয়ে সে ভাসা-ভাসা জবাব দিল, না না, ভয়ের কিছু নেই। বিপদ হবে না। এই রকমই তো ছিল। আসলে ছোট ছোট ফাটলগুলো এখনও মেরামত করার সময় হয়নি।

খাঁচাটা যখন খাদের নীচে এসে পৌছল, দেখা গেল জল জমে জমে যেন বেশ বড়সড় ডোবা হয়ে গিয়েছে একটা। কিন্তু একজন ডেপুটিও মই বেয়ে ওপরে উঠে দেখার প্রয়োজন বোধ করল না যে এই বিপর্যয়ের কারণটা কি? যে জল জমেছে পাম্প করে সরিয়ে দেওয়া যাবে আর যারা শ্যাফ্‌ট মেরামত করে তাদের বলা হবে যাতে তারা পরদিন রাতে জোড়গুলো পরীক্ষা করে দেখে। এমনিতেই তো এতদিন পরে নতুন করে কাজ শুরু করতে যথেষ্ট হাঙ্গামা হয়েছে। ইঞ্জিনীয়ার সাহেব ঠিক করেছেন যে নিয়মমাফিক কয়লা তোলার কাজ শুরু করবার আগে অন্তত পাঁচদিন বিভিন্ন ধরনের মেরামতির কাজ চলবে। এক-একজন ডেপুটির অধীনে দশজন করে মজুর সেই কাজ চালাবে। অনেক জায়গায় ধস নেমেছে, রাস্তা খারাপ হয়েছে। বেশ কয়েকশো মিটার করে এলাকা সারাইয়ের আওতায় পড়বে। সবাই নীচে পৌছলে গুনে দেখা গেল তিনশো বাইশজন মজুর—আগে আগে এই খাদে যখন পুরোদমে কাজ চলত, তখনকার সংখ্যার অর্ধেক।

এতিয়েন আর ক্যাথরিনের দলে একজন কম পড়ল। শাভাল এল। এটা অবশ্য মোটেই কাকতালীয় নয় কারণ, অন্য দলগুলো গঠনের সময় সে ইচ্ছে করেই নিজেকে আড়ালে রেখেছিল। এই দলটা উত্তর দিকের গ্যালারীর শেষ প্রান্তে কাজ করবে, অন্তত তিন কিলোমিটার দূরে। মাটি পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে, সেটা পরিষ্কার করা দরকার। ধসে যাওয়া পাথরগুলোর ওপর শাবল আর গাঁইতি চালালো তারা। এতিয়েন, শাভাল আর পাঁচজন মজুর এই কাজ করছে, ক্যাথরিন আর বাকি দু'জন ছেলে চাল বেয়ে ওই মাটি আর পাথর সরানোর কাজে হাতে লাগিয়েছে। নিজেদের

মধ্যে টুকটাক কথাবার্তা চলছিল। ডেপুটি কড়া নজরে সব কিছু তদারক করছে কিন্তু তা সত্ত্বেও শাভাল আর এতিয়েনের মধ্যে এক অলিখিত দ্বন্দ্ব প্রতি মুহূর্তে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। শাভাল যদিও মুখে বিড়বিড় করে বলছিল ক্যাথরিনের জন্য তার আর কোনো মাথাব্যথা নেই, কিন্তু মেয়েটার পিছু ছাড়ছিল না। এতিয়েনও রেগে গেছে। শাভাল ক্যাথরিনের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে সেও দেখে নেবে। ফলে ওদের নিজেদের মধ্যে ঠাণ্ডা গরম লড়াই থামছিল না।

আটটা আন্দাজ দঁসের এল কাজকর্ম কেমন চলছে দেখতে। মেজাজ ভীষণ গরম তার। ডেপুটির ওপর হম্বিতম্বি করতে লাগল, 'কোনো কাজ ঠিকমতো হচ্ছে না। এই-ভাবে ফাঁকি দিলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' গটগট করে হেঁটে গেল দঁসের—সে নাকি একটু পরেই ইঞ্জিনীয়ার সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে আসছে। এতক্ষণে নেগ্রেল এল না কেন সেটাই দঁসেরের মাথায় ঢুকছে না। তার জন্য অপেক্ষা করে করে পায়ে ব্যথা হয়ে গেল

আরও এক ঘণ্টা কেটে গেল। ডেপুটি অন্য কাজ বন্ধ রেখে ছাদ মেরামত করার আদেশ দিল।

ক্যাথরিন আর তার সঙ্গী দুটো ছেলে হাতে হাতে অন্যদের মাটি যোগান দিচ্ছিল। গ্যালারীর এই জায়গাটাতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে কাজ চলছে। অন্যদিকে কি হচ্ছে তা বোঝবার উপায় নেই। এক-একবার মনে হচ্ছে দূরে যেন অনেক লোকের ছোটা-ছুটির শব্দ। এই দলটা তখন কাজ থামিয়ে কান পেতে শোনবার চেষ্টা করছিল। ঠিক মনে হচ্ছিল সবাই যেন তাড়াতাড়ি খনি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে—কিন্তু খানিক পরই আবার সব চুপচাপ। এতিয়েনের দলটা আবার হাতুড়ি পিটতে শুরু করল। কিন্তু খানিকক্ষণ বাদে খুব ভয়ার্তভাবে দৌড়ে এল ক্যাথরিন। নীচে নাকি কেউ নেই।

—আমি চেঁচালাম, কিন্তু কেউ কোনো উত্তর দিল না। সবাই চলে গেছে।

এই দশজন এত ভয় পেয়ে গেল যে যন্ত্রপাতি ফেলে পাগলের মতো দৌড়তে শুরু করল, না হলে হয়তো খাদে বন্দী হয়ে পড়ে থাকতে হতে পারে। এই অংশটা শ্যাফ্‌ট থেকে অনেক দূরে। হাতে শুধু বাতিটা নিয়ে সারবদ্ধভাবে ছুটতে লাগল সকলে। এমন কি ভয়ে দিশেহারা হয়ে গিয়েছে ডেপুটিও। খনির অস্বাভাবিক স্তব্ধতা সকলের স্নায়ুর ওপর এত চাপ দিচ্ছে যে ভয় কাটাবার জন্য চেঁচাচ্ছে তারা। কি হয়েছে? খনিতে একজনকেও দেখা যাচ্ছে না কেন? তবে কি দুর্ঘটনায় সবাই শেষ হয়ে গেল? আসলে বিপদটা কখন কোথা থেকে এল সেটাই যে মাথায় ঢুকছে না। প্রাণটা যেন সুতোয় ঝুলছে মাথার ওপরে।

সবাই যখন শেষ পর্যন্ত খনির মুখের ঠিক নীচে এসে পৌছল, দেখা গেল হু হু করে জলের তোড় রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। নিমেষে জল হাঁটু পর্যন্ত উঠে গেল। এই দশ-জন দৌড়তে পারছে না। অতি কষ্টে জল ভেঙে এগোতে হচ্ছে। এক মিনিট সময় অপচয় করা মানেই মৃত্যু।

এতিয়েন বলল, সর্বনাশ! লাইনিং ভেঙে গেছে। আমাদের আর বাঁচার আশা নেই!

খনিতে নামার পর থেকেই ক্রমবর্ধমান প্লাবন লক্ষ করে পিয়েরোঁ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ছিল। কয়লার টব ভর্তি করবার সময় বার বার তাকাচ্ছিল ওপর দিকে। চোখে মুখে জোরে জোরে জলের ছিটে এসে লাগছে। অবিশ্রান্ত স্রোতের গর্জনে কানে তালা ধরে যায়। কিন্তু পিয়েরোঁ সবচেয়ে বেশী ভয় পেল যখন তার পায়ের কাছে দশ মিটার গভীর গর্তটা জলে ভরে উঠল। জল উঠছে ধীরে ধীরে। তার মানে পাম্পটাও বিকল হয়ে গেছে। হিসহিস শব্দ হচ্ছে পাম্প থেকে। দঁসেরকে সতর্ক করে দিল সে—চাপা বাগতস্বরে দঁসের জবাব দিল ইঞ্জিনীয়ার না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। দু-দুবার দঁসেরকে তাড়া লাগিয়েও কোনো কাজ হল না। জল উঠছে—তার জন্য কি আর করা যাবে

মুক্ হাজির হয়েছে বাতাঈকে নিয়ে। দু হাতে শক্ত করে তার লাগাম ধরে রাখতে হয়েছে। বুড়ো ঘোড়াটা হঠাৎ জোরে ডেকে উঠল।

—কি হল বাতাঈ, ভয় পেয়েছিস নাকি? ওঃ হো, বৃষ্টি পড়ছে ভেবেছিস? চলে আয়, ও কিছু নয়

কিন্তু ঘোড়াটা দাঁড়িয়েই রইল। তার সমস্ত শরীর কাঁপছে। অতি কষ্টে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হল তাকে।

বুড়ো মুক্ আর বাতাঈ গ্যালারীর দিকে যেতে না যেতেই প্রচণ্ড জোরে একটা শব্দ হল। ধস নেমেছে। লাইনিং-এর একটা অংশ আলগা হয়ে গিয়ে শ্যাফ্‌টের গা বেয়ে খসে পড়ছে। একশো আশি মিটার দৈর্ঘ্যের এই অংশটা খুলে নীচে পড়বার সময়ে পিয়েরোঁ আর তার সহকর্মীরা মরতে মরতে এক চুলের জন্য বেঁচে গেল। ওক্ কাঠের ভারী তক্তা নিমেষে একটা খালি কয়লার টবকে গুঁড়িয়ে দিল। তার সঙ্গে সঙ্গেই বাঁধভাঙা জল হুড়হুড় করে পড়ছে। দঁসের সবেমাত্র উঠে দেখতে যাবে গলদটা কোথায়, আর একটা বড় কাঠের টুকরো খসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে খনি থেকে সবাইকে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দিল দঁসের—ডেপুটিদের বলা হল, যে সব মজুররা কাজ করছে তাদের সতর্ক করে দেবার জন্য।

মানুষ প্রাণভয়ে পাগলের মতো ছুটছে। চারদিক থেকে দলে দলে মজুররা এসে নিজেদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করছে। কে কাকে ফেলে সকলের আগে খাঁচায় উঠে ওপরে পালাতে পারে তারই প্রতিযোগিতা চলছে। দরকার হলে অন্যদের মেরে সরিয়ে দিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাতে হবে। খাঁচাগুলো ভর্তি হয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। যারা পড়ে রইল তারা ভীত সন্ত্রস্ত, করুণ চোখে তাকিয়ে রয়েছে অপসৃয়মান খাঁচাগুলোর দিকে। এসকেপ শ্যাফ্‌টের দিকে দৌড়ে গেল কয়েকজন। চেঁচাতে চেঁচাতে ফিরে এল তারা—ও পথটা আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। ঈশ্বরই জানেন খাঁচাগুলো আবার লোক নিয়ে ওপরে যাবার আগেই সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে কি না। ওপরের স্তরে এখনও ক্রমাগত ভাঙচুর চলছে, জল পড়ছে, তক্তা ভাঙছে মড়মড় করে। অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা খাঁচা অচল হয়ে গেল। খালি অবস্থায় নীচে নামবার সময় ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে সেটা। অন্য আর একটা খাঁচা শ্যাফ্‌টের গাই

বিপজ্জনক জায়গায় এত বিশ্রীভাবে ঘষটে যাচ্ছে, যে কোনো মুহূর্তে তার ছিঁড়ে যেতে পারে। এখনও অন্তত একশোজনের ওপরে যাওয়া বাকি। তারা ক্রমশ অধৈর্য হযে উঠছে। দেওয়াল আঁকড়ে ধরে' দাঁড়িয়ে রয়েছে কোনো রকমে, গা ছড়ে রক্ত পড়ছে, হাঁটু ছাপিয়ে জল উঠেছে। ওপর থেকে ধসে পড়া তক্তার চাপে দু'জন তো সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। খাঁচার ভেতরে জায়গা না পেযে একজন মজুর খাঁচা ওপরে ওঠবার সমযে মরীয়া হযে তার তলাটা আঁকড়ে ধরেই ওপরে উঠে যাবার চেষ্টা করছিল। যত তাড়াতাড়ি খনি থেকে বেরোনো যায় আর কি! হাত ফসকে সোজা পঞ্চাশ মিটার নীচে পড়ে সমস্ত দেহটা তার থেঁতলে গেল।

দঁসের অবশ্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিল অবস্থা আয়ত্তে রাখবার জন্য। একটা গাঁইতি তুলে নিল সে, সকলকে ভয় দেখাতে লাগল যাতে কেউ মারামারি না করে। তাহলে এই গাঁইতির ঘাযে তার মাথাটা দু ফাঁক হযে যাবে। বারবার সকলকে সারবদ্ধ-ভাবে দাঁড় করাবার চেষ্টা করছিল। সব মজুররা নিরাপদে বেরিযে যাবার পর তবেই দলের নেতারা বেরোবে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। পিযেরোঁ পিছলে বেরিযে যাবার তাল খুঁজছিল। অতি কষ্টে তাকে রুখলো দঁসের। প্রতিবার খাঁচার দরজা বন্ধ হবার আগে পিযেরোঁকে ধাক্কা মেরে সরিযে দিতে হচ্ছিল। কিন্তু দঁসেরেরও ভয়ে দাঁতে দাঁত লেগে গেছে। একটা করে মুহূর্ত কাটছে আর মনে হচ্ছে এইবার শেষ হযে যেতে হবে। অবিশ্রান্ত জল, পাথর আর কাঠের টুকরো পড়ছে। তখনও কয়েকজনের ওপরে যাওয়া বাকি। আর যেন মাথা ঠিক রাখতে পারল না দঁসের। সকলকে ধাক্কা মেরে খালি খাঁচায় উঠে পড়ল। তার পিছু পিছু পিযেরোঁ।

ঠিক এই সময়ে শাভাল, এতিয়েন আর ওদের পুরো দলটা এসে পৌঁছেছে। দৌড়ে খাঁচার কাছে আসতে আসতে খাঁচাটা ওপরে উঠে গেল। আবার একপ্রস্থ ধস নামতে পিছু হটে এল সকলে। শ্যাফ্‌টের মুখ বন্ধ হযে গেছে। অর্থাৎ খাঁচাটা আর নেমে আসার কোনো সম্ভাবনাই নেই। ক্যাথরিন ককিযে উঠল। শাভাল ভাগ্যকে অভিশাপ দিচ্ছে। এখনও তারা কুড়িজন খাদে রয়ে গেছে। এরা উঠতে পারল না। শযতান ডেপুটিগুলো বিপদের মুখে পড়েই ঠিক কেমন লেজ গুটিযে পালালো! বুড়ো মুক্য বাতাঈকে ঠেলতে ঠেলতে নিযে এসেছে। যেতে হলে দু'জনেই একসঙ্গে যাবে। পুরুষমানুষগুলোর উরু পর্যন্ত জল উঠেছে। এতিয়েন চোয়াল শক্ত করে ক্যাথরিনকে কোলে তুলে নিল। মুখ উঁচু করে সকলে শ্যাফ্‌টের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, শুধু একটা কালো অন্ধকার গহ্বর—যা দিযে অস্বাভাবিক জলস্রোত এসে সকলকে ভাসিয়ে নিযে যাচ্ছে। এখান দিয়ে সাহায্য পাবার কোনো আশাই নেই তবু সকলে পাগলের মতো চিৎকার করছিল।

বাইরে এসে পৌঁছনোমাত্রই উজ্জ্বল সূর্যের আলোয় দঁসের দেখল নেগ্রেল আসছে। এমনই কপাল যে ঐদিন সকালেই মাদাম এনবো ঘুম থেকে উঠে নেগ্রেলকে বিয়ের জিনিসপত্রের ফর্দ দেখতে বলেছিলেন। খনিতে আসতে নেগ্রেলের তাই বেলা দশটা বেজে গেছে।

ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এল নেগ্রেল।

—কি হয়েছে?

ওভারম্যান দঁসের বলল, সব শেষ হয়ে গেছে!

তোতলাতে তোতলাতে কোনোমতে অবস্থাটা বুঝিয়ে বলল দঁসের। কিন্তু নেগ্রেল বুঝতেই পারল না। তা কি করে সম্ভব? একটা শ্যাফ্‌ট এমনিভাবে হঠাৎ অকেজো হয়ে যেতে পারে নাকি? নিশ্চয়ই বাড়িয়ে বলছে সকলে। এখুনি দেখা দরকার।

—দঁসের, নীচে কেউ আটকা পড়েনি তো?

দঁসের অপ্রস্তুত হয়।

—ঈশ্বর করুন যেন সকলেই বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে! কিন্তু বলা তো যায় না··

রাগে লাল হয়ে গেল নেগ্রেল।

—কোন আক্কেলে তুমি নিজে ওপরে উঠে এলে? তুমি তোমার মজুরদের এভাবে বিপদের মুখে ফেলে কক্ষনো চলে আসতে পারো না!

বাতি গোনবার আদেশ দেওয়া হল। সকালে তিনশো বাইশজন বাতি নিয়েছিল। দুশো পঞ্চান্নটার হিসেব মিলছে। অনেকে অবশ্য বলছে প্রাণরক্ষার তাগিদে তাড়াহুড়ো করার সময় কিছু বাতি পড়ে ভেঙে গেছে। তখন ঠিক হল নাম ডাকা হবে হিসেব মেলানোর জন্য। কিন্তু তাতেও সুবিধে হল না। বাইরে বেরিয়ে অনেকেই দৌড়ে বাড়ি চলে গেছে। অনেকে গণ্ডগোলের মধ্যে নিজের নাম শুনতেই পেল না। কেউ ভালো করে বুঝতে পারছে না ক'জন আটকা পড়েছে। কুড়িও হতে পারে, আবার চল্লিশও। তবে নেগ্রেল এটা বুঝতে পারল যে কিছু লোক নির্ঘাত ভেতরে আটকা পড়েছে কারণ শ্যাফ্‌টের খোলা মুখে কান পাতলে জলস্রোতের গর্জন আর কাঠ ভেঙে পড়ার আওয়াজ ছাড়াও ক্ষীণ আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে।

নেগ্রেল প্রথমে ভাবলো মঁসিয় এনবোকে খবর পাঠাবে যাতে আপাতত খনি বন্ধ করে দেওয়া যায়। কিন্তু এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। যারা বাড়ি ফিরে গিয়েছিল তারাই দুশো চল্লিশ নম্বর কলোনীতে খবর দিয়েছে। দলে দলে মেয়ে, বুড়ো, বাচ্চারা আসছে খনিতে খবর নিতে, কার বাড়ির সর্বনাশ হল জানতে। তাদের কান্না আর চিৎকারে কান পাতাই দায়। বার বার তাদের ঠেলে সরিয়ে দিতে হচ্ছে যাতে কাজের ব্যাঘাত না ঘটে।

যে সব মজুরদের উদ্ধার করতে পারা গেছে, তারা বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে—আজ তো তাদেরও এই অবস্থা হতে পারত! তাদের ঘিরে রয়েছে কলোনীর মেয়েরা। চিৎকার করে কাঁদছে, যারা খাদে আটকা পড়েছে তাদের নাম জানতে চাইছে। যে সব মজুররা বাইরে বেরিয়ে আসতে পেরেছে তাদের কথাবার্তা অসংলগ্ন। কাঁপছে আতঙ্কে, একটুক্ষণ আগের ভয়ংকর দৃশ্যটা মন থেকে মুছে ফেলতে চাইছে। আস্তে আস্তে ভীড় বাড়তে থাকলো। চারদিকে কান্নার রোল। একজন মানুষ কিছু বুঝে

গণ্ডগোলের মধ্যেও স্থিরভাবে একটা উঁচু ঢিবির ওপর বসে আছে। সুভারিন। সে এখনও গ্রাম ছেড়ে যায়নি।

মেয়েরা কাঁদছে।

—নামগুলো শীগগির বলো।

নেগ্রেল এক মুহূর্তের জন্য সকলের সামনে এল।

—যে মুহূর্তে আমরা জানতে পারব কারা কারা খাদে আটকা পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের জানিয়ে দেব। এখনই আশা ছেড়ে দেবার মতো কিছু হয়নি। সবাইকে বাঁচাবার চেষ্টা করা হবে। আমি নিজে খাদে নামব।

শোকে মুহ্যমান হয়ে সকলে দাঁড়িয়ে ছিল। খাদে নামবার জন্য চুপচাপ তৈরী হচ্ছে নেগ্রেল। অচল খাঁচাটা খুলে নিয়ে তার বদলে একটা মোটা দড়ি তারের সঙ্গে বেঁধে দিতে আদেশ করেছে। যদি জলের তোড়ে একটা বাতি নিভে যায়, তাই দ্বিতীয় বাতিও সঙ্গে নিয়েছে সাবধানে।

ডেপুটিরা তাকে সাহায্য করছে রক্তশূন্য ভয়াত মুখে।

নেগ্রেল কাটা কাটা ভাবে বলল, দঁসের, তুমিও আমার সঙ্গে নামবে।

কিন্তু দঁসেরের মাতালের মতো হাবভাব দেখে পরক্ষণেই মত বদলালো নেগ্রেল।

—নাঃ, থাক। অযথা ভীড় বাড়িয়ে লাভ নেই। আমি একাই নামবো।

সরু একটা বালতির মতো পাত্র, তারের এক প্রান্তে বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে, তাতে উঠল নেগ্রেল—এক হাতে বাতি, অন্য হাতে দড়ির প্রান্ত ধরা—যার সাহায্যে সে নীচ থেকে নির্দেশ পাঠাতে পারবে, দড়িতে কম বেশী টান দিয়ে।

ইঞ্জিন চালককে বলল, ঠিক আছে।

চালু হল ইঞ্জিন। ড্রাম ঘুরতে লাগল। নেগ্রেল আস্তে আস্তে নেমে গেল অনেক নীচে যেখান থেকে এখনও মানুষের গলার স্বর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

শ্যাফ্‌টের প্রথম অংশটা ঠিকঠাকই আছে। কোনোরকম অসঙ্গতি চোখে পড়ল না নেগ্রেলের। দুলতে দুলতে নীচে নামছিল সে। হাতের বাতিটা এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফেলছিল; শ্যাফ্‌টের দেওয়ালে। এত কম ফাটল এইখানে যে বাতিটারও কোনো ক্ষতি হল না। কিন্তু তিনশো মিটার নামবার পর, যেখানে লাইনিং-এর নীচের অংশটার শুরু, সেখানে বাতি নিভে গেল জলের ঝাপটায়। এখন অন্য বাতিটা ভরসা। সাবধানে সেটাকে আড়াল করল নেগ্রেল। এই বাতিটা দিয়েই কাজ চালাতে হবে। এমনিতে সে যথেষ্ট সাহসী। কিন্তু অবস্থা অনুমান করতে পেরে ভয়ে কেঁপে উঠল। মাত্র কয়েকটা তক্তা এখনও জায়গামতো আছে। তাছাড়া যাবতীয় ফ্রেম, ঠেকা দেওয়ার কাঠ—সব ধসে গেছে। সেখানে মস্ত বড় বড় সব গর্ত। হুড়হুড় করে নরম হলুদ বালি পড়ছে। সেই বালি ছাপিয়ে জল ঢুকছে সমানে। আরও নীচে নামলো নেগ্রেল। জায়গায় জায়গায় জল জমে ছোট বড় ডোবার মতো তৈরী হয়ে গেছে। বাতির লাল আলোর চারদিকের দেওয়ালে লম্বা লম্বা ভুতুড়ে সব ছায়া। এখন একটাই জরুরী কাজ—কোনোভাবে আটকে পড়া

মানুষগুলোকে যদি উদ্ধার করা যায়। যতই নীচে নামতে লাগল নেগ্রেল, আর্তনাদ ক্রমশ তীব্রতর শোনাচ্ছিল। আরও খানিকটা পথ আসার পর রাস্তাটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। সামনে বিরাট বাধা যা নেগ্রেলের একার পক্ষে সরানো দুঃসাধ্য। তক্তার স্তূপ, লোহার কড়ি, এসকেপ শ্যাফ্‌টের ভাঙা টুকরো, অকেজো পাম্প—সব এক জায়গায় জড়ো হয়ে আছে। নেগ্রেল ধ্বংসস্তূপ পরীক্ষা করে দেখছিল। হঠাৎ নীচ থেকে মানুষগুলোর আর্তনাদ থেমে গেল। নির্ঘাত জল আরও বেড়ে গেছে। হয় প্রাণভয়ে সবাই আরও ভেতরের গ্যালারীর দিকে চলে গেছে নয়তো সলিল সমাধি ঘটেছে তাদের।

আর কিছু করার ছিল না নেগ্রেলের। এতখানি বিপদের মুখে সে সত্যি অসহায়। দড়িতে টান দিল নেগ্রেল, তাকে ওপরে তুলে নেবার নির্দেশ দিয়ে। কিন্তু তার পরই আবার জানিয়ে দিল যে সে আরও খানিকটা পরীক্ষা করতে চায়। এই আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ না জেনে খনি থেকে বেরোতে তার মন সায় দিচ্ছিল না। সে শ্যাফ্‌টের লাইনিং পরীক্ষা করতে শুরু করল। এদিকে বাতিটাও প্রায় নিভু-নিভু। হাত বাড়িয়ে লাইনিং পরখ করতে গিয়ে তার অভিজ্ঞ আঙুল স্পষ্টই বুঝল যে নিপুণ হাতে করাত চালানো হয়েছে, গর্ত করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে সব কিছু ধ্বংস করে দেবার। খুব ঠাণ্ডা মাথায় এই এতবড় বিপর্যয়ের পরিকল্পনা করা হয়েছে। নেগ্রেলের বিস্মিত চোখের সামনে লাইনিং-এর বাকি অংশটাও হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। যে লোক এত নিপুণ হাতে সর্বনাশ করে রেখেছে, তার হিংস্রতার কথা চিন্তা করে মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠল নেগ্রেলের, রক্ত হিম হয়ে গেল। সব সময়ই মনে হতে লাগল এই বুঝি আড়াল থেকে লোকটা বেরিয়ে এল! তাড়াতাড়ি সে দড়িতে টান দিল ওপরে যাবার জন্য। অবশ্য ওপরে না গিয়ে তার উপায়ও ছিল না কারণ ইতিমধ্যে লাইনিং-এর ওপরের অংশের জোড়ও আলগা হয়ে ভাঙতে শুরু করেছে। ফলে জলও বাড়ছে। এখন আর কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার · সমস্ত শ্যাফ্‌টটা ভেঙে ভেতরে ঢুকে যাবে।

বাইরে বেরোবার ঠিক মুখেই দেখা গেল মঁসিয় এনবো উৎকণ্ঠিত ভাবে দাঁড়িয়ে।

—কি রকম বুঝলে?

নেগ্রেল কথা বলতে পারছিল না। আতঙ্কে, উত্তেজনায় তার কণ্ঠনালী শুকিয়ে গেছে। সে প্রায় টলে পড়ে যাচ্ছিল।

মঁসিয় এনবো অধৈর্য হলেন।

—কি আশ্চর্য! জবাব দিচ্ছ না কেন? ভালো করে ছাখোনি?

নেগ্রেলের সম্বিৎ ফিরল। কাছাকাছি দু'জন ডেপুটি দাঁড়িয়ে। মামাকে খানিকটা দূরে ডেকে নিয়ে গেল। তারপর ফিসফিস করে জানালো যে এটা কোনো পাকা মাথার কাজ। ইচ্ছে করে যন্ত্রপাতি দিয়ে লাইনিং অকেজো করে দেওয়া হয়েছিল। খনি ধুঁকছে। কোনোভাবেই বাঁচবার পথ নেই।

মঁসিয় এনবো বিবর্ণ হয়ে গেলেন। তিনি নিজেও ফিসফিস করে কথা বলছিলেন।

মঁস্যুর এই দশ হাজার কর্মচারীর সামনে চেঁচামেচি না করাই ভালো। পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

মুখে চেঁচিয়ে বললেন, খনির যা অবস্থা তাতে কেউ নীচে নামলে তাকে নিজের দায়িত্বে যেতে হবে এবং প্রাণ নিয়ে উঠে আসতে পারার সম্ভাবনা খুবই কম। এত বড় দুর্ঘটনা কি করে ঘটলো সেটাই বোঝা যাচ্ছে না।

ডেপুটিদের কাছে ফিরে এলেন মঁসিয় এনবো। হতাশভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে খনির এলাকা খালি করে দিতে বললেন। এখন আর কিছু করবার নেই। আস্তে আস্তে সকলে মাথা নীচু করে ফিরে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে ঘাড় উঁচু করে পেছনে ফিরে দেখছিল রাক্ষুসে দৈত্যের মতো লাল ইঁটের বাড়িটাকে।

মঁসিয় এনবো আর নেগ্রেল খনি ছাড়লেন সবার শেষে।

বাইরে অপেক্ষমান নারীপুরুষ সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল।—যারা আটকা পড়ল তাদের নাম বলুন!

এতক্ষণে মায়্য-গিন্নীও এসে হাজির হয়েছে। সে বুঝতে পেরেছে, শেষরাতে ক্যাথরিন আর এতিয়েন তৈরী হয়ে খনিতে যাবার জন্য বেরিয়ে এসেছে। নির্ঘাত দু'জনেই নীচে রয়ে গেছে। প্রথমে সে সকলকে ডেকে ডেকে বলছিল যে এতে উচিত শিক্ষাই হয়েছে দু'জনের। বেইমানির শাস্তি পেয়েছে। কিন্তু এখন সেও পাগলের মতো করছে। কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবকাশও নেই, চারপাশের কথাবার্তা থেকেই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে ক্যাথরিন আর এতিয়েন—দু'জনেই ছিল খনিতে। একজন মজুর দেখেছে। অন্যরা আর কে কে দেখেছে, তা নিয়ে অবশ্য মতবিরোধ আছে: বিভিন্ন নাম উল্লেখ করা হচ্ছে, আবার 'না না ও তো ছিল না' এই রকম ভাবে তা বাতিল হয়ে যাচ্ছে। 'শাভাল ছিল কি?' কিন্তু একটা ছেলে বলল যে শাভাল তার সঙ্গেই উঠে এসেছে। লেভাক আর পিয়েরোঁর বউরা তারস্বরে কাঁদছে যদিও দু'জনের কোনো আপনজনই আটকা পড়েনি। জাশারী খুব জোর বেঁচে গেছে। সে আনন্দে হাউ হাউ করে কাঁদছে আর বারে বারে মা, বউকে চুমু খাচ্ছে। সে এখন মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে, মায়ের দুঃখ ভাগ করে নিচ্ছে। ক্যাথরিনের জন্য তার দাদার মনে এতখানি ভালোবাসাও জমা ছিল! না না, তার বোন নিশ্চয়ই বেঁচে আছে, ওপরে উঠে আসতে পেরেছে কিংবা হয়তো শেষ পর্যন্ত খাদে নামেনি!

—বলুন! নাম বলুন! আমরা নামগুলো জানতে চাই!

নেগ্রেল আর সহ্য করতে পারছিল না। দু হাতে কান চাপা দিয়ে চিৎকার করে উঠল।—ওদের থামতে বলুন! আমি এবার মরে যাব। আর সইতে পারছি না। আমরা এখনও বুঝতে পারিনি কারা কারা আটকা পড়েছে।

ইতিমধ্যে দু ঘণ্টা কেটে গেছে। এত বড় বিপর্যয়ের পর প্রথম ঘোরটা কাটলে এতক্ষণে সকলের দ্বিতীয় শ্যাফ্‌টটার কথা মনে পড়ল। সেটা রকিয়ার-এ। মঁসিয় এনবো সবে ঘোষণা করতে যাচ্ছেন যে ওই পথে উদ্ধারকার্য চালাবার চেষ্টা চলবে, এমন সময় নতুন একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ল। পাঁচজন ব্যক্তি জল ভেঙে বাতিল

শ্যাফ্‌টটা দিয়ে মই বেয়ে কোনোরকমে বেরোতে পেরেছে। তাদের মধ্যে বুড়ো মুক্যু-এর নামও শোনা গেল। সকলে অবাক হল। কেউ ভাবতেই পারেনি বুড়ো নীচে ছিল। কিন্তু নতুন করে হা-হুতাশ শুরু হল। তার মানে বাকি পনেরোজন কোনো ভাবেই বেরোতে পারেনি। হয়তো পাথর পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে কিংবা অন্ধকারে পথ হারিয়েছে। এখন আর তাদের উদ্ধারের আশাও কম। কারণ রকিয়ার-এ এর মধ্যেই দশ মিটার গভীর জল জমেছে।

এতক্ষণে সবাই জেনেছে কে কে নীচে রয়ে গেছে। কান্নার দমকে ভারী হয়ে উঠেছে আকাশ-বাতাস।

নেগ্রেল পাগলের মতো চেঁচাতে লাগল।

—আঃ, ওদের চুপ করতে বলো। বড় বিপদ! পিছু হটিয়ে দাও সবাইকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, অন্তত একশো মিটার দূরে সরিয়ে দাও। এখন কি হবে কেউ বলতে পারে না।

হতভাগ্য, অস্থির মজুরদের পিছু হটতে বাধ্য করা হল। নতুন করে আতঙ্কিত হল সকলে। সর্বনাশ! তার মানে দুর্ঘটনার ব্যাপার, মৃতের সংখ্যা-সবই গোপন রাখবার চেষ্টা চলছে নিশ্চয়ই। ডেপুটিরা সবাইকে বুঝিয়ে বলতে চাইছিল যে আসলে তা নয়, শ্যাফ্‌ট ভেঙে পড়লে মাটি এত কেঁপে উঠবে যে মূল অফিস-বাড়ি-গুলোরও ধসে গিয়ে ক্ষতি হবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। কেউ কোনো কথা বলতে পারছিল না। ডেপুটিরা অবলীলায় সকলকে ধাক্কা মেরে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দিয়ে এলাকাটা ঘিরে ফেলল। মাঝেমাঝেই মজুররা আবার পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছিল অবচেতনভাবে। বেষ্টনীতে পাহারা দ্বিগুণ করে দেওয়া হলো। এখন প্রায় হাজার লোক সামনে, আরও আসছে দূরদরান্ত থেকে। আর ওই স্তূপটার ওপর ফ্যাকাশে চেহারার সুভারিন একের পর এক সিগারেট ধ্বংস করে চলেছে। তার নিষ্পলক চোখের দৃষ্টি খনির দিকে নিবদ্ধ।

উত্তেজিত ভাবে অপেক্ষা করছে সবাই। বেলা গড়িয়ে দুপুর হয়ে গেল। কেউ কিছু খায়নি। বাড়িতে যাবার কথাও মাথায় আসেনি কারও। ধূসর আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ। ঝোপের আড়াল থেকে একটা বড় কুকুর সমানে চিৎকার করছে—এতগুলো মানুষ একসঙ্গে দেখে। মাঠের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত শুধু মানুষ আর মানুষ। খনির চৌহদ্দি থেকে একশো মিটার দূরে চারদিক ঘিরে মাঠের পর মাঠ ছেয়ে গেছে অগুনতি মানুষে। মানুষের সমুদ্রের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ভূতুড়ে রাক্ষুসে দানবটা—লা ভোরা খনি! একমাত্র তাতেই কোনো প্রাণের স্পন্দন নেই। হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে নামলো একটা ঘেয়ো মাদী বেড়াল। চুল্লী এখনও পুরোপুরি নেভেনি। কালো সুতোর মতো ধোঁয়া বেরোচ্ছে, মিশে যাচ্ছে আকাশের গায়ে। মৃত্যুর গন্ধ গাঢ় হচ্ছে ধীরে ধীরে।

তুটো বাজলো। পরিস্থিতির বিন্দুমাত্র উন্নতি হল না। মঁসিয় এনবোর সঙ্গে নেগ্রেল আর অন্য ইঞ্জিনীয়াররা জামাকাপড় পড়ে তৈরী হল। কিন্তু জীড় ঠেলে

এগোনোই দুষ্কর। শরীরে আর যেন কোনো শক্তিই অবশিষ্ট নেই। মানসিক অবসাদে বিপর্যস্ত লাগছে। মাঝে মাঝে ফিসফিস করে দু-চারটে কথা বলছে সকলে। যেন অনেক মানুষ জড়ো হয়েছে অন্তিম শোকযাত্রায়। এতক্ষণে নির্ঘাত লাইনিং-এর ওপর দিকটাও ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে কারণ এইখান থেকে ধস নামার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে খানিকক্ষণ পর পর। এখন মাটির ওপরেও বিরাট ফাটল দেখা দিয়েছে। নেগ্রেল ছটফট করছে চূড়ান্ত আতঙ্ক আর অসহায়তায়। একবার তো কাছে গিয়ে দেখা উচিত। কিন্তু সবাই তার জামা ধরে টেনে রেখেছে। কি লাভ অযথা বিপদের ঝুঁকি নিয়ে? সে একলা কিই বা করতে পারে? শেষ পর্যন্ত একজন প্রৌঢ় মজুর ভীড় ঠেলে ছুটলো লকার-রুমের দিকে। কিন্তু খানিক পরে দেখা গেল সে নিজের কাঠের তালিমারা জুতোজোড়া আনতে গিয়েছিল।

তিনটে বাজলো। অবস্থা আগের মতোই। ভীড়ের মধ্যে থেকে কেউ এক পাও নড়েনি। এখন বেশ বৃষ্টি পড়ছে। রকিয়ার-এর কুকুরটা বিশ্রীভাবে চেঁচাচ্ছে। ঠিক তিনটে কুড়ি মিনিটে থরথর করে মাটি কেঁপে উঠল। ল্য ভোর্য দুলে উঠল কিন্তু খানিক পরই আবার সব শান্ত, নিস্তব্ধ। একটু পরে সবাই চেঁচিয়ে উঠল। বড় শেডটা ভেঙে পড়েছে। লোহায় লোহায় জোরে ঘষা লেগে দু চার জায়গায় আগুনের ফুলকিও দেখা গেল। তারপর ক্রমাগত ভূমিকম্প হতে লাগল যেন আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটেছে। দূরে এখন আর কুকুরটা ডাকছে না, বোধহয় ভয়ে চুপ করে গেছে। একটু পরে একবার কেঁউ কেঁউ করে উঠল, যেন বিপদের গুরুত্বটা বুঝতে পেরেছে। মেয়েরা আর বাচ্চারা কাঁদছে চিৎকার করে। দশ মিনিটের মধ্যে স্তম্ভের ওপরকার শ্লেট পাথরের ছাদটা ভেঙে পড়ল। দেওয়ালে বড় বড় গর্ত হয়ে গেছে। ওপরের সিঁড়িটা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। খানিকক্ষণ পরে সব শব্দ থামলো।

প্রায় ঘণ্টাখানেক এই রকম অস্বস্তিকর নীরবতা, যেন একদল তাতার দস্যু অবাধ লুঠতরাজ চালিয়ে ফিরে গেছে। সবাই চুপ করে অবস্থাটা খতিয়ে দেখছে। এদিকে ওদিকে শুধু ধ্বংসস্তূপ। হুড়মুড় করে ইঁট ভেঙে পড়ছে। লোহার কড়িবরগাও বাদ যায়নি। একটা বৈদ্যুতিক তার বিপজ্জনক ভাবে ছিঁড়ে গেছে। হেড গীয়ার ভেঙে একেবারে চুরমার। ভাঙা মই, ঝুড়ি, খাঁচা—সব মিলিয়ে অবর্ণনীয় অবস্থা। এখনও অবশ্য বাতি রাখবার ঘরটা দাঁড়িয়ে আছে কোনোরকমে। সেখানে এখনও সারি সারি বাতি জ্বলছে টিমটিম করে। ইঞ্জিনটাও এখনো ভাঙেনি।

ঘণ্টাখানেক ধরে সব শান্ত রয়েছে দেখে মঁসিয় এনবো একটু আশা ফিরে পেলেন। তার মানে নিশ্চয়ই ভূমিকম্প থেমে গেছে। ভূগর্ভস্থ স্তরগুলোর মধ্যে স্থিতাবস্থা আবার ফিরে এসেছে এতক্ষণে। ইঞ্জিন, অফিসের বাকি বাড়িগুলো আর কোনো কোনো যন্ত্রপাতি বেঁচে গেলেও যেতে পারে। কিন্তু তাহলেও কাউকে খনির ধারে-কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছিলেন না তিনি। আরও অন্তত আধঘণ্টা দেখা দরকার। উত্তেজনা এখন তুঙ্গে। নতুন আশার আলো এবং আশঙ্কা ঘনীভূত হচ্ছে একই সঙ্গে।

একই সঙ্গে ওঠানামা করছে সকলের বুক। মেঘ জমেছে আকাশে। বিকেলের আলো মরে এসেছে। ঠিক সাত ঘণ্টা হল এই অসহনীয় অবস্থা চলছে।

সবে যখন ভরসা করে ইঞ্জিনীয়াররা এগোবে, তখনই বিরাট এক ধাক্কায় সবাই ছিটকে পড়ল। প্রচণ্ড শব্দে ভূগর্ভে বিস্ফোরণ ঘটেছে। মাটি কেঁপে উঠেছে সজোরে—যে শেড আর ঘরগুলো এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, সব ক'টা মাটির সঙ্গে মিশে গেল। সেই সঙ্গে বইছে অদ্ভুত ঝোড়ো দামাল হাওয়া। উড়িয়ে নিয়ে গেল চালাঘর আর অন্য কিছু ধ্বংসাবশেষ। বয়লারের ঘরটা ফেটে গেল, তারপর আর সেটাকে দেখাই গেল না। চৌকোনা স্তম্ভটা পাম্পসুদ্ধ একটা কাটা গাছের মতো উপড়ে পড়ল মাটিতে—এর পরই সবাই ভয়ে সাদা হয়ে গিয়ে দেখল মাটি থেকে ছিটকে লাফিয়ে উঠেছে ইঞ্জিনটা, তার অংশগুলো টুকরো টুকরো হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। অনেকখানি হাঁ হয়ে গেল মাটি—ভাঙা ইঞ্জিনের বাকি অংশটা বসে গেল মাটির অনেক—অনেক নীচে। শুধু এখন দাঁড়িয়ে আছে তেত্রিশ মিটার উঁচু চিমনিটা—ঝড়ে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া জাহাজের মাস্তুলের মতো। সবাই ভেবেছিল এটাও ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে মাটির সঙ্গে কিন্তু তা হল না। হঠাৎই পুরো মাটিটা ফেটে চিমনিটা ভেতরে ঢুকে গেল। ঠিক যেন একটা মোমবাতি গলে শেষ হয়ে গেল। কিছু বাকি রইল না আর, এমন কি চিমনির ওপরের প্রান্তটুকুও নয়।··· সব শেষ হয়ে গেছে। রাক্ষুসে জন্তুটা খিদে মিটিয়েছে এতগুলো তাজা প্রাণ দিয়ে। জড় পদার্থও বাদ যায়নি তার ভয়াল কবল থেকে। ল্য ভোর‍্য মিশে গেল মাটির সঙ্গে—এতগুলো মানুষের চোখের সামনে!

মানুষগুলো তাড়া-খাওয়া জন্তুর মতো দৌড়চ্ছে। চোখে হাত চাপা দিয়ে ছুটছে মেয়েরা। ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মতো উড়ে যাচ্ছে মজুররা দলে দলে, চেষ্টা করছে না চেঁচাতে কিন্তু গলা দিয়ে বেরিয়ে আসা আর্তনাদ তো রুখতে পারা যাচ্ছে না। ল্য ভোর‍্য এখন একটা বিরাট শূন্য গহ্বর—হাঁ করে আছে। পুরো এলাকাটা চলে গেছে মাটির নীচে। যাবতীয় অফিসবাড়ি, বড় চালাঘরটা, টেবিল, চেয়ার, রেলিং, সার সার টব, তিনটে ট্রাক, সব—সবকিছু গ্রাস করেছে রাক্ষুসে খাদটা। শুধু কিছু ভাঙা ইঁট কাঠ ছড়িয়ে আছে এদিক সেদিক। সেগুলোও পুড়ে কালো হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে আরও যেন বড় হচ্ছে ফাটল—ছড়িয়ে পড়ছে তা দূরে, ধীরে ধীরে। খনির মধ্যে ধস নামায় ভূগর্ভে স্তরচ্যুতির জন্য যে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প এত কিছু ওলটপালট করে দিল, তার আঘাতে দূরে হ্রাসঙ্গরের দোকানের দেওয়ালেও চিড় ধরেছে। এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির হাত থেকে কোথায় পালিয়ে বাঁচবে সকলে?

কিন্তু সর্বনাশের আরও কিছু বাকি ছিল। হঠাৎ নেগ্রেল অব্যক্ত ব্যথায় ককিয়ে উঠল আর মঁসিয় এনবো হাতে মুখ ঢেকে হু হু করে কেঁদে উঠলেন। ভগবান আর কত শাস্তি দেবেন! খালের পার ভেঙে হু হু করে জল এসে ঢুকছে একটা ফাটল দিয়ে, খনির মধ্যে। তার অর্থই হল জলে সব গ্যালারী ভেসে যাবে। দীর্ঘ সময়—হয়তো কয়েক বছর ধরে জলে ডুবে থাকবে সব খাদ। কয়লা তোলার কাজ বন্ধ থাকবে বছরের পর বছর। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল ল্য ভোর‍্যর জায়গায়

থিকথিকে জল কাদা জমা একটা সুবিশাল হ্রদ—যার বহু নীচে চাপা পড়ে আছে কিছু বিপর্যস্ত ভাগ্যহীন মানুষ! অসহ নীরবতার মাঝখানে শুধু শোনা যাচ্ছে হু হু গর্জন করে স্রোতের মতো জল ঢুকে যাচ্ছে খনির রাক্ষুসে গহ্বরে।

ঠিক সেই মুহূর্তে উঠে দাঁড়ালো সুভারিন। দেখল খানিক দূরে অসহায় কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে জাশারী আর তার মায়ের শরীর। হাতের শেষ সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে একবারও পেছনে না তাকিয়ে সোজা ছুটতে লাগল সুভারিন। আস্তে আস্তে তার ছায়া মিলিয়ে গেল দূরে, অন্ধকারে।

সুভারিন চলে গেল অন্য কোনো দেশে যেখানে প্রয়োজন হলে এইভাবে সে ধ্বংস করবে সমাজ, শিল্প, নগর, গ্রাম। তাতে কিছু নিরীহ মানুষও মারা যাবে বইকি! কিন্তু যেদিন বুর্জোয়া সমাজ শেষবারের মতো পৃথিবীর বাতাস বুকে টেনে নেবে, সেদিন তারা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কান পাতলে শুনতে পাবে দূরে সুভারিনের সফল, দৃপ্ত পদক্ষেপের ছন্দ!

* * * *

লা ভোরাতে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার দিন রাত্রেই মঁসিয় এনবো প্যারিস চলে গেলেন। উদ্দেশ্য: মালিকপক্ষকে অবস্থার বিশদ বিবরণ দেওয়া। খবরের কাগজ-ওয়ালাদের তো বিশ্বাস নেই! পরদিন যখন ফিরে এলেন, তখন তিনি বেশ শান্ত। কে বলবে এত বড় ঝড়-ঝাপটা বয়ে গেছে তাঁর ওপর দিয়ে—দিব্যি আবার আগের মতোই শক্ত হাতে রাশ টেনে ধরলেন। অর্থাৎ স্পষ্টই বোঝা গেল এই দুর্ঘটনার ব্যাপারে সব রকম ব্যক্তিগত দায়িত্ব অস্বীকার করছেন তিনি। কর্তাদের বিরাগভাজন হননি। চব্বিশ ঘণ্টা পরে তো তাঁর পদোন্নতির আদেশপত্র পর্যন্ত চলে এল।

মঁসিয় এনবোর ম্যানেজারের পদটি যথেষ্ট নিরাপদ হলেও কোম্পানি এখন ধুঁকছে। শুধু কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষতিই নয়। এমন সব বিপর্যয় ঘটেছে যা সামলে ওঠাই দুষ্কর। মাঝে মাঝে এমনও মনে হচ্ছে, খনি এইভাবেই অনির্দিষ্টকাল বন্ধ রাখা দরকার। কি লাভ এই ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করে? কে বলতে পারে হয়তো যার ক্রূরতায় এই নিষ্ঠুর ঘটনা ঘটে গেল, সে ধরা পড়লে অন্যরা তাকে দেখে মনে মনে উৎসাহ পাবে না? এমনিতেই তো মজুররা ফুঁসছে, তার ওপর অপরাধপ্রবণতা বেড়েও যেতে পারে। কাজেই তদন্তের ব্যাপারটা ধামাচাপা দেওয়াই ভালো। আসলে কে যে প্রকৃত অপরাধী সেটা ঠিক আঁচ করতে পারা যাচ্ছে না। তবে অনুমান করা হচ্ছে বেশ বড় দলের কাজ—কারণ একজন মাত্র মানুষ এত নিখুঁতভাবে পরিকল্পনামাফিক কাজ করতে পারে কি? কোম্পানির মাথায় এখন বিপদের খাঁড়া ঝুলছে, যে কোনো মুহূর্তে আরও অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে। ম্যানেজারকে গোপনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে একে একে মজুরদের দলের মাথাদের ছাঁটাই করতে হবে। তবে খুব সাবধানে যাতে মূর্খ মজুররা সেটা বুঝতে না পারে। এই ভাবেই ওদের রাজনৈতিক চেতনাকে পায়ের তলায় পিষে মেরে ফেলা দরকার।

আপাতত একজনই ছাঁটাই হল। দঁসের। পিয়েরোঁর বউয়ের সঙ্গে তার

কেলেঙ্কারীর কথা ম্যানেজারের কানে এসেছিল আগেই। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা বলা যায় না। সুতরাং জানানো হল কাজে গাফিলতি এবং বিপদের সময় সহকর্মীদের ফেলে নিজের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টার জন্য তাকে বরখাস্ত করা হল। অবশ্য করে ভালোই হল কারণ মজুররাও তাকে সহ্য করতে পারছিল না।

কিন্তু জনমানসে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার প্রতিক্রিয়া হল সাংঘাতিক। একটা কাগজে লিখল যে মজুররাই নাকি বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে এই বিপর্যয় ঘটিয়েছে। কোম্পানির কর্মকর্তারা এর প্রতিবাদ করে কাগজে চিঠি লিখলেন। সরকারী ইঞ্জিনীয়ার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌছলেন যে লাইনিং ধসে গেছে কোম্পানিরই গাফিলতিতে—অনেক আগেই সবকিছু পরীক্ষা করে উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন ছিল। তিনদিন পরে তো এমন অবস্থা হল যে খবরের কাগজের একটাই গরম মুখরোচক খবর : 'খনিতে বহু হতভাগ্য শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছে।' প্যারিসের ঘরে ঘরে চায়ের টেবিল সরগরম হয়ে উঠল বিভিন্ন মত আর সমালোচনায়। মঁসুতে অভিজাত সম্প্রদায় ন্য ভোর্য্যর নামোল্লেখেই বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছেন। দিনে দিনে অবিশ্বাস্য সব কাহিনী দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। পুরো অঞ্চলটাই খনি-দুর্ঘটনার শিকার—ওই মজুরদের পক্ষে। দলে দলে লোক এসে খনি দেখে যাচ্ছে, আহা বেচারা শ্রমিকদের কি দুরবস্থা!

মঁসিয় ড্যন্সলাঁকে বিভাগীয় ইঞ্জিনীয়ারের পদ আগেই দেওয়া হয়েছিল। তিনি এবার পুরোদমে ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান করতে শুরু করলেন। তাছাড়া সবকিছু ভালো-ভাবে পরীক্ষা করাও দরকার। প্রথমেই বাঁধ দিয়ে খালের জলস্রোত রোধের ব্যবস্থা করা হল। কারণ প্রতি মুহূর্তে জল এইভাবে বাড়তে থাকলে কাজের প্রচণ্ড অসুবিধে হবে। একশোজন লোককে তিনি এ কাজে লাগালেন। দু-দুবার জলের তোড়ে বাঁধ ভেঙে গেল। এবার পাম্প বসানো হল জল নিষ্কাশনের কাজে। প্রতি ইঞ্চি জমি ফিরে পাবার চেষ্টায় নিরন্তর যুদ্ধ শুরু হল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের।

কিন্তু খনিতে ওই আটকাপড়া মানুষগুলোকে উদ্ধার করা যায় কেমন করে? পাগলের মতো চেষ্টা করতে লাগল নেগ্রেল। মজুররা দলে দলে এগিয়ে এল তাকে সাহায্য করার জন্য। ধর্মঘটের চিন্তা এখন দূরে থাক, বিনে পয়সায় কাজ করতেও আপত্তি নেই কারও। দরকার হলে সহকর্মীদের বাঁচাতে তারা নিজের প্রাণ দেবে। সবাই নিজের নিজের যন্ত্রপাতি এনে হাজির করল। বলা তো যায় না কোনটা কখন কাজে লাগে! অনেকে সেই দিনটার দুঃস্বপ্ন আজও দেখে। আতঙ্কে তাদের চোখ মুখ সাদা হয়ে যায়। কিন্তু তারাও আজ মাটির সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে সামনাসামনি লড়াইয়ে নেমেছে। মুশকিলটা হল যে কোথা থেকে কাজ আরম্ভ করলে সুবিধে হবে সেটাই বোঝা যাচ্ছে না। কি করে নীচে নামতে পারা যাবে?

নেগ্রেলের মতে পনেরোজন মজুরের একজনও বেঁচে নেই। হয় জলে ডুবে নয় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে সকলেই মারা গেছে। কিন্তু এই সব খনি দুর্ঘটনায় এই কথা ভেবেই উদ্ধারকার্য চালানোর নিয়ম যে সকলেই বেঁচে আছে। সুতরাং নেগ্রেল যথা-

খাটাতে আরম্ভ করল কোন রাস্তা দিয়ে কাজ শুরু করা যায়, সেই বিষয়ে প্রবীণ বিচক্ষণ ডেপুটিদের সঙ্গে পরামর্শ করল। একটা বিষয়ে সকলেই একমত—ওই পনেরোজন যদি বা বেঁচেও থাকে, জলস্ফীতির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তারা নিশ্চয়ই কয়লার স্তর বেয়ে বেয়ে ওপরে উঠেছে এবং এখন সর্বোচ্চ স্তরেই আছে। সুতরাং একেবারে ওপরের অংশের কোথাও না কোথাও তারা বন্দী। এ কথা সমর্থন করল বুড়ো মুক্যুও। তবে তার মতে প্রাণের আশঙ্কায় সবাই যেরকম পাগলের মতো ছোটাছুটি করছিল তাতে নিশ্চয়ই তারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গেছে। অর্থাৎ সবাইকে আলাদা আলাদা করে খুঁজে বের করতে হবে, যে কাজটা নিঃসন্দেহে অনেক বেশী কষ্টকর। ডেপুটিদের নিজেদের মধ্যেই মতবিরোধের সৃষ্টি হল। সবচেয়ে উঁচু অংশটাই একশো পঞ্চাশ মিটার নীচে। শ্যাফ্‌টটাও বসে গেছে। সুতরাং রকিয়ার দিয়ে যেতে হবে। ওটাই একমাত্র সম্ভাব্য রাস্তা। আর বিপদটা হল যে সেটাও এতদিন ব্যবহার করা হয়নি, উপরন্তু জলে ভাসছে। সুতরাং ল্য ভোরার সঙ্গে রকিয়ার-এর যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন বলা যেতে পারে। জল সরিয়ে কাজ আরম্ভ করতে বেশ কয়েক দিন লেগে যাবে। আপাতত তাই জলের ওপর দিককার গ্যালারীগুলো পরীক্ষা করে যেতে হবে প্রথমে—এইভাবে যদি সম্ভাব্য উঁচু গ্যালারীটা খুঁজে বের করা যায়। কিন্তু এতেও বাস্তব অবাস্তব সব পরিকল্পনার ছক দিতে লাগল সকলে।

খাদ তুটোর পুরনো নক্‌শাগুলো বের করে ভালোভাবে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল নেগ্রেল। এতদিন পর্যন্ত সে মানুষের জীবন নিয়ে এতটা মাথা ঘামাতো না। কিন্তু আজ দেখছে এতগুলো লোক তারই মুখ চেয়ে বসে আছে। ধীরে ধীরে মানসিক পরিবর্তন ঘটতে লাগল তার। অসহায় মজুরদের উদ্ধার করবার জন্য মরীয়া হয়ে উঠল। রকিয়ার-ই ভালো।

প্রথমে এত দিনের বাতিল শ্যাফ্‌টটা পরিষ্কার করা হল। তারপর জমা ছাইয়ের পাহাড়সমান স্তূপ কেটে কেটে সরানো হল। গাছ কেটে রাস্তা সাফ করা হল। সারানো হল মইগুলো। শুরু হল উদ্ধারের কাজ। নেগ্রেল দশজন মজুরকে বাছাই করে যন্ত্রপাতিসমেত নীচে নিয়ে গেল। তারপর দেওয়াল পরীক্ষা করে যন্ত্র দিয়ে ঠুকতে লাগল সেটা। খানিকক্ষণ চুপচাপ। কান পেতে রয়েছে সবাই, দূরে কোথাও কেউ অনুরূপভাবে দেওয়ালে শব্দ করে কোনো সাড়া দেয় কিনা শোনবার জন্য। প্রায় প্রতিটি গ্যালারী এইভাবে পরীক্ষা করা হল কিন্তু ফল হল না কিছুই। কোনো সাড়াই পাওয়া গেল না। কোথায় স্তর কেটে কাজ শুরু করবে তারা? কার জন্যই বা করবে? কোনো জীবিত মানুষের অস্তিত্বই তো টের পাওয়া যাচ্ছে না! কিন্তু তবুও হাল ছাড়লো না কেউ। পাগলের মতো কাজ চালিয়ে যেতে লাগল, অপরিসীম ক্লান্তি আর উদ্বেগে।

প্রথম দিন থেকেই মায়্য-গিন্নী রোজ সকালে রকিয়ার-এ চলে আসে। তারপর শ্যাফ্‌টের কাছে একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা একভাবে বসে থাকে রাত

না নামা পর্যন্ত। মাঝে মাঝে কেউ খাদ থেকে বেরোলে সে লাফিয়ে ওঠে। উৎসুক চোখে তার জিজ্ঞাসার জবাব খোঁজে। কিছু খবর পাওয়া গেল? নাঃ, কিচ্ছু না! তারপর আবার ভাবলেশহীন মুখে শুরু হয় তার নিরলস প্রতীক্ষা। যেদিন থেকে উদ্ধারের কাজ শুরু হয়েছে, জ'ল্যা ঘুরঘুর করছে এদিকে। আসলে তার মাথায় আছে সেই সেপাই 'জুল'-এর চিন্তা। বলা তো যায় না! হয়তো এত দিন বাদে জ'ল্যা ধরা পড়ে গেল। কিন্তু সেই দিকটা এখনও জলে ডোবা। তাছাড়াও কাজ চলছে অনেক বাঁ দিক ঘেঁষে। প্রথম প্রথম ফিলোমিনও আসত। জাশারী ছিল ওই দশজনের দলে। কিন্তু ঠাণ্ডা লেগে এত সর্দি বসে গেল ফিলোমিনের, যে ঘর থেকে না বেরোনোই ভালো বলে মনে হল তার। সারাটা দিন শুয়ে বসে কাটিয়ে দেয়। কাঁহাতক আর মাথা ঘামানো যায়! সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাশতে কাশতে বুক পিঠ ব্যথা হয়ে যায়। জাশারী কিন্তু উন্মাদের মতো পরিশ্রম করে চলেছে। ছোট বোনকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় খুঁজে বের করতেই হবে। তার জন্য দরকার হলে লা ভোরায়র প্রতিটি ধূলিকণা ওলটপালট করে দেবে সে। প্রতি রাতেই ক্যাথরিনকে স্বপ্ন দেখে জাশারী, ঐ তো সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে, কাঁদছে…। ধড়মড় করে উঠে বসে জাশারী। বাকি রাতটুকুতে ঘুম আসে না আর। দু'বার তো নেগ্রেলের আদেশ অমান্য করে অন্য জায়গাতেও সে খুঁড়তে শুরু করেছিল। খালি বলছিল তার মনে হচ্ছে বোন ওখানেই আছে। বিপদ বুঝে নেগ্রেল তার নীচে নামা বন্ধ করে দিল। কিন্তু জাশারী এত কষ্ট পাচ্ছে যে স্থির হয়ে বসতে পর্যন্ত পারে না। মায়ের মতো অন্তহীন অপেক্ষা করতেও নারাজ। তার কাছে নিষিদ্ধ, শ্যাফ্‌টের ওই রাস্তাটার চারদিকে মন তার মাথা খুঁড়ে মরছে শুধু।

এই ভাবে তিনটে দিন কেটে গেল। দুপুরে খেতে গিয়ে নেগ্রেল ঠিক করল, অনেক হয়েছে—এবার এই কাজ বন্ধ করা দরকার কারণ লাভ হচ্ছে না কিছু। আজকে একবার শুধু শেষবারের মতো চেষ্টা করে দেখবে, ব্যস। রকিয়ার-এ ফেরবার সময় তার চোখে পড়ল শ্যাফ্‌ট থেকে হন্তদন্ত হয়ে উঠে আসছে জাশারী—সমস্ত মুখ চোখ উত্তেজনায় লাল।

চেঁচাতে লাগল জাশারী।—ক্যাথরিন নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। ও জবাব দিয়েছে দেওয়াল ঠুকে। চলে এস ভাইসব!

নেগ্রেলের অনুপস্থিতিতে পাহারাদারের চোখে ধুলো দিয়ে মই বেয়ে আজ আবার নীচে নেমেছিল জাশারী। সে হলফ করে বলতে পারে গীলুমের প্রথম স্তরে কেউ টোকা দিয়ে সাড়া দিয়েছে।

নেগ্রেল অবাক হয়ে বলল, কিন্তু তুমি যে জায়গাটার কথা বলছ, সেখানে ইতি-মধ্যেই আমরা দু'বার পরীক্ষা করে দেখেছি। তবু আমরা আবার চেষ্টা করব।

মায্যু-গিন্নী উঠে দাঁড়ালো। হ্যাঁ, সেও নীচে নামতে চায়। অতি কষ্টে তাকে নিরস্ত করল সকলে। ঠিক শ্যাফ্‌টের মুখে দাঁড়িয়ে রইল ক্যাথরিনের মা। তার পায়ের কাছে হাঁ করে রয়েছে শ্যাফ্‌টের মুখটা—ভেতরে নিকষ কালো অন্ধকার।

পরিচিত জায়গাটায় পৌঁছে নেগ্রেল নিজে তিনবার টোকা দিল। কিন্তু কই? কান পাতলেও তো কোনো শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না! হতাশায় মাথা নাড়লো নেগ্রেল। জাশারী নিশ্চয়ই ভুল শুনেছে। জাশারী পাগলের মতো টোকা দিতে শুরু করল। উত্তেজনায় জ্বলছে তার চোখ দুটো। তারপর অন্যরাও পালা করে চেষ্টা করতে লাগল। ঐ তো, খুব অস্পষ্ট একটা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে!

হ্যাঁ, হ্যাঁ। অন্যরা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নেগ্রেলও কান পাতলো। তার অভিজ্ঞ কানে ধরা পড়ল নিঃশ্বাসের চেয়েও মৃদু একটা আওয়াজ। কিন্তু শব্দটা পরিচিত। খনির মজুররা এইভাবেই বিপদের সংকেত পাঠায়। কয়লার স্তরের মধ্যে দিয়ে তা ছড়িয়ে যায় নানা দিকে। একজন ডেপুটি পরীক্ষা করে জানালেন, অন্তত পঞ্চাশ মিটার গভীরতার দূরত্ব রয়েছে দুই দলের মধ্যে। কিন্তু এইবার যেন ইচ্ছে করলেই বন্ধুদের ছুঁতে পারা যাবে, এই কথা ভেবেই দশজন মজুরের মন আশায়, আনন্দে দুলে উঠেছে। নেগ্রেল সঙ্গে সঙ্গে স্তর কাটবার নির্দেশ দিল।

জাশারী ছুটে বাইরে বেরিয়ে এল তার মাকে খবর দিতে। দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরল।

পিয়েরোঁর বউ অবস্থাটা দেখতে এসেছিল। সে নিষ্ঠুর গলায় বলল, আগে থেকেই এত আহ্লাদ কোরো না। ক্যাথরিন যদি শেষ পর্যন্ত ওখানে না থাকে, সে ধাক্কাটা সামলাতে পারবে না তাহলে।

কথাটা অবশ্য রূঢ় হলেও সত্যি। এই সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। হয়তো ক্যাথরিন অন্য কোথাও আছে।

কিন্তু জাশারী রাগে অন্ধ হয়ে গেল।

—তুমি চুপ করবে? ও নিশ্চয়ই ওখানেই আছে। আমার মনে হচ্ছে সংকেতটা ক্যাথরিনই পাঠিয়েছে।

তার মায়ের মুখ আবার নির্বিকার।

এই খবরটা ছড়িয়ে পড়া মাত্রই দলে দলে লোক আসতে শুরু করল এত ভীড় হয়ে গেল যে সামলানোই দায়।

মাটির নীচে দিনরাত কাজ চলছে। যদি কোনো একটা রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, সেই ভয়ে নেগ্রেল স্তর কেটে একই সঙ্গে তিনটে সুড়ঙ্গ কাটবার নির্দেশ দিল। প্রতিটি সুড়ঙ্গ-পথের লক্ষ্য একই দিকে—যেখান থেকে শব্দটা উঠে আসছিল। একজন মাত্র ঢুকতে পারে এরকম পরিসরের সুড়ঙ্গ কাটা হচ্ছে—কিন্তু তাতেও অমানুষিক পরিশ্রম। প্রতি দু ঘণ্টা অন্তর মজুর বদল করা হচ্ছে। কাটা কয়লায় ঝুড়ি ভরে পেছনের মজুরের হাতে চালান করা হচ্ছে। গোড়ার দিকে কাজের গতি খুব কম নয়। প্রথম দিনে ছ মিটার গভীর সুড়ঙ্গ কাটা হল।

যে ক'জন মুষ্টিমেয় মজুরকে সুড়ঙ্গ কাটবার জন্য মনোনীত করা হয়, তাদের মধ্যে জাশারীও ছিল। এত বড় একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্য নির্বাচিত হওয়া মজুরদের কাছে বিরাট সম্মানের ব্যাপার। দু ঘণ্টা পর যখন জাশরীকে বিশ্রাম নিতে বল

হল, ঘোরতর আপত্তি জানালো সে। নিজের শাবল আর গাঁইতি আঁকড়ে ধরে রইল। না, সে নিজের জায়গায় বদলী কাউকে আসতে দেবে না। একটু পরেই দেখা গেল তার কাটা সুড়ঙ্গটা অন্যগুলোর তুলনায় বেশী গভীর হয়েছে। এত জোরে সে কয়লার স্তরে আঘাত হানছে যে খাদের মুখ থেকে সেই শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। খ্যাপা ষাঁড়ের মতো মরীয়া হয়ে উঠেছে জাশারী। হাঁফাতে হাঁফাতে বাইরে বেরিয়ে আসছে মাঝে মাঝে। কাদায় সমস্ত শরীর একেবারে মাখামাখি। দু পায়ের ওপর স্থির হয়ে দাঁড়াতেও পারছে না। কাঁপতে কাঁপতে কখনও বা শুয়ে পড়ছে মাটিতে। আশেপাশের লোকেরা তার গা ঢেকে দিচ্ছে কম্বলে। আবার একটু সুস্থবোধ করলেই কোনো কথা না শুনে টালমাটাল পায়ে ছুটে চলে যাচ্ছে ভেতরে। কয়লার স্তর কঠিন হচ্ছে ক্রমশ। তাছাড়া গরমও খুব। প্রতি মিটার গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে বাতাস কমে আসছে। যদিও একটা যন্ত্রকে হাতে চালিয়ে ভেতরে বাতাস চলা-চলের ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু তাতে সবটুকু প্রয়োজন মেটে না। তিন তিনবার তো কয়েকজন মজুরকে অজ্ঞান অবস্থায় বাইরে নিয়ে আসতে হল।

সকলের সঙ্গে খাদে নেমেছে নেগ্রেল। তার খাবার নীচে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা হল। কোটের ভাঁজে খড় মুড়ে সেটাকে বালিশের মতো পাকিয়ে মাথায় দিয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে নিচ্ছে। অসহায় বন্দী মজুরদের সাহায্যের আবেদন ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ধরা দিচ্ছে। এতে অন্য মজুররা নতুন করে উৎসাহিত হয়ে উঠল। এখন তো সাঙ্কেতিক আবেদন দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার। প্রতিবার মজুর বদল হওয়ার ফাঁকে নেগ্রেল গিয়ে দেওয়ালে টোকা মারছে। হ্যাঁ, ওই তো শব্দ শোনা যাচ্ছে! তার মানে ঠিক পথেই যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু ভগবান! কাজ এত ঢিমে-তালে এগোচ্ছে! এ ভাবে দুর্ভেদ্য কঠিন স্তর কেটে এগোনো কি দুঃসাধ্য ব্যাপার! হয়তো এত করেও শেষ পর্যন্ত ঠিক সময়ে পৌঁছুতে পারা যাবে না। বাইরে থেকে তো মনে হয় দু দিনে মোট তেরো মিটার গভীর সুড়ঙ্গ কাটা হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় দিনে কাটার হার কমে গিয়ে দাঁড়ালো মাত্র পাঁচ মিটারে। চতুর্থ দিনে আরও কমে মাত্র তিন। কয়লার স্তর এত পুরু আর কঠিন যে পঞ্চম দিন থেকে দু মিটারের বেশী এগোনোই যাচ্ছে না। ন'দিনের দিন দেখা গেল এত চেষ্টা করেও মোট মাত্র বত্রিশ মিটার গভীরতা ভেদ করা গেছে—আরও অন্তত কুড়ি মিটার কাটতে হবে। এদিকে ভেতরে মজুররা বন্দী হয়ে আছে ঠিক বারো দিন হয়ে গেল—অর্থাৎ দুশো অষ্টাশি ঘণ্টা হিমশীতল অন্ধকারে রয়েছে তারা। জল নেই, খাবার নেই, আগুন নেই। উদ্ধারকারী গোটা দলটার চোখে জল এসে যাচ্ছে বন্দী সহকর্মীদের দুর্দশার কথা ভেবে। 'আরও জোরে, সমস্ত শক্তি দিয়ে গাঁইতি চালাও ভাই সব।' শেষ পর্যন্ত কি ওদের জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা যাবে? বন্দীদশার এগারো দিনের দিন থেকেই তো সংকেতের শব্দ ক্ষীণ হয়ে গেছে। প্রতি মুহূর্তে ভয় হচ্ছে, এই বুঝি বা সংকেত আসা বন্ধ হল! হয়তো সব শেষ হয়ে গেল!

মাহ্যু-গিন্নী কিন্তু রোজ এসে ঠিক একই ভাবে শ্যাফ্‌টের মুখে কাঠের গুঁড়িটায়

ওপর বসে থাকে। তার কোলে এস্তেল, কারণ সারাদিন বাচ্চাটা মাকে ছেড়ে থাকতে পারে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে দুলে ওঠে তার মন! কত লোক সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছে বন্দী মজুরদের মুক্তির জন্য! মঁসুতে এখন আলোচনার আর দ্বিতীয় কোনো বিষয় নেই। বন্দী মানুষগুলোর সঙ্গে একই তালে স্পন্দিত হচ্ছে হাজার হাজার উৎকণ্ঠিত শুভানুধ্যায়ীর হৃদয়।

ন'দিনের দিন এক ভয়াবহ ঘটনা ঘটল। দুপুরে খাবার সময় জাশারীর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। অথচ নেগ্রেলের আদেশমতো তখন মজুরদের পালা বদল হবার কথা। ভূতে-পাওয়া মানুষের মতো বিড়বিড় করে বকতে বকতে গাঁইতি চালাচ্ছে জাশারী। নেগ্রেল একবার এসে ডাকলো। কিন্তু জাশারী তার কথা কানেই তুললো না। খাদে তখন শুধু একজন ডেপুটি আর তিনজন মজুর, জাশারী ছাড়া। বিষাক্ত গ্যাস বেরোচ্ছে। অত সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গ পথে বাতাস চলাচল ব্যাহত হওয়ায় জমা বিষাক্ত গ্যাসের পরিমাণ বেড়েই চলেছে ক্রমশ। সকলকে সতর্ক করে দেওয়াই ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে বোধহয় মাথার ঠিক ছিল না জাশারীর। টিমটিমে আলোতে কাজের অসুবিধে হচ্ছে দেখে রেগে গিয়ে বোকার মতো বাতির মুখটা খুলে ফেললো। এদিকে খাদের প্রতি ইঞ্চিতে বিষাক্ত বাতাস—হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে একটা বিস্ফোরণ! আগুনের হল্‌কা বেরিয়ে এল, যেন গোলাবর্ষণ হচ্ছে কামান থেকে। হু হু করে আগুন ছড়িয়ে পড়ছে গ্যালারীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। বাইরে পাথর আর কাঠের টুকরোর সঙ্গে ছিটকে এসে পড়ল ডেপুটি আর অন্য তিনজন মজুর। দ্রুত পিছু হটে গেল দর্শকরা। লাফিয়ে উঠল মায়্যু-গিন্নী এস্তেলকে বুকে তুলে।

নেগ্রেল আর অন্য মজুররা খাওয়া মিটিয়ে ফিরে এসে দেখল কি বীভৎস কাণ্ড ঘটে গেছে। তারা আক্রোশে, আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে গেল। ছি ছি, এমন করে কাজ পণ্ড করার কোনো মানে হয়! যেখানে ভেতরে এতগুলো মানুষ বন্দী হয়ে আছে, তাদের বের করে আনবার কাজ এতটা এগিয়ে গিয়েছিল, সেখানে ক্ষণিকের ভুলে কত বড় বিপত্তি ঘটে গেল! নিজের জীবন বিপন্ন করে এ ক'দিন কাজ করেছে সকলে। ডেপুটি আর ওই তিনজন মজুর অবশ্য এখনও মারা যায়নি। তবে ভীষণ-ভাবে সমস্ত শরীর পুড়ে গেছে তাদের। গলার মধ্যে দিয়ে ঢুকে গেছে বিষাক্ত বাতাস আর আগুনের হল্‌কা—ঝলসে গেছে ভেতরটাও। আর্তনাদ করছিল তারা। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছিল, কামনা করছিল মৃত্যুর। মজুর তিন-জনের মধ্যে একজন সেই লোক যার উপর্যুপরি আঘাতে গাস্ত-মারির পাম্প গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। সেনাবাহিনীর সঙ্গে মজুরদের সংঘাতের ব্যাপারে বাকি দু'জনেরও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল। এখনও তাদের হাতের আঙুলের ক্ষত সারেনি। সকলকে সাবধানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। উপস্থিত জনতা চোখ বুজলো আতঙ্কে।

মায়্যু-গিন্নী অপেক্ষা করছিল তার ছেলের জন্য।

জাশারীর দেহ ধরাধরি করে বাইরে আনা হয়েছে। সমস্ত জামাকাপড় পুড়ে

আগুন। শরীর কালো ঝামার মতো। ঝলসে গিয়ে এখন আর চেনাই যায় না তাকে। মাথাটা চৌচির হয়ে গেছে। তার দেহাবশেষ একটা খাটিয়ার শুইয়ে বাড়ির দিকে নিয়ে যাওয়া হল। পেছনে মা। চোখে এক ফোঁটা জল নেই ; কিন্তু কেমন জ্বালা করছে। এখনও বুকে চেপে ধরে আছে এস্তেলকে। মন্থর গতিতে হাঁটছে সে। মাথার চুলগুলো উড়ছে বাতাসে।

কলোনীতে পৌঁছল সকলে। প্রথম কয়েক মুহূর্ত ব্যাপারটা বোধগম্যই হল না জাশারীর বউ ফিলোমিনের। তারপর বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ল। মাহ্যু-গিন্নী শ্রান্ত পায়ে আবার ফিরে চলল রকিয়ার-এর দিকে। সে তার ছেলেকে ঘরে পৌঁছে দিয়েছে—এখন অপেক্ষা করবে মেয়ের জন্য।

আরও তিনদিন কেটে গেল। অত্যন্ত অসুবিধের মধ্যেও উদ্ধারের কাজ শুরু হল আবার। ভাগ্যক্রমে এই দুর্ঘটনাতে সুড়ঙ্গগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। কিন্তু এত বিষাক্ত বাতাস যে দম বন্ধ হয়ে যায়। নতুন ঘুলঘুলি বসানো হল যাতে কষ্ট কমে। প্রতি কুড়ি মিনিট অন্তর মজুরদের পালা বদল করবার আদেশ দেওয়া হল কারণ কেউই একটানা এর চেয়ে বেশীক্ষণ থাকতে পারছে না ভেতরে। কাজ প্রায় শেষ হবার মুখে। আস্তে আস্তে পথ ফুরিয়ে আসছে। আর মাত্র দু মিটার দূরত্ব বন্দী মজুরদল আর উদ্ধারকারীদের মধ্যে। কিন্তু এর মধ্যে আর কোনো সঙ্কেত আসেনি। প্রায় পনেরো দিন হতে চলল। হতভাগ্য ওই পনেরোজন বেঁচে আছে কিনা তাই সন্দেহ।

জাশারীদের দুর্ঘটনার পর মঁসুতে নতুন ভাবে আলাপ-আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে। উচ্চ আর মধ্যবিত্ত পরিবার নিয়ম করে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসছেন। গ্রেগোয়াররাও তাই সেখানে একবার যাওয়া অবশ্য কর্তব্য বলে স্থির করলেন। ঠিক হল, তাঁরা একটা গাড়ি নিয়ে সোজা ল্য ভোরোতে চলে যাবেন। সেখানে ল্যুসি আর জান্‌কে নিয়ে মাদাম এনবোও আসবেন অন্য একটা গাড়িতে। মঁসিয় দ্যন্‌লঁ্যা সব ঘুরে দেখাতে পারবেন। তারপর সবাই দল বেঁধে যাবেন রকিয়ার-এর দিকে। সেখানে পথনির্দেশকের ভূমিকা নেবে নেগ্রেল। সব দেখাশুনো হয়ে গেলে একসঙ্গে সকলে রাতের খাওয়া সেরে যে যার বাড়ির পথ ধরবেন।

বেলা তিনটে আন্দাজ গ্রেগোয়াররা ল্য ভোর্যতে এসে দেখলেন তারো আগেই মাদাম এনবো এসে গেছেন। চমৎকার দামী শেওলা সবুজ রংয়ের পোশাক পরা, হাতে খোলা ছাতা যদি রোদ্দুর লেগে গায়ের চামড়া নষ্ট হয়ে যায় সেই ভয়ে। চমৎকার আবহাওয়া। নির্মল আকাশ, না শীত না গরম, ভরা বসন্ত। মঁসিয় এনবোও উপস্থিত আছেন দ্যন্‌লঁ্যার সঙ্গে। গ্রেগোয়াররা এসে পৌঁছলে দ্যন্‌লঁ্যা বোঝাতে শুরু করলেন তাঁরা কিভাবে আবার সবকিছু নতুন ভাবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করছেন। মাদাম এনবো অন্যমনস্কভাবে শুনছেন কিভাবে বাঁধ দেওয়া হবে। জান্‌ এই ফাঁকে ছবি আঁকবার খাতায় আঁচড় কাটতে শুরু করে দিয়েছে—এত চমৎকার ভয়ংকর দৃশ্য আর তো মাথা খুঁড়লেও পরে মিলবে না। ল্যুসি বিস্মিত চোখে

চারপাশের 'উত্তেজনাকর' দৃশ্য দেখছে। বাঁধটা এখনও পুরোপুরি তৈরি হয়নি। জায়গায় জায়গায় ফাটল দিয়ে জল ঢুকছে। কাদা সরে গিয়ে অবলুপ্ত খনি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে ধীরে ধীরে।

মঁসিয় গ্রেগোয়ার হতাশ স্বরে বললেন, কি কাণ্ড! শুধু এই দেখতে এতদূরে এলাম কষ্ট করে?

সেসিল কিন্তু খোলা মাঠ, মুক্ত বাতাস খুব উপভোগ করছিল। মাঝে মাঝে হাসি ঠাট্টাও করছিল। মাদাম এনবো নাক কুঁচকালেন।—দূর, বিশ্রী দৃশ্য যত!

মঁসিয় এনবো আর মঁসিয় গুভলঁ্যা হাসি চাপতে পারলেন না। তাঁরা সকলকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগলেন কি ভাবে কোথায় কাজ চলত। কিন্তু মেয়েরা অধৈর্ষ হয়ে পড়ছে। হয়তো সমস্ত জল সরাতে পাম্পগুলোর ছ-সাত বছর লেগে যেতে পারে। শ্যাফ্‌টও আবার নতুন করে তৈরি করতে হবে—সবই অনেক সময়-সাপেক্ষ। এই কথা শুনে ভয়ে কেঁপে উঠলো সবাই। এর চেয়ে অন্য কোথাও বেড়াতে গেলেই হত। এই সব দৃশ্য দেখলে গা গুলিয়ে ওঠে। কত রাতের ঘুম নষ্ট হবে কে জানে।

গাড়ির দিকে পা বাড়ালেন মাদাম এনবো।

—চলো তো, এবার যাওয়া যাক।

জান্ আর ল্যুসির তাতে আপত্তি। এত তাড়াহুড়ো করবার কি আছে? তারা বাবার সঙ্গে এখানেই থাকতে চায়। সন্ধ্যেবেলা একেবারে খেতে যাবে। সুতরাং মঁসিয় এনবো স্ত্রীর সঙ্গে গাড়িতে উঠলেন। তাঁরও নেগ্রেলের সঙ্গে দরকার আছে।

মঁসিয় গ্রেগোয়ার বললেন, আপনারা রওনা হয়ে যান। আমরা পিছু পিছু আসছি। পাঁচ মিনিটের জন্য একটু কলোনীতে যাব। ঠিক সময়মতো রকিয়ার-এ হাজির হব দেখবেন। অযথা চিন্তা করবেন না।

স্ত্রী আর মেয়ের পেছন পেছন গাড়িতে উঠলেন তিনি। আসলে জাশারী মারা যাবার কথা শুনে খুবই ব্যথিত হয়েছেন। মায়্যু-পরিবারের জন্য কিছু করা দরকার। অবশ্য জাশারীর বাবার জন্য কোনো সমবেদনা নেই। লোকটা ছিল হাড়বদমাস। খনিতে গণ্ডগোল পাকিয়েছে। কিন্তু মায়্যুর বউ বেচারী তো কোনো দোষ করেনি, আহা রে! পর পর স্বামী আর ছেলের মৃত্যু, বেচারী না জানি কত কষ্ট পাচ্ছে। তার ওপর মেয়েটাও বন্দী হয়ে আছে খাদে। তাকে এখন জীবিত অবস্থায় ফিরে পেলে হয়! এর ওপর বুড়ো শ্বশুর, খোঁড়া ছেলে—আর একটা মেয়েও নাকি ধর্মঘটের সময় না খেতে পেয়ে মারা গেছে। ধর্মঘটের সময় এই পরিবারটি বহু মজুরকে মদত দিয়েছে, তবুও বিপদের দিনে সব ভুলে মানুষের পাশে দাঁড়ানো দরকার! গ্রেগোয়াররা এত উদারচেতা, ক্ষমাশীল! তাঁরা নিজেরাই সাহায্য করতে এগিয়ে যাবেন। দুটো বড় বড় জিনিসভর্তি বাণ্ডিল তাঁদের গাড়িতে রাখা আছে।

একটা বুড়ি মায়্যুদের বাড়িটা দেখিয়ে দিল। ষোলো নম্বর বাড়ি। গাড়ি থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিতে শুরু করলেন ওঁরা। কিন্তু

কেউ দরজা খুলল না। বন্ধ দরজায় করাঘাতের শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল। মৃত্যুর করাল গ্রাস পরিবারের জীবিত সদস্যদেরও কি তবে মৃতের সামিল করে তুললো?

সেসিল হতাশ হয়ে বলল, কেউ নেই বোধহয়। আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল তো! এখন জিনিসপত্র নিয়ে কি করি।

হঠাৎ পাশের বাড়ির দরজা খুলে উঁকি মারলো লেভাক-গিন্নী।

—ওঃ আপনারা! আমায় ক্ষমা করবেন। অনেক আগেই আমার আসা উচিত ছিল। এ বাড়িতে তো কেউ নেই এখন। জাশারীর মা রকিয়ার-এ বসে আছে মেয়ের জন্য।

হড়বড় করে একগাদা কথা বলে গেল লেভাকের বউ।

—বিপদের দিনে প্রতিবেশীর জন্য কিছু তো করতেই হবে। লেনোর আর অঁরিকে আমিই দেখাশুনো করছি।

তার চোখ পড়ল বড় বড় মোড়ক দুটোর ওপর। সঙ্গে সঙ্গে নিজের বিধবা মেয়ে ফিলোমিনের দুর্দশার কাহিনী বলতে শুরু করল। তার চোখ দুটো লোভে চকচক করছে। তারপর শান্ত গলায় বলল, অবশ্য আমার কাছে চাবি আছে। ভেতরে বুড়ো ঠাকুর্দা ছাড়া কেউ নেই। আপনারা ইচ্ছে করলে আসতে পারেন।

গ্রেগোয়াররা অবাক হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন। মেয়েছেলেটা বলে কি! ভেতরে বুড়ো আছে, অথচ এত ধাক্কাধাক্কিতেও দরজা খুলল না। ব্যাটা কালা নাকি? হয়তো নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু লেভাকের বউ দরজা খুলে দেবার পর আর কথা বলতে পারল না কেউ।

ঘরে একা বুড়ো বোনমর বসে আছে নড়বড়ে পায়াওয়ালা চেয়ারের ওপর। বড় বড় নিষ্প্রাণ চোখে তাকিয়ে আছে দেওয়ালের দিকে। ঘরে কোনো আসবাব নেই। তাই শূন্যতা বড় বেশী চোখে লাগে। দেওয়ালে শুধু রাজারাণীর হাসিমাখা মুখের ছবি। একবারের জন্যও যেন পলক পড়ছে না বুড়োর চোখে। এমন কি, এই যে ঘরের দরজা খুলে যেতে এক ঝলক আলো এল, তাতেও না। যেন কেউ ঘরেই ঢোকেনি। পায়ের কাছে নোংরা একটা ছাইদান।

লেভাক-গিন্নী ফিসফিস করে বলল, যদি কোনো কারণে উত্তেজিত হয়ে বুড়ো মানুষটা খারাপ ব্যবহার করে, তাহলে আপনারা দয়া করে কিছু মনে করবেন না। মনে হয় মাথার কোনো গোলমাল হয়েছে। গত পনেরো দিন যাবৎ একই ভাবে বসে আছে।

হঠাৎ কেশে উঠল বুড়ো। পিচ্ করে একদলা থুথু ফেলল ছাইদানীতে। কালো থকথকে থুথু। ছাইগুলো ভিজে চুপসে গেল, কয়লাখনির কাদা। সমস্ত কয়লার গুঁড়ো কি বুড়োর গলায় এত বছর ধরে জমা হয়েছিল? বুড়ো আবার আগের মতো চুপচাপ। শুধু মাঝে মাঝে থুথু ফেলা ছাড়া এক মুহূর্তের জন্যও নড়াচড়া করছে না।

মায়্যুদের দুর্দশায়, শোকে সকলেই খুব মর্মাহত কিন্তু এর মধ্যেই ঘেন্নায়

গ্রেগোয়ারদের চোখ মুখ বিকৃত হয়ে গেল। তবুও কথা খোঁজবার চেষ্টায় ব্যাকুল মঁসিয় গ্রেগোয়ার।

—কি গো, খুব সর্দি হয়েছে ?

বুড়ো মাথাটা পর্যন্ত নাড়লো না। সোজা শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেওয়ালের দিকে। ঘরে গাঢ় নিস্তব্ধতা দানা বেঁধেছে।

মাদাম গ্রেগোয়ার বললেন, তোমায় কি একটু চা করে দেবে ?

এ কথারও কোনো উত্তর নেই।

সেসিল বলল, বাবা, ভুলেই গিয়েছিলাম. আমাদের কিন্তু অনেকেই আগে বলেছিল বুড়োটা কেমন বোবা হয়ে গেছে।

কথাটা বলেই একটু অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে গেল সেসিল। টেবিলের ওপর স্যুপের পাত্রটা নামিয়ে রাখলো, দু বোতল মিষ্টি মদও। দ্বিতীয় মোড়কে আছে একজোড়া বড জুতো—এটা বুড়ো বোন্‌মরের জন্য আনা হয়েছিল। দু হাতে দু পাটি জুতো ধরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় সেসিল। বুড়োর পায়ের যা অবস্থা দেখছে তাতে তো এই জুতো পায়ে দিয়ে আর হাঁটতে পারবে বলে মনে হয় না।

মঁসিয় গ্রেগোয়ার সান্ত্বনার সুরে বললেন, আমাদের আরও আগেই আসা উচিত ছিল, বুঝলে ? যাহোক, দেখবে এবার হয়তো সুদিন আসবে তোমাদের।

বোনমর শুনতে পেল না হয়তো। উত্তরও দিল না। তার মুখটা এখন বীভৎস দেখাচ্ছে। পাথরের মতো ঠাণ্ডা আর শক্ত।

সেসিল চোরের মতো সন্তর্পণে দেওয়ালের পাশে জুতোজোড়া রাখলো। তবুও ক্ষীণতম শব্দটা এড়াতে পারা গেল না। একটা প্রায়-খালি ঘরে শুধু একজোড় চকচকে জুতো ! গ্রেগোয়ারদের চোখেই এটা এত বিসদৃশ লাগছে।

লেভাক-গিন্নী অবাক হল।

—বুড়োটার আক্কেল দেখুন ! আপনাদের একবার ধন্যবাদ পর্যন্ত দিল না ! ওকে এই উপহার দেওয়া আর একটা হাঁসের চোখের জন্য চশমা দেওয়া একই ব্যাপার !

কথাগুলো বলেই জিভ কাটলো। ছি ছি, এত বড মানুষদের সঙ্গে এসব বাজে ঠাট্টা করাটা মোটেই উচিত নয়। কিন্তু বারবার অবাধ্য চোখ চলে যাচ্ছে জুতো-জোড়ার ওপর। নিজের বাড়িতে এঁদের একবার টেনে নিয়ে যেতে পারলেও হত। বাধ্য হয়ে সে এক নতুন চাল চাললো।

—লেনোর আর অঁরি—ছেলেমেয়ে দুটো এত ভালো ! কেমন চালাকচতুর আর কি সুন্দর কথাবার্তা ! মঁসিয় আর মাদাম কষ্ট করে একবার আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিলেই বুঝতে পারবেন।

মঁসিয় গ্রেগোয়ার বললেন, সেসিল, তুমিও আসবে নাকি এক মিনিটের জন্য ?

সেসিল বলল, তোমরা এগোও, আমি যাচ্ছি।

মেয়েটি একলাই রয়ে গেল বুড়ো বোন্‌মরের সঙ্গে।

আচ্ছা, বুড়োর ঝুলকালি মাখা মুখটা তার এত চেনা চেনা লাগছে কেন ? কোথায়

দেখেছে? হঠাৎ সমুদ্রগর্জনের মতো বহু মানুষের চিৎকারের ধ্বনি ভেসে উঠল তার কানে। হ্যাঁ, ওই তো, সব লোক তাকে ঘিরে ধরেছে! এই বুড়োটা তার ঠাণ্ডা শক্ত আঙুলগুলো চেপে বসিয়ে দিয়েছিল সেসিলের গলায়। ওই তো সেই হাত দুটো, হাঁটুর ওপর রেখে এখন কেমন শান্তভাবে বসে আছে বুড়োটা! এখনও নিশ্চয়ই অনেক শক্তি ধরে দশটা আঙুল।

··· আস্তে আস্তে বোন্‌মরের চোখে মুখে প্রাণের স্পন্দন ফিরে এল। সে সেসিলকে দেখছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তার গাল লালচে হয়ে উঠল। মুখটা হাঁ করে আছে, কষ বেয়ে কালচে লালা ঝরছে। দু'জনে তাকিয়ে রইল দু'জনের দিকে স্বাস্থ্যে, দীপ্তিতে উচ্ছল ভরপুর সেসিল অবাক চোখে তাকিয়ে আছে বোনমর তাকিয়ে আছে মূক, হিংস্র জন্তুর মতো···

দশ মিনিট পর গ্রেগোয়াররা ব্যস্ত হয়ে মায্যুদের বাড়িতে ফিরে এলেন। এতক্ষণ ধরে সেসিল বুড়োটার কাছে কি করছে? ঘরে পা দিয়েই আর্তনাদ করে উঠলেন স্বামী-স্ত্রী। এ কি! তাঁদের মেয়ে পড়ে আছে মাটিতে! নীল হয়ে গেছে সমস্ত মুখ!

শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় মারা গেছে সেসিল! তার গলায় লাল দাগ চেপে বসেছে। বোঝাই যাচ্ছে কোনো ক্রুদ্ধ মানুষ জান্তব তাগিদে মেয়েটার গলা টিপে মেরে ফেলেছে। সেসিলের মৃতদেহের পাশে পড়ে আছে বোন্‌মর। তারও নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই, নিঃশেষ হয়ে গেছে সমস্ত শক্তি। এখনও বুড়োর হাতের আঙুলগুলো আক্রোশে মুঠি করা, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। টাল সামলাতে না পেরে বোধহয় সে হোঁচট খেয়েছে—পায়ের ধাক্কায় উল্টে গেছে ছাইদানীটা। ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে নোংরা থুথুমাখা ছাই। ঘরের এক কোণে চকচক করছে জুতোজোড়া।

আসলে কি ঘটেছিল, তা বোঝবার উপায় নেই কোনো। সেসিল ওর কাছাকাছি যেতেই বা গেল কেন? বোন্‌মরই বা কি করে মেয়েটাকে গলা টিপে মারলো? এটা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে যে একবার হাতে পেয়েই সে সেসিলের টুঁটি টিপে ধরেছিল; মরে না যাওয়া পর্যন্ত হাতের চাপ আলগা করেনি। আর সেই জন্যই পাশের বাড়িতেও দেওয়াল ভেদ করে কোনো শব্দ যায়নি গ্রেগোয়ারদের কানে। মনে হয় সাময়িক মস্তিষ্কবিকৃতিই বোন্‌মরকে বাধ্য করে এই নিষ্ঠুর পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড সংঘটনে। কে জানতো এত ঘৃণা আক্রোশ আর শক্তি সঞ্চিত ছিল এই বৃদ্ধের শরীরে আর মনে!

গ্রেগোয়াররা স্বামী-স্ত্রী হাঁটু মুড়ে মেয়ের মৃতদেহের পাশে বসে কাঁদছিলেন। ফুলের মতো নিষ্পাপ মেয়েটা অকালে শেষ হয়ে গেল। কত আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল সেসিলকে ঘিরে! কত রাতে পা টিপে টিপে বাবা-মা উঠে গেছেন ওপরে সেসিলের ঘরে—শুধু আদরের মেয়ের ঘুমন্ত মুখখানা দেখবার জন্য! বারবার তাকিয়ে থেকেও তাঁদের আশ মেটেনি। কোনো সাধ আহ্লাদ পূর্ণ করতে দ্বিধা করেননি কখনও···

গ্রেগোয়াররাও যেন মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেলেন। আর কি নিয়েই বা বেঁচে থাকবেন তাঁরা!

চেঁচিয়ে উঠল লেভাকের বউ।

—বুড়ো শয়তান! এ কি করল! ওর ছেলের বউ তো সন্ধ্যের আগে ফিরবে না। আমি কি ওকে ডেকে আনবো?

মঁসিয় আর মাদাম গ্রেগোয়ার শোকে মুহ্যমান। তাঁরা এ কথার কোনো উত্তর দিলেন না।

—আমি তাহলে যাই।

কিন্তু যাবার আগে লেভাকের বউয়ের চোখ পড়ল জুতোজোড়ার ওপর। এমনিতেই খবর পেয়ে দলে দলে লোক আসছে। হয়তো বা চুরিই হয়ে যাবে দামী জিনিসটা! আহা, ঠিক বুতলুর পায়ের মাপসই!

এদিকে রকিয়ার-এ মঁসিয় এনবো আর তাঁর সঙ্গীরা অনেকক্ষণ গ্রেগোয়ারদের জন্য অপেক্ষা করে করে অধৈর্য হয়ে উঠছিলেন। নেগ্রেল খাদ থেকে বেরিয়ে এসে বিস্তৃত বিবরণ শোনাচ্ছে মামা-মামীকে। হয়তো আজ রাতেই বন্দী মজুরদের উদ্ধার করা সম্ভব হবে—অবশ্য মনে হয় মৃত অবস্থায়। কারণ সকাল থেকে সঙ্কেত আসেনি। মায়্যু-গিন্নী এখনও একই ভাবে বসে আছে। নেগ্রেলের কথা কানে যেতে ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে তার। ইতিমধ্যে লেভাকের বউ এসে তার বুড়ো শ্বশুরের কীর্তি-কাহিনী শোনালো। অসহায় ভাবে হাত উল্টে লেভাক-গিন্নীর পিছু পিছু বাড়ির দিকে রওনা হল ক্যাথরিনের মা।

খবর শুনে মাদাম এনবো টলে পড়ে যাচ্ছিলেন। ইস্, বেচারী সেসিল! খানিক আগেও কি প্রাণচঞ্চল হাসিখুশী ছিল মেয়েটা! মঁসিয় এনবো তাড়াতাড়ি স্ত্রীকে ধরে মুক্যু-এর ঝুপড়ির দিকে নিয়ে গেলেন। স্ত্রীর জামার বোতাম আলগা করে দিলেন তিনি। হয়তো ওর দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে! এতদিন পরে এই পরিবেশেও স্ত্রীর শরীরের সুঘ্রাণে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন এনবো। কিন্তু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সঙ্গে আসা নেগ্রেলকে জড়িয়ে ধরলেন মাদাম এনবো। স্বামীর দিকে দৃকপাত না করে। নেগ্রেলও শোকে মুহ্যমান। হাজার হোক সেসিল তো তার বাগদত্তা! মঁসিয় এনবো তাকিয়ে রইলেন দু'জনের দিকে। ওরা কেমন নিজেদের দুঃখ ভাগ করে নেয়! মন থেকে বিরাট একটা ভার নেমে গেল তাঁর। এই দুর্ঘটনাটা হয়ে ভালোই হল। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য! মনের প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলেন তিনি। নেগ্রেলকে বিদায় করবার দরকার নেই। ও এখানেই থাকুক ওর মামীর সঙ্গী হয়ে। বলা তো যায় না, নেগ্রেল চলে গেলে হয়তো মাদাম এনবোর নজর পড়বে আস্তাবলের সহিসের ওপর!

* * * *

খাদের নীচে তখন কোমর জল। জলবন্দী মজুররা ভয়ে শিউরে উঠছে প্রতি মুহূর্তে। জলের গর্জনে কানে তালা ধরে যায়। লাইনিং-এর শেষ টুকরোটাও ভেঙে

পড়েছে প্রচণ্ড শব্দে। কিন্তু ভয়টা আতঙ্কে রূপান্তরিত হল যখন আস্তাবলে আটকা পড়া টাট্টু ঘোড়াগুলোর মুমূর্ষু আর্তনাদ কানে এসে পৌঁছল

মুক্যু বাতাঈয়ের লাগাম ছেড়ে দিয়েছে বুড়ো ঘোড়াটা কাঁপা কাঁপা পায়ে ঘোলাটে চোখে দাঁড়িয়ে আছে জলের মধ্যে নীচের সমস্ত ধাপগুলো জলের তলায় চলে যাচ্ছে ক্রমশ। ছাদে রাখা তিনটে বাতির লালচে আলোয় জলটা কেমন সবুজ দেখাচ্ছে গায়ে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা লাগাতে চার পায়ে লাফিয়ে উঠল বাতাঈ। তারপর দৌড়তে লাগল অন্য একটা গ্যালারীর দিকে। বাঁচবার আশায় মজুররাও তার পিছু নিল।

মুক্যু বুড়ো হয়েছে। তার অভিজ্ঞতাও অনেক বেশী। সে চেঁচিয়ে উঠল, এদিক দিয়ে কিছু সুবিধে হবে না। বকিয়ার-এর দিকে চলো।

সকলেই সেটা বুঝতে পারছে যদি কোনোভাবে পাশের বাতিল খনিটাতে পৌঁছনো যায় তবে হয়তো কোনোভাবে মৃত্যুর হাত এড়ানো যেতে পারে। কুড়ি-জন নিজেদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করতে লাগল মাথার ওপর উঁচু করে বাতিগুলো তুলে ধরা। সবাই সন্ত্রস্ত, জলের মধ্যে যাতে পা হড়কে না যায় সকলেই পরপর সারবদ্ধভাবে এগোচ্ছিল। কপাল ভালো যে গ্যালারী একটু ঢালু হয়ে ওপর দিকে উঠে গেছে। তুশে মিটার দিবি এগোতে পারলো তারা এত দিনের অন্ধ বিশ্বাসে তাদের মনে গুঞ্জন উঠেছে—মা ধরিত্রী পাপের শাস্তি দিলেন। তার বুকেই তো এত কাল নির্দয় ভাবে গাঁইতি আর শাবল চালিয়েছে তারা। একজন বুড়ো মজুর বিড়বিড় করে প্রার্থনা করছিল

খানিকটা এগিয়েই নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হল। রাস্তাটা দু'ভাগ হয়ে গেছে। মুক বলল বাঁ দিকের রাস্তা ধরতে কিন্তু অন্যরা বলল না। ডান দিকের পথ অনেক কম সময়ে বকিয়ার-এর দিকে গেছে

ফলে এক মিনিট সময় নষ্ট হল, এই অবস্থায় যা অমূল্য

শাভাল বলল, যারা মরতে চাও তারা থাকো আমি চললাম

ডান দিকের পথ ধরল সে। তার পিছু পিছু আরও দু'জন। বাকিরা মুক্যু-এর সঙ্গে অন্য রাস্তা ধরে ছুটলো—হাজার হোক বুড়োর অভিজ্ঞতা অনেক বেশী কিন্তু মুক্যুও পুরোপুরি ভরসা দিতে পারছে কই? সে যেন এই বিপদের সময় সব ভুলে যাচ্ছে। অবশ্য সকলেরই এক অবস্থা। ঠাণ্ডা মাথায় কোনো কিছু চিন্তা করতেই পারছে না কেউ। যা অবস্থা, একে অন্যকে চোখের ওপর মরতে দেখবে। প্রতিবার বাঁকের মুখে এসে একই দ্বিধা আর দ্বন্দ্ব। তাহলেও মনস্থির করে এগিয়ে যেতে হবে তো!

এতিয়েন আছে এই দলের একেবারে শেষের দিকে। ক্যাথরিন এত আস্তে এগোচ্ছে যে সেই তালে তাল মেলাতে গিয়ে এতিয়েনের গতিও মন্থর হয়ে যাচ্ছে। সে হয়তো শাভালের সঙ্গে ডান দিকেই যেত, তারও মনে হচ্ছিল ওইটাই সঠিক রাস্তা কিন্তু তাহলেও পুরনো আক্রোশে সে শাভালের সঙ্গে গেল না। তাতে যদি এই খাদে পচে মরতে হয়, সেও ভালো। অবশ্য আস্তে আস্তে দলে লোক কমছে। যে যার

নিজের বিচারবুদ্ধিমতো এক এক পথে যাচ্ছে। বুড়ো মুক্য-এর পেছনে এখন মাত্র সাতজন। ক্যাথরিন প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিল। এতিয়েন বলল, তুমি বরং আমার গলাটা জোরে জড়িয়ে ধর। আমি তোমাকে কোলে তুলে নিই।

ক্যাথরিন ফিসফিস করে বলল, নাঃ, আমাকে এখানেই ফেলে রেখে তোমরা এগিয়ে যাও। আমি মরে বাঁচতে চাই।

এর মধ্যেই এতিয়েন আর ক্যাথরিন অন্যদের থেকে প্রায় পঞ্চাশ মিটার পিছিয়ে পড়েছে। পাঁজাকোলা করে ক্যাথরিনকে তুলে ধরতে যাবে, এমন সময় বিরাট একটা পাথরের চাঙড় পড়ে সামনের পথ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। এদিকে আশেপাশের দেওয়ালের ফাটল দিয়ে ক্রমাগত জল ঝরছে। বাধ্য হয়ে পিছু হটতে হল দু'জনকে এবং যথারীতি রাস্তাও হারিয়ে ফেলল। সুতরাং রকিয়ার-এ ফিরে যাবার পথ বন্ধ। এখন একমাত্র উপায় যেভাবে হোক ওপরের স্তরে আশ্রয় নেওয়া, যাতে পরে কোনোভাবে জল কমলে উদ্ধারের আশা থাকে।

অবশেষে চলতে চলতে তারা 'গীল্যুম' স্তরে এসে পৌঁছল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল এতিয়েন।

—যাক, আমরা তাহলে একটু চেনা জায়গায় এসে পৌঁছেছি। তার মানে এতক্ষণ আমরা ঠিক পথেই এগোচ্ছিলাম। দ্যাখো, এখন যদি সোজা এগিয়ে যাই, তাহলে সামনেই চিমনিটা পাবো। সেটা বেয়ে ওপরে ওঠা যাবে

এখন কিন্তু চলার গতি আরও মন্থর হয়ে গেছে। জল উঠেছে বুক পর্যন্ত। অবশ্য যতক্ষণ বাতি জ্বলছে ততক্ষণ ভয় কম। তেল বাঁচাবার জন্য পালা করে বাতি দুটো জ্বালাতে হচ্ছে। চিমনি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এমন সময় পেছনে একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ। দু'জনেই চমকে ঘাড় ফেরালো। তবে কি অন্যরাও এই পথে এসেছে? ঠিক মনে হচ্ছিল কেউ যেন হিসহিস করে নিঃশ্বাস ফেলছে। তার পরই অন্ধকার ফুঁড়ে একটা বিশাল সাদা শরীর বেরিয়ে জমে থাকা কাঠের স্তূপের ভেতর দিয়ে প্রাণপণে এগিয়ে আসার চেষ্টা করতে লাগল

বাতাঈ। সে লাফিয়ে লাফিয়ে গ্যালারীগুলো পেরিয়ে আসছিল ভয় পেয়েছিল খুব, কিন্তু এগারো বছর ধরে মাল বইবার কাজ করছে। রাস্তাঘাট সব চেনা। অন্ধকারেও অসুবিধে হয় না। কোনোভাবে সমস্ত শরীরটা ঘষটে ঘষটে সঙ্কীর্ণ পথ ধরে এগোচ্ছে বাতাঈ। একবারের জন্যও থামছে না, দ্বিধান্বিত হচ্ছে না। সে জানে, হয়তো অনেক— অনেক দূরে বিছিয়ে আছে বিস্তীর্ণ সবুজ শস্যক্ষেত, যেখানে মস্ত বড় ঝাড়বাতির মতো আলো ছড়ায় সূর্য। বাতাঈ বাঁচতে চায়, বাইরের বাতাসে বুকভরা শ্বাস নিতে চায়। জল বাড়ছে। যত পথ যাচ্ছে রাস্তা ততই সরু হচ্ছে, ছাদ নীচু হচ্ছে। দেওয়াল চেপে আসছে দু ধারে, গা ছড়ে রক্ত ঝরছে। কিন্তু তা হোক, এগিয়ে তাকে যেতেই হবে

ক্যাথরিন আর এতিয়েন দেখছিল জলে ডোবা পাথুরে পথে কি কষ্টে বাতাঈ তার শরীরটাকে নিয়ে এগোচ্ছে। ইস্, পাথরে ধাক্কা খেয়ে তার সামনের পা দুটো ভেঙে

গেল। শেষ বারের মতো নিজেকে টেনে হিঁচড়ে তুলে আরও কয়েক মিটার এগোল। কিন্তু তারপরই পা মুচড়ে বসে পড়ল। মাথা ফেটে রক্ত পড়ছে, শরীর ছাপিয়ে জল উঠছে হু হু করে। অসহায়ের মতো চিঁ হিঁ হিঁ করে ডাকতে লাগল। জীবনের জন্য, আলোর জন্য এত আকুতিও ছিল এই অবোধ জীবটার মনে। হাঁ করে কাতর আর্তনাদ করছিল বাতাঈ। জল তার কেশর ছুঁয়েছে। এবার সে শেষবারের মতো আর্তনাদ করে উঠল। নাকে মুখে জল ঢুকে একটা অদ্ভুত শব্দ হতে লাগল যেন একটা খালি পিপের মধ্যে জল ঢুকছে। শব্দটা একটু পরেই মিলিয়ে গেল। কি ভয়ংকর মৃত্যু!

ক্যাথরিন কেঁদে উঠল।

—ভগবান! আমায় তুমি এইখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও। আমার যে খুব ভয় করছে! আমি মরতে চাই না।

এতক্ষণ পর্যন্ত অকেজো শ্যাফ্‌ট বেনোজলে ভরা খাদ, কিছুই তাকে সত্যিকারের ভয় দেখাতে পারেনি কিন্তু চোখের সামনে বাতাঈকে এই ভাবে মরতে দেখে আতঙ্কে সে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে। বাতাঈয়ের অন্তিম আর্তনাদ অনুরণিত হচ্ছে দেওয়ালে।

কেঁপে উঠল ক্যাথরিন।

—আমাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও।

এতিয়েন তাকে কোলে তুলে নিয়ে আবার চলা শুরু করল। এছাড়া আর উপায়ও ছিল না। চিমনি বেয়ে ওঠা শুরু হল। জল গলা পর্যন্ত উঠে এসেছে। ক্যাথরিনকে প্রায় টেনে তুলতে হচ্ছিল কারণ মেয়েটার শরীরে একবিন্দু শক্তিও আর অবশিষ্ট নেই। তিনবার তো এমন হল যে আর একটু হলেই টাল সামলাতে না পেরে ক্যাথরিনকে প্রায় জলে ফেলে দিচ্ছিল এতিয়েন।

প্রথম স্তরে পৌঁছে কয়েক মিনিট বিশ্রাম নিল দুজনে। এই জায়গাটা এখনও শুকনো আছে। কিন্তু জল বাড়ছে ধীরে ধীরে। আবার ওপরে ওঠা দরকার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু ঢাল বেয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছবার চেষ্টা চলল। ষষ্ঠ ধাপে এসে মনে হল অবস্থা এখন নিরাপদ। জল হয়তো আর বাড়বে না। কিন্তু সব আশা ভরসা নস্যাৎ করে আবার দ্রুত জল বাড়তে লাগল। সপ্তম ধাপ, অষ্টম। আর একটা মাত্র স্তর বাকি। সেখানে পৌঁছে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে দু'জনে। জলের গভীরতা যাচাই করছে মনে মনে। যদি শেষ পর্যন্ত জল বাড়া না থামে তবে তো বাতাঈয়ের মতো ফুসফুসে জল ঢুকে মারা যেতে হবে!

প্রতি মুহূর্তে চারদিকে ধস নামার আওয়াজ হচ্ছে। পুরো খনিটা থেকে থেকে কেঁপে উঠছে, মাটি পাথর কাঠ সব ছিটকে ছিটকে পড়ছে প্রচণ্ড শব্দ করে। পৃথিবী যেন মহাবিপর্যয়ে ওলটপালট হয়ে যাবে আজ। এই মহাপ্রলয়ে পাহাড় পর্বত নদী-নালা সব ধ্বংস হয়ে যাবে।

প্রতিবার ভূমিকম্পের সঙ্গে সঙ্গে ক্যাথরিনও কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

—না না, আমি মরতে চাই না। বাঁচতে চাই!

এতিয়েন তাকে এই বলে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল যে জল আর বাড়ছে না। মনে হয় ছ ঘণ্টা ধরে ওপরে উঠছে দু'জনে। কেউ না কেউ নিশ্চয়ই উদ্ধার করবার জন্য এগিয়ে আসবে। কিন্তু সময় এত দীর্ঘ আর ক্লান্তিকর হতে পারে, এতিয়েনের তা আগে জানা ছিল না। আসলে কিন্তু একটা পুরো দিন কেটে গেছে এর মধ্যে, গীলুাম স্তরের মধ্যে দিয়ে উঠতে। দু'জনের কেউই তা বুঝতে পারেনি।

আপাদমস্তক জলে ভিজে গেছে। দু'জনে চুপ করে বসে রইল। অন্তহীন অপেক্ষা শুরু হল হয়তো অবলীলায় জামাকাপড় খুলে জল নিংড়ে নিল ক্যাথরিন। তারপর সেগুলোই আবার পরে নিল, গায়েই আবার শুকিয়ে যাবে। ক্যাথরিনের পায়ে জুতো নেই নিজেই কাঠের শুকতলাওয়ালা জুতোজোড়া তাকে জোর করে পরতে দিল এতিয়েন। এখন অনেক সময় আছে হাতে বাতির শিখাটা খুব কমিয়ে দিল, অনর্থক তেল পুড়িয়ে লাভ কি? খিদেয় পেট জ্বলছে, এতক্ষণ পরে সে কথা খেয়াল হল দু'জনের। দুর্ঘটনাটা এমন সময় ঘটল যে খাবার সময় পায়নি কেউ। ক্যাথরিনের কাছে খাবারটা এখনও আছে দেখা গেল। মোড়ক খুলে দেখল স্যাণ্ডউইচ জলে ভিজে একেবারে চুপসে গেছে জোর করে এতিয়েনকে খাবারের ভাগ দিল ক্যাথরিন। খাওয়া কোনোরকমে শেষ করেই সে ঘুমিয়ে পড়ল আর বিনিদ্র চোখে তাকে পাহারা দিতে লাগল এতিয়েন।

কতক্ষণ কাটলো এইভাবে? কোনো হিসেব ছিল না তার। এতিয়েনের শুধু মনে পড়ে চিমনির মুখে কালো জল—তাদের দিকে সর্পিল গতিতে এগিয়ে আসছে। খানিক পরেই ক্যাথরিনের পা ভিজে গেল। তাকে ঘুম থেকে টেনে তোলা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছিল না এতিয়েন কিন্তু এ ভাবে তো বেশীক্ষণ থাকাও যাবে না — হয়তো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ক্যাথরিন স্বপ্ন দেখছে সোনালী স্বর্গ হলুদ বসন্তের। এতিয়েনের মনে পড়ল ঢাল বেয়ে ওপাশে পৌছতে পারলে আরও খানিকটা উঁচু জায়গা পাওয়া যাবে। ওদিকে যেতে পারলে হয়তো বাঁচতেও পারা যাবে। শান্তভাবে সে অপেক্ষা করতে লাগল ক্যাথরিনকে ডাকতে মায়া হচ্ছিল তার। আরও খানিকক্ষণ একই ভাবে কাটলো। অবশেষে বিপদ বুঝে ক্যাথরিনকে ধীরে ধীরে কোলে তুলে নিল এতিয়েন।

ক্যাথরিন ককিয়ে উঠল।

—ওঃ ভগবান, তাহলে সত্যিই আমি স্বপ্ন দেখছিলাম। আবার জল উঠছে।

পুরোপুরি জেগে উঠে আবার চেঁচিয়ে কাঁদতে শুরু করল ক্যাথরিন।

শান্ত গলায় তাকে বোঝাচ্ছিল এতিয়েন।

—কেঁদো না। নিশ্চয়ই একটা উপায় হয়ে যাবে।

জল এসে কাঁধ পর্যন্ত ভিজিয়ে দিয়েছে। এবারের রাস্তা অনেক বেশী দুর্গম—একশো মিটার লম্বা আর পুরো এলাকাটা আগাগোড়া টিম্বারিং করা। প্রথমে তার (কেব্‌ল) আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করল তারা কিন্তু পারলো না। মসৃণ কাঠ চেপে ধরে এগোতে হচ্ছে। হাতের নখ ভেঙে দুমড়ে যাচ্ছে। ক্যাথরিনের পেছনে

এতিয়েন। রক্ত ঝরছে মেয়েটার দু হাত দিয়ে। বারবার কষ্টে যাচ্ছে হাতের মুঠো। পেছন থেকে তাকে ধরে রেখেছে এতিয়েন। হঠাৎ সামনে একটা ভাঙা ধ্বংসস্তূপ— আর ওপরে ওঠা যাবে না। কি কপাল যে এইখানে গলে বেরিয়ে যাবার মতো ছোট্ট একটা ফাঁক আছে। তারা সাবধানে বেরিয়ে এসে পৌঁছল খনির আর একটা সঙ্কীর্ণ পথে।

এমন সময় দু'জনেই চমকে উঠল। ঠিক সামনেই একটা আলো জ্বলছে। একজন মানুষের রাগী গলার স্বর ভেসে এল

—কি ব্যাপার, আমারই মতো কোনো 'বিচক্ষণ বন্ধু' বলে মনে হচ্ছে!

শাভাল। সেও একইভাবে রাস্তা বন্ধ হওয়ায় মাঝপথে আটকে গেছে। তার দু'জন সঙ্গীই মারা গেছে পাথর চাপা পড়ে। কনুইতে আঘাত লেগেছে তার। কিন্তু কি দুর্জয় সাহস যে এইভাবে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে গিয়ে সঙ্গীদের বাতি-গুলো নিয়ে এসেছে। তাদের জামাকাপড় হাতড়ে দেখেছে খাবারদাবার পাওয়া যায় কি না। সবেমাত্র নিচে বেরোতে যাবে পাথর ধসে পড়ে গ্যালারীটি বন্ধ হয়ে গেল।

ক্যাথরিনদের এগিয়ে আসার শব্দ পেয়ে শাভালের প্রথমেই মনে হল: যেই হোক না কেন, খাবারের ভাগ দিচ্ছি না। তার চেয়ে পাথর ফেলে মেরে ফেলব। তারপর সে দু'জনকে চিনতে পারলো। নীচু গলায় আত্মতুষ্টির হাসি হাসলো

—ওঃ ক্যাথরিন তুমি! তাহলে আমাকে ফিরে পাবার জন্য কষ্ট করে এতটা পথ এসেছ! বেশ, বেশ, সময়টা দিব্যি কাটানো যাবে!

শাভালের হাবভাব এমন যেন এতিয়েনকে দেখতেই পায়নি। আর এতিয়েনের প্রথম চিন্তাই হল কি করে এই শয়তানটার হাত থেকে মেয়েটাকে বাঁচানো যায়! কিন্তু এখন সামনাসামনি অবস্থার মোকাবিলা করতে হবে। তাই মাথা ঠাণ্ডা রেখে কথা শুরু করল শাভালের সঙ্গে, যেন তারা কতকালের বন্ধু!

শাভাল, তুমি কি অন্য ধাপটা দেখেছ? আমরা কি ওই পাশ দিয়ে কয়লার স্তর বেয়ে বেরোতে পারব?

—পাগল নাকি! ওই পথটাও ধস নেমে বন্ধ হয়ে গেছে। দুটো দেওয়ালের মাঝখানে আমরা বন্দী হয়ে গেছি সাত কাবের মরণফাঁদ যাকে বলে। কিন্তু ইচ্ছে করলে পেছনের ঢাল বেয়ে নেমে যাওয়া যেতে পারে।

কথাটা ঠিকই। এখনও জল বাড়ছে। কলকল শব্দ শোনা যাচ্ছে। পিছু হটবার রাস্তা নেই। সত্যিই ইঁদুর-কলে আটকে পড়বার মতো অবস্থা। একটা বিরাট গ্যালারীর মধ্যে বন্দীদশা, যার দু প্রান্তই ধস নেমে বন্ধ

শাভাল বিদ্রূপ করল।

—তাহলে তোমরা এখানেই থাকো! অবশ্য সেটাই ভালো হবে। এতিয়েন, তুমি নিজে থেকে কথা না বললে আমি কোনোদিনই যেচে তোমার সঙ্গে কথা বলতাম না। ভেবো না সব অপমান আমি হজম করে নিয়েছি। এখন দেখা যাক কে আগে

মরে। অবশ্য যদি না উদ্ধারকারীরা এর মধ্যেই এসে যায়। যদিও তার আশা খুবই কম।

এতিয়েন বলল, আমরা দেওয়ালে টোকা দিয়ে সংকেত পাঠালে কেউ হয়তো তা শুনতে পেতেও পারে।

—শুধু টোকা মেরে মেরে আমি ক্লান্ত। তুমি বরং এই পাথরের টুকরোটা ঠুকে চেষ্টা চালিয়ে যাও।

এতিয়েন ক্ষয়ে যাওয়া পাথরের টুকরোটা নীচু হয়ে হাতে তুলে নিল। তারপর এক প্রান্তে গিয়ে সাঙ্কেতিক ধ্বনি সৃষ্টি করতে লাগল। একটুক্ষণ থেমে দেওয়ালে কান পাতলো। কোনো সাড়া নেই। বার কুড়ি চেষ্টা করে হতোদ্যম হয়ে পড়ল এতিয়েন।

ইতিমধ্যে শাভাল দিব্যি গুছিয়ে বসেছে। দেওয়ালে ঠেকা দিয়ে পর পর তিনটে বাতি সাজিয়ে রাখল। একটা জ্বলছে দুটো নেভানো। তারপর ঝাঁকিয়ে বসে এক টুকরো কাঠের ওপর দুটো স্যাণ্ডউইচ বের করে রাখলো। একটু কষ্ট করে চালিয়ে নিলে এই খাবারে তার দুটো দিন কেটে যাবে।

ঘাড় ফিরিয়ে ক্যাথরিনকে ডাকলো শাভাল।

—ক্যাথরিন যদি খুব খিদে পেয়ে থাকে তোমার, তাহলে স্বচ্ছন্দে অর্ধেকটা নিতে পারে

এ কথার কোনো জবাব দিল না ক্যাথরিন এই দুঃসহ অবস্থাতেও এতিয়েন আর শাভালের ঠাণ্ডা লড়াই থামেনি।

চরম অস্বস্তিকর নীরবতা নামলো এতিয়েন বা শাভাল কেউই মুখ খুলছে না যদিও পাশাপাশি বসে আছে একবার শাভালের টুকরো মন্তব্য শুনে এতিয়েন এক ফুঁয়ে বাতিটা নিভিয়ে দিল। সত্যি, বেশী তেল খরচ করবার মতো বিলাসিতার সময় এখন নয় যেভাবে শাভাল ক্যাথরিনের দিকে তাকাচ্ছে, ভয় পেয়ে মেয়েটা এতিয়েনের দিকে ঘেঁষে এসে গুটিশুটি মেরে শুল। সময় বয়ে যাচ্ছে, শুধু জলের কলকলানি আর মাঝে মাঝে পাথরের চাঙড় খসে পড়ার আওয়াজ প্রথম বাতিটার তেল ফুরিয়ে যাবার পর দ্বিতীয়টা জ্বালানো হল যদিও বিষাক্ত বাতাসের কথা ভেবে একটু দ্বিধান্বিত হল সকলে, কিন্তু অন্ধকারে থাকা যাবে না। তাতে বিস্ফোরণে চৌচির হয়ে যেতেও কারও আপত্তি নেই। কপাল ভালো। এখানে ওই বিষাক্ত বাতাস নেই। নিরাপদেই আলোটা জ্বলছিল। তিনজন শুয়ে রইল পাশাপাশি।

এ ভাবে বেশ খানিকটা সময় কেটে গেছে। এমন সময় একটা অদ্ভুত শব্দে চমকে উঠল এতিয়েন আর ক্যাথরিন। শাভাল উঠে বসে খাচ্ছে। একটা স্যাণ্ড-উইচকে দু টুকরো করে নিয়ে খুব ধীরে ধীরে চিবোচ্ছে। একসঙ্গে গিলে ফেললে তো মজাটাই মাটি। দু'জনে চুপ করে তাকিয়ে রইল শাভালের দিকে। খিদেয় যে তাদের প্রাণ যায়!

ক্যাথরিনকে ইঙ্গিত করল শাভাল।

তুমি তাহলে খাবে না? খুব ভুল করলে কিন্তু।

পাছে দৃষ্টি আরও লোভাতুর হয়ে ওঠে, সেই ভয়ে চোখ নামিয়ে নিল ক্যাথরিন, কিন্তু খিদের জ্বালা বড় সাংঘাতিক। দু চোখ জলে ভরে উঠল তার। শাভাল যে কি চায়, তাও বুঝতে পেরেছে ক্যাথরিন। সকালেই একবার শাভাল তার গরম নিঃশ্বাসের হল্‌কা ছড়িয়ে দিয়েছিল ক্যাথরিনের ঘাড়ে। আসলে এতিয়েনের সঙ্গে ক্যাথরিনকে দেখে রাগে অন্ধ হয়ে গেছে শাভাল। এতিয়েনের চোখের সামনে সে ক্যাথরিনের ওপর পুরোপুরি দখল নিতে চায়, তাকে ভোগ করতে চায়—এই ভাবেই এতদিনের চাপা আক্রোশ মেটাবে শাভাল। ক্যাথরিন লক্ষ্য করেছে তার পুরনো প্রেমিকের চোখে কামনার আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে। আগে আগেও এতিয়েনের প্রতি অহেতুক সন্দেহবশত সে প্রচণ্ড মারধোর করেছে ক্যাথরিনকে। কিন্তু এখন আর ক্যাথরিন শাভালের কাছে ফিরে যেতে চায় না কারণ তাহলে এতিয়েনও শাভালকে ছেড়ে দেবে না। এখানে এখন সকলেই মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। হায় ঈশ্বর। এখনও কি বন্ধুত্ব ফিরিয়ে আনা যায় না?

শাভালের কাছে খাবার চাইবার বদলে এতিয়েন বরং না খেয়ে মরতেও রাজী। একটা চাপা থমথমে অবস্থা এখন সময়ের হিসেব নেই কোনো। উদ্ধারের আশাও বা কতটুকু। পুরো একটা দিন কেটে গেছে দ্বিতীয় বাতিটার জোর কমে এসেছে তৃতীয়টা জ্বালানো হল।

দ্বিতীয় স্যাণ্ডউইচটা খেতে শুরু করল শাভাল। চাপা গলায় গরগর করে বলল, চলে এস না ক্যাথরিন!

ক্যাথরিন ভয়ে কেঁপে উঠল এতিয়েন সরে গেল। ক্যাথরিন যদি খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে খেতে চায় তো যাক। সে কেন বাধা দেবে? কিন্তু তবুও নড়ছে না ক্যাথরিন। ফিসফিস করে এতিয়েন বলল, যাও লক্ষ্মীটি।

এতক্ষণ ধরে অনেক কষ্টে কান্না চেপে রেখেছিল ক্যাথরিন। এবার বাঁধভাঙা বন্যার মতো হু হু করে তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলো সে সোজা হয়ে দাঁড়াবার শক্তিটুকুও নেই। সমস্ত শরীর মুচড়ে উঠছে ব্যথায়। এতিয়েন উঠে দাঁড়িয়ে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল। বারবার ব্যর্থ আশায় সঙ্কেত পাঠানোর চেষ্টা করা ছাড়া আর কিছু করবার ছিল না। একটাই দুঃখ, আর যে কয়েক ঘণ্টা বেঁচে আছে, তাও জীবনের পরম শত্রুর পাশাপাশি কাটাতে হবে। একটু আড়ালে গিয়ে মরবার মতোও জায়গা নেই। দশ পাও এগোতে পারা যাবে না। তার আগেই শাভালের সঙ্গে ধাক্কা লাগবে, এমনই অবস্থা। আর এই মেয়েটা! খাদের গভীরে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও ক্যাথরিনের জন্য দু'জন পুরুষ-মানুষ এক অলিখিত সংগ্রামে লিপ্ত। যে বেঁচে থাকবে, ক্যাথরিন তার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চরম নৈঃশব্দে কাটছে। পরিস্থিতি অসহ্য, ভয়াবহ। শারীরিক তাগিদ অস্বীকার করতে পারছে না শাভাল। এতিয়েনও দাঁতে দাঁত চেপে রয়েছে।

আরও একটা দিন কেটে যাচ্ছে। শাভাল ক্যাথরিনের পাশে বসে তার সঙ্গে স্যাণ্ডউইচটা ভাগ করে খাচ্ছে। অতি কষ্টে খাবার গিলছে ক্যাথরিন। খাবারে প্রতি কামড়ের বিনিময়ে এতিয়েনের সামনেই শাভাল তাকে বাধ্য করছে একটা করে চুমু খাওয়ার জন্য—এতেই তার পৈশাচিক উল্লাস। কিন্তু এর পরেও যখন ক্যাথরিনকে ভোগ করবার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠল শাভাল, ককিয়ে উঠল মেয়েটা।

—ছেড়ে দাও, আমার লাগছে!

রাগে কাঁপতে কাঁপতে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে ছিল এতিয়েন। সে কিছু দেখতে চায় না—কিছু না। কিন্তু ক্যাথরিনের আর্তনাদে আর স্থির থাকতে পারলো না। ঘুরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

—ওর ওপর থেকে হাত সরিয়ে নাও, শয়তান!

শাভালও গরম হল।

—তোমার কি! ও আমার সম্পত্তি যা খুশি তাই করতে পারি! সে কৈফিয়ত কি তোমাকে দেব নাকি?

সজোরে ক্যাথরিনকে জাপটে ধরল শাভাল নিষ্ঠুর ভাবে চুমু খেল তার ঠোঁটে। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে বলল, আমাদের একটু একলা থাকতে দাও তো!

এতিয়েনের ঠোঁট সাদা হয়ে গেছে সে বলে উঠল, যদি ওকে এই মুহূর্তে ছেড়ে না দাও, তোমাকে গলা টিপে মেরে ফেলবো।

শাভাল লাফিয়ে উঠল। এতিয়েনের গলার স্বরে অনমনীয় দৃঢ়তা মৃত্যু বড় মন্থর গতিতে আসছিল। তাকে একটু দ্রুতগামী করে দিতে সাধ জাগছে আজ। কোনো একজনকে এবার সরে যেতেই হবে। আক্রমণের জন্য তৈরি হল শাভাল। কিন্তু এতই অপরিসর জায়গা যে হাত তুলতে গেলেও দেওয়ালে ঘষা লেগে চামড়া কেটে যায়।

চেঁচিয়ে উঠে শাভাল বলল, সাবধান! আজ আমি তোমায় সত্যিই খতম করব!

এতিয়েনও পাগল হয়ে গেছে আজ। চোখ ঘোলাটে, মাথায় রক্ত উঠে গেছে। রক্তের পিপাসা বড় সাংঘাতিক। শারীরিক তাগিদের মতো তাকেও অস্বীকার করা যায় না। নিজের মনকে সংযমের বাঁধনে শক্ত করে আঁকড়ে রাখবার চেষ্টা ব্যর্থ হল এতিয়েনের। দেওয়াল থেকে অমানুষিক শক্তিতে একটা পাথরের টুকরো উপড়ে নিল। তারপর চোখের পলকে তা ছুঁড়লো শাভালের মাথা লক্ষ্য করে সতর্ক হবার সময়টুকুও পেল না শাভাল। নিজের জায়গা থেকে একচুল নড়তে পর্যন্ত পারলো না—তার মুখ থেঁতো হয়ে গেল। মাথার খুলি দু'ফাঁক হয়ে গেছে। ঘিলুগুলো ছিটকে পড়ল গ্যালারীর ছাদে। তারপর হুড়হুড় করে স্রোতের মতো রক্ত বেরিয়ে নিমেষেই জায়গাটা ভরে গেল। বাতির টিমটিমে আলোয় সমস্ত পরিবেশ এখন অদ্ভুত ভূতুড়ে ঠেকছে। শাভালের নিস্পন্দ কালচে শরীর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে মাটিতে।

বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইল এতিয়েন শাভালের নিথর হয়ে যাওয়া শরীরের দিকে। তাহলে শেষ পর্যন্ত সেও মানুষ খুন করল! নিছক আদিম প্রবৃত্তি তার

এতদিনের সংযমের মুখোশটা কেমন অবহেলায় টান মেরে ফেলে দিল আজ! পা মাথা সব টলছে এতিয়েনের। রক্তের নেশায় মাতাল হয়ে নয়, সম্ভবত খিদের জ্বালায়। মাথার চুল পর্যন্ত ভয়ে খাড়া হয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত মানুষের রক্তে তার হাত কলুষিত হল! কিন্তু সব ছাপিয়ে জয়ের উল্লাস···তাহলে সে-ই বেশী শক্তিমান! পাশবিক আনন্দে তার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছিল। জুলকে মেরে জাঁলার তাহলে এই রকমই আনন্দ হয়েছিল।

ক্যাথরিন চুপ করে দাঁড়িয়ে। একটু পরে পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল।

—হে ভগবান, ও তাহলে মারা গেল।

এতিয়েন নিষ্ঠুর গলায় বলল, খুব দুঃখ হচ্ছে নাকি?

ঢোক গিলল ক্যাথরিন। মুখ দিয়ে অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ করতে করতে ঢলে পড়ল এতিয়েনের প্রসারিত হাতের মধ্যে।

—আমাকেও এবার মেরে ফেল। সবাই একসঙ্গে মরব।

দু হাতে এতিয়েনের গলা জড়িয়ে ধরল ক্যাথরিন। এতিয়েনও আবেগে আপ্লুত হয়ে আলিঙ্গন করল তাকে। এইবার হয়তো শান্তিতে মরতে পারবে দু'জনে। কিন্তু মরণ আসে কই? ক্লান্তভাবে হাতের বাঁধন শিথিল করল তারা।

দু হাতে চোখ ঢাকলো ক্যাথরিন। এতিয়েন টানতে টানতে শাভালের নিষ্প্রাণ দেহটা নিয়ে গেল ঢালের দিকে, তারপর গড়িয়ে ফেলে দিল নীচে। এতক্ষণে থাকবার জায়গাটা একটু পরিষ্কার করা গেছে। মড়াটা সরিয়ে ফেলে ভালোই হয়েছে। শাভালের সঙ্গে কোনো অবস্থাতেই থাকা চলে না।

ঝপ্ করে দেহটা জলে পড়ল। ছিটকে উঠল অজস্র জলকণা। তার মানে ঢালের নীচের বড় গর্তটাও ইতিমধ্যে জলে ভরে গেছে। হ্যাঁ, ওই তো দেখা যাচ্ছে, উপচে ওঠা জল গ্যালারীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সির্পিল ভঙ্গিতে।

এখন বেঁচে থাকবার যুদ্ধ শুরু করতে হয়েছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে। শেষ বাতিটা জ্বালিয়েছে ওরা। তেল ফুরিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। এদিকে আবছা আলোয় দেখা যাচ্ছে জলও বাড়ছে। প্রথমে গোড়ালি ডুবলো, তারপর হাঁটু পাথুরে পথটা ওপরে উঠে গেছে ক্রমশ। কোনো রকমে নিজেদের ক্লান্ত দেহটা আরও ওপরে টেনে তুললো তারা—তবু কয়েক ঘণ্টা সময় পাওয়া গেল। জলও পিছিয়ে নেই। একটু পরেই কোমর জল। পাথুরে দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে ভয়ার্ত চোখে দেখছে তারা—জল বাড়ছে, বাড়ছে, বাড়ছে। আরও খানিক বাড়লেই গলা পর্যন্ত, তারপরই সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। উঁচু জায়গায় বাতিটা রাখা আছে। তার নরম হলদেটে আলোয় দেখা যায় কালো জলে ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ উঠছে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঘূর্ণি, অন্ধকার রাত। এই শক্ত ভিজে মাটিতেই হয়তো দু'জনকে শেষ ঘুম ঘুমোতে হবে—নতুন দিনের সোনালী সূর্যের স্বপ্ন দেখতে দেখতে।

এতিয়েন চাপা গলায় নিজের ভাগ্যকে অভিসম্পাত দিচ্ছিল।

ক্যাথরিন তার দিকে সরে এসেছে অনেকখানি। দেওয়ালে কালো কালো ছায়া

দেখে ভয় পেয়েছে বোধহয় শান্ত গলায় সে পুরনো প্রবাদবাক্য উচ্চারণ করল : 'মৃত্যু এসে বাতিটা এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দেবে '

সব জেনেও তো পাল্লা লড়তে হয় প্রতিকূলতার সঙ্গে। বাঁচার তীব্র, অদম্য আকাঙ্ক্ষাই তাদের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শক্তি যোগাবে। বাতির আংটা দিয়ে দেওয়ালে আঘাত করতে লাগল এতিয়েন। নখ দিয়ে আঁচড়াতে লাগল ক্যাথরিন—যদি কোনোভাবে সঙ্কেত পাঠানো যায়। উঁচু একটা পাথরের ধাপে দু'জনে পাশাপাশি বসল, পা ঝুলিয়ে, পিঠ বেঁকিয়ে--বাধ্য হয়েই, কারণ ছাদ এত নীচু যে সোজা হয়ে বসা যায় না। এখন শুধু পায়ের পাতাডোবা জল। একটু পরে গোড়ালি ডুবলো তারপর হাঁটু—ক্রমশই জল বাড়ছে। জল বাড়ার বোধহয় কোনো সীমাপরিসীমা নেই। ঠিকমতো বসাও যাচ্ছে না ভিজে স্যাঁতসেতে হয়ে গেছে জায়গাটা, সাংঘাতিক পিছল। শক্ত করে দেওয়াল আঁকড়ে ধরে বসে থাকতে হচ্ছে—হাত ফসকালেই মৃত্যু। বোঝাই যাচ্ছে, শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে—আর ওপরে ওঠবার জায়গাও নেই। কতক্ষণ এভাবে বসে থাকতে হবে তার কোনো স্থিরতা নেই। দু'জনেই ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত। বাতির আলো নিভে গেছে। অবশ্য অন্ধকার একটা উপকার করেছে—দু'জনকে জানতে দিচ্ছে না মৃত্যু কত তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে। কোথাও একটুও শব্দ নেই। জলে ডুবে গেছে সমস্ত খনি। প্রচুর জল ঢুকেছে গ্যালারীতে।

হিমশীতল নিস্তব্ধতার মধ্যে দিয়ে সময় কিন্তু বয়েই চলেছে—কতক্ষণ কেটে গেছে তার হিসেব নেই কোনো। আসলে ঠিক কতটা সময় যে এভাবে বন্দীদশায় কেটেছে তার কোনো আন্দাজ নেই ওদের। এত বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সময়ের হিসেব রাখাই দায়। ওরা ভাবছে দু'দিন—এক রাত ওরা বন্দী। আসলে কিন্তু পুরো তিন দিন হয়ে এল প্রায় এই অবস্থায়। উদ্ধার পাবার সব আশা শেষ কারণ কেউ তো জানেই না যে তারা কোথায় আটকে রয়েছে। আর জানলেই বা আসবে কোন পথ দিয়ে? যদি বা জল আর নাও বাড়ে, তাহলেও পেটের জ্বালায় দু'জনেই শেষ হয়ে যাবে। শেষবারের মতো চেষ্টা করে দেখা যাক সঙ্কেত পাঠিয়ে, কিন্তু দেওয়ালে ঠুকবার ওই পাথরটা যে জলের নীচে রয়ে গেছে। তাছাড়া শুনবেই বা কে।

হতাশভাবে বসে ছিল ক্যাথরিন। মাথার মধ্যে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে এভাবে ঘাড় গুঁজে বসে থাকার জন্য। হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠল।

—ওই শোনো।

প্রথমে এতিয়েন ভেবেছিল ক্রমশ বেড়ে ওঠা জলের আওয়াজ শুনে ভয় পাচ্ছে ক্যাথরিন। সে মিথ্যে সান্ত্বনা দিল।

—ওটা আমারই পায়ের আওয়াজ।

—না না, তা নয়। ঐ দিকে। একটু কান পেতে শোনো।

ক্যাথরিন কয়লার স্তরে কান পাতলো। এতিয়েনও। উত্তেজনায় দু'জনেরই নিঃশ্বাস বন্ধ। তারপর অনেক পরে পরে তিনটে টোকার আওয়াজ পাওয়া

গেল। খুব মৃদু আর অনেক দূরে। কিন্তু তবুও নিজেদের কানকে তারা বিশ্বাস করতে পারছিল না—সত্যিই কেউ সঙ্কেত পাঠাচ্ছে, নাকি কয়লায় চিড় ধরবার শব্দ? কি করেই বা জবাব পাঠানো যায়?

এতিয়েনের মাথায় প্রথম বুদ্ধি এল

—আমার কাঠের জুতোটা দিয়ে টোকা মারো

তাই করল ক্যাথরিন। খনি-মজুরদের চিরাচরিত সঙ্কেত আবার কান পাতলো তারা। ওই তো, আবারও একই শব্দ ফিরবার ভেসে এল কুড়িবার সঙ্কেত পাঠানো হল। কুড়িবারই উত্তর এল আনন্দে তারা ভেঙে পড়ল কান্নায়, পরস্পরকে বন্দী করল গভীর আশ্লেষে অবশেষে সঙ্গীরা উদ্ধার করতে আসছে! এত দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা সব ভুলে গিয়েছে উজ্জ্বল দু জনে—যেন এখনই পাথর সরিয়ে তাদের ওপরে টেনে তোলা হবে

ক্যাথরিন খুশীর হাসি হাসলো।

—কি ভাগ্যিস আমি দেওয়ালে কান পেতেছিলাম, বলো!

—হ্যাঁ, তোমার কান খুব সজাগ। আমি তো কিছু শুনতেই পাইনি

তারপর থেকে পালা করে দু'জনে সঙ্কেত পাঠাতে লাগলো। খানিক পরই কানে ভেসে এল শাবল গাঁইতির শব্দ। নিশ্চয়ই উদ্ধারকারী দল সুড়ঙ্গ কাটতে শুরু করেছে। প্রতিটি আওয়াজ উৎসুক হয়ে শুনছিল দু'জনে, কিন্তু ধীরে ধীরে আবার হতাশায় আচ্ছন্ন হল মন প্রথমে নিজেরাই মুক্তির সম্ভাব উপায়গুলো ব্যাখ্যা করছিল। রকিয়ার-এর দিক থেকে আসছে বন্ধুরা হয়তো তিনটে সুড়ঙ্গ কাটছে যাতে তাড়াতাড়ি উদ্ধার করা সম্ভব হয় এদের। কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় একটুক্ষণ চিন্তা করেই চুপ করে গেল দু'জনেই এতখানি গভীর পাথরের স্তর ভেদ করা কি মুখের কথা? মনে মনে তারা হিসেব করছিল মোট কতদিন লাগতে পারে কাজ শেষ হতে। এতদিন এইভাবে কি বেঁচে থাকা যাবে? অসম্ভব! মানসিক যন্ত্রণা বেড়েই যাচ্ছে ক্রমাগত। মাঝে মাঝে নির্মমভাবে সঙ্কেতধ্বনির প্রত্যুত্তর দিচ্ছে তারা পালা করে, কিন্তু সেও নিতান্ত অভ্যাসবশেই। শুধু এইটুকু জানিয়ে দেওয়া যে এই মুহূর্তে তারা বেঁচে আছে

আরও দু'দিন কেটে গেল। মোট ছ'দিন হল এইরকম অসহনীয় বন্দীদশা চলছে। হাঁটু পর্যন্ত জল। ঈশ্বরের অসীম কৃপা যে জল আর বাড়েনি। ঠাণ্ডা বরফগলা জলে সর্বক্ষণ ডুবে আছে পা। প্রতি মুহূর্তে মনে হয় এবার বুঝি খসে যাবে। মাঝে মাঝে ঘণ্টা খানেকের জন্য একটু পা তোলা যায় জল থেকে কিন্তু তাতে এমনই বেঁকে দুমড়ে বসতে হয় যে তখন মনে হয় পা ঝুলিয়ে বসাই ভালো। হাত পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরে যাচ্ছে। প্রতি দশ মিনিট অন্তর নড়েচড়ে ঠিক হয়ে বসতে হয়। যা পিছল পাথর! একবার হড়কে পড়লেই সব খতম! সমানে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে থাকার জন্য ঘাড়ে প্রচণ্ড ব্যথা। দিনে দিনে ভ্যাপসা গন্ধ হয়ে গেছে জায়গাটাতে। গুমোট গরম। বাতাস ভারী। কথা বললেও মনে হয় অনেক দূর থেকে কেউ ফিসফিস করে কিছু বলছে।

মাথার ভেতর সর্বক্ষণ ঝমঝম করে বাজনা বাজছে যেন। গরু ভেড়ার পাল যেন দিনের শেষে ফিরে যাচ্ছে। তাদের গলায় সুতোর বাঁধা ঘণ্টা দুলছে ঠুং ঠুং করে…।

প্রথম দিকে ক্যাথরিন ছটফট করত খিদের জ্বালায়। দু হাতে নিজের বুক খিমচে ধরত, যন্ত্রণায় ককিয়ে না ওঠা পর্যন্ত। মনে হত কেউ যেন সাঁড়াশি দিয়ে তার পেটটা ছিঁড়ে নিচ্ছে। এতিয়েনেরও একই অবস্থা। একদিন অন্ধকারে এতিয়েনের আঙুল ঠেকলো ঘুণধরা একখণ্ড নরম কাঠে। অল্প চাপ দিতেই খুলে এল সেটা। ক্যাথরিনকে তাই মুঠি ভরে খেতে দিল সে। নিজেও বাদ গেল না। পেটের জ্বালায় তাই গোগ্রাসে খেল মেয়েটা। দু দিন শুধু ঘুণধরা কাঠের টুকরো খেয়ে রইল তারা। যখন তা ফুরিয়ে গেল, তখন পাগলের মতো ভালো কাঠ ভাঙতে চেষ্টা করল—কিন্তু সেগুলো এত শক্ত! নিজেদের জামা কাপড় চিবিয়ে যদি খিদে মিটত! এতিয়েনের চামড়ার কোমর-বন্ধনীটা অবশ্য চিবিয়ে খানিক শান্তি মেলে। তাই টুকরো করে ভাগ করে খেল দু'জনে। হাজার হোক, চামড়া, কাঠ কিছু একটা চিবিয়ে তো মুখ, জিভ, দাঁত আর চোয়ালকে ব্যস্ত রাখা যায়। বেল্টটা পুরো খাওয়া হয়ে গেলে তারা জামা কাপড় চুষতে লাগল।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য সবই সয়ে যায়। এই উন্মত্ততাও কমে এল। এখন পেটে একটানা একটা ব্যথা শুধু সহ্য করে যেতে হয়। শরীর ধীরে ধীরে নির্জীব হয়ে যাচ্ছে অনেক আগেই হয়তো দু'জনেই শেষ হয়ে যেত যদি অপর্যাপ্ত জল না থাকত। আঁজলা ভরে শুধু তুলে খাবার অপেক্ষা। এখন বুকভরা এতই তৃষ্ণা যে সমস্ত জল খেলেও বুঝি পিপাসা মিটবে না।

সাতদিনের দিন ক্যাথরিন জল খেতে গেলে কিসে যেন তার হাত ঠেকলো।

—ছাখো তো এটা কি!

এতিয়েন অন্ধকারে জলে হাতড়াতে লাগল।

—বুঝতে পারছি না। বোধহয় ভাঙা ঘুলঘুলি একটা।

জল খাচ্ছিল ক্যাথরিন। কিন্তু আবার যেই জল তুলতে যাবে দু হাতে, তখুনি চেঁচিয়ে উঠল।

—এ তো ও, হায় ভগবান!

—কে?

—শাভাল! তুমি তো জানো। আমি ওর গোঁফটা ছুঁয়েছি।

সত্যিই শাভালের দেহ। জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুলে ফেঁপে ভেসে উঠেছে। এতিয়েন হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করল। এই তো থেঁতো হয়ে যাওয়া মুখ, ভাঙা নাক। ভয়ে, বিতৃষ্ণায় সে কেঁপে উঠল। ক্যাথরিনের বমি এসে যাচ্ছে—মুখে যে জলটুকু ছিল, তা ফেলে দিল। যেন শাভালের রক্তই অঞ্জলিভরে পান করছিল ক্যাথরিন এতক্ষণ, নিজের অজান্তেই!

এতিয়েন বলল, দাঁড়াও, সরিয়ে দিই।

মৃতদেহটাকে এক লাথি মারলো। ভাসতে ভাসতে দূরে সরে গেল সেটা। কিন্তু একটু পরেই ঢেউ এসে ফিরিয়ে দিল আবার তাদেরই পায়ের কাছে।

—চলে যাও শাভাল, চলে যাও!

তিনবার ব্যর্থ হয়ে হাল ছেড়ে দিল এতিয়েন। থাকুক এখানে। বারবার স্রোতের টানে ফিরে ফিরে আসছে শাভাল। ও যাবে না—ক্যাথরিনদের ছেড়ে। দু'জনের মাঝখানে অদৃশ্য প্রাচীর তুলে দেবে সে। সারাদিন আর জলই খেল না দু'জন। কিন্তু পরের দিন প্রাণ ওষ্ঠাগত হল খিদেয়, পিপাসায়। দেহটাকে সরিয়ে জল খেল তারা। কি লাভ হল তবে শাভালকে মেরে? দু'জনের মাঝখানে ও তো রয়েই গেল দুর্লঙ্ঘ্য বাধার মতো। নিজের ঈর্ষা নিয়ে মরেও বেঁচে রইল অভিশাপের মতো এতিয়েন আর ক্যাথরিনের জীবনে। তারা এখন শান্তিতে একসঙ্গে মরতেও পারবে না—মৃত্যুর সময়ও শাভালের শব তাদের সঙ্গ নেবে।

কেটে গেল আরও দুদিন। প্রতিটি ঢেউ আছড়ে পড়ে আর এতিয়েন অনুভব করে শাভালের দেহ—যে লোকটাকে ক'দিন আগে নিজের হাতে মেরে ফেলেছে সে। প্রতিবারই সেই স্পর্শে কেঁপে উঠছে এতিয়েন। চোখে ভাসে শাভালের চেহারা—বিকৃত, রক্তাক্ত। স্মৃতি তাকে প্রতারণা করে: কে বলতে পারে, হয়তো শাভাল মরেনি। ইচ্ছে করে ভেসে গেছে। সুযোগ বুঝে পায়ে দাঁত বসিয়ে দেবে। ক্যাথরিন কখনও কাঁদে, কখনও অজ্ঞানের মতো পড়ে থাকে। শেষের দিকে তো এমন হল, সব সময়ই মেয়েটা যেন ঘোরের মধ্যে থাকে, চোখও খুলতে চায় না। পাছে টাল সামলাতে না পেরে জলে পড়ে যায় সেই ভয়ে এতিয়েনই তার কোমর জড়িয়ে ধরে বসে থাকে। এখন এতিয়েন একাই সঙ্কেতের উত্তর পাঠায়। কিন্তু তারও জীবনীশক্তি ফুরিয়ে আসছে। দেওয়ালে টোকা মারার ক্ষমতাটুকুও নেই মনে হয়। ওরা তো জানে এখানেই বন্দী হয়ে আছে মজুররা, তবে আর কেন কষ্ট করে বারবার উত্তর দেওয়া? প্রতীক্ষা এত দীর্ঘ হতে পারে? মাঝে মাঝে মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে যায়। কিসের অপেক্ষায় বসে আছে এতিয়েন, জীবনের না মৃত্যুর?

একটাই ভরসার কথা যে জল সামান্য নেমে যাওয়ায় শাভালের মৃতদেহ অন্য দিকে সরে গেছে। ন'দিন হল উদ্ধারকারীর দল কাজে লেগেছে। জল সরে যাওয়াতে ক্যাথরিন আর এতিয়েনও নেমে এসে অতিকষ্টে গ্যালারীর মধ্যে কয়েক পা হেঁটেছে। এমন সময় দূরে কোথাও বিস্ফোরণের শব্দ হল। দু'জনেই ছিটকে পড়ল। দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরল প্রচণ্ড আতঙ্কে। আবার হয়তো দুর্ঘটনা ঘটল কোনো। কিন্তু খানিকক্ষণ পরে আবার সব চুপচাপ। এমন কি শাবল আর গাঁইতির শব্দও বন্ধ হয়ে গেছে।

গ্যালারীর এক কোণে চুপ করে বসেছিল ওরা।

ক্যাথরিন মৃদু গলায় বলল, নিশ্চয়ই বাইরে এখন চমৎকার আবহাওয়া। চলো, আমরা বেরিয়ে যাই।

প্রথমে এতিয়েন বোঝাতে চেষ্টা করল ক্যাথরিনকে। বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকছে সে। খানিক পর কিন্তু তার নিজের মাথার ভেতরটাও কেমন গোলমাল হয়ে গেল। তারও ক্যাথরিনের মতোই দৃষ্টিবিভ্রম ঘটতে শুরু করেছে ক্ষণে ক্ষণে। সমানে প্রলাপ বকছে ক্যাথরিন। 'ওই তো নতুন কচি ঘাসের গন্ধ, খালের ধারে সোনালী শস্যক্ষেত'—পাখির মতো সুরেলা গলায় কথা বলে যাচ্ছে ক্যাথরিন।

—কি গরম এখানে! এস, আমরা দু'জন এইভাবেই একসঙ্গে কাটিয়ে দিই।

তাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরল এতিয়েন। বুকের মাঝে চুপটি করে শুয়ে রইল ক্যাথরিন। একটু পরে ঘোরলাগা গলায় বলল, আমরা কি বোকা বলো তো! জীবনের এতগুলো দিন নিজেদের ঠকিয়েই কাটিয়ে দিলাম! আমি তো সেই প্রথম দিন থেকেই তোমাকে ভালোবাসি, তুমিই তা বুঝতে চাইতে না। মনে পড়ে, রাতে আমরা দু'জনেই জেগে শুয়ে থাকতাম, যন্ত্রণায় ছটফট করতাম? পরস্পরের কামনায় নীরবে কাটিয়েছি রাতের পর রাত!

ক্যাথরিনের উচ্ছলতা সংক্রামিত হল এতিয়েনের মনেও

—মনে আছে, তুমি একদিন কি জোরে আমার দু গালে মেরেছিলে?

—তার কারণ, আমি তোমাকে ভালোবাসতাম। কিন্তু জানো, সব সময় মনকে শাসন করতাম এই বলে যে আমাদের মধ্যে সব সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে তবু কে যেন সব সময় কানে কানে বলত তোমার সঙ্গে কোনো না কোনো দিন দেখা হবে। আমরা শুধু সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম—শুধু একটাই সোনার সুযোগ, তাই না?

এতিয়েনের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শীতল স্রোত নেমে গেল। সে থামাতে চেষ্টা করল ক্যাথরিনকে।

—না না, কক্ষনো সব শেষ হয়ে যায়নি। তুমি এবার সুখ পাবে, শান্তি পাবে দেখো।

—তাহলে তুমি আমায় কক্ষনো চলে যেতে বলবে না তো? আমাদের এই ভালোবাসাটা তো সত্যি!

ক্যাথরিন এত অসুস্থ যে তার গলার স্বর ধীরে ধীরে অস্পষ্ট, মন্থর হয়ে আসছে। এবার সত্যিই ভয় পেল এতিয়েন। জোরে চেপে ধরল ক্যাথরিনকে নিজের বুকের সঙ্গে।

—তোমার কি খুব শরীর খারাপ লাগছে?

ক্যাথরিন অবাক চোখে তাকালো।

—না তো! কেন?

কিন্তু এই প্রশ্নেই ঘোর কেটে গেল ক্যাথরিনের। সে ভালো করে চোখ মেলে তাকালো। হাতের ছোট্ট মুঠিটা খুলতে আর বন্ধ করতে লাগল। তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

—এত অন্ধকার কেন?

সোনালী শস্যক্ষেত হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে সবুজ ঘাসের গন্ধ, পাখির গান,

উজ্জ্বল সূর্যালোক। সে ফিরে এসেছে জলমগ্ন খাদের গভীর অন্ধকারে, রূঢ় বাস্তবে। এতক্ষণের বিকার কেটে গেল। ফিরে এল ছোটবেলার সংস্কার ওই তো বুড়ো মজুর এগিয়ে আসছে কালো হাত বাড়িয়ে, সব দুষ্টু মেয়েদের ঘাড় মটকে দেয়।

--শোনো, শুনতে পাচ্ছো শব্দটা?

না। আমি কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না।

—হ্যাঁ। আমি বলছি বুড়োটা এসে গেছে। ওই তো ওখানে! মাটি আমাদের মা! তার বুকে শাবল দিয়ে আঘাত করেছি আমরা। তাকে রক্তাক্ত, বিদীর্ণ করেছি। সেই পাপের শাস্তি পেতেই হবে। বুড়োটা আমাদের শাস্তি দেবে। অন্ধকারের চেয়েও কালো ওর শরীর। আমি ভয় পাচ্ছি এতিয়েন। আমার বড় ভয় করছে।

কথা থেমে গেল ক্যাথরিনের। তার সমস্ত শরীর সজোরে কাঁপতে লাগল। তারপর ফিসফিস করে বলল, না তো, বুড়োটা নয়। অন্য একজন।

—কে সে?

—ওই যে, যাকে আমরা মেরে ফেললাম। ও তো এখনও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে!

আধঘুমে স্বপ্নের মধ্যে শাভালকে দেখে চমকে চমকে ওঠে ক্যাথরিন। পুরনো দিনের ছবি ভেসে ওঠে—বিষাদমধুর স্মৃতি। শাভাল তার ওপর অমানুষিক অত্যাচার করেছে, তাকে নিষ্ঠুরের মতো দখল করেছে। দস্যুর বর্বর আলিঙ্গনে নিষ্পিষ্ট হয়েছে তার পাখির মতো হালকা দেহটা।

—ও আসছে এতিয়েন! আমাদের কিছুতেই শান্তিতে একসঙ্গে থাকতে দেবে না। সেই পুরনো হিংসেয় জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। ওকে চলে যেতে বলো। আমি তোমার কাছে থাকতে চাই।

এতিয়েনকে পাগলের মতো জোরে আঁকড়ে ধরল ক্যাথরিন, তারপর পরিপূর্ণ আবেগে চুমু খেল।

অন্ধকার মরে যাচ্ছে, ওই দেখা যায় সূর্য! খিলখিল করে হেসে উঠল ক্যাথরিন। কুমারী মেয়ের প্রথম প্রণয়ের ভীরু স্পন্দন তার বুকে। এতিয়েন গ্রহণ করল ক্যাথরিনকে পরিপূর্ণভাবে, উদ্বেল প্রেমে, পরম মমতায়। এই কাদামাখা পাথুরে মেঝেতে রচিত হল তাদের বাসরশয্যা, মৃত্যুর প্রহরায়। এই সুখটুকুই পরম আবেগে বিন্দু বিন্দু করে নিংড়ে নিল দু'জনে—সুধার পাত্র আজ পরিপূর্ণ।

এরপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা নির্জীবের মতো বসে রইল এতিয়েন। তার হাঁটুতে মাথা রেখে শুয়ে আছে ক্যাথরিন। এতিয়েন ভেবেছিল অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে মেয়েটা। হঠাৎ গায়ে হাত পড়তেই চমকে উঠল সে—বরফের মতো ঠাণ্ডা!

ক্যাথরিন মারা গেছে! তবুও একটুও নড়ল না এতিয়েন—আহা যদি ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে! পরম আবেশে সে লালন করতে লাগল ক্যাথরিনের স্মৃতি। একটাই দুঃখ, ক্যাথরিনের পরিপূর্ণ নারীত্বকে প্রথম মর্যাদা দিয়েও তাকে এতিয়েন তার সন্তানের মাতৃত্বে অভিষিক্ত করতে পারলো না। এই অতল গভীর অন্ধকারে অকালে ঝরে

গেল—জীবনের কাছে সামান্য পাওনার আকাঙ্ক্ষাটুকু বুকে নিয়ে। কত আশা ছিল সুখের, ভবিষ্যতের··· । আস্তে আস্তে এতিয়েনের শক্তি ফুরিয়ে আসছে, সেও কেমন ঝিমিয়ে পড়ছে···শুধু মাঝে মাঝে হাত দিয়ে অনুভব করছে ক্যাথরিনের শীতল অস্তিত্বটুকু। সমস্ত কিছু ডুবে যাচ্ছে ক্রমশ, এমন কি অন্ধকারও। কোথায় আছে এতিয়েন? শুধু মাথার মধ্যে একটা শব্দ হচ্ছে অনবরত, সেই শব্দটা বাড়ছে। উত্তর দেবার ক্ষমতা নেই তার। তবে কি ক্যাথরিন হাঁটছে হালকা পায়ে কাঠের জুতো পরে?

এইভাবে কেটে গেল আরও দুটো দিন। ক্যাথরিনের শরীর কোলে নিয়ে, তার কোমল চুলে আস্তে আস্তে বিলি কাটছিল এতিয়েন। 'লক্ষ্মী মেয়ে, ঘুমোও তুমি। এই তো আমি পাশেই আছি···'

ঘোর কেটে গেল। কথাবার্তার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে যেন। পায়ের কাছে গড়িয়ে আসছে ছোট বড় পাথরের টুকরো, একটা বাতি···

কেঁদে উঠল এতিয়েন—চোখ কচলে তাকালো টিমটিমে আলোটার দিকে। কই, সে তো স্বপ্ন দেখছে না! তাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে বন্ধুরা, মুখে চামচ করে স্যুপ খাইয়ে দিল কেউ। এই তো রকিয়ার গ্যালারী। নেগ্রেল সামনে দাঁড়িয়ে। দু'জনেই পারস্পরিক আক্রোশ ভুলে দু'জনকে জড়িয়ে ধরল। কেঁদে উঠল বিহ্বল আনন্দে, জীবন ফিরে পেয়ে।

বাইরে ক্যাথরিনের শবদেহের পাশে বিরামহীন আর্তনাদ করে চলেছে মায়ু-গিন্নী। অন্য কয়েকটা মৃতদেহও উদ্ধার করা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে শাভালের ক্ষতবিক্ষত দেহটাও আছে। সবাই ধরে নিয়েছে খাদে পাথরের আঘাতেই প্রাণ হারিয়েছে সে। এই ভাবেই মারা গিয়েছে আরও দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক মজুর আর একটা অল্পবয়েসী ছেলে। তাদের মাথা ফেটে চৌচির, পেট ফুলে ঢোল। উপস্থিত মেয়েরা এই মর্মন্তুদ দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে পাগলের মতো নিজেরা নিজেদের জামা-কাপড় ছিঁড়তে লাগল। শরীর ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল নখের আঁচড়ে।

বাইরে নিয়ে আসা হল এতিয়েনকে। অল্প অল্প করে তার চোখে আলো সইয়ে নেওয়া হয়েছে। তাকে খেতে দেওয়া হল। চেহারা একেবারে কঙ্কালসার। মাথার সমস্ত চুল বরফের মতো সাদা। দেখে চোখের জল চাপতে না পেরে মুখ ঘুরিয়ে নিল সকলে। এমন কি মায়ু-গিন্নীও কান্না ভুলে বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল এই অচেনা মানুষটার দিকে।

* * * *

ভোর চারটে। এপ্রিল মাস। রাতে ঠাণ্ডা পড়ে বেশ। বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে শীত ভাবটা কেটে যায়। তখনও আকাশে তারাদের ভীড়। এদিকে পূবদিকে লালচে নরম সূর্য উঠি-উঠি করছে। মৃদুমন্দ বাতাস বইছে।

এতিয়েন ধীরে ধীরে ভঁদামের রাস্তায় হাঁটছিল। ছ' সপ্তাহ তাকে থাকতে হয়েছে মঁস্যুর হাসপাতালে। এখনও খুবই রুগ্ন আর রক্তশূন্য হলেও পায়ে হেঁটে যাবার ক্ষমতাটুকু অন্তত ফিরে পেয়েছে। কোম্পানি প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি, বিপর্যয় সহ্য করে

এখন খুঁকছে—একে একে মজুরদের ছাটাইও করা হয়েছে এবং যথারীতি এতিয়েনও বাদ যায়নি। তাকে বলা হয়েছে অন্যত্র কাজ খুঁজে নিতে। উপদেশ দেওয়া হয়েছে এখন যেন খনির কাজকর্ম কোথাও না করে, তাহলে শারীরিক ক্ষতির সমূহ সম্ভাবনা। কর্তৃপক্ষ মিষ্টি কথায় বিদায় করলেন তাকে—অবশ্য একশো ফ্রাঁ বকশিশসমেত। কিন্তু একশো ফ্রাঁ হাত পেতে ভিক্ষে নেয়নি সে। প্লুশার তাকে চিঠি দিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছে প্যারিসে। টাকাও পাঠিয়েছে রাহাখরচ বাবদ। অর্থাৎ পুরনো স্বপ্ন সফল হয়েছে এতিয়েনের। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে আগের দিন রাতে বঁজোয়াতে বিধবা দিস্যিরের বাড়িতে রাত কাটিয়ে এখন বিদায় নেবার পালা প্রিয় বন্ধুদের কাছ থেকে—সকাল আটটায় মার্শিয়েন থেকে ট্রেন ধরতে হবে।

ভোরের নরম রোদ্দুরে গা ডুবিয়ে পথের ওপর খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল এতিয়েন। কি যে ভালো লাগছে প্রথম বসন্তের মিষ্টি বাতাসে বুক ভরে শ্বাস নিতে ধরিত্রীও জেগে উঠছে ধীরে ধীরে সূর্যের সঙ্গে। আবার সে হাঁটতে শুরু করল। ঠুকঠুক করে গাছের ছড়ি দিয়ে আঘাত করতে লাগল মাটির বুকে। রাতের অন্ধকার কেটে দূরে ঘরবাড়ি একটু একটু করে স্পষ্ট হচ্ছে হাসপাতালে কারুর সঙ্গে তার দেখা হয়নি। শুধু একদিন মায়্য-গিন্নী তাকে দেখতে এসেছিল। এতিয়েনের ধারণা তারপর সকলের চাপে পড়েই সে আসা বন্ধ করে। আসলে এতিয়েন জানে না যে দুশো চল্লিশ নম্বর কলোনীর সবাই 'জঁা-বার'-এ কাজে লেগেছে এবং মায়্য-গিন্নীও বাদ যায়নি।

ধীরে ধীরে জনহীন রাস্তায় প্রাণের স্পন্দন দেখা দিল। দলে দলে বিবর্ণ চেহারার মানুষ পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। কোম্পানি নাকি নিজের আখের গোছাতে শুরু করেছে। আড়াই মাস পরে অভাবের জ্বালা। মজুররা যখন বাধ্য হয়ে খনিতে ফিরে যায়, তখন নতুন বেতনক্রমই কার্যকরী করার ব্যবস্থা করা হয়—টিম্বারিং-এর জন্য আলাদা পয়সা। এই রকম চালাকি করে মাইনে কমাবার বন্দোবস্তে মজুররা ক্ষুব্ধ কারণ সহকর্মীদের রক্তের বিনিময়েও নিজেদের ন্যায্য দাবীগুলো আদায় করা গেল না। বাধ্য হয়ে সকলে নতি স্বীকার করেছে পুরোদমে কাজ শুরু হয়ে গেছে অনেক জায়গায় মিড়ু, মাদলেন, ক্রেভক্যর আর লা ভিক্তোয়ার—প্রতিটি জায়গায় ভোরের কুয়াশা ভেদ করে গরু ভেড়ার পালের মতো মজুররা চলেছে, মাটির সঙ্গে মিশে। সেই কশাইখানার দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। তারা কাঁপছে। পাতলা সুতীর জামা ভেদ করে হিমেল হাওয়া ছুঁচ বিঁধিয়ে দেয় শরীরে দুহাত বুকের ওপর জড়ো করা। শার্ট আর কোটের মাঝখানে রাখা দশ নাইটা উঁচু হয়ে আছে। একজনের মুখেও হাসি নেই আনন্দের ছোঁয়া নেই। ভালোভাবে নজর করলে দেখা যায় প্রত্যেকের চোয়াল অসহায় আক্রোশে দৃঢ়সংবদ্ধ, চোখে উপচে পড়া ঘৃণা। শুধু পোড়া পেটের জ্বালায় মাথা নীচু করে আজ খনিতে ফিরে যেতে হচ্ছে।

খনির যত কাছে আসছিল এতিয়েন, ততই মজুরের সংখ্যা বাড়ছিল। বেশীর ভাগই একলা হাঁটছে। যারা দল করে, তারাও সারবদ্ধভাবে চলছে। এখনই ক্লান্তিতে ভেঙে পড়া, নিজেদের প্রতি বিন্দুমাত্র উৎসাহবিহীন। একজন বুড়ো ঠকঠক

করে চলেছে। তার পাকা ভুরুর নীচে চোখজোড়া যেন জ্বলন্ত কয়লার টুকরো। আর একজন অল্পবয়েসী কিন্তু এখনই নুয়ে পড়া চেহারা। টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছে। বুকটা ওঠানামা করছে হাপরের মতো। অনেকে কাঠের জুতোজোড়া হাতে নিয়ে চলেছে। তাদের মোজা-পরা পায়ের শব্দ কানেই আসে না। অন্তহীন মিছিল শুধু—তাদের চোখে মুখে প্রতিহিংসার আলো, যুদ্ধের প্রতিজ্ঞা।

এতিয়েন যখন 'জঁ-বার'এ এসে পৌছল তখন আলো ফুটেছে তবে রাতের বাতিগুলো সব নেভানো হয়নি। কালচে বাড়িগুলোর মাথায় বড নিকাশী পাম্পের সাদাটে মাথাটা। চালাঘরের পাশের সরু রাস্তা দিয়ে সে খাদের মুখে এসে পৌছল।

নীচে নামবার জন্য তৈরি হচ্ছে সকলে। লকার-রুম থেকে এসে জমা হচ্ছে একে একে। এক মুহূর্ত চুপ করে রইল এতিয়েন। টবগুলো ব্যস্ত হাতে সরাচ্ছে কেউ। মেঝেতে লোহার পাতে ঘষা লেগে ঠনঠন করে আওয়াজ হচ্ছে-- আবার রাক্ষুসে দৈত্যটা হাঁ করে রয়েছে মানুষের মাংসের লোভে। খালি খাঁচাগুলো উঠে আসছে, তারপর দৈত্যটার রসদ বোঝাই করে নেমে যাচ্ছে নীচে। দুর্ঘটনার পর থেকেই খনি সম্বন্ধে কেমন যেন আতঙ্ক হয়ে গেছে এতিয়েনের। এই খাঁচাগুলোকে বোঝাই হয়ে নীচে নামতে দেখে পেটের ভেতরে পাক দিয়ে ওঠে। এই দৃশ্য সে সহ্য করতে পারে না। চোখ ফিরিয়ে নিল এতিয়েন।

বড় শেডটায় আবছা অন্ধকার। টিমটিম করে আলো জ্বলছে। একটাও চেনা মুখ দেখতে পাচ্ছে না এতিয়েন। মজুররা বাতি হাতে অপেক্ষা করছে। তারা জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল এতিয়েনের দিকে। অপ্রস্তুতভাবে মুখ ঘুরিয়ে নিল এতিয়েন। সবাই তো চেনে তাকে, নাম শুনেছে নিশ্চয়ই। কিন্তু এতগুলো চোখ তার দিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে রয়েছে—তাতে ঘৃণা নেই, অবজ্ঞা নেই, রয়েছে অজানা ভয়ের আভাস। লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে মজুরদের মুখ—তারা ভাবছে এতিয়েন তাদের নীরবে ভর্ৎসনা করছে ভীরু কাপুরুষ বলে। দুঃখে ভরে উঠল মন, এতিয়েন ভুলে গেল এরাই তাকে বিদ্রূপ করেছে, পাথর ছুঁড়েছে। আবার সে স্বপ্ন দেখতে শুরু করল — এরাই হবে রূপকথার নায়ক। পুঁজিবাদ ধ্বংস হোক।

একটা খাঁচা ভর্তি হয়ে নীচে নেমে গেল। এতক্ষণে অপেক্ষমান একজনকে চিনতে পারলো এতিয়েন, যে বলেছিল আত্মসমর্পণ করবার আগে সে বিষ খেয়ে মরতেও রাজী।

আহত গলায় এতিয়েন বলল, শেষ পর্যন্ত তুমিও?

অপ্রস্তুত হল লোকটি। অস্পষ্ট গলায় বলল, আমার কিছু করার ছিল না। আমি বিবাহিত। স্ত্রী-পুত্র, পরিজন যে আমারই মুখ চেয়ে রয়েছে।

পরের দলের প্রত্যেককেই এতিয়েন চেনে।

—তুমিও! তুমিও! তুমিও!

সবাই লজ্জারুণ মুখে বলল, আমার মা · ছেলেমেয়ে·· কিছু খেয়ে বাঁচতে হবে তো।

খাঁচাটা উঠতে বড় বেশী দেরি হচ্ছে। নিজেদের পরাজয়ে ক্ষুব্ধ, লজ্জিত মজুররা একে অন্তের দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারছিল না।

এতিয়েন বলল, মায়্যা-গিন্নীর খবর কি ?

কেউ এ কথার উত্তর দিল না। একজন ইঙ্গিতে জানিয়ে দিল, 'ও আসছে।' অনেকেই হতাশায় কাঁধ ঝাঁকালো। 'আহা বেচারী! কি দুর্দশার মধ্যেই না দিন কাটাতে হচ্ছে!' কিন্তু স্তব্ধতা অটুট।

বিদায় নেবার জন্ম হাত বাড়ালো এতিয়েন। সবাই আন্তরিকভাবেই করমর্দন করল। নীরবে শক্ত করে ধরে চাপ দিল তার হাতে—মালিকপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণের তিক্ত কষায় স্বাদ মুহূর্তে সঞ্চারিত হল প্রত্যেকটি মনে, শরীরে—হয়তো কোনোদিন প্রতিহিংসার আগুন আবার জ্বলে উঠবে।

খাঁচাটা উঠে এল। মজুর বোঝাই হয়ে আবার হারিয়ে গেল নীচে।

পিয়েরোঁ এসে পৌঁছল। তার মাথার চামড়ার টুপিতে খোলা বাতি লাগানো। পদোন্নতি হয়েছে এক সপ্তাহ হল সে এখন একজন ডেপুটি। আর তাতেই তার মাথাটি গেছে বিগড়ে। বিরক্ত হয়ে অন্য মজুবর। তাকে পারতপক্ষে ঘাঁটায় না, এড়িয়ে চলে। এতিয়েনকে দেখে চমকে গেলেও যখন কাছে এসে শুনল সে বিদায় নিতে এসেছে, স্বস্তির নিঃশ্বাস গোপন করতে পারলো না পিয়েরোঁ। তার সঙ্গে গল্প করতে শুরু করল। তার বউ নাকি এখন একটা শুঁড়িখানা চালায়। কর্তৃপক্ষ কি উদার যে তার গিন্নীকে কাজটার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। হঠাৎ কথা থামিয়ে বুড়ো মুক্যকে কাজে গাফিলতির জন্ম বকাঝকা করতে শুরু করল পিয়েরোঁ। মাথা নীচু করে সব শুনল বুড়ো। তারপর চলে যাবার আগে এতিয়েনের হাত দুটো জড়িয়ে ধরল হার্দিক উষ্ণতায়, ভবিষ্যতে বিপ্লবের প্রতিজ্ঞায়। গভীরভাবে বিচলিত হল এতিয়েন। আপ্লুত হল আবেগে। ছেলেমেয়ে হারিয়েও মুক্য কোনো অভিশাপ তো দিল না তাকে! ধীরে ধীরে খাদের দিকে এগিয়ে গেল বুড়ো।

এতিয়েন পিয়েরোঁকে জিজ্ঞেস করল, আজ মায়্যা-গিন্নী আসবে না ?

প্রথমে পিয়েরোঁ এমন ভাব করল যেন বোঝেইনি কথাটা—কারণ তার কাছে ঐ মেয়েমানুষটা ভীষণ অপয়া। সকালবেলা নাম পর্যন্ত মুখে আনতে নেই। বাজে ছুতোয় পাশ কাটাচ্ছিল সে কিন্তু হঠাৎ কি মনে হতে জবাব দিল, কে, মায়্যা-গিন্নী ? ওই তো এসে গেছে!

লকার-রুম থেকে বাতি হাতে বেরিয়ে এল ক্যাথরিনের মা। প্যাণ্ট আর কুর্তা পরনে। মাথায় টুপি। কোম্পানি তার অসহায় অবস্থা বিবেচনা করে তাকে এই চল্লিশ বছর বয়সে খনিতে কাজে নামতে অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু কয়লা তোলবার মতো পরিশ্রমসাপেক্ষ কাজ সে করতে পারবে না। তাই বাতাস চলাচল করবার নতুন হাত-ঘুলঘুলিটা চালাবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাকে, উত্তরের গ্যালারীতে। বাতাস সেখানে বয় না বললেই চলে। সেখানে দশ ঘণ্টা একটানা পিঠ বেঁকিয়ে কাজ করে যেতে হয়, চল্লিশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায়। গায়ের চামড়া যেন পুড়ে ঝলসে যায়,

পুরুষের পোশাকে দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্যাথরিনের মা। খাদের জল পড়ে তার পেট আর বুকের খানিকটা জায়গা ভিজে গেছে। এতিয়েন এত বিচলিত হয়ে পড়ল যে কথা খুঁজে পেল না। এমন কি বিদায় নেবার কথাটাও জানাতে দ্বিধা হল তার।

অনেকক্ষণ পরে মায়ু্য-গিন্নী বলল, এখানে আমাকে দেখে অবাক হয়েছ, না? সত্যিই তো, আমি বলেছিলাম—আমার পরিবারের যে কেউ মাথা নীচু করে আবার খনিতে আসবে, তাকে নিজের হাতে আমি গলা টিপে মেরে ফেলব। আজ তাই আমারই আত্মহত্যা করা উচিত। তাই করতাম, জানো, তাই করতাম যদি বাড়িতে বুড়ো আর ওই দুধের শিশুগুলো না থাকত।

ক্লান্ত গলায় টেনে টেনে কথা বলছিল সে। কোনো কৈফয়ত নয়, অবস্থার বিবরণ মাত্র। উপোস করে করে যখন আর চলছিল না, তখনই মনস্থির করে সে কাজে আসে। নইলে বাড়ি থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে কোম্পানি বের করে দিত।

—বুড়োর খবর কি?

—এখনও বড় চুপচাপ। কিন্তু মাথার ঠিক নেই। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়নি, সে তো জানো। সকলে ওকে পাগলাগারদে রাখতে চেয়েছিল কিন্তু আমি তা হতে দিইনি। তাহলে খাবারে বিষ দিয়ে ওকে ঠিক মেরে ফেলত ওরা। কিন্তু অন্যদিক থেকে ক্ষতি হয়েছে। ওর অবসরভাতা বন্ধ হয়ে গেছে—একজন ভদ্রলোক তো বললেন, এখন ওকে বেঁচে থাকবার জন্য টাকাপয়সা দেওয়াটা নাকি রীতিমতো অনৈতিক হবে।

—জ্যঁল্যাঁ কি কাজ করছে?

—হ্যাঁ। ওকে খনিতেই একটা কাজ দেওয়া হয়েছে। তবে মাটির ওপরে। মাইনে কুড়ি স্যু। না না, আমি কোনো অভিযোগ করতে চাই না। কর্তৃপক্ষ খুবই মহানুভব। আমরা মা ছেলেতে মিলে পঞ্চাশ স্যু পাই। শুধু ছ'টা পেট, নইলে এতেই দিব্যি চালিয়ে নেওয়া যেত। এখন তো এস্তেলও খেতে শিখেছে। সবচেয়ে মুশকিল হল যে লেনোর আর অঁরির খনিতে কাজে লাগতে লাগতে আরও ছ-সাত বছর দেরি।

এতিয়েন আর ক্ষোভ গোপন করতে পারল না।

—ওদেরও শেষ পর্যন্ত খনিতে আনবে?

মায়ু্য-গিন্নীর ফ্যাকাশে গালে রক্তের ছোঁয়া। তার চোখ দুটো ধকধক করে জ্বলছে। অসহায়ভাবে ভাগ্যকে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কি?

—কি করব বলো? ওদের বাপ-ঠাকুর্দার পথেই যেতে হবে। কপালের লিখন! সবাই খনিতে তাদের জীবন দিয়েছে। ওরাই বা বাদ যায় কেন?

কয়েকজন মজুর এসে পড়াতে কথা থামালো সে। জানলার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়েছে। বাতির ঘেরাটোপ ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে ধূসর আলো। তিন মিনিট অন্তর অন্তর ইঞ্জিন চলার শব্দ। তার খুলে যাচ্ছে পাকে পাকে। খাঁচাগুলো মানুষ নিয়ে নামছে, উঠছে……।

পিয়েরোঁ বলল, সবাই তোমরা শীগগির কাজে এস! নইলে আজ সারাদিনে কিছু কাজ হবে না।

মায়্যু-গিন্নীর দিকে সে আড়চোখে তাকালো। সেদিকে দৃকপাত করল না ক্যাথরিনের মা। তিন তিনটে খাঁচা এদিকে নেমে গেছে। এবার চমক ভাঙলো তার।

এতিয়েনকে বলল, তুমি তাহলে চলে যাচ্ছ?

—হ্যাঁ, আজ সকালেই।

—তুমি ঠিকই করেছ। পারলে অন্য কোথাও চলে যাও। ভালোই হল তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে। তোমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই আমার। যখন আমার মাথার ঠিক ছিল না, তখন ইচ্ছে করত তোমায় খুন করি। কিন্তু আসলে তোমার কোনো দোষ ছিল না। দোষ আমাদের সকলের, আমাদের ভাগ্যের।

নিস্পৃহ গলায় কথা বলছিল মায়্যু-গিন্নী। তার স্বামীর কথা, ক্যাথরিন আর জাশারীর কথা। জলে ভরে উঠল তার চোখ দুটো শুধু ছোট্ট আলজিরের কথা বলতে গিয়ে। সেই পুরনো ছবি; স্মৃতি ব্যথাতুর করে তোলে মনকে।—'কখনও ভালো হবে না মালিক পক্ষের! এতগুলো তাজা মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে ওরা। মজুররা কিছু না করতে পারলেও আপনাআপনিই সব ধ্বংস হয়ে যাবে একদিন। সৈন্যরা যেমন করে মজুরদের মেরেছে, তেমনি নিষ্ঠুরতায় তাদের বন্দুক তুলে ধরবে শাসক সমাজের বুকের ওপর -পরিবর্তন আসবে একদিন। এত অবিচার অন্যায় অনাচার আর বেশীদিন চলবে না, চলতে পারে না। যদি ভগবান নাও থাকেন, শয়তান অন্তত মাথা চাড়া দিয়ে উঠে সব কিছু সমূলে ধ্বংস করে দেবে।'

নরম গলায় ধীরে ধীরে কথা বলছিল মায়্যু-গিন্নী। পিয়েরোঁকে কাছাকাছি আসতে দেখেই গলা চড়ালো।

—তোমার দুটো জামা, তিনটে রুমাল, একটা পুরনো প্যান্ট পড়ে আছে।

এতিয়েন হাত নাড়লো।

—আমি নতুন জামাকাপড় বানিয়ে নেব। ওগুলো তুমি রাখো। ছেলেদের কাজে লাগবে।

আরও দুটো খাঁচা নেমে গেছে। পিয়েরোঁ এসে সোজাসুজি এবার মায়্যু-গিন্নীকে বলল, ভাখো, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি। গল্প শেষ হয়নি এখনও!

পেছন ফিরে রইল মায়্যু-গিন্নী। এই বিশ্বাসঘাতকটাকে দেখলে মাথার ভেতরটা জ্বলে ওঠে। আর সবচেয়ে বড় কথা, এসব খবরদারী করা তো ওর কাজ নয়! সুতরাং সে দাঁড়িয়েই রইল। এক পাও নড়ল না।

এতিয়েন আর ক্যাথরিনের মা, দু'জনের কেউই কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। দু'জন দু'জনের মুখের দিকে চুপ করে তাকিয়ে থাকল। ব্যথায় ভরে উঠেছে মন, আজ এই বিদায়ের প্রাক্কালে।

শব কথার কথা হিসেবে মায়্য-গিন্নী বলে উঠল, লেভাকের বউ আবার সংসার পেয়েছে। লেভাক তো জেলে, এখন বুতলুই ওর স্বামী।

-বুতলু? ওঃ, তা তো হবেই!

—তোমায় কি বলেছি ফিলোমিন চলে গেছে?

—চলে গেছে! কোথায়?

—একজন মজুরের সঙ্গে। 'পা স্ত-কালে'তে। কি ভাগ্যিস, বাচ্চা দুটোকেও নিয়ে গেছে সঙ্গে করে। আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেই হয়েছিল আর কি! জানো, ওরা আমার নামে যা-তা বলছে। আমি নাকি তোমার সঙ্গে শুয়েছি পর্যন্ত। আমার স্বামী মারা যাবার পর যদি তাই ঘটত, তবে অবাক হবার কিছু ছিল না। অবশ্য যদি আমার বয়স অনেক কম থাকত, তবেই। তবে আমি খুব খুশী যে কোনো অবস্থাতেই আমাদের মধ্যে শুধু বন্ধুত্ব ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক দানা বেঁধে ওঠেনি। সেটা আমাদের দু জনের পক্ষেই খাবাপ হত।

—হ্যাঁ।

দু'জনের মধ্যে এটাই শেষ কথা। খাঁচাটা অপেক্ষা করে আছে। এইবার না গেলে জরিমানা হতে পারে। এতিয়েনের হাতটা ঝাঁকিয়ে চলে গেল মায়্য-গিন্নী। এতিয়েন তাকিয়ে রইল অকালে বুড়িয়ে যাওয়া, দারিদ্র্যের চাপে নিষ্পেষিত, রক্তশূন্য, দুর্বল এই মহিলাটির দিকে। শুধু সন্তানের জন্ম দিয়েছে বারবার, আর কি পেল জীবনে? শেষ করমর্দনে এতিয়েন অনুভব করেছিল দীর্ঘ স্নেহময় দিনগুলোর স্মৃতি. যেদিন আবার বিপ্লবের সূচনা হবে, সেদিনও মায়্য-গিন্নী তার পাশে এসে দাঁড়াবে— সেই নীরব আশ্বাস। এতিয়েন তার চোখে দেখেছে পরম বিশ্বাস আর নিশ্চিন্ততা। নতুন দিন না আসা পর্যন্ত বিদায়, বন্ধু!

অন্য আরও চারজনের সঙ্গে খাঁচায় উঠে বসল মায়্য-গিন্নী। ঘণ্টা বাজিয়ে খাঁচাটা নেমে গেল নীচে—শুধু তারটা দুলতে লাগল চোখের সামনে।

খনি ছেড়ে এতিয়েন বেরিয়ে এল। শেডের মধ্যে কয়লার স্তূপের ওপর বসে আছে জঁলাঁ। সে এখানে কাজ করে। দু পায়ের ফাঁকে কয়লার চাঙড় রেখে হাতুড়ি দিয়ে ভাঙছে। কয়লার কালো ধুলো উড়ছে চতুর্দিকে। ছেলেটার সর্বাঙ্গ মিহি কালো গুঁড়োয় ঢাকা। মুখ না তুললে তাকে হয়তো চিনতেই পারত না এতিয়েন। সেই বড় বড় কান, জলজ্বলে সবুজ চোখ! জোরে হেসে উঠে কয়লার চাঙড়ে বাড়ি মারলো আবার। একরাশ কালি উড়ে গেল।

বাইরে খোলা বাতাসে এসে দাঁড়ালো এতিয়েন। হাঁটতে হাঁটতে চিন্তা করছিল এতদিনের আশা, স্বপ্ন আর বিপ্লবের কথা। কি ভালোই না লাগছে মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে। সূর্য উঠছে দিগন্ত ছাড়িয়ে, আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে চতুর্দিক। জেগে উঠছে সমস্ত শহরতলী, নতুন দিন আসছে, সুখের দিন। পূর্ব থেকে পশ্চিমে আদিগন্ত বিস্তৃত ভূমি—সদ্য সূর্যস্নাত, সোনা রঙে ঝকঝক করছে। জীবনের নব অঙ্কুরোদগম হয়েছে আজ—ধরিত্রী উন্মত্ত, ব্যাকুল সেই জীবনের স্পন্দনে। পাখির

কলকাকলি, বনের মর্মর—বেঁচে থাকা এত আনন্দের। শত বসন্ত এমনিভাবেই ফিরে আসুক বারবার, নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে।

গতি মন্থর হল এতিয়েনের। দু চোখ ভরে শুধু প্রকৃতির রূপমাধুরী পান করবার অদম্য ব্যাকুলতা। নিজের কথা মনে হচ্ছে বারবার। এখন সে অনেক শক্তিমান, অনেক পরিণত, অনেক অভিজ্ঞ। খনির জীবন তাকে এক নতুন রহস্য উন্মোচনে সহায়তা করেছে। শিক্ষানবিসীর পালা শেষ—এবার সশস্ত্র বিপ্লবের শুরু। প্লুশারের মতো সমাজনায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারবে এতিয়েন, যার অসাধারণ বাচনশৈলীতে মুগ্ধ হবে সাধারণ মানুষ, স্বপ্ন দেখতে শিখবে আর সেই স্বপ্নের সফল রূপায়নের তাগিদে সংগ্রাম করতে গিয়ে পিছু হটবে না। বুর্জোয়া শাসকশ্রেণীর প্রতি অপরিসীম ঘৃণায় চোখ মুখ কুঞ্চিত হল তার। হয়তো তাকে দুঃস্থ মজুরদের মতো অসহনীয় জীবন কাটাতে বলা হলে আপত্তি জানানো বিচিত্র নয় এতিয়েনের পক্ষে, কিন্তু তবুও এইসব অসহায় মজুরদের প্রতি এক মমতামেশানো দুঃখবোধ তার মনে কাজ করে চলে অহরহ। সমস্ত পৃথিবীকে দেখাতে হবে, এই সব খেটে-খাওয়া মানুষেরা পাবে সুখের আশ্বাস, নতুন জীবন। মানবিকতা, পরার্থপরতার জয়গানে মুখর হোক ধরিত্রীর প্রতিটি ধূলিকণা, আর সেই ধর্মযুদ্ধে নেতৃত্ব দেবে এতিয়েন।

মিষ্টি সুরে ডাকতে ডাকতে একটা পাখি উড়ে গেল আকাশে। মুখ তুলে তাকালো এতিয়েন। রাতের অন্ধকার এখন সম্পূর্ণ অপসারিত, আকাশ মেঘমুক্ত। সুভারিন আর র‍্যাসনুরের কথা মনে পড়ল তার একটা কথা ঠিক, কোনো মানুষ সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নিতে চাইলে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। হয়তো সেইজন্যই আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থাও ব্যর্থ হল চরমভাবে সেখানেও সবাই যে নেতা হতে চেয়েছিল। তাহলে হয়তো ডারউইনের মতবাদই ঠিক। দুর্বলের বিরুদ্ধে সবলের সংগ্রাম অবিরত চলছে চলবে আর সেইমতো জীবন এগিয়ে চলবে উন্নতির পথে, সৌন্দর্যের দিকে। এই প্রশ্নই অহরহ জাগছে এতিয়েনের মনে। এখন একমাত্র উদ্দেশ্য নতুন সমাজ গঠন। যদি কোনো একটা শ্রেণীকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতেই হয় তবে তা হবে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সমাজ। সমূলে ধ্বংস হোক অভিজাত ও বিলাসী সম্প্রদায়। এতক্ষণে এতিয়েন বুঝতে পারল সশস্ত্র বিপ্লবেই সে বিশ্বাস করে। সেদিন রক্তস্নাত ধরিত্রী উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে মুক্তিসূর্যের উজ্জ্বল আলোয়, ঠিক যেমন করে এখন এই সকালবেলার সূর্য অরুণ রাগে রাঙিয়ে দিয়েছে দিগন্তব্যাপী নভোতলকে।

দিবাস্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে হেঁটে চলেছে এতিয়েন। চেনা পথের বাঁক—যেখানে দাঁড়িয়ে এতিয়েন মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ইন্ধন জুগিয়েছিল। আর আজ। মাথা নীচু করে মজুররা ফিরে গেছে খনিতে। আবার শুরু হয়েছে প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে তাদের উদয়াস্ত পরিশ্রম। এতিয়েন যেন শুনতে পাচ্ছে মাটি থেকে সাতশো মিটার নীচে শাবল আর গাঁইতির শব্দ—এইমাত্র যে সে দেখে এসেছে সহকর্মীরা জন্তুর মতো গাদাগাদি করে কয়লা তুলতে খাদে নামলো। হয়তো তাদের এই শ্রমিকবিপ্লব শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে, কলোনির প্রতিটি বাসিন্দা আজ কপর্দকহীন, কেউ কেউ নি[illegible]

'অমূল্য জীবনও বিসর্জন দিয়েছে, কিন্তু প্যারিস কোনোদিন ভুলবে কি ল্য ভোরুর আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে সেই বন্দুকের গুলির আওয়াজ? সাম্রাজ্যবাদের শরীরে এক দুষ্ট ক্ষতের মতো এই ব্যর্থ ধর্মঘটের স্থায়ী ছাপ থেকে যাবে। যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়ে গেছে—এখন শুধু তা শুরু হবার অপেক্ষা। সন্ধির কোনো প্রশ্নই ওঠে না। খনি-মজুররা তাদের সীমিত শক্তি আর সামর্থ্য নিয়ে সোচ্চার হয়েছিল শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে। ফ্রান্সের যাবতীয় শ্রমিক আজ ঐক্যবদ্ধ। তাই এই পরাজয় স্বস্তি আনেনি কোনো পক্ষের মনে—অস্থিরতাই বেড়েছে শুধু। সাময়িকভাবে যুদ্ধে জিতেও শাসক-সমাজ সন্ত্রস্ত ভবিষ্যতের কথা ভেবে—আপাতশান্ত মজুররা তবে কি কোনো নতুন পরিকল্পনা করছে? হয়তো কালই নতুন করে ধর্মঘট শুরু হবে আর তা স্থায়ী হবে অনির্দিষ্টকাল। অর্থাৎ বর্তমান শাসনব্যবস্থা নাড়া খেয়েছে সমূলে. শোষকশ্রেণীর পায়ের নীচে মাটি কাঁপছে, ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে পুরনো ধ্যানধারণা এইভাবে ঘুণধরা অবস্থার বুর্জোয়া সমাজ আর বেশীদিন টিঁকে থাকতে পারবে কি? হয়তো ল্য ভোরুর মতোই সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে অদূর ভবিষ্যতে!

এতিয়েন বাঁ দিকের মোড় ঘুরল। জোয়াজেল রোড। এইখানেই সে সকলকে নিরস্ত করেছিল গাস্ত-মারি ধ্বংস না করবার জন্য। প্রখর সূর্যালোকে দূরের খনি-গুলোর মাথা দেখা যাচ্ছে—ডানদিকে মিত্রু, পাশাপাশি ম্যাদলেন, ক্রেভকার। কাজ চলছে সর্বত্র। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে শাবল আর গাঁইতির শব্দ। সমস্ত মাঠ পথ আর বসতি যেন সূর্যের আলো মেখে হাসছে। প্রথমে বোঝা যায় না কিন্তু মন দিয়ে শুনলে ধরা পড়ে মাটির ব্যথাতুর দীর্ঘ নিঃশ্বাস, সে তো চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে কঠিন নিষ্ঠুর আঘাতে। আবার দ্বিধা জাগছে মনে। তবে কি হিংস্রতা কাম্য? উন্মত্ততা, আক্রোশ কি মুক্তির উপায়? সবই তো অর্থহীন ঠেকে মাঝে মাঝে। ধ্বংসের উল্লাস ছাপিয়ে অনুভূত হয় বিবেকের দংশন। কি অনাবশ্যক শক্তিক্ষয়। বরং তো মানুষ ধীরে ধীরে জয় করে নেবে, বিচারবুদ্ধির আলোয় সে নিজের ভালোমন্দ, সুখদুঃখ যাচাই করে নেবে। মায়্য-গিন্নী ঠিকই বলেছিল—একদিন সেই সোনালী দিন আসবে যেদিন সব মানুষ আইনত সমান আর ন্যায্য অধিকার ভোগ করবে সংঘবদ্ধ হয়ে গর্জে উঠবে অন্যায় আর অবিচারের বিরুদ্ধে। এই ভাবে লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ জয়ী হবে মুষ্টিমেয় কয়েক হাজার ধনীসম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের বিরুদ্ধে। সেদিন জন্ম নেবে সত্যতা আর সুবিচার।

ভঁদামের রাস্তা ছাড়িয়ে এতিয়েন বড় রাস্তায় এসে পড়ল। ডান দিকে মঁস্যু। ঢাল বেয়ে নেমে গেছে নীচে। সামনে ল্য ভোরুর ধ্বংসস্তূপ। সেখানে শুধু বিশাল শূন্য একটা গহ্বর। জল সরাবার কাজ চলেছে। দূরে দিগন্তে আবছা ভাবে নজরে আসে অন্য খনিগুলো, লা ভিক্তোয়ার, সেন্ট টমাস, ফ্যুত্রি ক্যাঁতে—তাদের বড় উঁচু চিমনি আর ফার্নেস—বাতাস কালো হয়ে যাচ্ছে কয়লার গুঁড়োয়। আরও ছ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হবে। আটটার ট্রেন ধরতে গেলে তাড়াতাড়ি পা চালানো দরকার।

নিও পায়ের নীচে মাটি কোপাবার শব্দ। সব সহকর্মীরা নীচে কাজ করছে। রো পথটা এতিয়েনকে অনুসরণ করে চলেছে তারা। এই বিস্তীর্ণ বীটক্ষেতের হয়তো শক্ত হাতে হাত-ঘুলঘুলির চাকা ঘুরিয়ে চলেছে মায়ার বউ। তার সের গরম হল্‌কা এসে লাগছে এতিয়েনের শরীরে—ডাইনে. বাঁয়ে, এই কতের নীচে শুধু বন্ধু আর বন্ধু!

সূর্য এখন অনেকটা উঠে এসেছে মাথার ওপরে। সমস্ত উত্তাপ আর আলো অকৃপণ হাতে ছড়িয়ে দিচ্ছে পৃথিবীর মাটিতে। উর্বরা ধরিত্রীর গর্ভে আজ জীবনের স্পন্দন—কুঁড়ি থেকে ফুল ফুটবে, সবুজ মখমলের মতো ঘাসে ভরে যাবে রুক্ষ মাটি। সব জায়গায় বীজ পুষ্ট হচ্ছে, বড় হচ্ছে। এর পর উপযুক্ত আলো আর তাপে তা উন্মীলিত হবে। শস্য রসসিক্ত হচ্ছে, জীবনের অঙ্কুরে সূর্য এঁকে দিচ্ছে সস্নেহ চুম্বন। মাটির নীচে ওই তো বন্ধুদের হাতিয়ারের শব্দ! ওরাও উঠে আসছে ওপরে, এগিয়ে আসছে নতুন জীবনের দিকে। এই যৌবনদীপ্ত বসন্তের সকালে, এই নবারুণরাগে রঞ্জিত দিনে হাতিয়ারের শব্দে রণিত হচ্ছে সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত। মানুষ খুঁজে পেয়েছে মুক্তির স্বাদ, ভবিষ্যতের ফসলকাটা শুরু হল আজ—মানবিক অধিকারবোধের তীক্ষ্ণ ধারালো কাস্তে দিয়ে। এই নবীন অঙ্কুর সুবিশাল মহীরুহ হয়ে তার শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত করে দিক পৃথিবীর সমস্ত মানুষের হৃদয়ে, যুগে যুগে, অন্তহীন সফলতার পবিত্র বারিসিঞ্চনে

জার্মিনাল সম্বন্ধে দু-চার কথা

জার্মিনাল শুধুমাত্র উত্তর ফ্রান্সের কয়লাখনির মজুরদের কাহিনী নয়। এমিল জোলার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল শ্রমজীবীদের দুর্বিষহ অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা, পুঁজিবাদ-সাম্যবাদের কঠোর সংঘাত এবং তৎকালীন শ্রমিক সম্প্রদায় কর্তৃক প্রচারিত বিভিন্ন ধরনের মুক্তিপন্থা সম্পর্কে বিশদভাবে বিবৃত করা। কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্যসাধনে একজন নিরপেক্ষ প্রত্যক্ষদর্শী প্রয়োজন, যার পরিশীলিত দৃষ্টি ও বিচারবুদ্ধির আলোয় সমস্যা ও সমাধান, দুই-ই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে—যে তার শিক্ষা আর যুক্তির জোরে এই সব খেটে-খাওয়া মানুষদের পাশে এসে দাঁড়াতে পারবে, সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে তাদের গর্জে উঠতে সাহায্য করবে বুর্জোয়া, ক্ষয়িষ্ণু সমাজের বিরুদ্ধে। তাই এতিয়েনের প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন ছিল জার্মিনালেরও। অর্থাৎ এতিয়েন উপলক্ষমাত্র, লক্ষ্য মানবিকতা।

জার্মিনাল সম্ভবত প্রথম সফল প্রয়াস, যেখানে সাধারণ মানুষের সংঘবদ্ধতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে শোষণের বিরুদ্ধে। দীর্ঘদিন অবহেলিত, পশ্বাধম জীবনযাপনের পর আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হয়েছে শ্রমিকসমাজ। এই কাহিনীর প্রতিটি ছত্রে তারই বিবরণ, যা এক মুহূর্তের জন্যও কঠোর বাস্তবতা থেকে বিচ্যুত হয়নি।